তন্দ্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়



শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৪১

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল

তিন টাকা

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং বাণীপ্রেস, ১৬নং হেমেন্দ্রসেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে সমরেন্দ্র ভূষণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

রেখা-চিত্র

শ্রীঅরবিন্দ

হে মহান্ !

কাল-আবর্ত্তনে যবে,—দেশমাঝে অজ্ঞানের গাঢ় আবরণ,
স্বার্থোন্মত্ত সবলের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি মাত্র নিয়োজিত দুর্ব্বলপীড়নে ;—
হিংসাদ্বেষ-অশান্তির প্লাবন বহিয়া যায়, সভ্যতার চারিসীমানায়,
দরিদ্রের জীবন বিকল, হাহাকারে উদ্বেলিত হয়ে উঠে যবে
তাপক্লিষ্ট ধরণীর এ বায়ুমণ্ডল, কোথা মুক্তি, কোথা প্রতিকার ?

কেন্দ্রে আদ্যা মহাশক্তি, সর্ব্বান্তরযামী, করুণায় হন বিচলিতা ;
সঙ্গে সঙ্গে মহান কল্যাণ-প্রসূ শুভইচ্ছা স্ফুট এক, তাঁহা হতে হয়ে উৎসারিত
ধেয়ে আসে ধরা পানে, উপযোগি শুদ্ধ দেহ করিয়া গ্রহণ সাধিতে তাঁহার ইচ্ছা,
শুনাতে অভয় বাণী পথভ্রষ্ট বিপন্ন সমাজে।

সেই তুমি ! তাঁরি ইচ্ছা মূর্ত্তিমান, আসিয়াছ—জানে মন্মিজন,
ঘুচাতে জাতির দৈন্য, জুড়াতে দুঃসহ গ্লানির জ্বালা। পাশবদ্ধ ভারতের কানে,
অভয়, দিয়েছ শক্তির বীজ ;—তারি সাথে আত্মসমর্পণ-যোগ, সিদ্ধির অমোঘ বাণী
মোরা ধন্যমানি, সকলের শ্রীঅরবিন্দ তুমি, গুরুরূপে প্রকট ভারতে।

মরলোকে হে চির অমর ! প্রদীপ্ত ভাস্কর তুমি ;—তোমাপাশে আমি
অতি অকিঞ্চন,—ভক্তি-অর্ঘ্য আজি এই "সাধুসঙ্গ" খানি মোর
তব-কর-কমলেতে করিয়া অর্পণ, সার্থক করিতে চাই জনম আমার।

লহ নমস্কার।

৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৮
কসবা

কয়েকটি কথা

১৩৪৬ সালে হিমালয়পারে কৈলাস ও মানসসরোবর ভ্রমণকাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে যখন প্রবাসীপত্রিকায় প্রকাশিত হইল ;—ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব যাঁরা অনুসন্ধিৎসু আমার আরও পর্য্যটন, বিশেষতঃ সেই সময়কার সাধুসঙ্গকাহিনী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রধানতঃ আমি চিত্রশিল্পী, আমার ধ্যানের বস্তু এবং তার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ কৌশল রং ও তুলির মধ্যদিয়ে ;—সাহিত্য তা থেকে ভিন্ন,—আমার মনে হয় এর পদ্ধতিও বড় সহজ নয়। তবে ঐ ভ্রমণবৃত্তান্তখানি যে অবস্থায় বেরিয়েছিল, তাকে একটা প্রেরণা বলেই মনে হয়। কারণ, তারপর আমি যে আর কখনও সাহিত্যে হাত দিতে পারবো, তা ছাড়া আমার আরও লেখবার বিষয় যে আছে তাও তখন আমার কল্পনাতে ছিল না। আরও কথা, তখন চিত্রকলা আমার উপজীবিকা ছিল না। কারণ, তখনকার দিনে সংসারকে ভয়, সেইহেতু সংসার থেকে পালিয়েই বেড়াতাম আর তাই এতটা ভ্রমণ-অবকাশে নানা প্রকার সাধুসঙ্গের যোগাযোগ ঘটে ছিল। কিন্তু এখন আমি একেবারে ডাহা সংসারী, ছবিই আমার অবলম্বন, তাই নিয়েই মগ্ন। উপজীবিকা শুধু নয়, আমার কতকগুলি বিশেষ ধ্যানের বিষয় ছিল তাই ফোটাবার চেষ্টায় দিন যাপন করি। আমি তখন স্বাধীন ছিলাম,—যেহেতু বাইরে কোথাও কোন চাকরী বা বাঁধা কাজ তখন ছিল না।

এই সূত্র ধরে একদিন উত্তরার পরিচালক শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র এসে আমার ঘরে, আসনের সুমুখে হাজির হলেন। সাঁড়াশীর দুই দাড়া দিয়ে যেমন করে একটা জিনিসকে ধোরে মানুষে কার্য্য উদ্ধার করে, তেমনি করে দুটি প্রবল যুক্তি দিয়ে তিনি আমায় আঁকড়ে ধোরে উত্তরার জন্য তন্ত্রমতের সাধুসঙ্গের কথা লিখতে বাধ্য এবং উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর প্রথম অকাট্য যুক্তি এই যে, তন্ত্রসম্বন্ধে কথা বা আলোচনা বা জ্ঞান, যা কিছু আমি এত দিন পর্য্যটন এবং এতগুলি সাধুসঙ্গের ফলে লাভ করেছি, মোটকথা উল্লেখ যোগ্য যা কিছু পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি সে লাভেতে দেশবাসীর অংশ আছে—সুতরাং, আমি সে সকল প্রকাশ করতে বাধ্য এবং তা জাতীয় সম্পত্তি। আলস্য করে সে সকল উপেক্ষা করবার আমার কোন অধিকার নেই। আর দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যে হেতু আমার এখন অবকাশ আছে এবং সম্প্রতি প্রবাসীতে অতখানি একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে চুকেছি আর সেটা সাধারণের ভালও লেগেছে তখন, কেন আমি প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্র উত্তরার জন্যে তার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করবো না! তারপর কথা চলে না বিশেষতঃ ঐ লোকটির সঙ্গে ; তাঁকে যাঁরা জানেন ভালমতেই বুঝবেন।

এখন এই দীর্ঘ পর্য্যটনে আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল একখানি খাতা আর তার বুকে ঢাকা একটি পেন্সিল। তার পাতায় পাতায় ছিল গান আর নানা কথা টোকা, আর ছিল সাধুসঙ্গের নানা আলোচনার নোট। আরও ছিল অনেকগুলি সাধু সজ্জনের স্কেচ—যে সব মূর্ত্তি আমার মনে সাড়া তুলেছিল। ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৭ সালের নানা কথায় পূর্ণ খাতাখানি। কোথায় পড়ে ছিল সে খাতা, হাঁতড়ে খুঁজে বারকরে বসলাম। এই হোল তন্ত্রাভিলাসীর গোড়ার কথা।

উত্তরার অগ্রহায়ণ মাস ১৩৩৭ সাল থেকে সুরু হোল—আর শেষ হোল ১৩৪৩ সালের আশ্বিনে। তারপর কতদিন পড়ে রইলো উত্তরার পাতায়। শেষে এই সুরেশচন্দ্রই এই শ্রীঅজিত শ্রীমানী প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে এখানি প্রকাশের পথ করে দিলেন। আরও একজন সুরেশচন্দ্রের চেষ্টার সঙ্গে পূর্ণভাবে যোগ দিয়ে ছিলেন যাঁর নাম প্রকাশে নিষেধ। কাজেই এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পণ্ডিতপ্রবর অনন্তমোহন বিশারদ মহাশয় অশেষ শ্রম স্বীকার করে বইখানির মুদ্রণে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছেও আমি বিশেষ ঋণী।

শেষে, তন্ত্রাভিলাসীতে প্রচলিত মূর্দ্ধণ্য য না দিয়ে দন্ত্য স লাগানো নিয়ে একটু ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বন্ধুবর্গের মধ্যে। কিন্তু অভিধান খুললেই দেখা যাবে যে এ ব্যবহার ভুল নয় বা সংশোধনের ও আবশ্যক করে না। আমি আশা করি অতঃপর শুভ ইচ্ছাই পাওয়া যাবে। নমস্কার—

৭৭নং রসারোড সাউথ
টালীগঞ্জ

—প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়



তন্ত্রাভিলাসী—

তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ

১

নানা উদ্দেশ্য লইয়া নানা জনে ঘর ছাড়িয়া বাহির হয়। সেই নানা জনের মধ্যে আমি একজন, জীবনের পূর্ণ যৌবনেই একবার ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলাম। সাংখ্য, পাতঞ্জল, উপনিষৎ, বেদান্ত, তত্ত্ব সাক্ষাৎকার, এই সকলই ছিল তখনকার আলোচনার বস্তু, আর কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার প্রভৃতি প্রকৃষ্ট আর্য্য তীর্থক্ষেত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্ম-বিদ্যা বিকাশের উদ্দাম আশা। এইভাবে তিন-চার বৎসর কাটাইয়া একবার দেশে ফিরিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের জটিল সাধনা সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে প্রবল হয়। সাধনসিদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন, এমন কোনও মহাপুরুষের সন্ধান যদি পাই, তাহা হইলে এ চঞ্চল মন প্রাণ বুঝি স্থির হয়। তন্ত্রের প্রসিদ্ধ স্থানসকল খুঁজিলে কি মিলে না? বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় যত পীঠস্থান আছে ঘুরিতে সংকল্প করিলাম। খুব আশা ছিল যে, কোনো না কোনো স্থানে নিশ্চিৎ সন্ধান মিলিবে।

অন্য কোথাও যাইবার পূর্ব্বে, কি জানি কেন পুরী বা শ্রীক্ষেত্র যাইতে অন্তরের মধ্যে একটা টান অনুভব করিলাম। সুতরাং অবিলম্বেই পুরী যাইবার আয়োজন এবং পরদিন পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। পাঁচ-সাত দিন কাটিয়া গেল, এদিক-ওদিক বেড়াই, সমুদ্রে স্নান করি, জগন্নাথ দর্শন করি, মনে প্রাণে জগবন্ধুর কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাই।

একদিন বৈকালে মন্দিরের সিং-দরজা পার হইয়া জগমোহনের সম্মুখেই এক ভৈরব মূর্ত্তি চোখে পড়িল। সুদীর্ঘ স্থুল বা মাংসল শরীর, গোলগাল মুখ, ঢুলু ঢুলু আঁখি, মাথায় ছোট ছোট কালো চুল, তার উপর একটা কাপড় অযত্নে জড়ানো, মুখে কার্ত্তিকেয়ের মত মানান-সই গোঁফ, দাড়ি কামানো। লাল কাপড় পরা, তার উপর লাল চাদর জড়ানো, হাতে একটি সরু লাঠি, যাহা শরীরের সঙ্গে মোটেই মানায় নাই, আপন ভাবেই বিভোর, ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। আমি তাঁর সঙ্গ লইলাম।

তিনি জগবন্ধুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দর্শন করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া যখন চাতালের এক দিকে বসিলেন তখন আমিও কিছু দূরে বসিয়া পড়িলাম।

ক্রমে দুই-একজন করিয়া সাত-আটজন বাঙ্গালী জড়ো হইল, কেহ-বা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াই বসিল,—কিছু জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া কেহ-বা আরও কাছে গিয়া বসিল। তিনি কিন্তু কোনও কথাই কারো সঙ্গে বলিলেন না, একভাবেই বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর একজন তখন আর একজনের দিকে ফিরিয়া নীচু গলায় বলিলেনঃ ইনি কথা কন না বোধ হয়, এখন কিছু বোলবেন না।



আর একজন তাই শুনিয়া, প্রণাম করিয়া উঠিয়া, তাহোলে এখন আসি বাবা, বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। একে একে তখন সকলেই চলিয়া গেল। তিনি নির্ব্বিকার, একই ভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা-দীপ জ্বালা হইলে তিনি উঠিলেন এবং মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সমুদ্রের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি পিছনেই আছি।

যখন স্বর্গদ্বার শ্মশানের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন রাত্রি হইয়াছে। অবিরাম সমুদ্রগর্জ্জন শুনা যাইতেছিল, তার উপর চারিদিকেই ঘোর অন্ধকার। ভৈরব কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া শ্মশানের দিকে বিহ্বল-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। একটি মাত্র চিতা জ্বলিতেছে, তার আশে-পাশে যেন দুই-তিনজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছায়াপুরুষ লম্বা লম্বা দণ্ড হাতে নড়াচড়া করিতেছে। শ্মশানের প্রান্তে যাত্রীদের ঘরখানিও চিতার আলোকে দেখা যাইতেছিল, তাহার ভিতরে আলোর কোনও আভাষ নাই।

ভৈরব রাস্তা হইতে নামিতে লাগিলেন, দেখিলাম, শ্মশানের সেই ঘরখানি লক্ষ্য করিয়াই যেন চলিতে লাগিলেন। আমি পিছনে, নিঃশব্দে চলিলাম। শ্মশানভূমি পার হইয়া তিনি সরাসর সেই ঘরের মধ্যেই প্রবেশ করিলেন, আমি কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন আমার কি করা উচিত।

ক্রমে দেখিলাম ভিতরে আলো, আবার আরও দুইটি মূর্ত্তি ভিতরে নড়াচড়া করিতে লাগিল। সে দুইটিই নারী,—তাহার মধ্যে ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম যেন একজন যুবতী। দুজনেরই

লাল কাপড় সুতরাং তাঁহারা ভৈরবীই অনুমান করিলাম। যাই হোক, আমি ঠিক করিলাম কাল প্রাতে আসিয়া দেখা করাই ভাল, আজ এ অবস্থায় ওখানে যাইয়া উপস্থিত হইতে মন সরিতেছে না। ফিরিলাম সে-রাত্রে।

পরদিন সকালে, তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে, স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইলাম। শ্মশান-যাত্রীদের সেই ঘরের সম্মুখেই একটু চাতালের মত, সেইখানে দেখিলাম ভৈরব—নিদ্রা হইতে উঠিয়া পুরাতন একখানি সতরঞ্চির উপর অর্দ্ধশায়িত ভাবে তাকিয়াতে ঠেস দিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। গা খোলা, গলায় পৈতার গোছা মালার মত ঝুলিতেছে, দড়ির মত নীচের দিকটা পাকানো,—একখানি লুঙ্গির মত পরা। সেইরূপই ঢুলু ঢুলু আঁখি। আমি প্রণাম করিয়া কিছু দূরে বসিলাম।



আমার দিকে একবার অনাসক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি আপন মনে তামাক খাইতে লাগিলেন। দূরে পোটলা-পুঁটলি, একটা টিনের টোল খাওয়া বিবর্ণ তোরঙ্গ, সাপুড়েদের বেতের বড় ঢাকা দেওয়া চুপড়ির মত সেকালের প্যাটরা দুই একটি, পুরানো হ্যারিকেন একটা, ত্রিশূল, চন্দন-পিঁড়ি—এই সব নানা জিনিস চারিদিকেই ছড়ানো। ভিতরে বুঝি উনান ধরানো হইয়াছে, ধোঁয়া বাহির হইতেছে। আমি কতকক্ষণ বসিবার পর লাল কাপড় পরা যুবতী একজন কলাইকরা বাটিতে চা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া মৃদু স্বরে, বাবা চা খান, বলিয়া সসংকোচে চলিয়া গেল। বাবা কিন্তু চা খাইবার কোনও চেষ্টাই দেখাইলেন না।

আমার মনের অবস্থা তখন জটিল, তার উপর সম্মুখে রাস্তার দিকে হঠাৎ চাহিয়া দেখি পাহারাওয়ালার মত একজন, আরও দুই-তিনজন সঙ্গে, রাস্তা হইতে নামিয়া এই দিকেই দ্রুত গতিতেই আসিতেছে। আমি ভাবিলাম, থাকিব না যাইব। দেখাই যাক না কেন, আরও একটু থাকিয়া যাই, যদিই বা কথাবার্ত্তা কহিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

পাহারাওয়ালা ও তাহার সঙ্গীর দল আসিয়া পড়িল। দেখিলাম যে গতিতে তারা শ্মশানের

উপর দিয়া আসিতেছিল ঘরের কাছে আসিয়া তাহাদের গতি বিশেষ মন্দ হইয়া পড়িল। তারপর সকলেই দাঁড়াইয়া গেল, কেহই তাহাদের মধ্যে কথা কহে না।—

ভৈরব কিন্তু কোনো দিকে না চাহিয়াই আপন মনে তামাক টানিয়া যাইতেছেন। এতগুলি লোক যে এখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকেই দেখিতেছে, সেদিকে তাঁর লক্ষ্যই নাই। দলের একজন একটু অগ্রসর হইয়া, কাশিয়া গলা সাফ্ করিয়া, দেখ! এটা সাধু-সন্ন্যাসীদের থাকবার জায়গা নয়, বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া আর একজন বলিল: শুনছেন? তাহাতেও তাঁর ভাবের কোনও ব্যতিক্রম হইল না দেখিয়া আর একজন পাহারাওয়ালাকে বলিল: দেখছো না, ভয়ানক মাতাল অবস্থা! ভাবটা তাঁর মাতালের মতই বটে। দলের সকলে নিজেদের মধ্যেই নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল। কোন মীমাংসায় আসিতে না পারিয়া উড়িষ্যার প্রহরী এবার ভিতরের দিকে চাহিয়া ডাকিল: কে অছ গো ভিতরে?

তখন ভিতর হইতে একটি অর্দ্ধবয়সী ভৈরবী মূর্ত্তি বাহিরে আসিলেন। তাঁকে দেখিয়াই প্রহরী বলিল: দেখ! আজ চার দিন হই গল, তোমরা এখান হতি যাইছ না, কিন্তু এবার দারগাবাবু হুকুম দিইছেন, তোমাদের এখান হতি সরাই দিতি হব। অমরা সেই জন্যই আসুচি।

ভৈরবী শুনিয়া কাতর-কণ্ঠেই বলিলেন: কি কোরবো বাবা, আমরা এতদিন কোথাও একটা জায়গা ঠিক করতে পারিনি; আজ বিকেলে আমরা এখান থেকে যাবো, ঠিক বল্‌ছি বাবা, কাল আর তোমরা আমাদের এখানে দেখতে পাবে না।

প্রহরীর দল এই কথা শুনিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, আর কিছু না বলিয়া একে একে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আমি তখন সংকোচ কাটাইয়া ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনারা কোথায় যাবেন?

তিনি বলিলেন: জগবন্ধুর মন্দিরের কাছে, কালীকা-দেবী-সাহিতে পাণ্ডারা একটা জায়গা দেবে ত বোলেছে, এখন সেইখানেই যাওয়া হবে।

এই সময় দেখিলাম ভৈরব তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ধীরে ধীরে ঢুলিতে লাগিলেন, চক্ষু প্রায় বুজিয়াই আছেন।

—চা খান বাবা জুড়িয়ে গেল যে, বলিয়া ভৈরবী বাটিটা তুলিয়া ধরিলেন। তখন ভৈরব, অ্যাঁ, বলিয়া একবার চক্ষু চাহিয়া সেটি হাতে লইলেন বটে কিন্তু আবার চোখ বুজিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, এখন বোধ হয় চেষ্টা করিলে আমার সঙ্গে কথা কহিতেও পারেন। ভৈরবী তখন ঘরের ভিতরে গেলেন দেখিয়া আমিও একটু কাছ ঘেঁষিয়া বসিলাম।

তিনি ত কথাই কহিবেন না, আমি অনেকক্ষণ পর সসংকোচে বলিলাম: আপনি কি দয়া করে আমার কথা শুনবেন? আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

তিনি চক্ষু বুজিয়াই ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শুনিব। সাহস পাইয়া তখন আমি ধীরে ধীরে নিজের কথাগুলি গুছাইয়া বলিতে লাগিলাম। তন্ত্রশাস্ত্রের লক্ষ্য কি এবং সাধন-পথ কি প্রকার? ঐ মার্গের কোনও সাধক বা সিদ্ধ পুরুষের সংযোগের আশা করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘুরিতেছি—এই সব। তাঁর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম তিনি সব শুনিয়াছেন। অন্য কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম না, কেবল তিনি চক্ষু মুদিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে আপন মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

আমি যখন দেখিলাম তিনি কিছুই বলিলেন না—তখন আমি অনুমান করিলাম যে আমায় হয়ত অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। স্থির হইয়া বসিয়াই রহিলাম। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা রহিলাম, তার পর দেখিলাম, তিনি ধীরে ধীরে উঠিলেন, সেইরূপ ঢুলু ঢুলু চোখে, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মাতালের মত চলিতে চলিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। পাঁচ সাত দশ পনেরো মিনিটের বেশী হইয়া গেল,—তিনি আর বাহির হন না দেখিয়া আমিও উঠিলাম।

২

আমি দিনটা কাটাইতাম নানা স্থানে, আর রাত্রে থাকিতাম চক্রতীর্থে বালির উপরে। গায়ের চাদরখানি পাতিয়া ঘুমাইতাম। ভোরে উঠিয়া আবার স্বর্গদ্বারের দিকে আসিতাম।

যাহা হউক আমি পরদিন শ্মশানে সকালে আর না আসিয়া বৈকালে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তল্পি-তল্পা কিছুই নাই। ভাবিলাম, ভৈরব কালীকা-দেবী-সাহিতেই গিয়াছেন। আমি ছুটিলাম সেই দিকেই। পথে উঠিয়াই একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম: এখানে যে ভৈরবটি ছিলেন তিনি কোথায় গেলেন?

যাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁকে এই স্বর্গদ্বারে অনেকবারই দেখিয়াছি, একসঙ্গে দুই-তিনদিন সমুদ্রে স্নানও করিয়াছি। এইখানে তাঁর একখানি ছোট বাড়ী আছে। সপরিবারে বায়ু-পরিবর্ত্তনে আসিয়াছেন।

তিনি বলিলেন: সেই বামাচারী ভৈরবের কথা বোলছেন, যাঁর সঙ্গে দুজন ভৈরবী ছিলেন—শ্মশানের ঐ ঘরটায় আড্ডা করেছিলেন ত?—

আমি তাঁদের কথাই ত বলিতেছিলাম। তিনি বলিলেন: সে এক বড় মজাই হোয়েছে। আমরা সেই ভৈরবী দুটির খিটিমিটি আজ চারদিন থেকে অনেকেই শুনছিলাম। কাল আমার বাড়ীর মেয়েরা স্নান করতে গিয়ে শুনে এসেছেন সেই বড়টির মুখে। ছোটটি আগে ছিলেন না, বামুনের ঘরের বাল-বিধবা, মাসখানেক হোলো ভৈরব তাঁকে কোনও গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছেন। বড়টিই অনেক দিন সঙ্গে ছিলেন। ছোটটি আসাতে বড়টির সঙ্গে আর চোললো না, ক্রমে দুজনে ঝগড়া-ঝাঁটি থেকে এখন অচল অবস্থায় এসেই দাঁড়িয়েছে। সেইজন্যে তাঁকে বিদায়ও নিতে হোয়েছে। নগদ পোনেরো টাকা দিয়ে বিদায় দিয়েছেন। তারপর কাল বিকালে তাঁরা সহরে পাণ্ডাদের আশ্রয়ে উঠে গিয়েছেন।

আমি আর না দাঁড়াইয়া দ্রুত সহরের দিকে চলিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই কালীকা-দেবী-সাহির খোঁজ মিলিল। ভৈরবের সন্ধান পাইতেও বিলম্ব হইল না। দেখিলাম চারিদিকেই চালাঘর যাত্রীদের জন্য,—আর ভৈরব উঠানের সতরঞ্চের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাকু সেবা করিতেছেন। আমি যাইতেই তিনি অতি যত্ন-সহকারে, এস, বস, বলিয়া সস্নেহেই আবাহন করিলেন। আমার ত আনন্দের আর সীমা নাই। আজ ভৈরবের আর-এক রকম মূর্ত্তি দেখিলাম।

অল্পক্ষণ বসিবার পর তিনি আপনিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন: এখানে কোথায় আছ? কি ভাবে চালাও ?

আমি তাহার যথাযথ উত্তর দিলাম। তার পরই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: এরকম অবস্থা কত দিন ?

বলিলাম: আজ চার বৎসর হ'তে কিছু বাড়াবাড়ি, না হোলে আগে বাড়ীতেই আলোচনা ছিল।

—আচ্ছা তান্ত্রিক সাধনার উপর তোমার এতটা অনুরাগ কি থেকে হোলো ?

—কি থেকে হোলো তা চট্ করে বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয় বৈদিক উপাসনা যে লক্ষ্যে পৌছায়, তান্ত্রিক-সাধনায় হয় ত আর একটা অন্য কিছু রহস্যময় অবস্থায় নিয়ে যায়, না জানি সে অবস্থা কতই অদ্ভূত ঐশ্বর্য্যময়। তা ছাড়া, পাতঞ্জলের যোগদর্শন প্রভৃতি আর্য্য বৈদিক সম্প্রদায়ের সাধনা আর তার ফল স্পষ্ট ভাষায় ক্রমান্বয়ে সব জায়গায় খুলেই লেখা আছে কিন্তু তন্ত্রের সবই গুহ্য, সেই জন্যই রহস্যময়,—বিশেষত আমার কাছে বেশী কৌতূহলের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি স্থিরভাবে একবার ঘাড় নাড়িলেন, ঠিক যেন বুঝিয়াছেন এবং উত্তরটি সন্তোষজনক, —এই ভাবটা। তারপর ডাকিলেন: ওমা, কৌটোটা দিয়ে যাও, চারটে বেজেছে বোধ হয়। তারপর নল ছাড়িয়া, একটি হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন।

এবারে দেখিলাম সেই কনিষ্ঠা ভৈরবী, একটি ছোট কালো টিনের কৌটা ও এক গ্লাস জল আনিলেন। তিনি কৌটা খুলিয়া, ছোট মটর পরিমাণ একটি গুলি মুখে দিয়া একটু জল খাইয়া সেটিকে গিলিয়া ফেলিলেন। তারপর ভৈরবী চা আনিয়া দিতে তিনি আমায় বলিলেন: চা খাবে কি ?

আমি বলিলাম: চা খাইনা।

চা খাইবার পর তাকিয়াতে হেলান দিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন: আচ্ছা, তুমি সন্ধ্যাহ্নিক করতে কি ?

আমি বলিলাম: যখন উপনয়ন হয়েছিল তখন নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক প্রায় একবৎসর করেছিলাম। তারপর প্রায় তিন বৎসর করিনি। তারপর আমার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এলো। ভগবৎ উপাসনা আর ধর্ম্মপথে যাবার প্রেরণা। আমার মেসো মশায়ের গুরু

তিনিই একবার আমায় বলেছিলেন যে, ব্রাহ্মণের ছেলে ভক্তিভাবে সন্ধ্যাহ্নিক আর গায়ত্রী জপ করলে তাঁকে পাওয়া যায়। তখন থেকেই সন্ধ্যাহ্নিকের উপর জোর দিলুম।—

এই অবধি শুনিয়া তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরে অন্তরালস্থিত ভৈরবীকে উদ্দেশ করিয়াই বলিলেনঃ ওমা, এর কথাগুলি শুনছো? মন দিয়ে শুনে যেও। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেনঃ আচ্ছা, সন্ধ্যার কোন্ অংশে তুমি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলে? বলো বাবা, কোন সঙ্কোচ কোরোনা।



—সূর্য্যোপস্থান আর গায়ত্রী জপে।

—সূর্য্যকে কি ভাবে ধারণা করতে?—গায়ত্রীর সঙ্গে, না আলাদা?

—ধ্যানে যে গায়ত্রীর বর্ণনা আছে, প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে, সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে ঠিক্ ঠিক্ সেই রূপই চিন্তা করতুম আর তিনি যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে উঠছেন এই রকম প্রত্যক্ষ করতুম।

—আচ্ছা, তোমার বাপ, মা, স্ত্রী, এ-সব ত আছেন?

আমি বলিলামঃ আছেন, ঠাকুমাও আছেন

তিনি পুনরায় বলিলেন: তাঁরা তোমায় রোজগারের জন্য তাড়া দেননি ?

উত্তরে বলিলাম: বাবা আমায় তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে চাকরীতে ঢুকিয়েছিলেন,— চাকরীতে আমার মন বসেনি, আমি তাঁর অমতে চিত্রবিদ্যা শেখবার জন্য আর্ট স্কুলে গেলাম। তারপর পাঁচ বৎসরে সেখানকার কাজ শেষ করে, বেরিয়ে ঐ সব কাজই করতাম। এ অবস্থায় এখন আর ছবি আঁকাও ভাল লাগে না।

আমার কথাগুলি শুনিয়া সস্নেহেই বলিলেন: তুমি ছবি আঁকা ছেড়ো না বাবা,—ওতে ভাল হবে তোমার। একে তোমার উঁচু সংস্কারগুলি আছে, তার উপর চিত্রবিদ্যায় অধিকার থাকাতে ভগবৎ-মূর্ত্তির ধারণা তোমার স্পষ্ট হয়, এতে ধ্যানের কাজ হয়, বুঝলে? ওটা ছেড়ো না। আবার বলিলেন: ওটা ভগবানেরই দান জানবে, কখনও ছেড়ো না।

আমি চুপচাপ বসিয়া তাঁর কথাগুলি মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন: আচ্ছা বাবা, ধ্যানে তোমার কোনও মূর্ত্তি আসে কি ?

আমি বলিলাম: আসে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: স্ত্রী, না পুরুষ ?—

আমি বলিলাম: পুরুষ।

তিনি অনেকক্ষণ পর বলিলেন: বাবা, তোমার শৈব শরীর।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তিনি যেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন: আচ্ছা তোমার কি ঘরদোর ছেড়ে, গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে জীবন কাটাতে ইচ্ছা যায় ?

আমি বলিলাম: না, তা আমার কখনও ইচ্ছা হয় না। আমি উৎকৃষ্ট গৃহস্থজীবনে সন্ন্যাসীর জ্ঞান পেতেই চাই।

শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন: বেশ বাবা বেশ, খুব ভালো। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন—আর তপস্যা ?

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম: গার্হস্থ্য জীবনেও ত তপস্যার অভাব নেই, এখানেও ত দেখছি প্রতি পদে পদে তপস্যা।

তিনি যেন উত্তেজনা-বশেই উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন: বাবা, তুমি পাবে, ঘরে বোসেই পাবে।

আমি বলিলাম: কি কোরে পাবো বোলে দিন, এখনও অনেকটাই অন্ধকার আছে, নিরাশাও কম নয়—মাঝে মাঝে কাতর করে ফেলে।

তিনি বলিলেন: ঐ রকম করেই পাবে, যেমন করে খুঁজছো, ঠিক ঐ রকম করেই খুঁজতে খুঁজতে পাবে। ঠিকই পাবে।

তাঁর কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ-কথামৃতের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী মনে পড়িল। ঠিক যেন একসুরেই বাঁধা। প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল, শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এইভাবে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল।

এখন মনে হইল, আসল কথাই ত চাপা পড়িয়া যাইতেছে। আমি একটু অধৈর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম : কই, আমার আসল কথা-সম্বন্ধে ত কিছুই বললেন না ?

উত্তরে প্রসন্নমুখেই তিনি বলিলেন : আস্তে ! বাবা আস্তে। এত অধৈর্য্য কেন ? পরে বলিলেন : এখনও অনেক কিছুই বোলতে হবে তোমাকে।

তাঁর এই কথা শুনিয়া পরীক্ষার্থী ছাত্রের মত তাঁর প্রশ্নের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। তিনি নল হাতে মুদিত-নেত্রে কেবল ঢুলিতে ঢুলিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে ভৈরব বলিলেন : আচ্ছা, বল দিকি, কালীকে তোমার কি মনে হয় ?

আমি বলিলাম : প্রথম অবস্থায়, ছেলেমানুষ যখন, মামার বাড়ীতে কালী-পূজো হোতো, দেখতাম। সে সময় কালীমূর্ত্তি দেখলেই একটা অবোধ্য আতঙ্কের ভাব উপস্থিত হোতো। সেই ভাবটা অনেকদিন সংস্কারগত হয়েছিল। তারপর বড় হোলে জ্ঞান হোলো, রামপ্রসাদের গান আর পরমহংসদেবের কথামৃতের সঙ্গে পরিচয় হোলে সে ভাবটা চলে গেল। ভয়ঙ্কর ভাবের জায়গায় এলো মায়ের মত করুণাময়ী একটি ভাব।

ভৈরব বলিলেন : কি রকম, খুলে বলো দেখি বাবা, কোনোও কথা যেন বাদ দিও না।

আমি বলিলাম : ছেলেবেলায় কালীমূর্ত্তি দেখ্‌লেই মনে হোতো যে এই ভয়ঙ্কর দেবতা, কেবল হিংসাপ্রবণ রাক্ষসী, এর চেহারার ভাব-ভঙ্গীতে সবটাই আতঙ্কের কারণ। এর দ্বারা কখনও কারো অমঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু হয় না। অথচ জিজ্ঞাসা করলে সকলেই বোলতো—কালী ভগবান। মনে করতাম, ভয়েতেই এই ভগবানকে সকলে পূজা করে, উপাসনা করে। তারপর যখন আমার মধ্যে ধর্ম্মের প্রেরণা এলো—রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণের ভাবের সঙ্গে পরিচয় হোলো, তখন থেকে ঐ ভয়টি ক্রমে ক্রমে ভক্তিতে দাঁড়ালো। তখন বুঝলাম, ঐ মূর্ত্তির আসল ভাবটি রূপকের একটা বিশাল আবরণে ঢাকা আছে। বাইরে থেকে কালীকে ধারণা করবার যো নাই।

ভৈরব বলিলেন : আচ্ছা, তুমি ত দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা কিছু কিছু করেছ, সে দিক থেকে কালীকে কি রকম বুঝলে, কি ভাবে সামঞ্জস্য করে নিলে, কোনও বিরোধ হোলো না ?

আমি বলিলাম : না, তাতে বিরোধের কিছুই পাইনি। কারণ,—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ—এঁদের উপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রথম থেকেই ছিল। তাঁরা গানের ভিতর যে সকল তত্ত্ব রেখে গেছেন, সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে তাই গান করতাম, আর অনেক সময়ই সেগুলি বিশেষ ভাবেই আলোচনা করতাম। তাই জ্ঞানের দিক থেকেও কালীতত্ত্বের মীমাংসায় গোল বাধেনি। আরও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির কাছে এই কালীতত্ত্বের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনেছিলাম তাতেই আমার বিষয়টি সহজ হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্ট অদৃষ্ট এই বিশ্ব, যে শক্তিসামান্যে অধিষ্ঠিত সেই বিরাট প্রকৃতিই কালী, এই ভাবেই ধারণা হয়ে গেল।

ভৈরব বলিলেন: আর শিবের সঙ্গে কালীর সম্বন্ধটা কি ভাবে মীমাংসা করলে, শব হয়ে পদতলে পড়ে আছেন কেন ?

আমি বলিলাম: এক্ষেত্রে সাংখ্য-দর্শনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিশেষ মিল দেখতে পাই। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগেই ক্রিয়াশীল। তাই সৃষ্টির মধ্যে তিনিই প্রধান। শিব পুরুষ নিষ্ক্রিয় বোলেই শব হয়ে পড়ে আছেন।

ভৈরব বলিলেন: তাহোলে তুমি কালীকে মাতৃভাবেই দেখেছ ?

আমি বলিলাম: হাঁ নিশ্চয়ই। এই কথা শুনিয়াই ভৈরব বলিলেন: তুমি ত বাবা তন্ত্রের মতে সাধন কখনও করতে পারবে না। তোমার পৃথক মার্গ।

আমি বলিলাম: তাতে আমার দুঃখ নেই, তবে আপনি অনুগ্রহ করলে এ মার্গের সাধন-রহস্য ত জানতে পারবো, তা হোলেই হোলো।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তিনি উঠিলেন, বলিলেন: আচ্ছা বাবা, কাল তিনটে নাগাদ এসো, কথা হবে—কেমন ?

আমি, আচ্ছা,—বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিদায় লইলাম।

মনের মধ্যে এই সকল তোলাপাড়া করিতে করিতে একটা কৌতূহলের জ্বর লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। কাল তিনটা কতক্ষণে বাজিবে।

আকাঙ্ক্ষার বস্তু পাইতে যতই বিলম্ব ঘটুক, সে বিলম্ব কাটে, পাওয়াও যায়। আমারও রাত্র কাটিল, পরদিন বেলাটুকুও কাটিল। আবার অন্তরে অদম্য কৌতূহল লইয়া ঠিক তিনটার কিছু পূর্ব্বেই উপস্থিত হইলাম।

তিনি আবার সহাস্যে আহ্বান করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়াই মনের মধ্যে এক প্রশ্ন আসিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিল। দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল, যেন কতকটা অধৈর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম:

—কালীকে আপনার কি মনে হইত ?

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন: তোমায় এখনও অনেক প্রশ্ন করবার আছে; এর মধ্যেই তুমি আমায় প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে বাবা ?

আমি বলিলাম: কি জানি আমার কেন ধৈর্য্য থাকল না, না হোলে এত তাড়াতাড়ি এটা জিজ্ঞাসা করা উচিত হয়নি। আপনি ক্ষমা করবেন।

তিনি সস্নেহেই বলিলেন: আরে বাবা, এটা কি অপরাধ বলে ধরা যায় ? আচ্ছা বোসো, তোমার যখন এতটা হয়েছে, তখন আগেই তোমার ছটফটানিটা ঠাণ্ডা করে দেওয়া যাক্। কেমন, তুমি জানতে চাও, কালীকে আমার কি মনে হোতো,—এই না ? ছেলেবেলা থেকেই কালীকে আমার বৌ মনে হোতো।

আমি শুধু আশ্চর্য্য নয়, স্তম্ভিত হইলাম, ঐ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিকে বৌ! তিনি কিন্তু মনের কথাটি বুঝিয়া ফেলিলেন, বলিলেন: তোমার কি ওটা অদ্ভুত লাগলো ? আমার কিন্তু

ছোটবেলা থেকেই নিজের পুরুষভাব প্রবল থাকার জন্যেই কালীকে আমার স্ত্রী বা ভালবাসার বস্তু মনে হোতো।

আমি তখন বলিলাম : আশ্চর্য্য বটে! আচ্ছা, এখন অনুগ্রহ করে আমায় বলুন তান্ত্রিক-সাধনের ব্যাপার, আর সে সাধনের লক্ষ্যই বা কি ?

ভৈরব বলিলেন : তোমাদের বৈদিক সাধনায় যেমন অধিকারভেদ আছে, আমাদের তন্ত্রের সাধনায়ও তেমনি আছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারিভেদে দিব্যাচার, বীরাচার ও পশ্বাচার। তন্ত্রে সাধারণ জীব বোল্‌তেই পশু, এই জন্যই শিব হোলেন পশুপতি।

এইটুকু শুনিয়াই আমি বলিলাম : যদি সেই অধিকারিভেদেই ব্যবস্থা, তবে তন্ত্রের দরকার কি, বৈদিক প্রণালীতে সাধন করলেই ত সকলকারই কাজ হয়ে যায় ?

—তোমাদের বৈদিক প্রণালীর সাধনের মধ্যে, উত্তরে ভৈরব বলিলেন, অনার্য্য, শূদ্র, এদের সাধনার স্পষ্ট অধিকার কোথায় ? এদের যে দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকারই নাই ত পূজা করবে কি করে বল দেখি ? এইখানেই দেখতে পাবে শিব কত উদার, কেন তিনি মহাদেব। তিনি যে সাধনপ্রণালী আবিষ্কার করেছেন তা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির জন্য বা আর্য্যবংশাভিমানী কুলীনদের জন্য নয়,—সর্ব্বসাধারণের জন্য।

আমি বলিলাম : তা সত্য, কিন্তু তাতে প্রবৃত্তির এতটা উৎকট প্রশ্রয় দেওয়া কেন ?

ভৈরব বলিলেন : তাহোলেই ত সেই সোজা কথাটা এলো যে, সাধারণ জীবের ভোগ না হোলে ত্যাগ আসবে কেমন কোরে। সেই জন্যই প্রথম অধিকারীর পশ্বাচার। ভোগের উৎকট আকাঙ্ক্ষা যাদের মধ্যে গজ্‌ গজ্‌ করছে ; বাক্‌-চাতুরীতে তাদের তা'থেকে কি কিছুতেই সরানো যাবে ? তাই তিনি পঞ্চ মকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনের প্রবর্ত্তন সাধনের অঙ্গ রূপে উপদেশ করেছেন। যারা মোহান্ধ হয়ে নির্ব্বিচারে ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যে ডুবে আছে তারা সাধনার অঙ্গ বোলে ঐ সকল ব্যবহার করবে।

আমার কূটতর্কের উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না, সহজ বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝিতে পারিতেছি, তর্কের বিস্তারের জন্য তার মধ্যে বাঁকা প্রশ্ন তোলা আমার ভাল লাগে না। তার চেয়ে চুপ করিয়া থাকিলে অনেক কিছু শুনিতে পাওয়া যায়, জানিতেও পারা যায়—এইজন্যই আমি চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন :

আসলে, পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ। পাশমুক্ত হওয়াই তন্ত্রের সাধন এবং লক্ষ্য। এই পাশই আমাদের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে প্রকাশ হতে দিচ্ছে না পরন্তু প্রতি পদে বাধা দিচ্ছে। লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, সংকোচ প্রভৃতি পাশ আছে, জান ত ? সেই পাশগুলি থেকে মুক্ত হবার জন্য পশ্বাচারের পর সাধকেরা বীরভাবে উৎকট সাধন করেন। যেমন মনে কর ভয়, এই ভয়কে একেবারে দূর করবার জন্য ঘোর অমাবস্যার নিশায় শবের আসনে বসে সাধনার প্রবর্ত্তন। এভাবে সাধনার পর কি সাধকের আর জগতে কোনও বস্তুতে কোনও প্রকারের ভয় থাকে ? তেমনি

কাম জয় করবার জন্য সম্পূর্ণ উত্তেজিত উলঙ্গ অবস্থায় পূর্ণ যুবতীর সঙ্গে মৈথুনে রত হয়ে জপে তন্ময় হয়ে যাওয়া। ঘৃণাও তেমনি, যত ঘৃণ্য বস্তু আছে সে সকলের সঙ্গে ব্যবহারে মনের সংকোচ, শুচি, অশুচি ভাবকে দূর করা। এই রকম সকল পাশগুলিকে একে একে প্রবৃত্তির অনুকূল ক্রিয়াযোগে বিপরীতভাবে উৎকট সাধনার দ্বারা মনের রাজ্য থেকে সমূলে উৎপাটিত করে সাধক পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। তখন ঐ পঞ্চ মকারের মানে আলাদা হয়ে যায়।

আমি কৌতূহলী হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম: আলাদা মানে কি রকম, বলুন না? তখন তিনি অতি মধুরভাবে স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিলেন:

মদ্য তখন আর উত্তেজক মদ নয়, শিব বলছেন পার্ব্বতীকে:—

১। সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পিত্বানন্দময় স্তাং যঃ সএব মদ্যসাধকঃ॥

(মদ্য) ব্রহ্মরন্ধ্র হতে যেই সুধা ক্ষরে অনিবার,
পিয়ে মাতে সদানন্দে সেই মদ্যসাধক সার॥

—তারপর মাংস কি? :—

২। মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি সএব মাংসসাধকঃ॥

(মাংস) মাশব্দে রসনা বুঝ, বাক্য তারি অংশ হয়,
সেই বাক্য রসনার অতি প্রিয় সুনিশ্চয়,
সে বাক্য ভক্ষণ করে বাক্‌সংযত যেই,
নির্ব্বাক সেই মহাসাধু মাংসের সাধক সেই॥

—তারপর মৎস্য? :—

৩। গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥

(মৎস্য) গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুই মৎস্য চরে অবিরাম,
ইড়া ও পিঙ্গলা সেই দুই নদী অনুপম;
রজ, তম দুই মৎস্য চলে ফিরে তাহার মাঝারে;
সেই মৎস্যদ্বয় যেই ভক্ষিবারে পারে;
সেই সে সাত্ত্বিকবীর সদা স্থির সুষুম্নাবিমানে,
মৎস্যের সাধক শ্রেষ্ঠ বলি তারে মানে যোগিগণে॥

তারপর মুদ্রা, সেটা এই:—

৪। সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্॥

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্,
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্,
যস্য জ্ঞানোদয় স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥

(মুদ্রা) সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকার মাঝে,
শ্বেতবর্ণ সুনির্ম্মল চল চল পারদের সাজে,
চন্দ্রসূর্য্য হইতেও রশ্মি যার হয় জ্যোতিষ্মান্
অতীব কোমল স্নিগ্ধ কুণ্ডলিনী মহাশক্তিমান,
এই যে অপূর্ব্ব আত্মা তাহারে যে হয় অবগত,
সেই সে মহান্ প্রাজ্ঞ মুদ্রার সাধক জগতে বিদিত।

তারপর চরম হ'ল মৈথুন। সেই মৈথুনের তত্ত্ব শিবের মুখে শোনো :—

৫। মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি র্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ॥
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোগৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥
আকারহংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ॥

(মৈথুন) মৈথুন পরমতত্ত্ব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ,
তাহাতে হইলে সিদ্ধি সুদুর্লভ লভে ব্রহ্মজ্ঞান,
নাদ বিন্দু করি যোগ যেই যুক্ত পুরুষ ধীমান,
শিবা শিব রমণেতে মৈথুনের করে অবসান।
আত্মা আর কুলকুণ্ডলিনীশক্তি রমণের মূল উপাদান,
এই মৈথুনে রত যেই সে মৈথুনের সাধক প্রধান ॥

কেমন বাবা, তন্ত্রের সাধন কথা শুনলে? সহজ কথায় অল্পের মধ্যে তন্ত্রসম্বন্ধে এই টুকুই বলা যায়।

আমি বলিলাম : এ ত অতি অপূর্ব্ব তত্ত্ব, আসলে বৈদিক প্রণালীর সাধনলব্ধ সিদ্ধির সঙ্গে ত কোনও গোলমালই নেই।

তিনি বলিলেন : তা হবে কেমন করে, আসলে তোমরা সকলে যাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলো, সেই ব্রহ্মজ্ঞানই যে সকল সাধনার চরম লক্ষ্য।

আমার ধারণা ছিল তন্ত্রের লক্ষ্য অন্য, কাজেই তাঁহার ঐ কথাগুলি শুনিয়া আমার প্রাণে সাম্যভাবের এক অপূর্ব্ব আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। কতক্ষণ পর তিনি নিজেই বলিলেন :

সবই তো হ'ল, কিন্তু এখনও তোমার মধ্যে একটা খট্‌কা চুপি চুপি লেগে রইলো যে বাবা!

আমি দেখিলাম তিনি সত্যই বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মুখ হইতে শুনিবার জন্য বলিলাম : কি বলুন দিকি ?

তিনি বলিলেন : আমরা নানাপ্রকার ভৈরবী নিয়ে ঘর করি, সেটা তোমার ব্যভিচার বলেই মনে হয়, তার উপর আবার তাকে মা বলেই ডাকি, তারা আমাদের বলে বাবা, এ সব কি রকম ?—কেমন এই না ?

আমি অস্বীকার করিতে পারিলাম না, বলিলাম : বাস্তবিকই, আমার এটা বড়ই বীভৎস লাগে, স্বামী-স্ত্রী ভাবে ঘরকন্না করা আবার তাতে মাতৃ সম্বোধন।

তিনি বলিলেন, হাঁ, ওটা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের খুবই বিষম ঠেকে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনাদের তন্ত্রমতে বুঝি কামিনী ও জননীর সম্বন্ধ একই ? যদি মনে কিছু না করেন ত এর রহস্যটি জানতে বড়ই কৌতূহল হয়।

তিনি হাসিয়া বলিলেন : এর রহস্য মোটেই শক্ত নয়, আমাদের পক্ষে অতীব সহজ। কেবল যাদের পক্ষে নৈতিক হিসাবের স্ত্রী ও জননী পৃথক সংস্কার বদ্ধমূল তাদের পক্ষে এটা ধারণা করা খুবই শক্ত।

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনি কি জননী ও কামিনী এই দুইটি সম্বন্ধ একই বলেন নাকি ?

ভৈরব তৎক্ষণাৎ বলিলেন : আমি বলি মানে—এই দুইটির মূলে একই নারী নয় কি ? প্রকৃতির মধ্যে কি এ দুটি ভাব পৃথক আছে নাকি ?

আমি বলিলাম : যদি তা না থাকে ত মানুষ সমাজের মধ্যে এলো কি করে ?

ভৈরব : সে ত মানুষেই করে নিয়েছে, মাতৃভাব ও কামিনীভাব পৃথকভাবে আস্বাদনের জন্য আর সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা রাখবার জন্য মাতৃভাবের মধ্যে পবিত্রতা ও স্ত্রী বা রমণীভাবের মধ্যে পবিত্রতা নেই। এই না তোমাদের সমাজের বা ধর্ম্মের যথার্থ ভাব ?

আমি বলিলাম : স্ত্রী বা কামিনী ভাবের মধ্যে একটা সম্ভোগের স্বার্থ এবং উন্মাদনা পুরুষের মধ্যে উৎকট ভাবেই আছে। কাজেই সেই ভাব মাতৃভাবের সঙ্গে এক কি করে হতে পারে ?

ভৈরব তখন বলিলেন : বলি বাবা, মাতৃভাবই বল আর কামিনীভাবই বল, দুই ত আরোপিত ভাব, আসলে ত সেই একই কামিনীর দুটি রূপ বা ভাব। তারপর,—গোড়াতেই ত প্রকৃতি কামিনী, সৃষ্টিতে সম্ভোগার্থেই ত তার সার্থকতা। তারপর যখন সৃষ্টি হয়ে গেল, সেই সৃষ্ট জীবের অসহায় ও দুর্ব্বল অবস্থায় তার লালন পালন ও বৃদ্ধির জন্যই ত জননীভাবটি, —নয় কি ?

আমি বলিলাম : তা হোলে এটা ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, জনক পুরুষের কাছে প্রকৃতি বা স্ত্রী মূলত সম্ভোগের বস্তু হলেও কিন্তু সেই প্রকৃতি গর্ভে ধারণ করে যে জীবটি প্রসব করলেন, শিশু অবস্থায় বলুন আর যুবা অবস্থায় বলুন সকল অবস্থায় তার সঙ্গে সন্তান-জননী সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনও ভাব আসতে পারে কি ? তার কাছে ত চিরকালই সেই মা। পুরাণের কথায়

কার্ত্তিকেয়ের কেন দারপরিগ্রহ করতে প্রবৃত্তি হয়নি! নারীমাত্রেই পরমা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তির অংশ এই তত্ত্বটিই ত তাঁর বিবাহ ব্যাপারে বিরাগের কারণ হয়েছিল ?

ভৈরব বলিলেন : একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে হবে বাবা, মানুষ সমাজের একটা নৈতিক সংস্কারকে সনাতন সত্য সিদ্ধান্ত বোলে মেনে নিলে তত্ত্বের দিক থেকে সত্য উদ্ধার অসম্ভব হবে। আসলে পুরুষ মানুষের সবটাই যথার্থ পুরুষ নয়, আর কামিনীর সবটাই প্রকৃতি নয়, এই গেল প্রথম কথা। তারপর, এটাও দেখতে হবে সমাজের মধ্যে নৈতিক শৃঙ্খলা রাখবার জন্যই কামিনীর মধ্যে ঐ দুটি মূল ভাবের সম্বন্ধ পুরুষ জীবের জন্য ব্যবহারিকভাবে আরোপিত হয়েছে। বেশী কথা না বাড়িয়ে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, সমাজ পরিবারের মধ্যে নৈতিক ব্যবহার আর প্রজাসৃষ্টির অনন্ত ধারার মধ্যে সতেজ শৃঙ্খলা রাখবার জন্যই আমাদের প্রাচীন ঋষিকল্প পুরুষেরা এই দুটি সম্বন্ধকে পৃথক এবং ধারাবাহিকভাবেই বদ্ধমূল করে গেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাবে যে, এজগতে সকলসমাজেই পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিকে কামিনীভাবে সম্ভোগের স্পৃহাটাই এতটা প্রবল যে, এপর্য্যন্ত তার ধারা তিলমাত্র ক্ষীণ হয়নি—যদিও সভ্যতার গরবে এখন পৃথিবীর সকল জাতিই গর্ব্বে একেবারে ঘাড় বেঁকিয়ে আছে। ও ভাব ত্যাগ করা একটা মহা তপস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কেবল জন্মমরণের কারবার যার শেষ করবার চেষ্টা এসেছে, মুমুক্ষুও এসেছে, যে বুঝতে পেরেছে যে প্রকৃতিকে স্বধু কামিনীভাবে দেখা মানে নিজে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি হওয়া,—ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করার সঙ্গে সঙ্গে পুনঃপুনঃ জন্ম-জন্মান্তর সৃষ্টি করা,—সেই কেবল প্রকৃতির জননীরূপটাই কষে' ধরে থাকে। তাতে ধীরে ধীরে কামিনীর মোহ কাটাবার পক্ষে সহজ হয়।

আমি : তাহোলেই ত এটা ঠিক কথা যে প্রকৃতির মধ্যে জননী ভাবটাই একমাত্র পবিত্র ও সত্য ভাব।

ভৈরব : আসলে তা নয় বাবা। মাতৃভাবই প্রকৃতির একমাত্র ভাবও নয় আর সত্যভাবও নয়। মুক্তির জন্য মানুষে ঐ ভাবটি প্রতিক্রিয়াবশেই ধরে আঁকড়ে, আসলে ওটা আংশিক ভাব মাত্র। জ্ঞানের বা জীবন মুক্তির পর আর ও ভাব থাকে না।

আমি : তখন আবার কি ভাব আসে ?

ভৈরব : সেইটিই প্রকৃতির আসল ভাব, অতি গুহ্য, অনির্ব্বচনীয়। কেবলানন্দময়ী ভাব। তার বর্ণনা নেই।

আমি : এইজন্যই পরমহংসদেব একসময় মাঠাকুরাণীকে * আমি তোমার কে ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন—তুমি আমার আনন্দময়ী গো।

ভৈরব বলিলেন : তুমিই বুঝে দেখ।

আমি : তাহোলে কথায় বলতে গেলে প্রকৃতির আসল ভাবটি, এই কথাই বোলতে

* পরমহংসদেবের বিবাহিতা পত্নী।

হয় যে, কোনপ্রকার সম্ভোগ কামনালেশশূন্য আনন্দময়ী, যেখানে রমণী ও জননী দুটি ভাব এক হয়ে গেছে।

ভৈরব বলিলেন: সাবাস্ বেটা—চৈতন্যময় পুরুষের কেবলানন্দদায়িনী।

এই সকল কথার পর আর ভৈরবের কাছে সপ্তাহখানেক যাই নাই। তারপর একদিন গেলাম, শুনলাম, তিনি পুরীর নিকটেই একখণ্ড স্থান সংগ্রহ করিয়া একটি আশ্রমপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। এখানকার অবস্থাপন্ন দুই-তিনজন ব্যক্তিকে সহায়ও পাইয়াছেন।

৩

পুরীতে প্রায় আড়াই মাস ছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিনমানে স্বর্গদ্বার আর বৈকালের দিকে চক্রতীর্থে আসিতাম, রাত্রে মহাকালের মন্দিরের ধারে বালির উপর রাত্র কাটাইতাম। গরমের সময়, সমুদ্রতীরে বেশ কাটিত।

চক্রতীর্থে আমার এক ঘর বন্ধু জুটিয়াছিল, তাঁরা আজিমগঞ্জের অধিবাসী। বড়লোক, কারবারী, মাড়ওয়ারী। বৈকালের দিকে তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতাম, বসিতাম, সৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা চলিত। মুনিবজী ব্যতীত তাঁদের সকলেই যুবা, আমাকে সাধুর মতই দেখিতেন এবং ব্যবহার করিতেন। মোট কথা, আমার সঙ্গে তাঁহারা সাধু-সঙ্গের ফললাভের চেষ্টা করিতেন।

আর স্বর্গদ্বারেও একটি আড্ডা ছিল। কলিকাতায় হাটখোলার কোনও একজন ধনী মহাজনের গৃহে। সেখানে ছিলেন কালীবাবু, বিশেষ ভদ্রব্যক্তি, সাধু-স্বভাব। তিনি যন্ত্রসঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন। স্বরদ বাজনাটি তাঁর বুঝি জীবনেরও অধিক প্রিয় ছিল। ওখানে আরও পাঁচজন সমজদার জুটিতেন। ধর্ম্মের আলোচনার লোকও দুই চারজন ছিল না এমন নয়। গানও হইত, অবশ্য ভজনগান, টপ্পা, ঠুংরীর কোন বালাই সেখানে ছিল না। পাঁচজনের একজন হইয়া আমারও একটা স্থান সেখানে ছিল। গান-বাজনা করিতাম, শুনিতাম, ধর্ম্মের নানা প্রসঙ্গ আলাপও চলিত। মোটের উপর সেখানে দিন কাটিত ভাল। দুই মাসেরও অধিক কাল ঐভাবে চলিয়া বেশ একটা আত্মীয়-সমাজের মতই মমতা জমিয়া উঠিয়াছিল। এমনই সময়—একদিন হঠাৎ বৃন্দাবনের কেশবানন্দজী ও কাশীর জ্ঞানানন্দজীর আবির্ভাব ঘটিল। আমার সঙ্গে কেশবানন্দের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সংসর্গের ফলে আমায় পুরী ত্যাগ করিতে হয়।

কেশবানন্দজী ব্রহ্মচারী নামেই প্রথমে পরিচিত ছিলেন। পরে আজকাল স্বামী নামেই পরিচিত। যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিয়াছেন, বিরজা হোমাগ্নিতে শিখা-সূত্র ত্যাগ না করিয়াছেন, তাঁহারা সন্ন্যাসী বা স্বামী নহেন, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমীর মধ্যেই স্থান। এই ত

শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিয়ম। কিন্তু ভারতের আধুনিক সকল সমাজেই সনাতন নিয়মের কতই না ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। গৃহত্যাগীর বাজারেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কর্ম হয় নাই। যাই হোক, কেশবানন্দজী আমাকে স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন।

কেশবানন্দজীর বৃন্দাবনে, হরিদ্বারে এবং অধুনা ভুবনেশ্বরেও একটি আশ্রম আছে। তাঁর বৃন্দাবনের আশ্রমে অনেকবারই গিয়াছি এবং অনেকদিনই কাটাইয়াছি। সেখানে বিদ্যানন্দ ও কালীকানন্দজীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

বয়সের দিকে যেন কিছু বেশী দেখাইলেও জ্ঞানানন্দজী কেশবানন্দজীর শিষ্য বলিয়াই প্রকাশ। কেশবানন্দজী বড় মহারাজ ও জ্ঞানানন্দজী ছোট মহারাজ বলিয়াই কাশীর ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল আশ্রমে পরিচিত, যদিও জ্ঞানানন্দজীই সেই প্রতিষ্ঠানের আদি মধ্য ও অন্ত সবটাই। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রাণ ধনপতিগণের অর্থে এবং বহুতর কর্ম্মীর সামর্থ্যেই মণ্ডলটি প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞানানন্দজীর ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত একথা সকলেরই প্রায় জানা আছে।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে উভয় আনন্দ-মূর্ত্তিরই পূর্ব্বাশ্রমের এবং বর্ত্তমান আশ্রমের ইতিহাস সাধারণের মধ্যে অনেকেরই জানা আছে। যেহেতু তাঁহারা বিখ্যাত লোক। আমার এই কাহিনীর সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই, কাজেই সে-সকলের আলোচনায় প্রয়োজন নাই। কেবল বর্ত্তমানে আমার যেটুকু সম্বন্ধ সেইটুকুই বলিব।

সংসার-ত্যাগী সাধু যাঁরা তাঁদের যদি সাধারণ সংসারীর মত আচার এবং ব্যবহার দেখা যায় সেটা সাধারণের দৃষ্টি তীব্রভাবেই আকর্ষণ করে এবং জন-সমাজে সে-সকলের আলোচনাটাও কম তীব্র হয় না। কাজেই কেশবানন্দ ও জ্ঞানানন্দজীর সম্বন্ধে নানা আলোচনা নানা সমাজে হইলেও আমি কেশবানন্দকে (এক সময়ে, বৈরাগ্যের প্রথম পাদে তাঁহার বহুতর তপস্যার কথা শুনিয়াছিলাম বলিয়া) তপস্বী, আর জ্ঞানানন্দজীকে দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই জানিতাম ও মানিতাম। এই গেল এই কাহিনীর মধ্যে তাঁদের পরিচয়-কথা।

তারপর পথে যখন হঠাৎ একদিন সকালে দেখা হইল, প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদামশাই, কবে এখানে এলেন? আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কেই তিনি দাদামশাই। এটা তাঁর পূর্ব্বাশ্রমের কথা; অভ্যাস মত, দাদামশাই, বলাতে দেখিলাম তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। যাহা হোক তিনি বলিলেন: আমাকে আর দাদামশাই ব'লো না, স্বামীজী বোলবে। আর তুমি বিকালে চক্রতীর্থে অমুক বাবুর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, কথা হবে। এখন তাড়াতাড়ি আছে, আমি সহরের দিকে যাচ্ছি।—তুমি কতদিন এখানে?

আমি যথাযোগ্য উত্তর দিয়া তখনকার মত চলিয়া গেলাম। বৈকালে ঠিক ঠিকানায় গিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, প্রকাণ্ড বাড়ী। একদিকে কেশবানন্দজী অপর দিকে জ্ঞানানন্দজীর ঘর। মধ্যে জ্ঞানানন্দের পার্শ্বের ঘরে একটি গৌরবর্ণা আধাবয়সী স্থূলাঙ্গী বহুমূল্য বেশভূষায়-

ভূষিতা নারীর স্থান। শুনিলাম, তিনি খৈরীগড়ের রাণী—গুরুদেবের সঙ্গে সমুদ্রের হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

একটি পরিষ্কার বিছানার উপর প্রকাণ্ড একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত, সেখানে কেশবানন্দজীকে পাইলাম। তিনি বলিলেন:



—এ রকম করে কতদিন চলবে, তুমি গৈরিক নাও, সাদা কাপড়ে এসব চলবে না। খাওয়া-দাওয়া চলছে কি করে?

আমি বলিলাম: একবার খাই, তা যেখানেই হোক সামান্য চেষ্টায় যা জোটে তাইতেই চালিয়ে নি।

—ও রকম করলে শরীর থাকবে না, কেশবানন্দ বলিলেন: গৈরিক নিয়ে তুমি গৃহস্থের বাড়ীতে, নারায়ণ হরি, বোলে দাঁড়াবে, তাহোলেই ভিক্ষা পাবে। এ আশ্রমে থাকতে গেলে ভেক চাই, লাল কাপড় পরতে হবে।

আমি বলিলাম: মাপ করবেন, আমার গৈরিক পরবার ইচ্ছা মোটেই নেই। এই সাদা কাপড়ে যা হয় তাই হবে। আপনি আমায় একটু নিরিবিলি থাকবার আর কাজ করবার জন্যে আপনার ভুবনেশ্বরের আশ্রমে একটু স্থান দিন, আর কিছু চাই না।

—আমার ভুবনেশ্বরের আশ্রমে এখন দোতালার ঘর তৈরী হচ্ছে। কালিকানন্দ সেখানে আছে, সব কাজ দেখছে শুনছে আর শিবানন্দের উপর আশ্রমের ভার দেওয়া আছে। কালিকানন্দ আর সেখানে থাকতে চাইছে না, তুমি যদি তার জায়গায় কাজ করতে পার ত যেতে পার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রকম কাজ ?

কেশবানন্দঃ কাজ এমন কিছু নয়, ল্যাটোরাইট পাথরের কাজ হচ্ছে। কত পাথর এলো, আর মিস্ত্রী মজুর খাটছে তার হিসাব রাখা, মজুরী দেওয়া, ঠিক মত সব চলছে কিনা লক্ষ্য রাখা—এই কাজ। সে তোমায় কালিকানন্দ সব বুঝিয়ে দেবে। দুই এক ঘণ্টার কাজ—অনেক সময় তোমার থাকবে। আর হুজুরী পাণ্ডা সেখানে আছে, সে তোমায় সব ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে।

পরে জানিয়াছিলাম হুজুরী পাণ্ডা তাঁর অনুগত একজন, তাঁর সাহায্যে তিনি সেখানে অনেক জমি-জারাত সংগ্রহ করিয়াছেন।

অন্যান্য কথার পর তিনি দুটি টাকা আমায় দিয়া বলিলেন—আচ্ছা তা হোলে এইখানে স্নানযাত্রাটা দেখে চলে যেও।

আমি বলিলামঃ কিন্তু টাকাকড়ি আমি রাখতে পারবো না, সেটা অন্য কারো উপর ভার দেবেন।

তিনি বলিলেনঃ তা হোলে শিবানন্দের কাছে টাকাকড়ি থাকবে।

—সেই ভালো—বলিয়া আমি সে প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

অন্যান্য অনেক কথাই হইল। উঠিবার সময় শেষে আবার একবার কথা হইল যে, আমি দুই চারি দিনের মধ্যে তাঁর ভুবনেশ্বরের আশ্রমে যাইয়া থাকিব ও কালিকানন্দজীর কাজটি লইব এবং কালিকানন্দজী বৃন্দাবন আশ্রমে যাইবেন।

চক্রতীর্থে ও স্বর্গদ্বারের আড্ডায় যখন প্রকাশ হইল, আমি এখান হইতে স্নানযাত্রার পরেই চলিয়া যাইতেছি, তখন যন্ত্রী কালীবাবুর বড় ভাবান্তর হইল, তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহার সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশী হইয়াছিল। করুণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া, হাসিয়া বলিলেনঃ আবার কবে দেখা হবে কে জানে, আপনাকে ত ধরে রাখবার যো নাই।

আমি বলিলামঃ বাঁচলেই আবার দেখা হবে, আপনার বাজনা শোনবার মোহ আমি সহজে কাটাতে পারব না। নিশ্চয়ই আবার আমাদের দেখা হবে।

ঘরে মা ভাই প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ থাকিতেও কালীবাবু বাড়ী যাইতেন না। সন্ন্যাসীর কোন বাহ্যিক লক্ষণ তাঁর ছিল না কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তিনি সন্ন্যাসীর মতই ছিলেন। সাদা কাপড়, পিরাণ, জুতা পরিতেন, টেরি কাটিতেন। অধিক রাত্রে গোপনে জপ ধ্যানে থাকিতেন, কেহই টের পাইত না। সাধু চরিত্র, তার মধ্যে বালকের সরলতা, তিনি চিরকুমার ছিলেন। এক স্বরদ যন্ত্রটিই তাঁর কেবলমাত্র আকর্ষণের বস্তু ছিল। কালীবাবুর সঙ্গে পুরীতে এই যে আলাপ এবং প্রণয় ইহা যেন চিরকালের।

ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতায় শোভাবাজার রাজবাটির একাংশে, একতলে, একটি ছোটঘরে, সঙ্গীতের আড্ডায় আবার কালীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা। দেখা হওয়ায় আনন্দে অধীর হইলেন। পুরীতে সেই আনন্দময় জীবন-যাপনের কথা হইল, সে দিন

এই আলোচনাতেই কাটিল। তারপর আর বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই। প্রায় ছয় সাত বৎসর পরে আবার টালিগঞ্জে কালীবাবুর সঙ্গে দেখা। স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির কনিষ্ঠ জামাতা ৺মথুরবাবুর পৌত্র শ্রীযুক্ত শিবনাথবাবুর বাড়ীতে। টালিগঞ্জের সঙ্গে আমারও সম্বন্ধ কম ছিল না, শিববাবু আমাদের প্রতিবেশী। দেখিলাম, তাহারই বাড়ীতে বাহিরের ঘরে কালীবাবু যন্ত্রপাতি লইয়া অবস্থান করিতেছেন। কিছু দিন মধ্যে মধ্যে তাঁর যন্ত্রালাপ শুনিবার সৌভাগ্য ঘটিল। কিন্তু সে বেশী দিন নহে,—একদিন শুনিলাম, কালীবাবু জ্বরাতিসারে ভুগিতেছেন—আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাইবার, তাঁহাদের দেখিবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি তাদের ওখানেই আছেন, তার এক সপ্তাহ পরে শুনিলাম, মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতালে তাঁর ভব-যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে। মমতা তাঁহার কাহারও উপর ছিল না; সুরের সাধনা করিয়া তিনি সুরলোকেই গিয়াছেন। তাঁর বিয়োগে প্রাণে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলাম। অনেক সঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত প্রচ্ছন্ন সাধু দেখি নাই।

পুরীতে আরও দুইটি সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ।—একজন গৌরবর্ণ বৃদ্ধ উড়িষ্যাবাসী, মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। গৃহী, তাঁর বড় বড় ছেলে, মেয়ে, বৌ, দাসদাসী, বিশাল সংসার, স্ত্রী নাই। আলাদা এক স্থানে থাকেন, বাড়ীর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। তিনি তান্ত্রিক, আবার বৈষ্ণব। গলায় রুদ্রাক্ষ, আবার তুলসীর মালাও আছে। গায়ে ওঁকারের ছাপ। কথায়-বার্ত্তায় যেন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়েরই ভাব। তীর্থ করিতে বাকী নাই। দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতাও আছে। তাঁর কাছে আমি দুই দিন গিয়াছিলাম।

ইনি জপের পক্ষপাতী, বলেন : জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, ন সংশয়ঃ। বিনা জপে কখনই ইষ্টলাভ হয় না। কালী বল, কৃষ্ণই বল, যাই বল না কেন, ইষ্ট-সাধনায় সিদ্ধি পেতে গেলে জপ ব্যতীত আর অন্য পথ নাই। জপের দ্বারাই মূর্ত্তি সাক্ষাৎকার হয়। যিনি মূর্ত্তি পান, তিনি মহাভাগ্যবান।

বুঝিলাম, ইনি মূর্ত্তিই চরম বলিয়া ধরিয়াছেন আর জপের দ্বারাই পাইয়াছেন।

আর এক ব্যক্তি, পাগলের মত অনেকটা নিঃসঙ্কোচ। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানোই কাজ। হঠাৎ একজন লোকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে কথা শুনিয়া তাঁহাকে পাগল বলিতে সাহস হইবে না। তৈলঙ্গীবাবা বলিয়া অনেকে তাঁকে বলেন। তিনি বলেন, যত মঠাশ্রয়ী সাধু আছেন সকলেই ভণ্ড, চোর, ধর্ম্মের নামে একটা ধুমধাম করিয়া পাঁচজনকে আকৃষ্ট করিবার ফন্দি। বিষয়-বুদ্ধি আর ভোগই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমাকে কোনও মঠাশ্রয়ী সাধুর সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলেন : ভগবানকে মানুষ কখনই চায় না। চায় কেবল শক্তি,—ভোগের বস্তু সংগ্রহ বা আকর্ষণ করিবার শক্তি। লোকের উপর নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি। যে বলে আমি ভগবানকে চাই তার ভিতরের কথাই এই। তিনি কেশবানন্দজীকেও জানেন, তাঁর বৃন্দাবনের আশ্রমে অনেকবারই অতিথি হইয়াছিলেন।

তাঁর সঙ্গে আমি অনেকদিন বেড়াইয়াছিলাম। পরনে একখানি কৌপীন, তার উপর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া একখানি ছেঁড়া কম্বল। তিনি বলিলেন: ঘুরিয়া ফিরিয়া যত বেড়ান যায় ততই ভাল। দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিলে চিত্ত নির্ম্মল থাকে। এক জায়গায় বসিয়া গেলেই বিপদ। যত ভোগ, রোগ, আলস্য, আরামের ইচ্ছা, নানা কর্ম্মে প্রবৃত্তি, নানা মতলব ও দুশ্চিন্তা আশ্রয় করিবেই করিবে। সাধু ব্যক্তির ইহাপেক্ষা অশান্তির কারণ আর কিছুই নাই।

আমি বুঝিলাম, এটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন যে [নানা শাস্ত্র অধ্যয়নে কেবল বৃথা সময় নষ্ট। যারা আলস্যপরায়ণ তারাই বসিয়া বসিয়া অতিরিক্ত অধ্যয়নের পক্ষপাতী। কেবল বইয়ে-মুখে থাকে যে-সকল মানুষ, বুঝিতে হইবে তাহাদের কর্ম্মশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সাধুর কর্ম্মই অবলম্বন হওয়া উচিত—অধ্যয়নের আড়ালে কর্ম্মকে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি মোটেই ভাল নয়। পরে ঘোর বিপাক আসিবে।]

দেখিলাম, তিনি কর্ম্মের পক্ষপাতী বেশী, বলেন: ভগবৎ উপাসনার চেয়ে উদ্যম এবং পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হলে উপাসনার বেশী কাজ হয়। এই যে অলস সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দেখছো, কর্ম্মের নামটি নাই, কেবল ভুঁড়ি বাড়াবার যত্নই চলছে, এরা ভাগ্যবান মনে কোরো না। এদের দুর্ভাগ্য অসাধারণ। মানব-সাধারণের অশ্রদ্ধাই তাদের প্রাপ্য। কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর চেহারায় ওরা কাপুরুষ, চোর। শাস্ত্রের কতকগুলি বাঁধা গৎ মুখস্থ ক'রে গৃহী লোকদের ঠকানোই ওদের প্রধান কাজ। কানে মন্ত্র দেওয়া আর একটা ঠকাবার ব্যাপার। অনেকেই তার মধ্যে গিয়ে পড়ে, শেষে গুরুশিষ্যে মারামারি। এদের অদৃষ্টে শেষকালে মার ঠেঙানি আছে। সমাজের আপদ এগুলি জানবে।

এঁর সঙ্গে আবার বৃন্দাবনে একবার দেখা হয়েছিল, পরে সে কথা বলব।

এখন এখানে স্নানযাত্রা দেখিব কি? লোকের ভীড়ে শ্রীক্ষেত্র একটি ভীষণ কোলাহলময় অশান্তির স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইসব দেখিয়া প্রাণ অশান্ত হইয়া উঠিল। সকলের কাছে বিদায় লইয়া সেই রাত্রেই ভুবনেশ্বর যাত্রা করিলাম, সঙ্গে একখানি কম্বল, একখানি গানের খাতা, খানকতক বই ও একটি পেন্সিল।

কালিকানন্দজী ত মহাখুসী। ইতিমধ্যে বড় মহারাজ তাঁহাকে আমার যাইবার কথা লিখিয়া থাকিবেন, তিনি যেন প্রতীক্ষায়ই ছিলেন বোধ হইল। এখান হইতে মুক্তি পাইবার আশায় আনন্দে আমাকে তাঁর কাজগুলি বুঝাইয়া দিতে লাগিয়া গেলেন। আমিও যথাসাধ্য বুঝিয়া লইতে লাগিলাম। টাকাকড়ি সবই শিবানন্দের কাছে থাকিবে, আমি কেবল হিসাব রাখিব। শিবানন্দ বাজার করিবে, পাক করিবে, ঘর সংসারের সকল ভারই তার উপর।

খাওয়ার কথাটা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। আনাজের মধ্যে তখন কচুই মিলিত, তাহারই ঝোল আর বোলতার টিপের মত মোটা লাল চালের ভাত। দুইবেলাই এই খাদ্য, ব্যস্। অবশ্য মহারাজের জন্য উৎকৃষ্ট কামিনী ধানের চাল সংগ্রহ করা আছে, আমাদের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ।

১৮৭০

তখন আষাঢ় শ্রাবণ, বর্ষার সময়। ভুবনেশ্বরে প্রায় দেড়মাস ছিলাম, তাহার মধ্যে কোনও দিন সূর্য্যদেবের মুখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কাজেই কোন্ দিকটা পূর্ব্ব, কোন্ দিকটা পশ্চিম তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে অনেকটা যাইতে হয়। গ্রামের শেষের দিকেই গৌরীকুণ্ড। এই প্রসিদ্ধ গৌরীকুণ্ডের অতি নিকটেই আমাদের কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। আশ্রমের একতলায় তখন দুইখানি পাকা পাথরের ঘর ছিল আর দুইখানি টিনের চালওয়ালা ঘর। আমরা সেই ঘরেই বাস করিতাম। পাকা ঘরগুলিতে মহারাজের আসবাব সকল ছিল, আরাম-চেয়ার, খাট, পালঙ্ক, বিছানা-পত্রে ঘরগুলি পূর্ণ। সবে দ্বিতলের সিঁড়ি শেষ হইয়া ঘর আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথম প্রথম ভুবনেশ্বরের আবহাওয়ার মধ্যে যাইয়া একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্রাণ পূর্ণই ছিল। গৌরীকুণ্ডে স্নান ও মুক্তেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণের নির্জ্জনতা আমার মধ্যে যে আনন্দ, বিস্ময় ও উদাসভাব ঘনীভূত করিয়া দিল তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। ভাষায় তাহার বর্ণনা নাই, তাই সে দিকে চেষ্টা না করিয়া অন্য কথা বলি।

ইচ্ছা হইত দিবারাত্র এইখানেই কাটাই। একটি প্রস্তর-বেদি, কুণ্ডের একদিকে ঘাটের ধারে, তার চারিদিকেই সুসমতল ভূমির উপর গাঢ় হরিৎবর্ণের ঘন তৃণ আচ্ছাদন। যেন সবুজ ঘাসের বিছানা। চক্ষু জুড়াইয়া যায়। সেই কুণ্ডের পার্শ্বেই মুক্তেশ্বরের মন্দির। মন্দিরটি খুব ছোট নয়, খুব বড়ও নয়। কিন্তু তাহার প্রস্তর-ভিত্তির কারুকার্য্য ভুবনবিদিত। নানা দেশবাসী শিল্প-প্রিয় অনুসন্ধিৎসু মানবের আকর্ষণের বস্তু। সেই মন্দিরের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ কারু-কার্য্যের তুলনা নাই।

মন্দিরের একটি দ্বার একদিকে, অপর তিনদিক বন্ধ। ভিতরে কিন্তু চামচিকারই রাজ্য। উপরের ছাদের দিকে যে সুন্দর সুন্দর কারুবিগ্রহ সকল, সকল সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া একসময়ে সাধারণের মনোহরণ করিত, তৈলদীপের ভূষায় সে সকল কৃষ্ণবর্ণ এবং বিকৃত হইয়া আছে। কখনও পরিষ্কার হয় না।

যাহা হউক দিনমানে মুক্তেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণেই ছিল আমার আসন। নিকটেই আর একটি ছোট মন্দির আছে,—কোণের দিকে মুক্তেশ্বর কুণ্ডের যে ঘাট তাহার উপরেই। সেই মন্দির অভ্যন্তরে কখনও কখনও সকাল সন্ধ্যায় বসিতাম। আমার কত সৌভাগ্যফলেই ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে আসিবার যোগাযোগ ঘটিয়াছে। ভাবিয়া মনে মনে অন্তর্য্যামীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রাণকে শান্ত করিতাম।

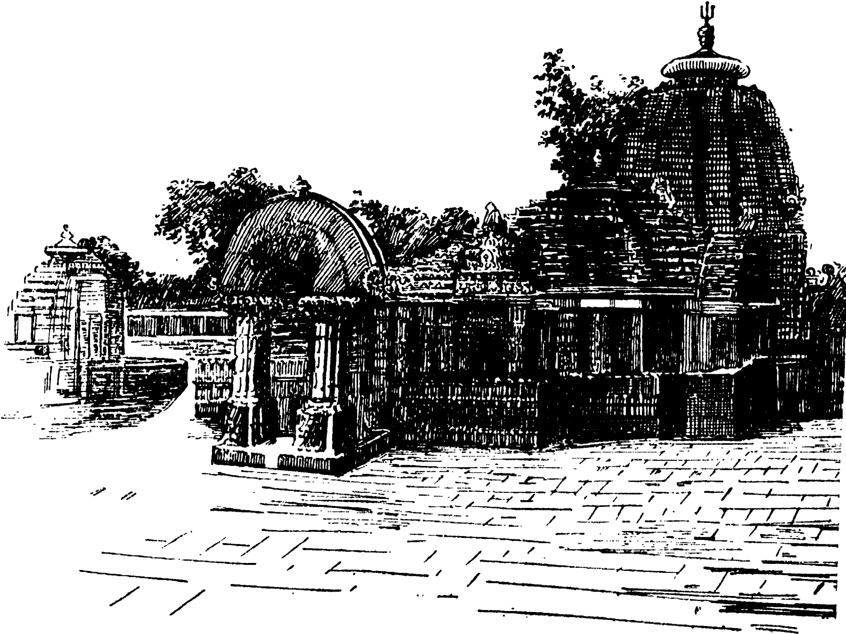
এই যে সৌভাগ্যের কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে বিপর্য্যয় কিছু ছিল; মধ্যে মধ্যে তাহা যথেষ্ট মনোকষ্টের কারণ হইত।

শিবানন্দই ছিল আশ্রমের প্রধান, তাহার গুরু অথবা প্রভুভক্তি অসাধারণ। গুরুদেব তাহার উপর যে আশ্রমের সকল ভারই দিয়াছিলেন সে বিষয়ে তাহার দায়িত্ব-বোধ অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। সেই মাত্রা সময়ে সময়ে আমার পক্ষে কষ্টকর হইত। শিবানন্দকে দেখিতে বেশ গৌর-

বর্ণ, ক্ষীণকায় যুবা, মাথায় জটা-মুকুট, একটু বঙ্কিম দৃষ্টি, যাকে আমরা ট্যারা বলি। গলার স্বর ক্ষীণ। একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির, কিন্তু একেবারেই স্নেহহীন ছিল না।

প্রথম প্রথম আমি যখন সকালে কাজকর্ম্ম সারিয়া মুক্তেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইয়া বসিতাম সে কিছু আপত্তি করে নাই। তারপর যখন দেখিল আমি নিত্য নিত্যই উহা করিতেছি এবং ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতেও বিলম্ব করিতেছি, তখন সে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—কালিকানন্দজী তো কভি এয়সা নহি করতে। অর্থাৎ কালিকানন্দজী কখনও আশ্রম হইতে বাহিরে গিয়া এত বেলা অবধি কোথাও থাকিতেন না।

আমি বলিলাম: সকালে আশ্রমের মধ্যে থাকা সর্ব্বক্ষণ আমার ভাল লাগে না, যদি নিকটেই



ক্তেশ্বরের প্রাঙ্গণে গিয়া বসি তাহাতে ক্ষতিই বা কি? সে বলিল: ক্ষতি নাই বটে, তবে শ্রমের মধ্যে থাকিলে মিস্ত্রীদের কাজকর্ম্ম দেখা হইত। সগড়ওয়ালা আসিলে পাথর কত সিল তাহার হিসাব রাখা হইত। আমাকে হাতের কাজ ফেলিয়া ডাকিতে ছুটিতে হইত না, ত্যাদি। অবশ্য সত্য বলিতে কি, রান্না ছাড়া তার হাতে অন্য কাজ থাকিত না।

পরাশ্রয়ের এই ত দোষ। যাহা হউক আমি বলিলাম: আচ্ছা। আমি সকাল সকালই সিব। মন কিন্তু একটা অশান্তির ছায়া পাইল।

সকালে তাহার স্নান পূজাদি সমাপন হইলেই সে প্রায় আটটা নাগাৎ রান্না চড়াইত, ন'টা ড় ন'টা নাগাৎ শেষ হইত। এক কচুর ঝোল আর ভাত, কতক্ষণ লাগে? রান্না শেষ

হইলেই আমাকে খাওয়াইয়া সে নিজেও খাওয়াটা সারিতে চাহিত। বোধ হয় তার ক্ষুধা পাইত।

আমারও যে ক্ষুধা পাইত না এমন নয়, কিন্তু যেখানে মাত্র দুইবার ভাত খাওয়ার বন্দোবস্ত সেখানে অত সকাল সকাল যদি খাই তাহা হইলে দুইটা তিনটা নাগাৎ আবার ক্ষুধা পায়। কিন্তু সন্ধ্যা বা রাত্র না হইলে ত আর দ্বিতীয়বার খাবার বা ভাত মিলিবে না। সেই কারণেই আমি সকালের দিকে একটু বিলম্বে খাইতে চাহিতাম,—সে সেটা পছন্দ করিত না। ভুবনেশ্বরে আসিয়া দিনকতক প্রায় এক পক্ষকাল ক্ষুধার তাড়না কিছু বেশী অনুভব করিতাম। বোধ হয় জলবায়ুরই গুণ। বৈকালে খাইবার কিছুই বন্দোবস্ত নাই বা এ আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। সংযম-অভ্যাস, বিশেষত আহারের ব্যাপারে তখন কষ্টকর মনে হইত।

আরও একটু অ-সুখের কারণ ছিল। শিবানন্দ রাঁধুনী ভাল। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় ভোজন শেষে আসন হইতে উঠিবার সময়, কেমন রান্না হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিত ; তখন নয়নের সজল অবস্থায়ই, বহুত আচ্ছা হুয়া, বলিতে হইত। একমাত্র উপকরণ, তাহাতে নিরামিষ, ঘৃতবর্জ্জিত তৈলপক্ক বলিয়া বোধ হয় শিবানন্দ অতিরিক্ত লঙ্কার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—যাহা আমার পক্ষে শেষের দিকে পীড়ার এবং স্থানত্যাগেরও কারণ হইয়াছিল। আমার জন্য ত আর পৃথক বন্দোবস্ত হইতে পারে না!

৪

একটি প্রৌঢ় বয়সের সাধুমূর্ত্তি একদিন সকালে কেশবানন্দের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ভুবনেশ্বরেই থাকেন, বিন্দু সরোবরের তীরে একখানি ঘরে। পূর্ব্ববঙ্গের লোক, তামাটে রং, কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ, লম্বা ক্ষীণ শরীর, নামটি তাঁর যাহাই হোক, নাগ মহাশয় নামেই পরিচিত।

আমার সঙ্গে পরিচয় হইবার পর তিনি একদিন তাঁর আশ্রমে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি সানন্দেই স্বীকার করিলাম। তিনি আমায়, দাদা, বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলেন—যদিও তিনি আমার পিতার বয়সের। বোধ হয় আমাকে জাতিতে ব্রাহ্মণ জানিয়াই ঐরূপ সম্বোধন করিতেন। অতীব বিনয়ী স্বভাব তাঁর, কিন্তু কথাবার্ত্তা তেজোপূর্ণ।

পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত সিদ্ধ মহাপুরুষ, বারদিয়ার ব্রহ্মচারী লোকনাথের কথা অনেকেই জানেন। তাঁর অনেক শিষ্য। পূর্ব্বে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই শুনিয়াছিলাম। নাগ মহাশয় তাঁরই শিষ্য একথা ঘনিষ্ঠ পরিচয়প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম। লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিবার জন্য তাঁহার কাছে বেশী বেশী যাতায়াত করিতাম। তিনি আগ্রহের সহিত আমাকে তাঁহার জানিত সকল কথাই শুনাইতেন। কথায় তাঁর বেশ পূর্ব্ববঙ্গের টান ছিল।

সাধু সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া নাগ মহাশয়কে ঠিক বুঝিবার যো ছিল না। ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পর তবে তাঁহাকে কতকটা জানিতে পারিলাম। আসলে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক

তাঁহার উদ্দেশ্য, জপ, তপ, যোগ, ধ্যান ইত্যাদি সাধারণত সাধু সন্ন্যাসীদের এ সকল অভ্যাসের অনুরূপ নয়, একদিন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা-প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলিলেন তাহাতেই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম প্রকাশ পাইল এবং আমায় বিস্মিত করিয়া দিল।

কথাবার্ত্তায় তিনি সকল সময়েই উৎসাহে পূর্ণ। সেদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন: দেখুন, ভগবানের জন্য জপ, তপ, ধ্যান-ধারণা আর এখন আমার ধর্ম্ম নয়, আমার ধর্ম্ম এক বিঘা জমিতে কিসে পনেরো থেকে বিশ মণ ধান উৎপন্ন হয়। ভগবানকে পাওয়ার কোন চিন্তাই নাই। তাঁহাকে পাইব ও আনন্দের স্রোতে ডুবিয়া যাইব, অমৃতত্ব লাভ করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে মুক্ত হইয়া জগতের যত সুখ দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক কাটাইব, এ আমার এখন আর প্রয়োজন নাই। আমাদের জমির উর্ব্বরাশক্তি কিসে বৃদ্ধি হয়, আর পতিত জমির উপর কিসে ফসল উৎপন্ন করা যায়, আর কি উপায়ে দেশের সকল জমিতে উৎকৃষ্ট চাষ-আবাদের ফলে দেশের দুঃখ দারিদ্র্য ঘোচে তাই আমার একমাত্র কাম্য। তাহা হইলেই আমার ভগবান পাওয়া হইল।

আমি বলিলাম: আপনি দেশ ছেড়ে এ রাজ্যে কেন? দেশের মধ্যেই কি আপনার এ ব্যাপার পরীক্ষা করবার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র পেতেন না?

তিনি বলিলেন:—এই উড়িষ্যারাজ্যে এত পতিত জমি আছে দেখলে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। তা ছাড়া আমাদের বাঙ্গালায় যা হোক দু' চারজনও এক্ষেত্রে কর্ম্মী আছে, কিন্তু উড়িষ্যাপ্রদেশে এখন কেউ নেই। এই উড়িয়া-শ্রমজীবীদের উদ্যমহীনতাই আমায় এখানে কর্ম্মক্ষেত্র গড়তে আকৃষ্ট করেছে। এরা এত অলস ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে যে, কোন রকমে এক সন্ধ্যা খাবার মত কিছু যোগাড় হোলেই আর পরিশ্রমের দিকে যাবে না। একটা পান ও একটু গুড়িতেই এদের সন্তোষ। অথচ এরা বাঙ্গলার তুলনায় বেশি নিরক্ষর নয়। কিন্তু আলস্যে বাঙ্গালার উপর যায়।

এ দিক থেকে কিছু সাড়া পেয়েছেন কি না,—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। নাগ মহাশয় প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন: হাঁ, এখানে উদয়গিরির পথে একখণ্ড জমি পেয়েছি আর আটজন গ্রাম্য লোকও পেয়েছি, কাজও গত বৎসর হতে সুরু করেছি, দেখা যাক। এখানে ব্যাপার কি জানেন, এরা জমি পরীক্ষা করে না,—আর জমিতে কখনও সার দেয় না। বড় জোর, কেউ কখনো কখনোও একটু গোবরের সার দিলে। এরা এটুকু বোঝে না, জমির উর্ব্বরা-শক্তি ক্রমশই কমে যাচ্চে। কোন্ জমিতে মাটি কি রকম, তাতে কতটা কি আছে তা বুঝে চাষ করা—এ সব জানা এখন প্রয়োজন। আমি অনেক ভাল ভাল চাষীর সঙ্গে আলাপ করেছি, দেখিলাম জমির উর্ব্বরাশক্তি কমে যাচ্চে, একথা এরা কেউ কেউ বোঝে বটে, কিন্তু কিসে উর্ব্বরাশক্তি বাড়ে সেটার দিকে কারো লক্ষ্য নেই। এখন এদের সঙ্গে কাজ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষার দ্বারা দেখাতে হবে যে, ক্লোরিন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করলে জমিকে খুব ফলানো যেতে পারে।

আমি: আপনার এতে ত অর্থেরও প্রয়োজন, সেটা কি ভাবে যোগাড় হয়?

নাগ : ভিক্ষা করি, আবার দুই-একজন এদেশের মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকও কিছু কিছু সাহায্য করেন। বরং এদের দয়া দাক্ষিণ্য, বিবেচনা আছে ; কিন্তু বড় লোকের দয়া মায়া কিছুই নেই। আমি প্রথমেই একজন জমিদার, রাজা উপাধি, তাঁর কাছে আমার প্লান নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিন দিন ঘুরিয়ে একদিন দর্শনের সুযোগ দিলেন। সকল ব্যাপার তাঁকে বেশ করে বুঝিয়ে হিসাব করে দেখিয়ে দিলাম। শেষে কিছু জমি ও প্রয়োজনীয় রাসায়নাদি (কেমিক্যাল) খরিদ আর চাষের ব্যবস্থার সঙ্গে দশজন শ্রমজীবী প্রার্থনা করলাম। বিবেচনা করে দেখবো বোললেন। একপক্ষ কাল হাঁটাহাঁটির পর ম্যানেজারবাবুর মুখে বলে পাঠালেন যে, ওসব সাধুসন্ন্যাসীর কর্ম্ম নয়, তার চেয়ে আপনি জপ তপ করুন গে।

আমাদের দেশে বড়লোকেরা প্রায়ই অ-চৈতন্য, বিশেষত গরীবের সম্পর্কে।

আমি বলিলাম : আপনি, অ-চৈতন্য কথাটি বললেন কেন ?—বিমুখ, বললেই কি ঠিক হোতো না ?

নাগ : না—গরীবের শরীরের রক্ত জল করে যে অর্থ উৎপন্ন হচ্চে তাই শোষণ করেই তাঁরা অর্থবান, বড়লোক বা জমিদার হয়ে ভোগ-বিলাসের উচ্চস্তরে বসে আছেন, এই যে মর্ম্মান্তিক সত্য এ সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই অচেতন, তাই অ-চৈতন্য বলছি।

তাঁর অন্তঃকরণে গরীব দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়া অন্তরের মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ করিলাম। এ ধরণের সাধু ত দেখি নাই ! জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনার এখানে চলে কেমন করে ?

নাগ : এই যে দেখুন না, একটি ছোট কাঠের উনান আছে, তাইতে একবার দুটো চাল ডাল ফুটিয়ে নি, এক পাকে যা হয়। একটু ঘি যোগাড় করা থাকে, তাই দিয়ে সুরু করি, আর শেষে একটু দই কিম্বা দুধ। এই যে সব লোকগুলি দেখছেন, এরা শ্রমজীবী এবং আমার অনেক কাজই করে দেয়। আমি কাউকে দিনে ঘুমুতে দিই না।

আমি : এখানে ত দেখেছি আমাদের বাঙ্গলা দেশের মত ভাত খেয়েই সকলে শোয়— না শুয়ে থাকতে পারে না।

নাগ : দিনের বেলায় এদের মধ্যে ঘুম তাড়াবার চেষ্টায় আছি। আমি এদের বোঝাতে চেষ্টা করি, বেশি পরিশ্রম করলেই বেশি পয়সা। কাজই আসল—আর তাই থেকে পয়সা। যদি তারা দিনে না ঘুমিয়ে বা অত্যন্ত অল্প সময় ঘুমিয়ে তারপর পরিশ্রমের কাজে লাগে ত তারা কখনো দরিদ্র থাকবে না।

আমি : সুধু জমির কাজেই সকল সময় ত কাটে না,—

নাগ : হাঁ, তা ত বটেই। ক্ষেতের কাজ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে ব্যবহার উপযোগী যা-কিছু সেই দিকে মন দিতে হবে। কেউ কেউ লোহার কাজ করে থাকে। কাস্তে, নিড়ান, পেরেক, কোদাল, ফলা, দরকারী কাঠের জিনিস—এই সব। আবার কেউ কেউ তুলার কাজও করে থাকে। চরখা চালানো এদের মধ্যে এখনো খুব চলন আছে। সে দিকেও কাজ চলছে।

আমি তাদের এইটুকু কেবল বোঝাতে চেষ্টা করি যে, চাষ করা ছাড়া অন্যান্য অনেক কিছুই অবসর সময়ে করা দরকার, যা না হোলে দারিদ্র্য ঘুচবে না। কেবল ধান-চালের ব্যবস্থা করলে চলবে না,—তবে সেদিকে আমি বিশেষ কিছুই সাহায্য করতে পারি না। দরকারী যা হোক একটা কিছু করতেই হবে, ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের বাঙ্গলা দেশের মধ্যে যে একটু সাড়া পড়েছে আমি সেইটাই এখানে চালাতে চাই,—তবে তার মধ্যে রাজনৈতিক কিছুই থাকবে না। দেখেছি এরা আমায় ভালবাসে। যতদিন এরা আমায় চাইবে, ততদিন আমি এদের কাছেই থাকবো।

আমি : আপনার চাষ-আবাদের উৎকর্ষের জন্য এই যে উদ্যম ও প্রচেষ্টা—কালে এ জয়যুক্ত হবেই আমার আন্তরিক বিশ্বাস। কারণ যেটা যে সময়ে উপযোগী ভগবান উপযুক্ত লোকের দ্বারা মানুষের সমাজের মধ্যে সেইগুলির প্রবর্ত্তন করেন, তাইতেই লোকে জীবনযাত্রায় বেঁচে যায়।

নাগ : যারা নেয় তারাই বাঁচে, যারা অলস তারা আলস্য ভোগ করতে করতে মরতেই ভালবাসে, তাও দেখছি।

নাগ মহাশয় আর একদিন আমায় তাঁর ক্ষেত্র দেখাইতে লইয়া গেলেন, সে ভুবনেশ্বর গ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশের কিছু বেশি হইবে। দরিদ্র পল্লীর মধ্য দিয়াই পথ। আমরা কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আচ্ছা, এই যে উড়িষ্যায় এত দুর্ভিক্ষ হয়, এত লোক না খেতে পেয়ে মরে, দয়ালু ভগবানের সৃষ্টিরক্ষার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় কি রকমে, তিনি দয়াবান, না নিষ্ঠুর, কি মনে হয় আপনার? অবশ্য আমি সাধারণ ভাবের দিক থেকেই বলছি।

নাগ : দয়াবান যদি তিনি তাহোলে নিষ্ঠুরতাটা কার, কোথা থেকেই বা এলো? এক জাহাজ সেপাই বা যাত্রী সমুদ্রের মাঝে ঝড় তুফানে ডুবলো, খবর এলো আড়াই হাজার লোক মারা গেছে, এটাও যা, ওটাও তা।

আমি বলিলাম : জাহাজ ডুবে মারা যাওয়া, ওটা ত দৈব বা আকস্মিক ঘটনা, ওটাতে কারো হাত নেই ; কিন্তু আমাদের দেশে বাঙ্গলায় বা উড়িষ্যায় যারা মরে দুর্ভিক্ষে, দারিদ্র্যে, না খেতে পেয়ে, রোগ ভোগ করে—এ যে বড় ভয়ানক, এ কোন্ পাপের দণ্ড?

নাগ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত জন্মালেই নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী—এ ত জানা কথা, যেখানে ভোগে সংযম নেই, কেবল উপভোগই চলছে—সেখানে এই রকমই জন্মে থাকে,—আর যেখানে এই রকম উচ্ছৃঙ্খল জন্মানোর হার—মরণও সেই রকম দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির এ ত সাধারণ নিয়ম।

আমি : বাঙ্গলা দেশে, জানেন ত প্রতি বৎসর কত লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কত মারা যায়?

নাগ : সে অনেকটা স্বকৃত। হয়েছে কি জানেন, ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

ভুগবে সেও ভাল, তবু প্রতিবিধানের জন্য শক্তি ব্যয় করবে না। এই দুঃখই সকলকার চেয়ে বড় দুঃখ নয় কি ?

আমি : শক্তি থাকলে ত ব্যয় করবে ?

নাগ : দাদা, শক্তিটা কি এতগুলো লোকের রোগে ভুগতে আর কেবল কুইনিন খেতেই চলে গেল ? যার অধিকারে যেটুকু জমি আছে একটু একটু করে যদি সকলে মিলে সাফ করতে সুরু করে, তাহোলে শরীরটাও ভাল থাকে, দেশের শ্রীও ফিরে যায়, রোগও সরে পড়ে যে। এটা কি অসম্ভব বলেন ?

আমি : জঙ্গল ত কম নয়, কত দিন ধরে জমচে,—

নাগ : কি যে বলেন দাদা ! প্রতি গ্রামে বেকার ছেলে কত আছে—ঘরের ভাত খেয়ে, ইয়ারকি দিয়ে, যাত্রা, থিয়েটার, কনসার্টের আখড়ায় আড্ডা মেরে, তাসে, পাসায়, ঘুমিয়ে, নানা অকর্ম্মে দিন কাটাচ্চে তার খবর রাখেন কি ? বিনাশ্রমে অন্ন জুটচে, কাজেই পরিশ্রমের গৌরবে চিরকালই বঞ্চিত হয়ে, ম্যালেরিয়ার শিকার হয়ে তিলে তিলে মরছে। আলস্য, আরামপ্রিয়তা এসকল পুরুষানুক্রমিক মজ্জাগত দুর্ব্বলতারই ভাবান্তর।

আমি : মাসিকেতে স্ট্যাটিসটিক্‌স্ দেখেছেন, কত লোক অর্দ্ধাসনে, কত লোক না খেতে পেয়ে, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রতি বৎসর মারা যাচ্ছে।

নাগ মহাশয়ের অমন শান্ত মুখমণ্ডল অশান্ত ভাব ধারণ করিল, ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন : দাদা, আমাদের দেশের মাসিক পত্রিকার খবরের কথা বোলবেন না। দেশ বিদেশের নানা খবর, শিল্প-সাহিত্য, কাব্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, নানা সমাজের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের খবর তারা খুব দিতে পারেন, আর মুখরোচক গল্প-সাহিত্য যোগাতে পারেন, কিন্তু এই যে পল্লীগ্রামের সর্ব্বনাশ করে সহরের পুষ্টি হচ্চে তার কোনও মীমাংসার কথা কোথাও পাবেন কি ? বৈজ্ঞানিক ভাবে ভোগবিলাসের ইন্ধন প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন থেকে শেষ পাতা অবধি। কেবল অর্থকরী পাশ্চাত্যের কৃত্রিম জীবনের অনুকরণে সমস্তই পাবেন ; আর এ সকলের প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় জীবনে এখন ঐকান্তিক একথাও পাবেন, কেবল পাবেন না দেশের বাস্তব জীবনের সরল পথের খবর। নিজেদের গ্রাম্য জীবনকে শক্তিশালী করবার দৃঢ় লক্ষ্য বা তার স্পষ্ট নির্দ্দেশ কোথাও পাবেন কিনা সন্দেহ।

আমি বলিলাম : আপনি হয়ত এটা লক্ষ্য করে থাকবেন, এখন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা দেশবাসীর মনে ক্রমশ এতটা বলবৎ হয়ে উঠেছে যে, আমাদের পল্লী-জীবনের ভিত্তিই যে সত্যভাবে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের কারণ এটা বোধের মধ্যে আসবার অবকাশ দিচ্চে না। রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপেই পল্লীসংস্কারের সকল আন্দোলনই এতটা ক্ষীণ করে ফেলেছে, এটা এখনকার দিনে খুবই স্পষ্ট। তবে এ দিকের কাজের মানুষও খুব কম—কেবল দুই-একজনের কথাই আমাদের মর্ম্মে পৌছায়।

নাগ : আমার আক্ষেপ এইটুকু যে, আমাদের দেশে এখনো অনুকরণের হাওয়াই চলছে,—

সকল বিভাগেই—ভাল মন্দ সকল দিকেই,—আর অত্যন্ত প্রবল ভাবেই চলেছে। সাহিত্য-শিল্পে, মায় চুরি ডাকাতিতে পর্য্যন্ত।

আমিঃ অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় যেখানে আমাদের দুঃখের ও দুঃখমোচনের পন্থার মিল দেখতে পাই, আমাদের কর্ম্ম স্বভাবত সেই ভাবেই চলে। সেটা অনুকরণের মত দেখালেও আমাদের তা ছাড়া আর উপায় বা গতি দেখতে পাওয়া যায় না, আর তাতে দোষই বা কি? তবে এটা ঠিক আমাদের দৃষ্টি এখনও ইউরোপের দিকেই সর্ব্বতোভাবে নিবদ্ধ।

নাগঃ দোষ ঐখানেই—যেখানে অন্তর থেকে দুঃখবোধ আর সেটা মোচনের প্রেরণা অন্তর থেকে আসে না। কোন দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার যতই মিল থাক, আপদ উদ্ধারের পন্থা অনুকরণের দোষ এই যে আমাদের জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সে পন্থা খাপ খাবে কি করে? মধ্যপথে গতিহীন হবার আশঙ্কা খুবই আছে।

আমরা চলিতে চলিতেই কথা কহিতেছিলাম। আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম পথে যে সব লোক চলিতেছে তাহাদের অধিকাংশই সুস্থ নয়। গোদ ও গলগণ্ডটা যেন বেশি বেশি আমার চোখে পড়িতেছিল। আমার মনে হইল, এ সকল জলবায়ুর দোষেই ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিপ্রায় কি, মীমাংসা কিরূপ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলামঃ দেখুন, এই এক মাইলের কিছু বেশি আমরা এসেছি, এর মধ্যে প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনকে পথে দেখলাম, আন্দাজেই বলছি।—এর মধ্যে আমি দুই জনের গলগণ্ড, তিনজনের পায়ে গোদ দেখলাম। প্রায় প্রত্যেককেই দেখছি গায়ে রক্ত নেই, বিমর্ষ, কারো গা-ময় দাদ, কারো কারো পেটজোড়া প্লীহা যকৃৎ—এই যে সব অসুখ এগুলি কি জলবায়ুর জন্য নয়? দেশবাসীর এতে কি হাত আছে? এরকম অসহায় অবস্থায় পড়ে এরা যে বাঁধা মার খাচ্ছে তার উপায় কি মনে হয় আপনার?

নাগ মহাশয় ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াই বলিলেনঃ এতে দেশবাসীরই ত একমাত্র হাত, আবার অন্য কার হাত থাকবে! ঐ আলস্য-শ্রমবিমুখতাই ত গোড়াকার অসুখ। বহুদিন থেকেই চলে আসছে—তাই এদের ও সকল সহ্য করার ক্ষমতা হয়ে গেছে। যদি প্রতিবিধানের উপর লক্ষ্য থাকতো, দেখতেন তাহোলে দেশের চেহারা অন্যরকম হোতো। দেখেছেন ত সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করতে সরকারী নিয়ম কি? গ্রামবাসীরা—নিজেদের মধ্যে থেকে এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় যোগাড় করে সরকারকে দেখাতে পারলেই সরকার থেকে বাকী টাকাটা দিয়ে সেটি সম্পূর্ণ করবার পক্ষে সাহায্য পাওয়া যাবে। প্রকৃতিই বলুন বা ভগবানই বলুন, সেখানকার নিয়মও ঐরূপ। সেই নিয়ম থেকেই না এ নিয়ম এসেছে? আপনি কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে আগে প্রাণপণ করে লাগুন, তারপর বাকীটা তাঁর কাছ থেকে এসে আপনার উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সফল করে দেবে। মানুষের হাতে কর্ম্মের ফলাফল নির্দ্ধারিত হবার শক্তি নেই, সেটা তাঁর হাতেই বরাবর। মানুষে আগে কোন কল্যাণকর কাজে তার দৃঢ় সংকল্পের পুঁজি নিয়ে সুরু করুক,—দেখবেন সাফল্যের জন্য বাকিটুকু তাঁর অনন্তশক্তির

ভাণ্ডার থেকেই আসবে। এ যেমন ব্যক্তিগতভাবে, সমষ্টিগত চেষ্টাও সেইরকম। এই রোগ তাড়ানোর ব্যাপারেও দেখবেন—দেশের লোক, তাদের মধ্যে যে অশান্তি, সে অশান্তি তাড়াবার জন্য যখনই বদ্ধপরিকর হয়েছে তখনই না হোক, কালের মধ্যে দিয়ে সমবেত চেষ্টাতে সে অশান্তি দূর হতে বাধ্য, এই গ্রহপতি সূর্য্যদেবই তার সাক্ষী। আর সকল কাজই যে অর্থসাপেক্ষ তা মনেও করবেন না, সমবেত মন ও শরীরের চেষ্টাতেই মূল কাজ হয়ে যায়। যেদিকেই দেখুন না কেন—

আমি : আপনার কথা শুন্‌লে মনে বল আসে—আর আপনার এসকল কথা অমূল্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ এত অসহায় ও অবসন্ন তা দেখলে আমার মধ্যে বড়ই অবসাদ আসে,—কি করে দেশের মানুষের মধ্যে এ অবসন্ন অবস্থা কাটবে—

নাগ : আগে দুঃখবোধ, তার পর তা থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা। সম্মোহিত অবস্থায় প্রতিকারের চেষ্টা আসে না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই দেখেছি, সাধারণ মানুষগুলি দুঃখে সমাহিত বা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সকল ব্যাপারে এইরূপ মুহ্যমান হওয়াটাই যেন ভারতের বিশেষত্ব। সুখে হোক আর দুঃখেই হোক এই মুহ্যমান ভাবটিই জগতের অন্যান্য স্বাধীন দেশের লোকের সঙ্গে সমান তালে চলবার পথে সর্ব্বাপেক্ষা বিষম বাধা নয় কি ? দেখুন দাদা, জলবায়ুর প্রভাবে অশান্তি ভোগ করা সকল দেশেই অল্পবিস্তর দেখা যায়, কিন্তু এখানকার লোক মুহ্যমান অবস্থায় যে কালটা কাটায় অন্য দেশের মানুষে ততক্ষণে সে অশান্তির প্রতিবিধান করে ফেলে।

আমি : এটা কি সত্য নয় যে অন্যান্য স্বাধীন দেশের লোকে সে বিষয়ে তাদের সরকারের সাহায্য পায়, কিন্তু আমাদের দেশের লোকে তাতে বঞ্চিত।

নাগ : আহা, আমি ওদিক দিয়ে যাচ্ছিনা, সাহায্য পাওয়া না পাওয়ার কথাটা এখানে আসল নয়। এখানে আসল কথাটা মুহ্যমান হয়ে পড়া আর সেই অবস্থায় অনেকটা কাল কাটানো। আর সরকারের সাহায্যের কথা যা বলছেন দাদা,—এ সরকারের সাহায্য না পাওয়া গেলেও, ও সরকারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে কে ?—আসল অকর্ম্মণ্য মানুষদের ও একটা অছিলা, অন্য পাঁচ জনের কাছে নিজের দুর্ব্বলতার কৈফিয়ৎ মাত্র, ভগবান যে বিরূপ তারই লক্ষণ। আমি দাদা, ওরকম চুনকামকরা কৈফিয়তের প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজি নয়।

আমি : আপনি তা হোলে কোন ব্যাপারেই রাজতন্ত্রের দিকে সাহায্যের অপেক্ষায় থাকতে রাজি নন ?

নাগ : এক একটি গ্রাম এক একটি রাজত্ব, গ্রামবাসীরাই তার কর্ত্তা, এ তো প্রাকৃতিক নিয়ম। এতে বাইরের কারোও হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই—যদি গ্রামবাসী তাদের শুভাশুভের জন্যে সকল কর্ম্মেই বদ্ধপরিকর হয়, সঙ্ঘবদ্ধ হয়। আমি সাদাসিধা কথাই বুঝি, জটিল পথে যাব কেন ? সহজ, সরল, সত্য কথাটা তাহোলে বুঝে দেখুন, সামাজিক জীব মানুষ, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করাতেই তার সার্থকতা। এখানে প্রাকৃতিক নিয়মেই সঙ্ঘবদ্ধ হতে প্রেরণা দিচ্চে

কিনা। সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়াটাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া, যার ফলে চিরকাল অশান্তি। তারপর, সহজ বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায়, মানব-শরীর পরিশ্রমের উপযোগী করেই সৃষ্ট হয়েছে, সেখানে তার অভাব, যতই ব্রেন থাক, যতই ইনটেলিজেন্স থাক, নানাপ্রকার অচিন্ত্যপূর্ব্বরোগের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। কাজেই প্রতি পদে পদে দেখতে পাওয়া যাচ্চে যে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গেলেই সর্ব্বনাশ হবে; জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হবে। কিন্তু মন-প্রধান মানুষ কখনই বুদ্ধিকে সকল ক্ষেত্রে অবলম্বন করে চলতে পারে না তারই ফলে মানুষের মধ্যে যত ছোট বড়, উচ্চ নীচ, সুখী দুঃখী, অত্যাচারী নিগৃহীত ইত্যাদি অবস্থার তারতম্য ঘটছে।

আমি: এখানে দেখলাম রামকৃষ্ণমিশনের কাজও আরম্ভ হয়েছে। সেখানেও রোগগ্রস্ত অনেকেই চিকিৎসার সাহায্য পাচ্ছে—

নাগ: আহা আসল কথাটা বুঝলেন না দাদা, দেশের মধ্যে অনেকগুলি ডাক্তার, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী হোলেই কি এই সব রোগের নিরশন হবে? এই যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের ফলে এত ডাক্তার, ঔষধ, হাসপাতাল হয়েছে, আরও হচ্চেনা বোলে খবরের কাগজে সরকারের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ হচ্চে—এতে কি দেশে রোগের সংখ্যা কিছুমাত্র কমেছে?—এত আইন, এত আদালত, বছর বছর পাল পাল উকিল জন্মাচ্চে এতে মামলা, মোকদ্দমা, বিরোধ কি তিলমাত্র কমেছে? এত ডাক্তার, এত উকিল বাড়াতে দেশের কি কল্যাণ হয়েছে, যার একটুও বুদ্ধি আছে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। এতে দেশের সর্ব্বনাশ হয়েছে আরও হচ্চে।

৫

নাগ মহাশয়ের আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি—কবে কোন্ সাল হইতে আমাদের দেশে এবং উড়িষ্যায় কোথায় কোথায় জলপ্লাবনে এবং জলাভাবে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল—কোন্ সময়ে মহামারী হইয়া কত লোক ক্ষয় হইয়াছে, এসকল তাঁর স্মৃতির মধ্যে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। তিনি বলিতেছিলেন—এই যে এক এক ধাক্কায় দেশ থেকে এতগুলি প্রাণী অকালে সরিয়া যায়, এটা একটা জাতির কতটা লোকসান জানেন? এখনও এ সকলের প্রতিবিধানের জন্য লোক সরকারের মুখ চাহিয়া আছে।

আমি পুনরপি বলিলাম: না চেয়ে উপায়ই বা কি?—

নাগ: তবুও আপনি ঐ কথা বলবেন? কেন সংঘবদ্ধ হওয়াটা কি আবেদন-নিবেদনের চেয়ে এখনও আপনার সর্ব্বপ্রকারে প্রয়োজনীয় মনে হচ্চে না? সকল অমঙ্গলের নিরসন যে তাইতেই হবে। আমি জানি, দেশের শরীরকে সুস্থ, কর্ম্মঠ, সবল এবং শ্রমতৎপর করতে হবে, আর কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করতে হবে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান দেশবাসীর এই কর্ত্তব্য সুমুখে রয়েছে। যিনি অবহেলা করবেন, সাধ্য থাকতে কর্ম্মে বিমুখ হবেন, বিধাতার অভিশাপ—তাঁদের অদৃষ্টে স্পষ্ট। এতটা দুরবস্থার মধ্যেও যারা সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা এখনও

অনুভব করছে না আপনি কি তাদের সভ্য কিম্বা ভগবানের নাম নেবার উপযুক্ত মানুষ মনে করেন ?

আমি : বোধ হয় আমাদের দেশে এখন কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে,—আপনার মত লোক যখন একজন একাজে—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন : কোথায় কাজ—ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কাজ করবার ভিন্ন ভিন্ন মানুষ চাই,—কয় জনই বা কাজে নেমেছে ? আপনি হয়ত মনে করছেন যে, সকলেই ঘরবাড়ী ছেড়ে, গীতাখানি বগলে করে, চাদর গায়ে দিয়ে, স্থধু পায়ে এসে কর্ম্মে নামবে ?—আসলে তা নয়। যে সওদাগরী অফিসে কাজ করছে সেই কেরানি থেকে আরম্ভ করে—যারা পায়ের উপর পা দিয়ে ভোগে বিলাসে, সুখে হুকুম তামিল করিয়ে জীবন-যাত্রার কাজ সারেন, তাদের পর্য্যন্ত একাজে নামতে হবে—তবেই না দেশলক্ষ্মী প্রসন্না হবেন।

আমি বলিলাম : যদি সেটা সত্য-সত্যই হয়—আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোক যদি কাজে নামে তা হোলে কী দিন আসবে আমাদের দেশে—তা কি ঘটবে ?

তিনি মহা উৎসাহেই বলিলেন : তা অচিরেই ঘটবে—আপনি দেখতে পাবেন এমন অবস্থা দেশের এসেছে তাতে দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করবে। যদি বিধাতা বোলে কেউ থাকেন, তবে এটা অবশ্যই ঘটবে, ঘটতে বাধ্য জানবেন। ভেদ, বিদ্বেষ, দলাদলি ও দুর্ব্বলতা চরমে এসে ঠেকেছে এখন ও না হোলে আর উপায় নেই।

আমি শান্ত একটা উত্তেজনা অনুভব করিলাম—কবে আমাদের দেশের লোক পরিশ্রমের গৌরবকে নিজ নিজ জীবনে প্রাণ দিয়া বরণ করিবে।—সে ১৯১৭ সালের কথা।

একদিন নাগ মহাশয়ের গুরু লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কথা কিছু শুনিবার জন্য ধরিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন যে এখনকার লোকে অলৌকিক কিছু দেখবার জন্য লালায়িত। একটা অলৌকিক কিছু না দেখলে সাধারণের বিশ্বাস হয় না, তাই আমার গুরু মাঝে মাঝে আমাদের অনেক কিছু দেখিয়েছেন। তিনি বোলতেন যে, এদিকে লক্ষ্য থাকলে ইষ্টলাভ হবে না। অতি স্থূলবুদ্ধি যাঁরা তাঁদেরই কেবল ঐ সকলেতে আকর্ষণ। ভগবানের ঐশ্বর্য্যেই তাঁরা মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন, ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটলে তবেই না চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়।

আমি বলিলাম : রামকৃষ্ণদেবেরও ঐ মত ছিল।

তিনি বলিলেন : সব শেয়ালের একই ডাক,—প্রত্যেক সিদ্ধ মহাপুরুষের আসল কথা একই। তা সত্ত্বেও দেখবেন, সাধারণের ঐশ্বর্য্যের কতবড় মোহ গ্রাস করে আছে। সাধুর কাছে কত লোক আসে, কটা যথার্থ ইষ্টের সন্ধানে আসে। গুরু যাঁরা, তাঁরা উপযুক্ত আধার লক্ষ্য করে তাঁদের জ্ঞানশক্তি প্রয়োগ করেন।

একবার ক্রমান্বয়ে কিছুদিন ধরে ব্রহ্মচারী (লোকনাথ) কেবল, সকল জীবে সমবুদ্ধির

সম্বন্ধেই কথা বলছিলেন। সকল জীবে সমান বুদ্ধি যদি না আসে বুঝতে হবে সাধন ঠিক হয়নি। জ্ঞানলাভ করে সাধনার শেষে সর্ব্বজীবে একই সত্ত্বা রয়েছেন এই বুদ্ধি আসে। কিন্তু সাধন পূর্ণ ত সকলকারই হঠাৎ হয় না, সেইজন্য তিনি বোলতেন যে, সকল জীবের মধ্যে তোমারই সত্ত্বা, তোমার আত্মা আর সকল প্রাণীর আত্মা একই, সকল জীবের একই উপাদান—এইটি ভাবতে অভ্যাস করতে তোমরা তৎপর হও, তাতে সাধনের পথ সুগম হবে। কিছুদিন ধরে তিনি এই ভাবটিই আমাদের মধ্যে যাতে বদ্ধমূল হয় তারই চেষ্টা করছিলেন।

এমন সময় একদিন আমাদের গুরু-ভাইয়ের মধ্যে একজনের পিতৃবিয়োগ হয়। যে দিন তার পিতৃশ্রাদ্ধ সেদিনে ব্রহ্মচারীকে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকতে বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। ব্রহ্মচারী ইদানীং কোথাও যেতেন না। বোলতেন—আমায় তোমরা কোথাও যাবার জন্য টানাটানি কোরো না। কিন্তু ভক্তের জোর বেশি, তাঁরা সকলে মিলে ধরে বসলেন যে যেতেই হবে। শেষে ব্রহ্মচারী মহাশয় বোললেন—অনেক মিনতির পরে, যে আমি যাব বটে কিন্তু আমি একলা যাব, যে-কোন সময় যাব, তোমরা কেউ আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসো না।

তাইতেই রাজী, সকলে ত মহাখুসী হয়ে যে-যার ঘরে গেল। পরে কাজের দিন সকাল থেকে সন্ত্রস্ত হয়ে সকলেই অপেক্ষা করতে লাগলো। আর শ্রাদ্ধবাসরে অনেকেই তাঁকে দেখবে বলে এসে উপস্থিত হোল। যখন শ্রাদ্ধের বেদিতে বসে কাজ আরম্ভ হয়েছে, সেইসময় দৌড়ে এক কালো কুকুর সেই শ্রাদ্ধবাসরে এসে উঠলো। সকলেই মার মার করে ছুটলো। একজন একটা চ্যালাকাঠের বাড়ি কুকুরটাকে এক ঘা বসিয়ে দিল। কুকুরটা সেই মার খেয়ে আস্তে আস্তে নেমে একবার সেই বেদির উপরে কর্ম্মকর্ত্তার দিকে করুণভাবে চেয়ে সটান বেরিয়ে গেল, আর কাউকে কিছু করতে হোলো না।—এদিকে কিন্তু শ্রাদ্ধের সকল কাজ হয়ে গেল, সমস্ত দিন গেল, ব্রহ্মচারী এলেন না। তিনি কখনও মিথ্যাকথা বলতেন না—যাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই কিছু অসুখ বিসুখ হয়ে থাকবে, তাই বুঝি আসতে পারলেন না—এই ভেবে তিনি সন্ধ্যার পর কাজকর্ম্ম সমস্ত চুকে গেলে একবার তাঁর আশ্রমের দিকে গেলেন। দেখলেন, তিনি শুয়ে আছেন। তাঁর না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—বাবা, এত আদর করে নিমন্ত্রণ করে শেষকালে প্রহার! শুনিয়া কর্ত্তা ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। ব্রহ্মচারী বললেন—বাবা, কালো কুকুরটি কি অপরাধ করেছিল যে তাকে অত কঠিন অভ্যর্থনা করে তাড়ালে?—সকলে এ কথা শুনে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে প'ড়লেন, কারো মুখ দিয়ে রা বার হোল না।

তাঁর সঙ্গে যিনি সর্ব্বদা থাকতেন, আমাদের গুরুভাই, পরে তাঁর মুখে এরূপ শুনেছিলাম ঐ দিন দ্বিপ্রহরের পর ব্রহ্মচারীর ঘর হতে একটা কালো কুকুর বার হয়ে গেল—ঘরের মধ্যে আর ব্রহ্মচারীকে দেখা গেল না। অল্পক্ষণেই সেই কুকুর আবার এসে ঘরে ঢুকল। তখন ঘরে এসে দেখা গেল ব্রহ্মচারী যেন বাইরের দিকে আসছেন। দেখা হবামাত্র বললেন—শ্রাদ্ধবাড়ীতে বেশ কিছু খেয়ে এলাম।

নাগ মহাশয় বলিলেন: এ রকম অনেক কিছুই আমরা তাঁর দেখেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি এ সকল মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন? একটা মানুষ—কিভাবে কুকুর হয়ে গেল—ভগবানের পক্ষে—

নাগ: আপনি বুঝি যুক্তি ছাড়িয়ে কোন কিছু বুঝতে রাজী নন? আমরা যে তাঁর কতরকম ঐশ্বর্য্য দেখেছি, তাঁর সঙ্গ যে অনেক দিন করেছি। তা ছাড়া জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষের কত কত ব্যাপার—তা কি আমরা সব জান্‌তে পারি?

আমি: তা বোলে একটা মানব-শরীর একটা কুকুর-শরীর হয়ে গেল,—এটা বুদ্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়ালেন কি রকমে?

নাগ: হাঁ, তার আর আশ্চর্য্য কি? তাঁর যে অণিমা লঘিমাদি সিদ্ধি ছিল। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, হিমালয়ের গুরুগৃহে তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ যৌবনাবস্থাটি কেবল সাধনেই কেটেছিল।—তাঁর পক্ষে একটা শরীর পরিবর্ত্তন কি খুব একটা বড় কথা?—মনে ভাবুন দেখি, এই শরীরগুলি কি?—হাড়, মাস, রক্ত, মজ্জা, নাড়িভুঁড়ি, নখচুলের একটি আকৃতি, আসলে ত ভৌতিক বা যৌগিক পদার্থ। তারপর পরমেশ্বরকে যে পায় সে ত তাই হয়ে যায়, তাঁর ইচ্ছাশক্তি কি সাধারণ? একটা কায়ার পরিবর্ত্তন সে ত তাঁর ইচ্ছাধীন। আমাদের ভোগ বা কর্ম্মের মোহ, শুভাশুভের বা কর্ত্তৃত্বের মোহ জর্জ্জরিত করে রেখে দিয়েছে, তাই আমাদের কাছে ওটা অসম্ভব ব্যাপার। শুনতে ও সব বুজরুকির মতই, কিন্তু মহাপুরুষের কাছে ও ত তুচ্ছ, কিছুই নয়।

আমি: কিছু মনে করবেন না একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—যদি তিনি এতই শক্তিমান ছিলেন তাহোলে তিনি ত দুহাজার বৎসর শরীর ধারণ করে থাকতে পারতেন;—নানা কর্ম্ম, ভোগ ও জগতের কত কল্যাণ করতে পারতেন।

নাগ: হাঁ তা তো পারতেনই, কিন্তু তাঁরা কেন প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে সাধারণ জীবের মধ্যে অহেতুক বাধা বা গতির অন্তরায় সৃষ্টি করবেন।

আমি: তা হোলে মানব-শরীরকে পশু-শরীরে পরিবর্ত্তিত করে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে সাধারণের মধ্যে ধোঁকার সৃষ্টি করলেন কেন?

নাগ: তাঁদের প্রয়োজন, জীবের কল্যাণের জন্যই যেটুকু প্রয়োজন মনে করেছেন, মাত্র সেইটুকুই করেছেন,—আর মুক্তকণ্ঠে বলবো যেটুকু ঐশ্বর্য্য তাঁরা দেখিয়েছেন, তাতে সংশ্লিষ্ট সে-জনসমাজের কল্যাণই হয়েছে—অকল্যাণ কিছুমাত্র হয় নি। আর এটা ধোঁকা কেন হবে—তা তো ঠিক নয়। কারণ তাঁর সত্য তপস্যার কথা আমাদের অনেকেরই শোনা আছে, কঠোর কঠোর যোগসাধন এবং ঐশ্বর্য্যলাভ এসকল সে-সমাজের মধ্যে পরীক্ষিত সত্যের মতই বিশ্বাসের বস্তু। তাঁর ভক্ত সকলকারই ধারণা এই যে, যোগ-সিদ্ধির ফলে ওসকল ঐশ্বর্য্য সকলকারই আসবে, তা লোকনাথ ব্রহ্মচারীই বা কি আর রামচন্দ্র মাইতিই বা কি। তবে রামকৃষ্ণ যেমন এটা পুনঃ পুনঃ বলতেন যে, যোগৈশ্বর্য্যের দিকে লক্ষ্য থাকলে ঐটুকুই তার

গণ্ডি—উচ্চ লক্ষ্যে যাওয়া যায় না, লোককে তাক লাগাইয়া দেওয়া যায় বটে। ব্রহ্মচারীও বলতেন—বাবা এ সকলের দিকে লক্ষ্য দিবি না, জগদম্বাকে পেলে এসকল আপনা হোতেই আসবে। তখন সামাল সামাল ডাক পাড়তে হবে।

আমি: সামাল সামাল ডাক পাড়তে হবে কেন?

নাগ: আরে দাদা এটুকু বুঝলেন না? যোগ-ঐশ্বর্য্য এলে শক্তি-চাঞ্চল্য কি ভাবে উপস্থিত হয়ে থাকে, আধার যদি রজোগুণী হয় তা হোলে ঐ যোগৈশ্বর্য্যের বলে আধিপত্য, ভোগলালসা, উচ্চ উচ্চ শক্তির চালা-চালি—এ সকল আপনা হতেই এসে পড়ে, তাতে তাকে ভ্রষ্ট করবেই। লক্ষ্যভ্রষ্ট হোলে যে কি দুঃখ তা যে পড়ে সে-ই জানে,—উচ্চ সত্বগুণী আধার না হোলে ঐ যোগৈশ্বর্য্যের মোহে অনেক লটাপটি খেতে হবে,—জানেন ত বিশ্বামিত্রের ব্যাপার? এ বড়ই জটিল সমস্যা, ইষ্টসিদ্ধি কি সহজে হবার যো আছে দাদা এ মাটিতে! বসুন্ধরার মাটির অনেক গুণ—মাধ্যাকর্ষণটা তার স্থূলভাব মাত্র—সেই কায়ার মধ্যে অনেক কিছুই আছে।

অল্পক্ষণ থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন—এই আমার কথাই বলি, যে পরিমাণে মনঃসংযম প্রয়োজন আমি ইষ্টলাভের জন্য কি তাই করতে পেরেছি? মাত্র চার বৎসর কাটিয়েছি—তারপর বাপ বাপ বোলে পালিয়ে আসতে হোল।

এইভাবে নাগ মহাশয় সরলভাবে তাঁর পরিবর্ত্তিত জীবনের কতকাংশ খুলিয়া ফেলিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কেন, ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছিলেন নাকি?

নাগ: তা ভয়ঙ্কর বই-কি! আধার তৈরী না হোলে যা হয়। যে-তালে যে-মাত্রায় অগ্রসর হতে হয় তাড়াতাড়ি পৌছাব বলে যদি দৌড় বেশি দেওয়া যায় তাহোলে কি শীঘ্র শীঘ্র প্রাণশক্তির পুঁজি খালি হয় না?—প্রাণশক্তি কি খেলার জিনিস?—এর তাল দ্রুত হোলেই সর্ব্বনাশ—এর লয় যত বিলম্বিত হয় ততই নিশ্চিত, ততই দৃঢ় অধিকার লাভ হয়। গুরু সঙ্গে থাকায় ঐ সুবিধা; তিনি রাস খুব দৃঢ় মুষ্টিতে পাকড়ে থাকেন। ব্রহ্মচারীর সিদ্ধির সুযোগ সুবিধা ত ঐ জন্যই হয়েছিল, গুরু বরাবরই সঙ্গে—আর আমার ত তা নয়—একলা গোঁ ভরে চলেছিলাম—তাল রাখতে পারিনি।

নাগ মহাশয়ের সরলতায় মুগ্ধ হইলাম। আমি বিশেষ কৌতূহলী হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম: তারপর কি হোলো?

নাগ: লাভ এই হোল যে, গতিভঙ্গ হোল, এ যাত্রায় ঐ পর্য্যন্ত। যেটুকু পুঁজি হয়েছিল তাই নিয়ে এই সৎকর্ম্ম-মার্গে নেমে পড়েছি। গুরুর কৃপায় কোন প্রকার ইন্দ্রিয়জ মোহে পড়বার আগেই সামলাতে পেরেছিলাম—এখন তাঁরই কৃপায় কায়মনোবাক্যে কর্ম্মের মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টায় আছি।

যখন তিনি এতটাই বলিলেন তখন আমি তাঁহাকে আরও একটু ধরিয়া বসিলাম—ইন্দ্রিয়জ মোহটা কি সকল তপস্যারই অনিবার্য্য পরিণাম?—

নাগ মহাশয় আমার মুখের দিকে চাহিয়া পেটের কথাটা যেন তল অবধি দেখিবার চেষ্টা করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন : ওটা জিজ্ঞাসা করলেন কেন বলুন ত ?

আমি : মহাভারতের সেই বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধ আদি বড় বড় মহাত্মার ইন্দ্রিয়জ মোহে পড়বার কাহিনী ত অনেকানেক শুনে এসেছি। তা ছাড়া ছোটখাট মহাত্মাদের ইন্দ্রিয়জ মোহে পড়বার কাহিনীও কম শুনি নি। কাজেই উৎকট তপস্যার পরিণামে, যে একপ্রস্থ সকলকারই ইন্দ্রিয়জ মোহের ফাঁদে পড়বার সম্ভাবনা নিশ্চিত-ভাবেই যেন সংস্কারগত হয়েই রয়েছে,—সেইজন্য, বিশেষ করে জানবার অভিপ্রায়েই আপনাকে ধরে বসেছি।

নাগ : যা বলেছেন তা অনেকাংশেই সত্য কথা। তপস্যার জোর যার যতটা, বৈরাগ্যের প্রাবল্য অনুযায়ী একবার ঐ ইন্দ্রিয়সুখের লালসাটি তার ততই প্রবলভাবে আক্রমণ করতে বাধ্য।—এর কারণ আর অন্য কিছু নয়, অহঙ্কারটিতে যার ভোগলালসা যতটা মাখানো থাকে, শুদ্ধ ভাবের আলোক যখন তাতে লাগে তখন সেই লালসার মলিনতা কতটা অহংকে প্রভাবিত করেছে সেটি স্পষ্ট দেখা যায় আর সেই ইন্দ্রিয়সুখের বা রূপজ মোহের অনিত্যতা তখনই সম্যকবোধে জাগিয়ে দেয় যখন তার ক্রিয়া হয়ে যায়।

আমি : ক্রিয়া হয়ে যায় ?—ক্রিয়া হবার দরকার কি ? বুঝতে পারা গেলেই ত হয়ে গেল, বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁরা ত তা থেকে সামলে নিয়ে ইন্দ্রিয়ঘটিত কর্ম্ম থেকে তফাতে—

নাগ :—না না, ঠিক তা ঘটে না। আসল ব্যাপারটা যে সুধু মনে হয়েই ক্ষান্ত হয় না—শরীর পর্য্যন্ত না জড়ালে তার কাজ সম্পূর্ণ হয় না। শরীর থেকে আরম্ভ করে, স্নায়ু দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে মন পর্য্যন্ত তার যে ক্রিয়া সেইটাই হোক একটি সম্পূর্ণ ক্রিয়া, বুদ্ধিই এটি নিশ্চয় করে বুঝিয়ে দেয়, আর আত্মা থাকেন সাক্ষী। এই যে আমাদের ভোগমূলক যত কিছু কর্ম্ম তা সবগুলিই এই ক্রমে ঘটে থাকে। প্রথমে মনে হয়, সাধারণ মানুষের,—তারপর সংস্কারবদ্ধ সেই মন তার সুখকর স্মৃতির সাহায্যে সেই সুখ পুনঃ ভোগের ইচ্ছাকে সতেজ করে, তারপর ভোগের বস্তু পেতে যেটুকু দেরী। তা ওরকম অবস্থায় পেতে দেরীও হয় না। যেন মানস-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষে আবির্ভাব হয়,—তখন আর ঠেকাবে কে ?—তখন ভোগ ছাড়া যেন আর গতি নেই।

আমি বলিলাম : ঐখানেই ত পতন হোলো।

নাগ মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন : তাই দেখায় বটে, কিন্তু উচ্চ আধার যদি হয়, তা হলে বুঝতে পারা যায় যে, ভিতরের গলদ কেটে গেল—আর পড়তে হবে না—ইন্দ্রিয়জ মোহের অসারতা—তখন তার চেয়ে আর কে ভাল বুঝতে পারে।—সে ভবিষ্যৎকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে যে মনে ইন্দ্রিয়সুখের ইচ্ছার স্ফোট আর উঠবেই না। মনে উঠলে তবেই না ইন্দ্রিয়কে ভয় ?—না হোলে ভয় কি ?

আমি : তা হোলে দেখুন সাধারণের মধ্যে এসম্বন্ধে কতটা ভ্রম ধারণা আছে। তারা

ভাবে বুঝি যোগী, তপস্বীদের সাধানাবস্থায় মনের মধ্যে কাম-ইন্দ্রিয় ভোগের ইচ্ছা হোলেও তাঁরা জোর ক'রে সেই কর্ম্ম থেকে বিরত থাকেন—আর তাকেই বলে সংযম।

নাগ মহাশয় উচ্চ হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন : মনেই যদি নারী-সম্ভোগের ইন্দ্রিয়সুখের লোভ বা ইচ্ছা এলো তবে সংযম টেঁকবে কি করে? সংযম কথাটির মহিমা কোথায়?—কি অপূর্ব্ব বস্তুর সন্ধান যোগশাস্ত্রে দিয়েছেন এই সংযম শব্দাত্মক ভাবটির মধ্যে দিয়ে!

আমি : আচ্ছা যোগভ্রষ্ট হোলেই ত আর সকল সঞ্চিত কর্ম্মগত শুভ ফল নষ্ট হয় না?

নাগ মহাশয় বলিলেন : তা হবে কেন? মানুষ যা-কিছু তপস্যা দ্বারা উপার্জ্জন করে তা সহজে নষ্ট হয় না। মানুষের এই যে তপস্যার প্রবৃত্তি, এর মধ্যে যে ভগবানের একটি অভিপ্রায় আছে তা হয়ত মানুষে সব সময়ে বুঝতে পারে না বা মনে রাখতেও পারে না। অহঙ্কার সব কর্ম্মের গোড়ায় থাকে, কাজেই যা-কিছু করছি তা আমিই করছি এই ভাবে চলে। মধ্যপথে প্রবৃত্তির কোন একটা বিশেষ প্রাবল্যের জন্যই ঠেকে যায়। তার মধ্যেও অন্তর্য্যামী ভগবানের কোন অভিপ্রায় থাকে। এই যে তপস্যার গতিভঙ্গ হয় তাতেও একটা না একটা কল্যাণময় অভিপ্রায় থাকে। তাইতে, তার ফলে আমরা একটা কিছু মহৎ ভাবই দেখতে পাই। যেমন বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের ফলে শকুন্তলার জন্ম। সেই শকুন্তলা থেকেই ভরতের উৎপত্তি আর সেই ভরত থেকেই ভারতবংশ—আর তাই থেকে ভারতবর্ষ—ঠিক যেন তপোভঙ্গের একটি ধারাবাহিক স্থায়ী ইতিহাস এই ভারতবর্ষ নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তারপর বিশ্বামিত্রের দিক থেকে দেখতে গেলেও আমরা দেখতে পাই যে, আর বিশ্বামিত্রকে ও মোহে পড়তে হয়নি। তারপর ক্রোধ হিংসা প্রভৃতির জন্যও যে পতন তার ফলও কম নয়—শেষের দিকে যখন তাঁর সকল মোহ কাটলো তখনই বিশ্বামিত্র ঋষি হলেন। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথমেই বিশ্বামিত্র ঋষির নাম রইলো। তা হোলে এটা আমরা সুন্দরভাবেই বুঝতে পারি যে তপস্যায় যদি বাধা আসে ত সে বাধা নিজের উৎকট ভোগের আকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তি থেকেই আসবে আর সেটা না কাটলে কখনই অগ্রসর হবার যো নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : মানুষের মধ্যে এই যে কাম ইন্দ্রিয় ভোগের উৎকট স্পৃহা, সেটা যেন সকল ভোগের উপর যায়, তার জোর এতই বেশি অন্য যা-কিছু যেন তার তুলনায় কিছুই নয়। আমার এখানে এই সংশয় লাগে যে, কেন মানুষের কামেন্দ্রিয় এত প্রবল, সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির যেন সকলের চেয়ে বড় বাধা।

নাগ : মৈথুন যে সৃষ্টির আদি—যেখানেই সৃষ্টির ব্যাপার সেইখানেই মানুষের নারীদেহের উপর টান, আবার যেখানে সৃষ্টি-নিবৃত্তির ব্যাপার সেইখানেও পূর্ব্ব সংস্কারের প্রবল উত্তেজনা। এতদিনের সংস্কার এককথায় কি যাবার? সেটা যে যেতে যেতেও আবার কতক সৃষ্টি হয়ে পড়ে, তার ধারায় কত বংশের উৎপত্তি হয়, যেমন বিশ্বামিত্রের বেলা আমরা দেখেছি। মানুষ প্রবৃত্তির উদ্দাম ছন্দে যখন ভেসে যায় তখনও তার সৃষ্টির ছাপ বা নিশানা রাখতে রাখতে যায়, আবার যখন নিবৃত্তির ছন্দে, ত্যাগের মার্গে চলে তখনও তার ছাপ রাখতে রাখতে চলে।

মুক্ত পুরুষের অধ্যাত্ম পথের যাত্রার মাঝে কায়িক ভোগের কর্ম্ম বন্ধ হয়ে গেলেও তাঁর চিন্তা-প্রবাহ নূতনতম তরঙ্গের সৃষ্টি করে, সেই ধারা শুদ্ধ মনের সাহায্যে অনুসরণ করলে তাঁকে ধরতে পারা যায়।

আমি: তাহোলে আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষের স্থূল কাম বা ইন্দ্রিয়জ মোহ ট্রান্স্‌ফর্ম্‌ড্‌ হয়ে যায়—

বাধা দিয়া নাগ মহাশয় বলিলেন:—ট্রান্সেণ্ড্‌ করে,—ইংরাজীতে কাজ নেই দাদা—মন চৈতন্যমুখী হোলেই অন্তরের যতকিছু ভোগের প্রেরণা আর স্থূল বস্তুমুখী হয়ে থাকতে পারে না, স্বভাবতঃই বিজ্ঞানমুখী হয়ে সূক্ষ্মতত্ত্বে তার সকল প্রবৃত্তির অর্থবোধ হয়।

৬

কোনও একজনকে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে দেখিলে সাধারণত সকলে না হোক, বেশীর ভাগ লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশেষত যাঁরা একটু দেশের বা দশের দিকে চাহিয়া চলিতে ইচ্ছা করেন তাঁরা সকলকার আগে সে-সব মানুষের গুণ গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদের নাগ মহাশয়ের ওখানে বন্ধুর অভাব ছিল না। একে ত তাঁর গরীব লোকের সঙ্গেই কারবার, শ্রমজীবী সাধারণ তাঁর কথায় জীবনে একটা উৎসাহ অনুভব করিত, তার উপর ভোগের, নিজ সুখ-স্বচ্ছন্দের উপর লক্ষ্য না থাকায় তাঁর চরিত্রের শক্তি স্থানীয় সাধারণের গোচরে স্পষ্টরূপে সকল সময়েই জ্বলজ্বল করিত। অনেকে নিজেদের মধ্যে কোন কোন বিবাদের মীমাংসার জন্যও তাঁহার কাছে আসিত। তিনি তাহাদের মধ্যে দেশকালপাত্র-হিসাবে অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেন।

একদিন এক মীমাংসার ব্যাপার লইয়া এক দল লোক উপস্থিত হইল। ইহারা সকলেই অভিযোগকারী। তাহাদের অভিযোগ একজন ব্রহ্মচারীর উপর। আমি সকল ব্যাপার শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। কিন্তু তাঁহার মীমাংসা শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম।

নাগ মহাশয়ের অতীব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি। যখনই তিনি কোনও বিষয়ে মনোযোগী হইতেন তখনই যেন সে ব্যাপারের শেষ অবধি দেখিতে পাইতেন এবং তাহার যেরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন তাহাতে তাঁহার পবিত্র অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইত।

—ব্রহ্মচারীর উপর তোমাদের এতটা কোপ কেন?

তাহাদের একজন বলিল: যদি কোন সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে সুন্দরী যুবতী দেখা যায় তা হোলে সাধারণের কি মনে হয়?

নাগ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন: তোমরা কি সাধু-সন্ন্যাসীদের একা পুরুষ জাতির ভোগের সম্পত্তি মনে কর নাকি? যে উপকার গৃহী-পুরুষেরা পান, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীরা কি সে সুযোগ পেতে পারেন না?

তিনি : তা পারেন বটে, কিন্তু একজনের সঙ্গে যদি বেশী ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়—

নাগ : তা হোলেই বা। গুরুকে সেবা করা এবং নিজ সাধন উৎকর্ষের জন্য যদি কোন কুললক্ষ্মী গুরুসঙ্গ নিরন্তর কামনা করেন, আর যদি গুরু উহা সমীচীন মনে করেন তা হোলে তাতে দোষটা কি বুঝ্‌তে পারলাম না ত।

তিনি : আচ্ছা, এটা লোকচক্ষে কেমন—

নাগ : সেটা যাঁর বিষয় তিনিই বিবেচনা করবেন, তোমাদের ও বিষয়ে মাথা ঘামানোতে কি বোঝায় জানো?—নারীজাতির প্রতি দৃষ্টি তোমার পূত হয়নি, মাতৃজাতির প্রতি তোমার দুষ্ট মনোভাব এখনও আছে। বলিয়া তিনি মধুর হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন।

তিনি এই অভ্যাগতদের প্রতি সস্নেহে চাহিয়া বলিলেন : যারা নিজের ঘরে ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, সঙ্ঘবদ্ধ হবার উদ্যম নেই, তাদের অন্য আশ্রমের সমালোচনার নামে এই সব কদালোচনা শোভা পায় কি?—

যাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলা হইল,—তাহাদের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। একজন তাহাদের মধ্যে একটু অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমরা অনেক কিছুই নালিশ নিয়ে এসেছিলাম—আপনি একেবারেই সব শেষ ক'রে দিলেন।

নাগ : বেশ ত যতগুলি আইটেম্ সবগুলোই বলে যাও না, সবগুলির মীমাংসা হবে এখন। বল ত, তারপর দ্বিতীয় দফা—

তিনি : সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে অত বিষয়ের দিকে নজর কেন?—জমি জমা অনেক কিছুই করেছেন, করছেন, আবার জোর কোরে সেদিন একটা কুণ্ড দখল করে নিলেন।

নাগ : আশ্রম করতে গেলে তাকে স্থায়ী করবার উপায়ও করতে হয় ত? সেটা চলবে কিসে? জমিজমা থাকলে তার উপস্বত্ব থেকে আশ্রম চলে যাবে। এতে দোষ কি? পাঁচজন সাধুসজ্জন প্রতিপালিত হবে, ওগুলো ত আশ্রম করতে গেলে দরকার হয়েই থাকে। যাঁর ও সকল স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত করবার সুযোগ সুবিধা আছে তিনি তা ছাড়বেন কেন?

তিনি : আর জোর করে জায়গাজমি দখল করা, কুণ্ডটি জোর করে নিজের এলাকার মধ্যে করে নেওয়া?

নাগ : ও সকল বিচার ধর্ম্মাধিকরণে হবে, এখানে কেন? বিষয়ে অধিকার-অনধিকার সাব্যস্ত হবে বিচারালয়ে; আপত্তির সূক্ষ্মবিচার সেইখানেই হবে।

তিনি : তা হয় না, আজকাল টাকার জোরে যেটি অসম্ভব, যেটি অন্যায়—সেও সম্ভব হয়, ন্যায়ও হয়।

নাগ মহাশয় উত্তরে তৎক্ষণাৎ বলিলেন : তা না হয় আপাতত হোলো কিন্তু সে ত তোমাদের একতারই অভাবে, সঙ্ঘবদ্ধ-বিমুখ হয়ে আছ বলেই না তোমরা একটা সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পার না। আদালতে যেতে হয় কেন? তারপর বিচারের ওপর বিচার আছে ত?

তিনি : আপাতত অধর্ম্মের জয় হোলো ত ?

শুনিয়া হাসিয়া নাগ মহাশয় বলিলেন : সব কাজে কি সভ্য ফল পাওয়া যায় ? তারপর ধর না কেন, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বলে একটা কথা আছে জান ত ? এখানে যার শক্তি বেশী, সে-ই নিজ মনোমত ভোগের উপাদান সংগ্রহ করবে, তাতে যদি কারো কোনে বাধা না খাটে তখন কি বুঝতে হবে ?—মাথা নীচু করা ছাড়া আর উপায় নেই। ন্যায়-অন্যায়ের কথা বলছো, তুমি হোলে কি করতে ? বিষয়ে প্রবল তৃষ্ণা থাকলে আর সেই উপযোগী শক্তি থাকলে তুমি কি কোন ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধককে গ্রাহ্য কর ? একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখ না—এই বাঙ্গলার রাজত্বটা কি ভাবে, কাদের হাত থেকে কাদের হাতে এসে পড়েছে। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবেই বা কে, মানবেই বা কে ! প্রবল শক্তি দুর্ব্বলকে স্তম্ভিত ক'রে নিজ উদ্দেশ্য সফল করবে।

তিনি : এটা হোলো আলাদা, রাজত্ব নিয়ে—

নাগ মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন : কেন, কেন আলাদা কেন ? এও ত নিজ শক্তি-মত্তারই কথা, জোর করে দখল করার ব্যাপারই আসছে !

তিনি বলিলেন : সাধু-সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী যাঁরা, তাঁরা কেন পরধনে, পরের সম্পত্তিতে লোলুপ হবেন ? সেটা ধর্ম্মের রাজ্যে কি অন্যায় নয় ?

নাগ মহাশয় বলিলেন : বিষয়ের ব্যাপার যেখানে, সেখানে সাধুই বা কি আর সন্ন্যাসীই বা কি ! বিষয়টা বিষয়, সম্পত্তিটা সম্পত্তি। অধিকার নিয়েই কথা নয় কি ? সম্পত্তি বা বিষয়ের ব্যাপারে অধিকারের যে আকাঙ্ক্ষা, তার মূলই হোল লোভ। সম্পত্তির স্পৃহা সম্পত্তিকেই টানবে। সম্পত্তি-লোলুপ মন,—তার সঙ্গে কর্ম্মশক্তি অনুকূল থাকে যদি, তাকে কে ঠেকাবে ? ঠেকাতে গেলে তার চেয়ে প্রবল শক্তি চাই ; বাক-বিতণ্ডার কর্ম্ম নয় ত !

তিনি : তাহোলে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহীর প্রভেদ কি রইল ?

নাগ মহাশয় বলিলেন : যেখানে বিষয় নিয়ে কথা, সেখানে কোনও প্রভেদ ত নাই-ই। বিষয় থাকলে বিষয় রক্ষা করবার শক্তি চাই। ব্যক্তিত্ব, জনবল ও অর্থবল এই তিনটি তার মুখ্য প্রয়োজন। সেটি যার আছে সে বিষয় উপার্জ্জন, অধিকার ও রক্ষা করতে পারবে।

তিনি : তাহোলে সন্ন্যাস আশ্রমের সার্থকতা কি ?

নাগ মহাশয় পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে যেন একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শান্তভাবেই বলিলেন : প্রভেদ দেখতেই ত পাচ্ছ ভাই, যেখানে বিষয় সেখানে প্রভেদ কোথায় ? বিষয়মূলক কর্ম্ম যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ লাল কাপড়ই পর আর সাদা কাপড়ই পর ফল যে সমানই, একথা কি আজকার দিনে কারো বুঝতে অপর একজনের সহায়তা দরকার করে ? সংসার ছাড়া, বিষয় ত্যাগ করা—এ ত করার মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যেই গেল। আর কর্ম্ম যখন যার এতটাই প্রবল তখন আর সন্ন্যাসের কথায় কাজ কি ?

তিনি : নিষ্কাম কর্ম্মই ত সন্ন্যাসীর ? গৃহীদের—

নাগ মহাশয় বলিলেন : নিষ্কাম কর্ম্ম যদি সম্ভব হয় ত গৃহীদের হবে না কেন? আর, গৃহী আর সন্ন্যাসীতে তফাৎ কি? গৃহী-অবস্থার পরিণতিই তো সন্ন্যাস! গৃহীই ত পরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় সন্ন্যাসী হন। না কি, সন্ন্যাসী আবার কোথাও অন্য লোক থেকে এখানে আসে?

তিনি যেন একটু গোলমালে পড়িলেন, বলিলেন : এই যে এখানকার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় এঁরা সকলে গার্হস্থ্যের পরিপক্ক অবস্থায় সন্ন্যাসী হচ্চেন না—এঁরা কেউ আধপাকা অবস্থায়, কেউ বা একেবারে কাচা অবস্থায়, অল্পবয়সে সন্ন্যাসীর দলে ভর্ত্তি হয়ে পড়েছেন, তাই ত যত গোলমালের সৃষ্টি হচ্চে।

নাগ মহাশয় : আরে ভাই, এখন সেই পুরানো দিনের চতুরাশ্রম ত আর নেই! দেশের মধ্যে সমাজের আগাগোড়া পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে যে! তখনকার দিনে প্রাকৃতিক নিয়মেই আমাদের মানব-সমাজের আশ্রম নিয়মিত হয়েছিল, যেহেতু তখনকার মানুষে প্রকৃতির কোলেই মানুষ হোতো। চতুরাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস ছিল চতুর্থ আশ্রম। জীবনে ভোগ ও কর্ম্ম পূর্ণ হয়ে বৈরাগ্য এলে তখন ত্যাগ। মহাভারতের যুগের পর বর্ত্তমান ইতিহাসের কালে প্রথমেই মহাবীর জৈন-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর দল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের আর এক সঙ্ঘ বা প্রকাণ্ড সন্ন্যাসীর দল জমে গেল। ধর্ম্মের যেন এক প্রবল বন্যা এলো। তাইতে গৃহী, অগৃহী, নির্ব্বিচারে বৈরাগীর রাজ্যে ঢুকে পড়লো। বৈরাগ্য-ধর্ম্মের নামে যেন এক বিরাট মোহ এলো রাজ্যের সকল দিকে। সম্রাট অশোকের প্রভাবে তার বহু বিস্তার। তখন থেকেই আশ্রমের ব্যভিচার সুরু হোলো, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম ঠিক রইলো। ক্ষণিক বৈরাগ্যের ঝোঁকে অথবা রাজানুগ্রহ লাভের লোভে যাঁরা ঢুকলেন সঙ্ঘের মধ্যে, তাঁদের মোহ কাটলে প্রকৃত ভোগের ক্ষুধা পেতে লাগলো। তখন থেকেই সঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত আইন কানুনের ফাঁকের মধ্যে বেশ কতক ভোগের হাওয়া ঢুকে, ক্রমে ঝড় বইতে সুরু করে দিলে। ক্রমে সঙ্ঘের একটা দিক বিকৃত হয়ে প্রকৃতির নিয়মেই দেশের সমাজের আপদ হয়ে উঠলো। তখন শঙ্কর এলেন। সনাতন ধর্ম্মকে মায়ার দঁক থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে পাল্টা নতুন করে সম্প্রদায় গড়ে গেলেন। পুরানো বৌদ্ধ তন্ত্রের ঝড়তি পড়তি জাত হারিয়ে আউল, বাউল, সাঁই, ইত্যাদি নানা ছাঁচে সহজ ধর্ম্মের জঙ্গল হয়ে বাঙ্গলার নানা দিকে ছড়িয়ে রইলো।

তারপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের পালা,—সে দিকেও সন্ন্যাসীর দল বড় কম হোলো না। অধ্যাত্মজ্ঞানের ভেদের এক একটি মীমাংসা নিয়ে বিরাট সম্প্রদায়, বিরাট দল গড়তে চললো। শঙ্করের সম্প্রদায়ের আদর্শ ক্রমশ বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। কুলিন, গিরি, পুরী, ভারতী, অরণ্য ইত্যাদি দশ নামী থেকে বংশজ বহু নামী ও নানা পন্থী হয়ে ভারতময় আনন্দের হাট বাজার লাগিয়ে দিলে। গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ের সংখ্যা তাদের মধ্যে বড় কম যান না। তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত যোগী বা সন্ন্যাসী রাজ্যের নিষ্কাম কর্ম্মের যোগফল এইভাবে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ইদানীং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সম্প্রদায় শুধু ভারতে নয়, নূতন পৃথিবীর আমেরিকা পর্য্যন্ত ঠেল মেরেছে,—দেখছো ত?

তিনি : তা হোলে এই যে প্রাচীন নবীন সন্ন্যাসীর নানা সম্প্রদায় এঁদের কর্ম্মপন্থাও নানা দেখাচ্চে, তাঁদের আদর্শ যাই হোক। গৃহীদের সঙ্গে এক কাপড়ের রং-এর ব্যবধান ছাড়া আর কি ব্যবধান তা ত দেখতে পাই না।

নাগ মহাশয় বলিলেন : সে ত দেখতেই পাওয়া যাচ্চে বাইরে থেকে—আমি কিছু আরও ব্যবধান দেখতে পাচ্চি। সেটা, এই যুবকসঙ্ঘের মধ্যে বিদ্যানুরাগ, বিলাসত্যাগ ও কুমার অবস্থায় সন্তোষ আর গৌরববোধ। এটা কম গৌরবের নয়। আর এটাও একটা বিশেষ শুভ যোগাযোগ নয় কি, দেশের নানান কাজে, দেশের যুবক-সম্প্রদায় কতটা আত্মনির্ভরশীল হয়ে কাজ করতে পারছে? এই যে পরার্থে কর্ম্মের যোগ এটা বড় সুন্দর, পূব-পশ্চিমের মিলন সেতু। বিবেকানন্দ পুরানো সন্ন্যাসী সঙ্ঘের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর এই নূতন দল গড়ে। এর মধ্যে স্রষ্টার একটা অভিপ্রায় রয়েছে ত?

এই ভাবের কথায় আমরা সকলেই বিশেষ কৌতুহলী হইলেও তিনি বিষয়টি লইয়া আর বেশি কিছু সময়ক্ষেপ করিতে চাহিলেন না, বলিলেন : আজ এই পর্য্যন্ত, আবার সময়ান্তরে হবে।

আমার হাতটি ধরিয়া বলিলেন : চলুন দাদা, আজ আপনাকে একটি নূতন জিনিস দেখাব।

একটি জীর্ণ পুরাতন মন্দির—তার অল্পদূরেই একটি বহুপ্রাচীন নিম গাছ। তখন আষাঢ় মাস, গাছটি সুপক্ক ফলে পূর্ণ। নীচেও অসংখ্য বীচি স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। নাগ মহাশয় গাছে উঠিতে আরম্ভ করিলেন।

—আসুন দাদা, বলিয়া একগোছা সুপক্ক নিম ফল হাতে লইয়া দুই-একটা করিয়া মুখে পুরিতে আরম্ভ করিলেন। আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—এ কি তেতো লাগছে না?

তিনি বলিলেন : একটা খেয়েই দেখুন না, মন-রসনার বিবাদ-ভঞ্জন হোয়ে যাক্।

আশ্চর্য্য—এমন মধুর, একেবারেই তিক্তস্বাদ শূন্য নিম ফল। আমার জীবনে এমন মিষ্ট যে নিম ফল হয়, তা কখনও আস্বাদ করি নাই। ভুবনেশ্বরে আসিয়া এই এক অপূর্ব্ব বস্তু দেখিলাম। নাগ মহাশয় আজ আর অন্য কিছুই খাইলেন না, ঐ ফলই হইল তাঁহার আজ আহার। আমিও কিছু কিছু খাইয়াছিলাম। আমরা নামিবার পূর্ব্বে দেখিলাম, একটি দুইটি করিয়া অনেকগুলি মহাবীর আসিয়া নীচে জমা হইতে সুরু করিল। নাগ মহাশয়ও দেখিতে পাইলেন, বলিলেন : দাদা আর নয়,—অধিকারীরা এসেছে আর আমাদের এখানে স্থান নেই।

আমরা নামিতে না নামিতেই তাহারা একে একে চকিতের মত উঠিয়া পড়িল। আমরা নিকটস্থ দেউলের মণ্ডপে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে সুরু করিলাম। তখন পশ্চিমদিকে মেঘের ফাঁকে একবার দিনকর দর্শন দিলেন। ভুবনেশ্বরে আসিয়া বোধ হয় আজ প্রথম সূর্য্য দেখিলাম। কিরণগুলি যেন আনন্দ ঢালিয়া চারিদিক নাচাইয়া তুলিল। মনের সকল

অবসাদ যেন কাটিয়া গেল। বলিলাম: দেখলেন, আমাদের মনের যেন সকল জড়তা কাটিয়ে এতদিন পর আজ মার্ত্তণ্ড দেবদেব দেখা দিলেন,—কি আনন্দ বলুন ত!

নাগ মহাশয় আনন্দোজ্জ্বল ছল্‌ছল নেত্রে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া—একটি ধ্যান আবৃত্তি করিলেন, কি সুন্দর তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ,—

ভাস্বদ্রত্নাঢ্যমৌলী স্ফুরদধররুচা রঞ্জিতশ্চারুবেশো,
ভাস্বান্ যো দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ স্বর্ণবর্ণঃ প্রভাভিঃ;—
বিশ্বাকাশাবকাশ গ্রহপতিশিখরে ভাতি যশ্চোদয়াদ্রৌ,—
সর্ব্বানন্দপ্রদাতা হরিহরনমিতঃ পাতু মাং বিশ্বচক্ষুঃ।

ইনি যে আমাদের মূর্ত্তিমান কল্যাণ। আমাদের জীব-সমাজের এঁর চেয়ে কে বড় আপনার আছে।—জানেন দাদা, আর্য্যেরা যতদিন এই প্রত্যক্ষ দেবতাকে জীবন্তভাবে ব্যক্তিগত, জাতিগত জীবনের মধ্যে ধরেছিল, ততদিন তারা বিশ্ববরেণ্য ছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে যখন এঁকে ছেড়ে নানা মূর্ত্তির দিকে অনার্য্য-মিশ্রণের ফলে রজোগুণের প্রভাবে বিস্তৃত হতে লাগলেন, তখন থেকেই ক্রমেই শৌর্য্য, বীর্য্য, আত্মজ্ঞান, ঔদার্য্য, ক্ষয় হতে লাগল—যার শেষ পরিণাম এই বর্ত্তমান অবস্থা।

আমি: শিবনারায়ণ স্বামীর মতে এই একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা,—ইনিই ঈশ্বর।

নাগ: সনাতন ধর্ম্মের ত ইনিই আদি দেবতা, সেইজন্য ইনি অজ, তারপর আদিত্য, ইনিই একমাত্র সত্য প্রত্যক্ষ দেবতা। এষ বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব ব্রহ্মাচৈব প্রজাপতিঃ, মহেন্দ্রশ্চৈব কালশ্চ যমো বরুণ এবচ। নক্ষত্রগ্রহতারানামধিপো বিশ্বতাপনঃ।............এষ ভূতাত্মকো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ॥ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতাত্মা পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ, জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি সংসার ভয়নাশনঃ॥ কালাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ, দারিদ্র্যব্যসনধ্বংসী শ্রীমান্ দেবো দিবাকরঃ। ইহার কোনটি অতিরঞ্জিত বিশেষণ নয়, প্রত্যেকটি উপলব্ধ সত্য।

নাগ মহাশয় আনন্দে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন: যেন একটি বালক খেলায় উন্মত্ত হইয়া সঙ্গীকে সম্ভাষণ করিতেছে।

—কি বোলবো, অধঃপতনের কালিমা আমাদের জাতির আজ আর মাথা তোলবার যো রাখেনি, না হোলে আজ জগৎকে ডেকে, গলায় যত জোর তত বড় করে বলবার কথা যে আমাদেরই সূর্য্যদেবতা সনাতন, এখন স্বার্থের ক্ষেত্রে যার রোগ আরোগ্য করবার শক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বহু বহু পূর্ব্বে তাঁকে একমাত্র, আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্যের দেবতা বোলে জীবন্ত ভাবেই পূজা করে গেছেন। ইনি নারায়ণ, জীবের সর্ব্বকালের পরমগতি

আমি: আমাদের ত্রিসন্ধ্যা ত শুদ্ধ সূর্য্যোপাসনা, কিন্তু যথার্থ উপদেশের অভাবে আমরা ত্রিসন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভুলেছি। অথচ এখনও আমাদের উপনয়ন সংস্কারটি প্রথা-অনুসারে বজায় আছে।

নাগ : মন্দের ভাল এইটুকু যে, উপাসনার এই মহান সত্যটি প্রথার মধ্যে এখনও আছে, কালে কোনও যোগাযোগে আবার পুনরুদ্দীপন হতে পারে।

আমি : হোতে পারে নয়, বলুন হবে। হতে পারে শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

নাগ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন : দাদা এ ব্যক্তির কথা ত নয়, জাতির কথা হচ্চে। সমষ্টি গোষ্ঠি, সর্ব্বজনের কথা বোলছি—কালের ব্যবধানের মধ্যে দিয়েই না সেটা সম্ভব!—তবে হবে বইকি, না হোলে সন্ধ্যা-গায়ত্রীর কোনও অস্তিত্বই থাকতো না যে। জাতিগত ভাবেই বলুন বা সমাজগত ভাবেই বলুন, পুরাতন বোলে যেটির অস্তিত্ব আছে যে ভাবেই হোক না কেন, তারই প্রয়োজন আছে। পদ্ধতি, আচার, এ সকলই মানব-সমাজের চৈতন্য, উন্নততর আবিষ্কারের লক্ষণ। যতক্ষণ এর প্রয়োজন আছে ততক্ষণ এগুলি তিনিই রেখে দেবেন, মানুষ নানা ষড়যন্ত্র করেও একে লোপ করতে পারবে না!

আমি : আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে আমাদের আসল ধর্ম্ম সেই পূর্ব্বপুরুষের অধিকৃত, সাধনলব্ধ অনুভূতিকে পাওয়া, যা আমরা এতদিন ধরে হারিয়ে বসেছি?—আমার স্বতই মনে হয়, আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্ম, যার গতি সেই হারানো পূর্ব্বগত সিদ্ধমহা-পুরুষদের উপলব্ধ তত্ত্বের দিকে।

নাগ মহাশয় আনন্দে আমাকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিয়া স্নেহভরে আমার দাড়িতে হাত দিয়া বলিলেন : দাদা, আজ এই নির্জ্জনে আমায় যে আনন্দ দিলেন, তা আর কি বোলবো! আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদের এই যে মহাতত্ত্বের জ্ঞান তা জাগ্রত সূর্য্য উপাসনার ফলেই হয়েছিল। মানুষের চৈতন্য এর চেয়ে আর বড় ধরণা করতে পারবার নয় বোলেই আর এগিয়ে যেতে পারে নি, বংশানুক্রমে নীচের দিকেই বহুর মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। প্রাচীনতম উপাসনার পদ্ধতি যা আর্য্য সভ্যতার একমাত্র চরম পরিণতি তা সূর্য্যোপাসনার মধ্যেই আছে।

আমি : পরবর্ত্তী যুগে যে উপনিষদের বা বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান তা যে সূর্য্যোপাসনার প্রত্যক্ষ ফল তা আমরা একটু গভীর আলোচনা করলেই বুঝতে পারি।

নাগ : যোগদর্শনে ত স্পষ্টই নির্দ্দেশ আছে যে, সূর্য্যে মনঃসংযম করলে বিশ্বজগতের জ্ঞান হয়। এই সূর্য্যকে ধরলে কিছুই জানতে বাকি থাকে না। পাশ্চাত্য জগতের বুদ্ধি বস্তুতন্ত্র সেইজন্যই সূর্য্যের প্রথমে তাঁর আরোগ্যকারী শক্তির উপর লক্ষ্য দিয়েছে। রোগময় মানব-সমাজে আরোগ্যই ঐকান্তিক কাম্য, তাই চিকিৎসার জন্য একদল তাঁকে ধরেছে, আবার এমন সময় আসবে যে পদার্থ বা বস্তুবিজ্ঞান-বিদেরা এই সূর্য্যকে ধরে বিশ্বের সকল তত্ত্বই আয়ত্ত করবেন, টেলিস্কোপ আর কাজে লাগবে না। আরও,—তখন বিদ্যুৎ তৈরী করতে আর যন্ত্র বা কোনও ডাইনামোর প্রয়োজন হবে না, যখন আসল ডাইনামোর নাগাল পাওয়া যাবে।

ভারতের অনুসন্ধান পদ্ধতিই আলাদা। এরা এমন একটি বস্তু চেয়েছিলেন যাকে পেলে আর

কিছুই পেতে বাকি থাকে না, এঁদের বুদ্ধি যন্ত্র-নির্ম্মাণের দিকে যায় না—তাঁরা গোড়াতেই বুঝতেন যে, যন্ত্র কখনই সকল অভাব পূর্ণ করতে পারে না। যাঁকে জানলে আর কিছু জানতে বাকি থাকে না, তাই তাঁরা এমন একটি বস্তুর আবিষ্কারে সমাহিত হয়েছিলেন। সে এই তেজোময় মণ্ডলটি, বাইরের শরীর তাঁর তেজ, অন্তরে শুদ্ধ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য। এইটি তাঁদের চরম আবিষ্কার—সে আবিষ্কারকে আধুনিক মানবের জাতিগত জীবনে উপলব্ধি করতে, প্রত্যক্ষ করতে অনেক কালই লাগবে।

আমি: দেখুন, পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী এই সূর্য্য-উপাসনার বিষয় অনেক দিন থেকেই বোলছেন (১৯১১ সাল), খুব অল্প লোকেই তা গ্রহণ করতে পেরেছে।

নাগ মহাশয় কতক্ষণ যেন অন্যমনস্ক হইয়াই রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন: দেখুন, তাঁর তপস্যা, সাধারণের মধ্যে সত্য বস্তুতে নিষ্ঠা জাগাবার এই যে তাঁর চেষ্টা, তা কখনও বৃথা হবে না,—তবে কি জানেন, এই বস্তুতন্ত্রের যুগে ভারতসন্তানের কথা একেবারে গোড়াতে পাশ্চাত্য অনুকরণ-তৎপর আধুনিক ভারতের জনসমাজ কানে নেবে না। এই তত্ত্ব পাশ্চাত্যদেশের সভ্য-সমাজ আয়ত্ত করে যখন ভারতসন্তানকে উপদেশ করবে তখনই এখানে এ তত্ত্ব জনসমাজে প্রাধান্য লাভ করবে।

আমি বলিলাম: কি দুঃখের কথা—

নাগ মহাশয় অবিচলিত ভাবেই বলিলেন: সুখ দুঃখের কথা নয় ত, আসলে একটি তত্ত্বজ্ঞানের তরঙ্গ পূর্ব্বদিক থেকে উঠে কালের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম দিকে যায়, আবার পশ্চিমকে প্লাবিত করে পূর্ব্বে এসে সমাহিত হয়। এই ত জগৎ-তত্ত্বের খেলা আবহমান কাল থেকেই চলচে। এখানকার জ্ঞান এই ভাবেই একটি জাতির তপস্যার ফলে সেই দেশের একদিকে উদ্ভাসিত হয়ে সেই জাতিকে, সভ্যতাকে সফল করে দেশ-দেশান্তরে সংক্রামিত হয়ে অপর জাতিকে সফল করে থাকে। শেষে জগৎ-সভ্যতাকে বেষ্টন করে তাকে পূর্ণ করে তারি মধ্যে সমাহিত হয়ে যায়। সকল তত্ত্বজ্ঞানের এই ত ইতিহাস। কত জাতি উঠলো, কত গেল কিন্তু বেদ হোলো সনাতন, এর ক্রিয়া অপ্রতিহত ভাবেই চলছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের উপলব্ধজ্ঞান যাকে বোলছি সেটি ত এই একটি জাতির সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চিরকাল বাঁধা থাকবে না,—এক জনস্থানকে আলোকিত করে উপযুক্ত অপর জন-সমাজে বা সভ্যতাকে আলো দেবে। এই ভাবেই সৃষ্টিতে বেদের উদ্দেশ্য ত সফল হয়ে থাকে।

আমি: তা হোলে, আমরা যেটা শ্লেষ করে বোলে থাকি, বা আমাদের অধঃপতনের ফল বোলে যেটাকে আমরা হালকা মনোভাবের পরিচয় বোলেই জানি বা মনে করি তার মধ্যেও কতটা সত্য রয়েছে—তার অন্তরালে স্রষ্টার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে সে বিষয়ে আমরা সাধারণে একেবারেই অন্ধ।

নাগ: তা তো হোতেই পারে। আরে দাদা, এতটা ভেবে কেই বা দেখে, এতটা মাথা কেই বা ঘামায়, কিন্তু যে দেখে সে পায়—যে বুঝতে চায় সে ত বুঝতে পারে। চৈতন্য-

রাজ্যের রাস্তা একেবারেই সোজা। তারপর দেখুন, এটা ত আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যঋষিরা, আমরা যাঁদের বংশধর বোলে গৌরব করি বা করছি, তাঁদের উপলব্ধজ্ঞান আমরা পাইনি বোলেই না এখানে পেতে এসেছি। আমাদের সেই তত্ত্বের বা জ্ঞানের প্রয়োজন বোলেই না আমাদের এই জাতির, এই সমাজের, এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি—যাতে সেই বস্তুটি পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয়। এই যে আকর্ষণ, টান একটি গুণের সম্পর্ক ধরে—এই যে আর্য্যঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধানুরক্তি এর ফলেই না আমাদের সিদ্ধি নিকটতর হচ্চে। এটি এই ভারতের আবহাওয়ার একটা কত বড় মহৎ গুণ। অবশ্য জীব যেখানেই জন্মায় সেই দেশের, সমাজের, সেই পরিবারের বিশিষ্ট গুণগুলি পেয়ে যায় যাতে তার নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। আমরাও তাই করতে এসেছি।—কি বল দাদা!

আমি বলিলাম: একটা কথা আমার মনে হচ্চে সেটা বোলে ফেলি, হালকা ভাববেন না ত? শুনিয়া নাগ মহাশয় হাসিয়া কাঁচা পাকা লম্বা দাড়ির চুলগুলির উপর আঙ্গুল চালাইতে লাগিলেন। বলিলেন: বোলে ফেলুন দাদা, মনের মধ্যে জমা রেখে দেবেন না যেন।

আমি বলিলাম: দেখুন আজ প্রায় দশ-বারো দিন হোল এই ভুবনেশ্বরে এসেছি, আজ সবে সূর্য্যের মুখ দেখলাম, সেই মূর্ত্তি দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে কি অপূর্ব্ব আনন্দই এলো। তারপর যে তত্ত্বটির আলোচনা চললো তার মূলও ঐ দিবাকর, তা হোলে উনিই যে আমাদের একমাত্র জাগ্রত উপাস্য দেবতা তাই কি প্রমাণ হোলো না?—

শুনিয়া নাগ মহাশয় তখন গম্ভীর হইয়া গেলেন। অস্তমিত সূর্য্যের পানে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে তাকাইয়া কিন্নরকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন:—

ওঁ অজায় লোকত্রয়পাবনায়, পূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়,
সূর্য্যায় লোকপ্রলয়ান্তকায় নমো মহাকারুণিকোত্তমায়॥
ওঁ বিবস্বতে জ্ঞানভৃদন্তরাত্মনে, জগৎপ্রদীপ্তায় জগদ্ধিতৈষিণে,
স্বয়ম্ভুবে দীপ্তসহস্রচক্ষুষে, সুরোত্তমায়ামিততেজসে নমঃ॥
ওঁ সুরৈরনেকৈঃ পরিসেবিতায়, হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্ময়ায়,
মহাত্মনে মোক্ষপ্রদায় তুভ্যম্ নমোঽস্তুতে বাসরকারণায়॥
ওঁ যন্মণ্ডলম্ জ্ঞানময়ম্ পবিত্রম্ ত্রিলোকপূণ্যম্ ত্রিগুণাত্মরূপম্
সমস্ততেজোময়দিব্যরূপম্ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্॥

ক্রমে তাঁহার দুনয়নে ধারা বহিতে লাগিল—গদগদকণ্ঠে তিনি গাহিতে লাগিলেন। এমন আনন্দময় স্তোত্র আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। আবৃত্তি চলিতে লাগিল—আদিত্য-হৃদয়ের শেষাংশ তিনি সবটুকুই আবৃত্তি করিয়া শেষ করিলেন:—

ওঁ যন্মণ্ডলম্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধসঙ্ঘাঃ,
যন্মন্ত্রিণো বেদবিদাঃস্মরন্তি, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্॥

ওঁ যন্মণ্ডলম্ বেদবিদোপগীতম্, যদ্‌যোগিনাং যোগপথানুগম্যম
তৎসর্ব্ববেদম্ প্রণমামি সূর্য্যম্, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ॥

সকল বর্ণ, সকল রসের আকর এই জগতপ্রাণ তেজোময় দিনদেবকে লোকে কত দিনে চিনিবে, কত দিনে যে জাগ্রত দেবতা, তোমার দিকে প্রজাসমষ্টি দৃষ্টি ফিরাইবে। হে অন্তর্য্যামি, তোমার অগোচর কিছুই নাই, তোমাতে নিষ্ঠা থাকিলে সকলই পাওয়া যায়, জীবন সফল হয়, তোমার প্রতি বিমুখ হইয়াই আমরা রোগে, শোকে, জরাগ্রস্ত হইয়া অকালে, অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জ্ঞান লইয়া গতায়ু হইতেছি—কে একথা বুঝিবে!

আমরা বহুক্ষণ শান্তচিত্তে সেই আনন্দঘন অনুভব লইয়া কাটাইয়া দিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। নাগ মহাশয় কোনও কথা না বলিয়া সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন। নিরুদ্বিগ্নচিত্তে অনেকক্ষণ কাটিল, শেষে নাগ মহাশয় উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন: চলুন যাওয়া যাক, রাত হয়ে গেল।

আমি বলিলাম: তা গেল ত গেল, এখানে আমাদের ত কোনও বন্ধন নেই, আমরা এখন মুক্ত, যদি ইচ্ছা হয় থাকুন না—আমার যাবার তাড়া নেই।

বলিলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে শিবানন্দের কথা উদিত হইল। কোথাও যদি যাই, ফিরিতে রাত্র হইয়া গেলে শিবানন্দ মহা ত্যক্ত করে, কৈফিয়ৎ চায়। বলে, আশ্রমে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবার নিয়ম। একথা বার বার তোমাকে বলিতে হয় কেন?—যাহা হউক—

নাগ মহাশয় আর থাকিতে চাহিলেন না, বলিলেন: দাদা, আজ এই পর্যন্ত। আজিকার এই সূর্য্যদেব-প্রসঙ্গ মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে আমি সে রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

৭

আমি আশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই শিবানন্দের কাছে কিরূপ সম্ভাষণ পাইব, কতকটা অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আসলে সেদিন ততটা কিছু ঘটিল না। তবে দ্বার হইতেই শিবানন্দ আরম্ভ করিল:

—তোমকো আজ রাজমজুরলোককো হিসাব সব ঠিক করনা পড়েগা। আজ ছয় রোজ পূরা হিসাব কিয়া নহি।

আমি ত, বহুত আচ্ছা, বলিয়া লাগিয়া গেলাম। কৃতজ্ঞ-মনে তখন পরমেশ্বরকে এই বলিয়া স্মরণ করিলাম যে, শিবানন্দের কোপ হইতে বুঝি আজ রক্ষা পাইলাম। কিন্তু আসলে তা পাই নাই। আমার অদৃষ্ট!

বলিতে হইবে না যে আমার উপর রাজমজুরদের হিসাব-নিকাশের ভার আছে, আশ্রমের যে সিঁড়ি, নূতন ঘর নির্ম্মাণ হইতেছে তাহার খবরদারীও অল্পাধিক আমার

কর্ত্তব্যের মধ্যে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমি খবরদারীর কাজ হইতে সরিয়া পড়িতেছি তা শিবানন্দ লক্ষ্য করিতেছিল। আজ সে বলিয়া বসিল যে, উহা সে মহারাজকে লিখিয়া দিয়াছে। আমি: আচ্ছা, বলিয়া হিসাবেই মন লাগাইলাম।



অনেক হিসাব করিলাম, প্রায় দেড় ঘণ্টার উপর, সকল দফাই মিলিল—কিন্তু গত কাল তারিখের সাড়ে তিন টাকার খরচ একটা হিসাবের মধ্যে কিছুতেই মিলাইতে পারিলাম না। পূর্ব্ব সপ্তাহেও আমার হিসাবে কিছু ভুল হইয়াছিল—সেটাও গরমিল হইয়া আছে। টাকা থাকে শিবানন্দের কাছে, আর হিসাব করি আমি। সুতরাং আমার তছরুপাতের ভয় ছিল না, কিন্তু শিবানন্দ দোষটা আমারই ঘাড়ে ফেলিতে চায় এই বলিয়া যে, খরচটা আমি তাহার বলা সত্ত্বেও মনোযোগ করিয়া লিখি নাই। মহারাজের কাজে গাফিলি করিয়াছি। আমি জ্ঞানত হিসাবের কাজে অমনোযোগী হই নাই। তবে যোগফলে ভুল-চুক আমার পক্ষে হওয়া যে অসম্ভব তা নয়। মা সরস্বতী অঙ্ক-বিদ্যায় পাঠশালার জীবন হইতেই আমায় রেহাই দিয়াছেন, সেইজন্য অঙ্কের সঙ্গে আমার চিরবিরোধ। কি করিব, এক্ষেত্রে দফায় দফায় মিলাইয়াও যখন কিছু করিতে পারিলাম না—তখন শিবানন্দের স্মরণশক্তির শরণাপন্ন হইলাম। বলিলাম: তোমার কালকের খরচগুলি আর একবার মনে করিয়া বল দেখি। শিবানন্দের ধারণা তাহার কখনও ভুল হয় না।

তাহাকে পুনরায় স্মরণ করিয়া দেখিতে বলায় শিবানন্দ ত একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি। এত না দফে বোল চুকা, তোমরা খ্যাল নহি রহতা ?—লেও ফের লিখো, ফের মিলাও। পড়াশুনা কুছ কিয়া নহি, বাঙ্গালী তোম, কলিজমে পড়কে কেয়া শিখা, ইত্যাদি। যাই হোক, সে আবার বলিয়া গেল, আবার দফায় দফায় মিলাইলাম কিন্তু সেই কালকের তবিলে সাড়ে তিন টাকা ঘাটতি রহিয়া গেল। তারপর আমি তাহাকে আবার যখন, বেশ করিয়া মনে করিয়া দেখ, বলিলাম, সে কোনও কথা না কহিয়া উঠিয়া টাকা পয়সার থলিটা ঝনাৎ করিয়া আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া গেল।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, এরকম করিয়া ত আর বেশি দিন চলিবে না, মহারাজকে

আমার সকল কথা খুলিয়া লিখিয়া দিব ঠিক করিলাম। যাহা হোক এখন উঠিলাম,—শিবানন্দকে বলিলাম: দেখ, হিসাবে ওরকম একটু ভুলচুক হয় তার জন্য রাগ করিতে আছে কি? এখন টাকা-কড়ি তুলিয়া চল আমায় খাইতে দিবে। এ আশ্রমে মোটে আমরা দুটি প্রাণী থাকি, এই দুজনের মধ্যে রাগারাগি করিলে চলে কি?

সে কথা শুনিল, টাকার থলিটি উঠাইয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া আমায় ভাত দিতে দিতে বলিল: মহারাজ ক্যা সমঝে গা, হামারা পাস রূপেয়া রহতা। হামকো চোর সমঝেগা। তোমরা ক্যা—

আমি বলিলাম: যদি ইয়াদ ভুল হো যায় তো ক্যা হোয়গা?

যেই ইয়াদ ভুলের কথা বলা, আবার সে মহা গরম হইয়া গেল, বলিল: হাম এতনা রোজ সে ইহা রহা হামারা ইয়াদ কভি ভুল নহি হোতা, তোমরা লিখনে কোঁ ভুল হুয়া। মহারাজকো পয়সা এয়সাই যায়েগা?

যাই হোক, আহারাদির পর মহারাজকে গুছাইয়া একখানি পত্র লিখিয়া দিলাম যে, হিসাব-নিকাশের কাজে আমার ভুল হয়, মিলাইতে পারিনা, আপনি অন্য ব্যবস্থা দেখুন। আর এখানে আমি যে শান্তির আশায় আসিয়াছি, আমার তাহা ভাগ্যে ঘটিতেছে না। যে বিষয় ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইয়াছি যদি এখানে আমায় তাহাই লইয়া মাথা ঘামাইতে হয়, তাহা হইলে আমার কি হইল? আমি কি এই সব করিতেই ঘর ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি? আপনি আমায় মুক্তি দিবেন।



পর দিন যথাসময়ে পত্রখানি এখানকার ডাকে ছাড়িয়া দিলাম। উত্তর আসিতে দশ-বারো দিনের কম নয়। ইতিমধ্যে আমি একটু স্বাধীনভাবেই বেড়াইতে লাগিলাম। রাজমজুরদের কাজের তদারক এক রকম ছাড়িয়া দিলাম, সেই সময়টা নাগ মহাশয়ের কাছে অথবা অন্য কোথাও কাটাইয়া দিতাম।

বিন্দু-সরোবরের তীরে একদিন বিকালে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন জীর্ণ মন্দিরের নিকটে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ একদল নবাগত যাত্রী দেখিতে পাইলাম। বিন্দু-সরোবরের তীরেই

তাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা এদিকেই আসিতে লাগিলেন দেখিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। নিকটে গিয়া দেখি, আমাদের কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, ভাগবতরত্ন, তাঁহাদের মধ্যে। ভুবনেশ্বরে আসিবার পূর্ব্বে দুই-এক দিন পুরীতেও ইঁহাকে দেখিয়াছিলাম। জগন্নাথের মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার বক্তৃতাও শুনিয়াছিলাম। নির্জ্জন ভুবনেশ্বরে তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তিনিও আলাপ করিবার জন্য যখন অগ্রসর হইলেন, তখন আমরা মিলিলাম। এইখানেই তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল।

তাঁহার বক্তৃতা থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে কতবার শুনিয়াছি, দেবালয়ে এবং অন্যান্য স্থানেও কতবার শুনিয়াছি, ভাগবতের ব্যাখ্যান তাঁহার মুখে বড়ই মধুর এবং চিত্তাকর্ষক। দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহার ভাগবতের এই প্রকার ব্যাখ্যা তখনকার দিনে বিদ্বজ্জন-সমাজে বিশেষ আগ্রহের বস্তু এবং আনন্দের বিষয় ছিল। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে নির্জ্জনতার মধ্যে তাঁহাকে পাইয়া যেন ধন্য হইলাম। তাঁহার সঙ্গ-সংযোগের ফলে আমার অনেক কিছু অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়াছিল।

সদালাপী লোকটি, সবল, অকপট এবং সুচতুর। বয়স প্রায় বত্রিশের কাছে, খর্ব্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ, পূর্ণ মুখমণ্ডল, দীর্ঘ ললাট, কেশগুলি দীর্ঘ—প্রায় পিঠের উপরে ঝুলিতেছে। আমার চক্ষে তাঁর মূর্ত্তিটি ভালই লাগিল। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া সেখানে আমাদের আলাপ এবং পরিচয় হইল।

পরিচয় প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, এখানে মহাপাত্র একজন ভদ্র গৃহস্থ এবং সাহিত্যিক। সামাজিক সংস্কারে তাঁর অদম্য উৎসাহ। তিনিই ভাগবতরত্নকে এখানে আনাইয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহারই অতিথি। মন্দিরে আজ সন্ধ্যায় তাঁর ভাগবতের বক্তৃতা।

ভাগবতরত্নের বাড়ি বীরভূমের সিউড়িতে। তন্ত্রের স্থানগুলি দেখিবার এবং আমায় তান্ত্রিক সাধু সঙ্গ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জানিয়া তিনি তাঁর ঘরে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ করিলেন। বলিলেন: আমাদের বীরভূমে তন্ত্রের অনেকগুলি পীঠস্থান আছে। চলুন, আপনাকে লইয়া যাইব। সেখানে আপনি অনেক কিছুই দেখিতে, জানিতে পারিবেন। এখানে কোথায় আছেন? আমি কেশবানন্দের আশ্রমের কথা বলিলাম। তার পরে সে-প্রসঙ্গে সকল কথাই বলিলাম। আমার এখানকার অবস্থাটি তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন।

সকল শুনিয়া তিনি বলিলেন: চলুন আমার সঙ্গেই চলুন। আমি বলিলাম: যে, সেটি হইবে না, মহারাজের আদেশ আসিলে তখন যাইব। তবে আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে বীরভূমে যাইব। বীরভূমের পীঠগুলি দেখিতেই হইবে। আজ ত চলুন, মন্দিরে আপনার কথা শুনিয়া আসা যাক।

কতক্ষণ আমাদের নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলাম যে, তাঁর বক্তৃতায় আমরা মুগ্ধ, তাঁর বলিবার ধরণটি সুন্দর, তাঁর মধ্যে কতকটা যেন (পাল) বিপিনচন্দ্রের প্রভাব দেখিতে পাই। তিনি তাহাতে বলিলেন যে, পালের বাঙ্গলা বক্তৃতা অতীব ওজস্বিনী

এবং প্রাঞ্জল,—আমরা তাঁর গুণমুগ্ধ তাহাতে ত আর কোনও সন্দেহ নাই। সেই সূত্রে কিছু প্রভাব আসিয়া পড়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তবে এখনকার দিনে বক্তৃতায় পাল বাঙ্গলায় অদ্বিতীয়, একথায় সকলেই একমত।

একথা সত্য যে, পাল মহাশয়ের বক্তৃতা তখনকার দিনে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে নির্ঘাত,—তবে তাহার মধ্যে কিন্তু একটু আছে বটে মনে হয়। অনেকেই বলেন, গভীর চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান এবং আন্তরিকতা থাকিলে তাঁর বক্তৃতা যথার্থই উৎকৃষ্ট হইত। আসলে এ সময়টা যেন উত্তেজনামূলক বক্তৃতারই যুগ। তাই এখন তাঁর প্রভাব নয় কি? শেষে আমাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, যাঁর কর্ম্ম যত পরিমাণে আন্তরিক, যাঁর ত্যাগের সাহস আছে, চিন্তা যাঁর গভীর, তিনিই দেশের কল্যাণ করিতে পারিবেন। উত্তেজনামূলক বক্তৃতার প্রভাব বেশি দিন থাকিবে না। ঋতু পরিবর্ত্তনের মতই উড়িয়া যাইবে।



সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা সকলে ভুবনেশ্বর নাটমন্দিরে সমবেত হইলাম। বাঙ্গালী আট-দশ জন ছিলেন,—তার মধ্যে ছিলেন ভুবনেশ্বর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক। ভদ্র ব্যক্তি প্রবীণ, চেহারায় তাঁর সম্ভ্রম সূচনা করে। শুনিলাম, তিনি অবসরপ্রাপ্ত সব-জজ, কয়েক বৎসর ভুবনেশ্বর ষ্টেটের কাজে এইখানেই আছেন। শ্রোতার মধ্যে বেশিরভাগ স্থানীয় উৎকলবাসী,—তার মধ্যে পাণ্ডারাই প্রধান। সর্ব্ব সুদ্ধ পঁচিশ হইতে ত্রিশ জনের মধ্যেই। কয়েক জন প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তার মধ্যে ছিলেন। বাঙ্গলায়ই কথা হইল। তবে সামাজিক, প্রাদেশিক এবং ভাষাগত বৈষম্য থাকায় ভাল জমিল না। মধ্যে আবার একটু বিতর্কও হইয়া গেল।

ভাগবতের বিষয়ই বক্তৃতা, রাধা ও কৃষ্ণ-তত্ত্বই তার মধ্যে মুখ্য। এই ভাবের কথাই ব্যাখ্যানের মধ্যে ছিল। একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় হঠাৎ একটি প্রতিবাদ-সূচক

প্রশ্ন করিয়া বসিলেন। রাধাকে পাইলেন কোথা? ভাগবতে রাধার কথা নাই, সুতরাং রাধা ত অপ্রামাণ্য।

কুলদাবাবু তখন উত্তরে টিকাকারের কথা বলিলেন। প্রধানা গোপীকেই রাধা বলা হইয়াছে। যাহা হউক, বক্তৃতা হইয়া গেল। তখন ভুবনেশ্বর ষ্টেটের ম্যানেজার মহাশয় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিলেন—উভয়কেই আগামী কল্য তাঁহার আবাসে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।

পর দিন শিবানন্দকে—আশ্রমে আহার করিব না বলিয়া চলিয়া গেলাম। কুলদাবাবুর বাসায় গিয়া কথাবার্ত্তায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিলাম। তারপর ম্যানেজার মহাশয়ের ওখানে খাওয়া গেল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানেও সেই বিষয়ী সাধুর কথাই হইল। যে ব্রহ্মচারী সাধুর কথা স্থানীয় কয়েকজন নাগ মহাশয়ের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন, ম্যানেজার মহাশয় তাঁরই কথা বলিলেন। এ রকম বিষয়ী, মামলাবাজ সাধু ত দেখি নাই। জায়গা জমির উপর লোলুপ দৃষ্টি, অন্যায় অধিকারের কথাও বলিলেন। সাধু খোঁজা আমার কাজ—আমি পূর্ব্বে একবার তাঁহার খোঁজে আসিয়াছিলাম। তিনি তখন পুরীতে রথ দেখিতে গিয়াছিলেন। কাজেই আমার আর তাঁর সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই। পরে তাঁর সম্বন্ধে এই সকল শুনিয়া আমার আর তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আবার এখানেও যখন শুনিলাম তখন একটু বিচলিত হইলাম।

সেই সাধুর পরিচয় যথার্থরূপে জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। এতগুলি লোকের অভিযোগ সত্য কিনা, জানিবার জন্য অন্তরে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সংকল্প করিলাম, আজই বৈকালে একবার যাইব। তিনি পুরী হইতে এতদিনে ফিরিয়া থাকিবেন।

ম্যানেজার মহাশয়ের সৌজন্য এবং এই বিদেশে স্বদেশীয় অতিথির প্রতি যত্নের ক্রটি হইল না। পরিতোষ আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি ওখান হইতে ছুটি লইয়া বাহির হইলাম এবং অল্পক্ষণেই সেই ব্রহ্মচারীর আশ্রম-দরজায় উঠিলাম।

তখন তিনি সবে নিদ্রা হইতে উঠিয়াছেন। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। স্থূল শরীর, গাঢ় শ্যাম বর্ণ, দেখিতে অনেকটা তান্ত্রিক কাপালিকের মত। একখানি প্রকাণ্ড ইজি-চেয়ারে শুইয়াছিলেন। গলার স্বর তাঁর বেশ মিষ্ট। আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করা হয়, কোথায় থাকা হয়, কি উপলক্ষে আগমন, লেখাপড়া কতদূর হইয়াছে, বিবাহ হইয়াছে কিনা, দীক্ষা হইয়াছে কিনা, ইত্যাদি।

এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম: আপনার নামে কিছু অভিযোগ আছে। এতক্ষণ আমি দাঁড়াইয়াই ছিলাম, এইবার তিনি, মেজেতে মাদুর পাতা ছিল দেখাইয়া বসিতে আজ্ঞা করিলেন।

তিনি: এভাবের কোনও কথা হঠাৎ একজন আগন্তুকের মুখে শুনিবেন তাহা আশা করেন

নাই। যেন একটু বিস্মিত হইলেন,—পরে বলিলেন : কি রকম ? তখন আমি তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ শুনিয়াছিলাম খুলিয়া সকলগুলিই বলিলাম। শেষে বলিলাম যে, সাধু বা সন্ন্যাসীদের এভাবে বদ্ধ বিষয়ীর মত ব্যবহার শুনিয়া আমায় বেদনা দিয়াছে, তাই আমি আপনার কাছে সত্য ব্যাপারটি জানিবার জন্যই আসিয়াছি।

তিনি অল্পক্ষণ গম্ভীর হইয়া গেলেন, পরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন : তোমার এ সকল কথায় কাজ কি ? তোমায় ভাল লোক বোলেই মনে হচ্ছে, যার তার কথায় কান দিয়ে কোন লাভ নেই। হাতী চলে বাজার মে, কুত্তা ভুখে হাজার—সাধুন কো দুর্ভাব নেই যব নিন্দে সংসার।

এমনভাবে বলিলেন যাহাতে এ প্রসঙ্গ আর আলোচনার প্রবৃত্তি রহিল না, যেন এইখানেই উহা শেষ হইয়া গেল। আমি কিন্তু শান্ত হইতে পারিলাম না। অথচ কি যে বলিব তাহাও ঠিক করিতে পারিলাম না। কতকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : কাহার মুখে এ সকল শুনিয়াছ ?

ভাবিয়া দেখিলাম, যদি নাগ মহাশয়ের স্থানে এই সকল শুনিয়াছি অথবা ম্যানেজারের ওখানে তাঁর মুখে এসকল শুনিয়াছি বলি তাহা হইলে তাঁদের প্রতি হয়ত মন্দ ভাব পোষণ করিতে পারেন। ভাবিবেন, ইহারাই তাঁর বিরুদ্ধে দল পাকাইতেছেন। এই সকল ভাবিয়া আমি বলিলাম : তা আমি ঠিক বোলতে পারছিনা, তবে এখানকার সাধারণের মধ্যেই শুনেছি। আমি এখানে কোন লোকেরই পরিচিত নহি, আমারও কেহ পরিচিত নাই—আপনার প্রসঙ্গ এখানকার অনেকেরই আলোচনার বিষয়। পূর্ব্বে আপনি যখন পুরীতে গিয়াছিলেন তখন আমি একবার আপনার খোঁজে আসিয়াছিলাম।

আরও কিছুক্ষণ বসিবার পর আমার মনে হইল, কাজ কি আমার এত মাথা ব্যথায়, সে যা আছে তা থাকুক, আমি দেখি যদি সাধুসঙ্গের ফল কিছু লাভ হয়। লোকের অভিযোগের কথা সত্য কি মিথ্যা আমার কি দরকার! ভাবিতেছি, সাক্ষাৎ লোকটির সংস্রবে আসিয়া কেমন মনের ভাবটা বদলাইয়া গেল—আর তাঁহার নিন্দার কথা শুনিতে বা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি মাত্র নাই। এই সকল কথা তোলাপাড়া করিতেছি—তিনি বলিলেন : তোমার পিতামাতা আছেন কিনা।

তারপর বলিলেন : তোমার দীক্ষা হয়েছে,—কোথায় দীক্ষা নিয়েছ ?

আমি : উপনয়নই ত দীক্ষা, আবার দীক্ষা কি ?

তিনি বলিলেন : ও ত বৈদিক দীক্ষা, তান্ত্রিক দীক্ষা ত হয়নি ?

আমি বলিলাম :—দীক্ষা ত একবার হোলেই হোলো। আর প্রণবই ত শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

তিনি বলিলেন :—সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর বৈদিক দীক্ষাতেই কাজ হয়—গৃহীদের তান্ত্রিক দীক্ষা চাই। আমি শুনিয়াছিলাম বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রভাব শুধু সন্ন্যাস নয় আমাদের গার্হস্থ্য জীবনকেও পাইয়া বসিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্ঘাদি, সন্ন্যাসের

প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশ হইতে উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু গার্হস্থ্য বিভাগে কুলগুরুগণের শাসন অটুট রহিল। নানা দিক দিয়া তান্ত্রিক সাধনের সারভাগ সকল জাতির মধ্যে এদেশের গার্হস্থ্য জীবনকে আচ্ছন্ন করিল,—আজও তাহার প্রভাব স্পষ্টই বর্ত্তমান। যাহা হউক, বলিলাম: যদি আমার উপনয়নের দীক্ষাকেই দৃঢ় করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রণবেরই সাধন করি, তাহা হইলে ক্ষতি কি ?

বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচারীজি বলিলেন: তোমার বাপ পিতামহ যা ক'রে গেছেন তাই করবে, না কি, নিজের যা খুসি, ধর্ম্মের ব্যভিচার করতে চাও ? তোমাদের ঐ হয়েছে, আজ-কাল দুপাতা ইংরেজী পড়ে সকলেই এক এক অবতার।

তাঁর এই প্রকার মন্তব্য ভিত্তিশূন্য—জ্ঞানের অভাবই সূচনা করে। যাক, তাঁর এ ভাবটি আমার ভাল লাগিল না, আমিও মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং দৃঢ়ভাবেই বলিলাম: বৈদিক দীক্ষাও রইল আবার তান্ত্রিক দীক্ষাও—তারপর একটা চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। দুইটির প্রয়োজন কি এটা জানতে কৌতূহল হওয়াটা ব্যভিচার না কি ? বাপ পিতামহ যা ভাল বুঝেচেন তা করেছেন, তাঁদের কাজের জবাব তাঁরা দেবেন, আমাদের—

তিনি: তোমাদের বাপ পিতামহের চেয়ে কি মনে কর তোমরা বেশি জ্ঞানী হয়েচ না কি ?

আমি: আপনার কথার ভাবটা এই যে, আমরা ক্রমাগত বংশবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়েই চলেছি। সোজা কথায় আপনার মতে দেশস্থ এখনকার বংশধরেরা ক্রমে অধঃপাতেই যাচ্চে আর ঘোরতর অজ্ঞান হয়েই পড়ছে !

তিনি: হাঁ, তা তো পড়ছেই, দু পাতা ইংরেজী পড়ে বক্তৃতা করতে পারলেই কি জ্ঞান হোলো ? পূর্ব্বপুরুষদের পথানুসরণ করবার প্রবৃত্তি নেই, দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই, সাধু-সন্ন্যাসীর সম্মান নেই, পূজো নেই ; দেশ ত উচ্ছন্ন যেতেই বোসেছে।

আমি: আমার মনে হয় পুরানো ক্রিয়াকর্ম্ম, আচারের উপর আপনার অন্ধ আকর্ষণ—সেই গোঁড়ামিই আসল ব্যাপারটি দেখতে দিচ্চেনা, আপনার সত্য দৃষ্টিকে অন্ধ ক'রে দিয়েছে।

তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন: দেখ, তোমরা যে মূর্খ তার প্রমাণ তোমরা সাধু গুরু এদের সম্মান জাননা, কি ক'রে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয় তা জানো না।

আমি: আমারও বিশ্বাস আপনি ভগবানের সত্য নিয়মের ব্যভিচার করেছেন, আর আমি যদি মূর্খই হই তাতে বেশি দুঃখ নেই কিন্তু আপনি যদি মূর্খ হন, কি ভণ্ড হন, সেটা খুব বেশি দুঃখের কথা নয় কি ?

হঠাৎ তাঁহার চক্ষু দুটি মহারোষে জ্বলিয়া উঠিল, বোধ হয় যেন ভস্ম করিবার ইচ্ছা। যেন মূর্ত্তিমান ক্রোধ। একেবারে সেই চণ্ডমূর্ত্তি দেখিয়া আমার লোকটির উপর যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তাহাও চলিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—ছ্যাখো,—বলিয়া হঠাৎ সামলাইয়া লইলেন। সে ভাব পরিবর্ত্তন একটি দেখিবার মত জিনিস। তিনি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পর

মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন : তোমরা বালক, তোমাদের উপর রাগ করবো, না দুঃখ করবো কিছু বুঝতে পারছি না।

আমি কোনও কথা না কহিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়াই রহিলাম দেখিয়া তিনি বলিলেন : যাক্, ছেড়ে দাও ও সব, যদি তোমার কিছু জানবার থাকে ত সেই কথা বল, আমি বুঝিয়ে দেবো বৈকি। আমরা না বুঝিয়ে দিলে কে তোমাদের বুঝিয়ে দেবে। তবে সাধু-গুরুর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে বিনয়ের সঙ্গেই করা চাই, অনুগত হওয়া চাই, আজ্ঞাধীন ভাবেই তাঁদের কাছে প্রশ্ন করতে হয়।

আর কেন এইবার উঠিয়া যাওয়াই ত ভাল আর উঠিয়া যাইতেও আমার ইচ্ছা হইতেছিল বটে কিন্তু যদি তাহা করি তাহা হইলে ইনি মনে ঘা পাইবেন, আর আমার পক্ষে হয়ত অসৌজন্য প্রকাশ পাইবে। ইহার উপরে আরও কিছু কথা ছিল। দেখা যাক্ না, শেষ অবধি যদি কিছু খবর পাওয়া যায়, এখানে আসাটা একেবারেই কি বৃথা হইবে! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছি দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : কুলগুরুর উপর বিশ্বাস আছে কি?

সঙ্গে সঙ্গেই আমি উত্তর দিলাম : না। তিনি ফের জিজ্ঞাসা করিলেন : কেন?

আমি : আমাদের মনের মধ্যে গুরুর যে আদর্শ আছে তা কুলগুরুর সম্পর্কে এসে বাধা পায়। তাঁরা আমাদের মতই গৃহী, আমাদের মতই লোভী, আমাদের মত ধনলোলুপ, আমাদের সকল দুর্ব্বলতাই তাঁদের আছে। এ দেখেও যদি তাঁদের প্রতি আপনি আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার দাবী করেন তা হোলে আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এখান থেকে উঠে যেতে হবে।

তিনি : ওই তোমাদের কেমন একটা গোঁ। কেন? হোক না তিনি খারাপ, হোক না তিনি গৃহী, তাতে কি আমার এলোগেলো, আমার মন্ত্রই তো সব, যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীর বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। এ ভাবটি কেমন বল দেখি?

আমি : আগে,—সেকালে ঐ ভাবটির মাহাত্ম্য যেমন তাঁরা বুঝতেন আমরা একালে তেমন বুঝতে পারি না, বুঝতে প্রবৃত্তিও হয় না। অসতের সঙ্গে আপোষ করা ভাল মনে হয় না। যদিও ভাবটি সহজ ও সরল বটে।

তিনি : তোমাদের কুলগুরু আছেন?

আমি : আছেন, আমার মার গুরু।

তিনি : তাঁর ছেলেপুলে আছে?

আমি : হাঁ, ছয়টি ছেলে, চারটি মেয়ে। তাঁর ছেলের মধ্যে বাপের কাজে কেউ আছে কিনা, ছেলেরা কি করে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম : যতদূর জানি, বড়টি ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করে বারো টাকা মাইনে,—তার বিয়ে দিয়েছেন গত বছরে, মেজটি, চা সিগারেট, পান, বিড়ির দোকান করেছে, তার পরেরটি মোটার চালাতে শিখছে, আর একটি থিয়েটার করে, তার পরেরটি পাঠশালে যায়, ছোটটি সাত-আট মাসের।

তিনি : তা হোক, গুরু ত্যাগ করা উচিত নয়—তবে তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়ে পরে ক্রম-দীক্ষা নিতে পার।

আমি : কার গুরু ? তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কেন, তোমাদের বংশের গুরু, কুলগুরু !

আমি বলিলাম : আমাদের বংশের সকলকে নির্ব্বিচারেই কি তাঁকেই গুরু করতে হবে এমন কোনও ভগবানের নিয়ম আছে ? তাঁরা উপযুক্ত কিনা, যোগ্যতা আছে কিনা,—

তিনি যেন আবার গরম হইতে আরম্ভ করিলেন (প্রকৃতি বা স্বভাবেরই দোষ ?) বলিলেন : কি ! গুরুর যোগ্যতা তুমি বিচার কোরবে ! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা।

আমি : সে বিচার আমি ছাড়া আর কে করবে ? আমার যিনি গুরু হবেন, আমার সর্ব্ব সংশয় ছেদ যদি না করতে পারেন, আমার শ্রদ্ধা যদি তিনি আকর্ষণ না করতে পারেন, কি করে তিনি আমার গুরু হবেন ?

তিনি : না না, ওসব জ্যাঠামি ধর্ম্মরাজ্যে চলবে না। কুলপ্রথা ত্যাগ করলে সর্ব্বনাশ হবে। গুরুর অভিশাপে বংশ জ্বলে যাবে—আজকালকার সব ছেলেরা ঐ করেই ত উচ্ছন্ন গেলো। নিজের পছন্দমত বিয়ে কোরবো, নিজের পছন্দমত গুরু কোরবো, আরে তাই যদি হবে তো শাস্ত্রে কুলগুরু বোলেছে কেন ? হাঁ, যদি গুরুবংশ না থাকে তাহোলে অন্য কথা বটে।

আমি বলিলাম : তা যদি হয় তাহোলে আমাদের গুরুবংশ নাই, আমার পিতা সেইজন্য দীক্ষা নেন নি।

তিনি : তবে এই যে বোললে তোমার মার গুরু আছেন।

আমি বলিলাম : আমাদের পিতৃকুলের গুরুবংশ লোপ হওয়ায় মা আমার জ্যাঠাইমার মামাদের গুরুপুত্রের কাছে একাই দীক্ষা নিয়েছেন। আমি প্রথমে তাঁকেই কুলগুরু মনে করেছিলাম,—ঠিক অতটা ভেবে দেখিনি।

তিনি শুনিয়া বলিলেন : যাক্, তা তোমার যদি কুলগুরু না থাকে তাহোলে আলাদা কথা, কিন্তু তা বোলে গৃহী লোকের সন্ন্যাসী গুরু ঠিক না, গৃহী গুরুই দরকার।

আমি বলিলাম : সব রোগীর কি একই ওষুধ ? গৃহী গুরু কে কোথায় আছেন আমি খুঁজতে যাবো ?

তিনি বলিলেন : চেষ্টা ক'রে না পাওয়া যায় ত তাহোলে অন্ততঃ আগে গৃহী ছিলেন পরে ব্রহ্মচারী হয়েছেন এমন দেখে গুরু করতে হবে। একেবারে সন্ন্যাসী গুরু করা হবে না।

যাঁহার সঙ্গে আমার কথা হইতেছিল, ইনি আগে গৃহী ছিলেন, একটি ছেলে আছে, স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায় ব্রহ্মচারী হইয়াছেন এমনই একটা খবর শুনিয়াছিলাম, ইঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে।

আমি : যাক্, আসলে আমার মন্ত্র নেওয়ার কথা নয়,—তান্ত্রিক দীক্ষার উদ্দেশ্যই বা কি বৈদিক দীক্ষারই বা উদ্দেশ্য কি তাই আমার জানতে কৌতূহল ছিল।

তিনি: গৃহী লোকের তান্ত্রিক দীক্ষার কত ফল তা চট্ ক'রে এখন তোমার কাছে কি কোরে বোলবো? দীক্ষা নাও, মন্ত্র পাও, জপ কর, অভিষেক হোক, পুরশ্চারণ কর, লক্ষ জপ কর, তবে বুঝবে যে কি ব্যাপার,—শক্তির রাজ্যের মধ্যে ঢুকলে তখন গুহ্য ব্যাপার সব বুঝবে।

আর নয়, এখন উঠিতে পারিলেই বাঁচি। ভগবান রক্ষা করুন।

৮

ইতিমধ্যে মহানন্দ বলিয়া একজন অপূর্ব্ব সাধুর সঙ্গে দেখা হইল। প্রথমে যেদিন গেলাম তিনি কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিলাম। দুইজন লোক ছিলেন তাহাদের সঙ্গেও যে তিনি মনোযোগ করিয়া কথা কহিলেন তাহাও বোধ হইল না।। দু'একটি কথা কহিলেন তাহাও এত ধীরে আমার কানে পৌছাইল না।

তিনি আসনে বসিয়াছিলেন। নিম্নাঙ্গ একেবারে স্থির, কেবল হাত দুটি মাঝে-মাঝে নাড়িতেছিলেন। মুণ্ডিত-মস্তকের উপর যৎসামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচা-পাকা চুল গজাইয়াছে। গৌরবর্ণ মূর্ত্তি যেন অনেকটা হরিদ্বারের ভোলানন্দ-গিরির মত। ভুরু দুটি খুব কালো। লম্বা-ধরণের মুখ। পরিধানে সাদা কাপড়। গৈরিকের সম্পর্ক নাই। গলায় একটি মালা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিক মিলাইয়া একটির পর একটি গাঁথা। ক্ষীণ শরীর।

পরদিন গেলাম ক্ষুদ্র একটি কুঁড়ের মধ্যে, চারিদিকে বাগান। ঘরখানির চওড়া দাওয়ার উপরে তিনি সমস্ত দিন আসনে থাকেন। আমি সেদিন যখন গেলাম, তখন কেহ ছিল না। নির্জ্জন আশ্রমে অপর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে করিলাম যে ভালই হইয়াছে, কথা কহিবার বেশ সুযোগ পাওয়া যাইবে। প্রণাম করিয়া বসিলাম। তিনি অভয় মুদ্রা দেখাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর দৃষ্টি ফিরাইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। মনে হইল, যেন আমার কথাই ভাবিতেছিলেন। আমিও স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। কথা কহিবার প্রবৃত্তিই হইল না। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টার উপর সময় চলিয়া গেল এমন সময় আর একজন মোটাসোটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক রেশমের পাঞ্জাবী ও চাদর পরিয়া আসিলেন ও প্রণাম করিয়া বসিলেন।

আগন্তুক ধনবান্ বিষয়ী লোক বলিয়াই মনে হইল। সাধু কিন্তু তাহার সঙ্গেও কোন কথা কহিলেন না। কিছুক্ষণ তিনি বসিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। যেন কথা কহিবার সাধ্য নাই। পরে যেন অসহ্য হইয়াই বলিলেন: স্বামীজি, তাহোলে কি আজ বিকেলে আমাদের ওখানে যাওয়া হবে?

একটু ভাবিয়া সাধু বাংলায় বলিলেন: না দরকার নাই। ভদ্রলোকটি তখন কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন: কেন কাল ত আমি বলে গিয়েছি, আপনিও ত—

তোমার বাড়িতে আমায় নিয়ে গিয়ে কি উপকার হবে? ও অসুখের কথা ত আমি আগেই বলেছি,—এখন সারবে না। যে কারণে ওটা হয়েছে তার ভোগ পূর্ণ না হোলে, কারো সাধ্য নেই যে সারিয়ে দেয়।

শুনিয়া তিনি বলিলেন: আপনারা ত ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন। তাতে সাধু আবার বলিলেন: যদি কেউ মন্ত্রশক্তির দ্বারা সারান তা হোলে যিনি আরোগ্য করবেন তাঁকে কঠিন ভোগের মধ্যে পড়তে হবে। ফাঁকি দিয়ে কোন কঠিন কাজ হয় না যে, হবার যো নেই।

কথাগুলি শুনিয়া ভদ্রলোকটি আমার দিকে একবার চাহিলেন এবং কিছু বিমর্ষ হইয়া গেলেন। বোধ হইল যেন অন্তরে ক্ষুব্ধ হইলেন। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিলেন: তা হোলে কি আপনাদের দয়ায় কিছু হতে পারে না। আপনারা মহাপুরুষ, ইচ্ছা করলে ত দয়া করতে পারেন।

সাধু যেমন বসিয়াছিলেন ঠিক তেমনি অবস্থায় স্থিরভাবে বলিলেন: দয়া, দয়া—দয়ার কথা বলছেন?—তার পাত্রও ত আছে।

ভদ্র:—আমরা কি এতই অধম? এমন ত কাজ কিছু করিনি যার জন্যে—

সাধু: তবে এই কঠিন ভোগটা এলো কোথা থেকে? প্রকৃতির রাজ্যে সবই সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীন, এখানে কিছু অবিচার কি হবার যো আছে?

ভদ্র: আমরা অনেক কিছুই ভাল কাজ ত করে থাকি। দোল-দুর্গোৎসব আজ তিন পুরুষ থেকে চলছে। অনেক কাঙ্গালী-ভোজন করানো হয়, গরীব ছোটলোককে দানও করা যায়—

সাধু কি যেন একবার বলিবার চেষ্টা করিলেন তারপর নিরস্ত হইলেন, আর কোনও কথা কহিলেন না। ভদ্রলোকটি দুই একটি যেন আরও কি কথা বলিলেন মন দিয়া শুনি নাই, কিন্তু সাধুর মুখ হইতে আর কিছু বাহির হইল না দেখিয়া তিনি উঠিয়া চিন্তিতমনে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আর প্রণামও করিলেন না।

আমি আরও কিছুক্ষণ রহিলাম, কিন্তু তিনি কথা না কওয়াতে প্রণাম করিয়া আমিও উঠিলাম। যখন রাস্তায় আসিয়াছি তখন দেখি ঝাঁকড়া-চুল, চাদর-গায়ে যুবা মূর্ত্তি একজন বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হাতে তাঁহার কিছু জিনিস-পত্র ছিল। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—এঁর সঙ্গে কথা কওয়া ত মুস্কিল দেখছি, আপনি বোধ হয় এঁর সঙ্গেই আছেন।

তিনি: হাঁ, প্রায় দুই বৎসরকাল যাবৎ আমি পিতার আজ্ঞায় এঁর সঙ্গে আছি, আমার সঙ্গেও কথা ইনি খুবই কম কন। আমাকেও যে কথা কইতে নিষেধ করেছেন তা নয়। কিন্তু এঁর সঙ্গে এসে অবধি কথা বলবার সময়ে আমার নিষ্প্রয়োজনে কথা কইবার প্রবৃত্তিই হয় না। এটি এঁর সঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল বুঝতে পারছি।

আমি : যদি কারো সঙ্গে কথা কইতে হয়—

তিনি : সে সময়ে আমি ঠিক বুঝতে পারি কতটুকু কথা বলা দরকার।

আমি বলিলাম : যদি কোন বিষয়ে আলোচনা—

মুখ হইতে কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন : নিষ্প্রয়োজন। তাতে বাক্য নষ্ট আর শক্তি ক্ষয় হয়। শুনিয়া আমি বলিলাম : কোনও প্রকার সদালোচনা কারো সঙ্গে না কোরেই বা থাকেন কি কোরে, সকলকার সঙ্গে না হোক—ভাল সঙ্গী পেলে কথা কইবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করে না?

তিনি : এখন সব আলোচনাই নিজের মনের সঙ্গে—খুব তর্ক-বিতর্ক করি, বুদ্ধির ক্রিয়ায় যখন সেটার মীমাংসা হয়ে যায় তখন কি আনন্দ। আর এঁর সম্বন্ধে কথা এই যে—ঝুড়ি ঝুড়ি গীতার কথা, নানাপ্রকার যোগশাস্ত্রের কথা এঁর কাছে শুন্‌তে যদি চান তাহোলে নিরাশ হতে হবে। শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—তা হোলে?…

আমাকে কথা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া, যদি প্রত্যক্ষ কিছু পেতে চান ত দু'চার দিন আসা-যাওয়া করুন, কথা না কইলেও এঁর কাছে এসে একটু স্থির হয়ে বসে গেলে অনেক কিছুই পেতে পারবেন। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কথাটা আমার অন্তরে প্রবেশ করিল।

আমার একটু আন্তরিক ভক্তি ইঁহার উপর হইয়াছিল আর মনের মধ্যে বেশ একটু ইঁহার সঙ্গলাভের ইচ্ছার তাড়না অনুভব করিতেছিলাম। এদিকে কুলদাবাবুরও কলিকাতায় যাইবার সময় নিকট হইয়া আসিল। আমার এখনও মহারাজের হুকুম আসে নাই—কাজেই আমার আর তার সঙ্গে যাওয়া ঘটিল না। কথা তাঁহার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত রহিল যে, মহারাজের হুকুম আসিলেই আমি কলিকাতায় তাঁহার ঠিকানায় যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সক্ষাৎ করিব। তারপর তাঁর সঙ্গে সিউড়ি যাওয়া যাইবে। বীরভূমের তান্ত্রিক পীঠস্থানগুলি দেখিবার সুযোগ পাইব। কুলদাবাবুও ইতিমধ্যে ঢেকানল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। সেখানে তাঁহার বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল।

আমি ঠিক করিলাম এই সময়ে মহানন্দের সঙ্গ যতটুকু পাই সে সুযোগ ত্যাগ করিব না। কুলদাবাবুকে বিদায় দিয়া আমি সেই দিনই বৈকালে মহানন্দের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ঠিক সেইরূপ আসনে সেই ঘরের দাওয়ায়—তিনি বসিয়া আছেন। প্রণাম করিয়া একটু দূরে বসিলাম।

আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, অল্পক্ষণেই আসনে শরীরটি আমার একেবারেই স্থির হইয়া গিয়াছে। কোনও অঙ্গ যেন নাড়িবার সাধ্য নাই। আকণ্ঠ যেন একেবারে পাথর হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর হইতে যেন প্রশ্ন হইল—কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি।

কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছি?—প্রথমত এই উত্তর হইল যে প্রাণের চাঞ্চল্য, যে জন্য অস্থির হইয়া সাধু, সাধক বা তপস্বীর পানে ছুটিয়াছি সেই অস্থির চিত্তকে স্থির করিবার উপায় জানিতে

আসিয়াছি। অবার প্রশ্ন—যোগশাস্ত্রে ইহার উপায় ত নানাভাবে ব্যাখ্যা করা আছে, সে সকল ত অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সকল উপায়ের মধ্যে উপযোগী কোন একটা অবলম্বন করিলেই ত পারি।

উত্তর: তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, ছাপানো পুস্তকের মধ্যে নিহিত উপায় অবলম্বন করিতে প্রাণ চাহে না, কেন যে চাহে না তা ত ভাবিয়া দেখি নাই।

প্রশ্ন: ভাবিয়া দেখিলে কি পাওয়া যায় ?—

উত্তর: পুঁথিতে ত প্রণব মন্ত্র শ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। সেই মন্ত্র ঈশ্বরের বাচক ;—উঁহার জপের দ্বারা চিত্ত স্থির হইবে ইহা স্পষ্টাক্ষরেই লেখা আছে।

উত্তর: আমার তাহাতে ত প্রাণ চায় না, সর্ব্বদাই একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ বা সিদ্ধ যোগীর পশ্চাতে মন অবিরাম চলিতেছে।

প্রশ্ন: কেন ?—**উত্তর:** সাধারণ নিয়ম জানিয়াই প্রাণ সন্তুষ্ট নয়। একজন জীবিত ব্যক্তির নিকট হইতে জীবন্ত শক্তিমান নির্দ্দেশ যেন চাহিতেছে।

প্রশ্ন: তাহা হইলেই ত গুরুর কথাই হইল। **উত্তর:** হাঁ, তাইত বটে।

প্রশ্ন: তাহা হইলে গুরুর প্রতি বিশ্বাস আছে কিনা! সেটা অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট হওয়া উচিত।

উত্তর: যখন নিজের শক্তিতে কুলাইতেছে না তখন গুরু বলিয়া একজনকে মানিতেই হইবে।

প্রশ্ন: এটা যেন দায়ে পড়িয়া মানার মত হইল না ?—

উত্তর: সত্য বটে, যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস বা গুরুর প্রতি ভক্তি ত আসিতেছে না!

প্রশ্ন: আমার সুবিধার জন্য একজনের সাহায্য চাই, কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব, আমার প্রতি কৃপার জন্য নির্ম্মল কৃতজ্ঞতা তাহাও স্বীকার করিব না এটা কোন্ ভাবের পরিচয় ?—

উত্তর: জ্ঞানরাজ্যে মানুষ-গুরুর কথা নাই। সব মানুষই অল্প বিস্তর অসম্পূর্ণ, জ্ঞান তাঁহাদের সংকীর্ণ বলিয়াই চক্ষে পড়ে। এই সকল দেখিয়া কি করিয়া সে রকম লোককে গুরু বলিয়া সম্পূর্ণ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আইডিয়্যাল হিসাবে পূজা করিব।

প্রশ্ন: জ্ঞান-রাজ্যের *ঐটি* কি *একটি* প্রকাণ্ড বাধা নয় ? তত্ত্বজ্ঞান যে গুরুমুখী, যাঁর সে জ্ঞান হইয়াছে তিনিই উহা আর একজনকে দিতে পারেন ; আর নিঃসন্দেহ বুদ্ধিতে নির্ম্মলচিত্তেই তাহার ক্রিয়া হয়, অন্যথায় শুভফল ঘটিবে কি করিয়া ?—

উত্তর: সেটা বুঝিতে পারি, কিন্তু তবুও মানুষকে গুরু স্বীকার করিতে প্রাণ চায় না। এ রোগের ঔষধ কি ?

প্রশ্ন: এটা ত বুঝিতে পারা যায় যে এতাবৎ যা কিছু জ্ঞানের রাজ্যে প্রকাশ হইয়াছে তা ত মানুষের চৈতন্যের মধ্যে দিয়াই হইয়াছে—তাহা হইলে যাঁহার নিকটে অন্তরের সকল সংশয়চ্ছেদ হয় তাঁহাকে গুরু বা শ্রেষ্ঠ বা আমার আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধা কি ?

উত্তর : এখন মনে হইতেছে যে বাধা অন্য কিছুই নয়, কেবল যে ব্যক্তি আমার মধ্যে সকল ভেদ ঘুচাইবেন সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ না পাওয়াই একমাত্র বাধা।

এই ত ঠিক কথা। তাহা হইলে এই কথাই স্থির হইল যে গুরু পাওয়া গেলে তাঁহার প্রতি মন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে বাধা নাই। তাই না এত খোঁজাখুজি !

বুদ্ধি এতক্ষণে স্থির হইল। নির্ম্মল আকাশে যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। স্পষ্ট ধারণাতে স্থির হইল, গুরুই আমার সকল ভেদ নিরসন করিবেন, যখন তাঁহাতেই চিত্ত সমাহিত হইবে—তখনই শান্তি আসিবে।

তখন এই কথাই মনে হইল কোথায় তিনি, যিনি আমার সকল অশান্ত হৃদয়ের সকল প্রশ্নের মীমাংসার দ্বারা শান্ত করিবেন।

মনের মধ্যে তাহার এই উত্তর হইল যে, সময় হইলেই পাওয়া যাইবে। অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইলেই যোগাযোগ ঘটিবে।

তা বলিয়া ত স্থির থাকা যায় না, অন্তরে আকুল তৃষ্ণা কি নাই ? মনে হয় ত উহা তীব্র-ভাবেই রহিয়াছে। এ জগতে আসাই ত তত্ত্ব মীমাংসা করিতে। যদি, আমি কে—কেন আসিয়াছি,—আমার গতি কোন্ দিকে ? এই তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা না হয় তাহা হইলে জীবনধারণই ত বৃথা।

এ প্রশ্নের উত্তর ত একরকম মোটামুটি জানা হইয়াছে। আমি কে—? ইহার উত্তর : আমি আত্মা, পরমাত্মার অংশ।

কেন আসিয়াছি ?—ইহার উত্তর : ভোগ করিতে আসিয়াছি, ভোগের সম্পর্কে প্রকৃতির পরিচয় পাইতে, আমার প্রকৃতিকে চিনিতে আসিয়াছি। লক্ষ্য আমার পূর্ণ জ্ঞান, আনন্দ ও শাশ্বত অবস্থাই ভূমানন্দের ক্ষেত্র। পার্থিব যত কিছু বিষয় আছে সে সকলের অতিরিক্ত যে আনন্দ অর্থাৎ যে আনন্দ বিষয়ীভূত নয়, যে আনন্দের বাধা নাই সেই আনন্দই আমার একমাত্র কাম্য। তাহার অভাবেই না বিষয়ীভূত আনন্দকে অবলম্বন করিয়া দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে বিষয়মুখী মন থাকিতে ভূমার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আবার এদিকে বিষয়কে জোর করিয়াও ছাড়া যাইবে না, বিষয়ের সম্পর্কে থাকিতে থাকিতে পরিবর্ত্তনশীল বিষয়ের অনিত্যতা বোধ ক্রমাগত অন্তরে যতই বদ্ধমূল হইবে ততই বিষয়ীভূত আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা হইতে পৃথক হইতে থাকিবে। আর বিষয়ের আনন্দ যতটা পরিমাণে পৃথক হইবে ভূমা ততটাই চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিবে। ইহাও বুঝিতে পারি কিন্তু কতদিনে বিষয়ভোগ কাটিবে, ক্ষুদ্রের মোহ সম্পূর্ণ কাটিলে তবেই না সর্ব্বাত্মিক জ্ঞান ফুটিবে তাহার উপরেই ভূমার খেলা, পূর্ণ আনন্দে তাহার পরিশেষ। এতটা কর্ম্ম কি সহজে অল্প সময়েই ক্ষয় হইবে ? তাহা ত হইবে না, তবে আমি কি করিব ?

এখানে সাধনের প্রয়োজন, তপস্যা লইয়াই থাকিতে হইবে। লক্ষ্য সর্ব্বদাই থাকিবে ভূমার দিকে। কর্ম্মকে শৃঙ্খলিত করিতে হইবে, ভাগ করিয়া লইতে পারিলে সহজ হয়, আরও

সহজ হয় সকল কর্ম্মেই, কর্ম্ম-ক্ষয়ের উপর লক্ষ্য থাকিলে। কর্ম্মের বিস্তৃতি না হয়, কারণ কর্ম্ম বিস্তার করিলেই বিষয় বেশী ঘাটিতে হইবে, আর বেশী বিষয়ের ব্যবহারের ফলই মুক্তি হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া। সহজ ও সবল বুদ্ধি তীব্রভাবে সকল সময় জাগ্রত রাখিতে হইবে, ইহাই ত তপস্যা, আর তপস্যা কি?—আমি জীব, কর্ম্ম ও বিষয়ভোগে লিপ্ত, আমার কর্ম্ম বিষয়মূলক যাবতীয় ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা, আমার স্বভাবে বা স্বরূপে স্থিত হইবার যে ঐকান্তিক যত্ন আর তাহা লইয়া যে উদ্যম, ক্রমান্বয়ে কালের মধ্য দিয়া যে রতি উহাই তপস্যা। যাকে জড়াইয়া আমি অশান্তির মধ্যে কাল কাটাইতেছি, এই যে বিষয়কামনা, প্রাণকে বিষয়-মুখে নিরন্তর চালনা করিতেছে, অভাবমোচন হইলে সুখ, পুনরায় অভাবগ্রস্ত হইয়া দুঃখবোধ এবং তাহার প্রতিকারের জন্য যে তীব্র কর্ম্মপ্রবাহে নিরন্তর তাড়িত হইতেছি তাহা হইতে নিবৃত্তির চেষ্টা—তাহাই তপস্যা। পূর্ণভাবে উপলব্ধি না হইলেও আভাসে স্বরূপের যে বিমলানন্দময় আভাস তাহাই সম্বল করিয়া এবং তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া সেই লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের যে চেষ্টা বা কর্ম্ম তাহাই আমার তপস্যা হইবে।

গুরু মূর্ত্তি ধরিয়া সাক্ষাতে বা কাছেই থাকুন কিম্বা নাই থাকুন, গুরু আছেন। তাহাতে সন্দেহ-ই নাই। কারণ অধ্যাত্ম পথ দেখাইবার জন্য সকল ধর্ম্মেই গুরুর একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। লক্ষ্যে অলক্ষ্যে গুরুর অস্তিত্ব ব্যতীত চলিবার যো নাই। বাপ, মা, হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া পার্থিব কর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন, কিন্তু অধ্যাত্ম পথ কে দেখায়? না কেহ দেখাইলে যাইবার, পাদক্ষেপ করিবার উপায় কি? জীব ত জন্মাবধিই অসহায়। বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে সকল অবস্থায়ই সে সহায় চায়, এবং পায়,—তাই-ই চলে। যেমন জগত-সংসারে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, ধন, জন, সহায়,—অধ্যাত্ম-পথেও তার সহায়তা, সাহায্য চাই। সে সহায় গুরু। যার মনোবৃত্তি যেমন, যে ভাবে যার সংস্কার গঠিত তার সহায় সেই ভাবে জোটে। যার দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ সহায়ের প্রয়োজন, জীবন্ত মূর্ত্তির মধ্য দিয়া না হইলে যে অন্যভাবে সহায়তায় বিশ্বাসী নয় যে জীবন্ত মানুষ বা দেহধারী গুরুই পায়। যে জীবন্ত মানুষ গুরুতে বিশ্বাসী নয় সে তার চৈতন্যশক্তি হইতেই অলক্ষ্যে সাহায্য পায়। যতটা পায়, পুরুষার্থের সহায়েই আবার ততটাই অগ্রসর হয় কিন্তু আসলে নাম রূপাত্মক যে আমি—সে আমি যে আত্মচৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ আমি নয় একথা প্রত্যেক অগ্রগামী পাদক্ষেপেই প্রমাণ হইয়া যায়। কি ভাবে?—দুঃখের আঘাতে। অভাবেই দুঃখ, অভাবমোচনেই সুখ। নামরূপাত্মক আমি যে আমার সকল অভাবমোচনে সক্ষম নই, পুরুষার্থ বিফল হইলে সেইটাই প্রমাণ করে। যতকিছু জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি আমার আছে সবটা উজাড় করিয়া চেষ্টা করিলেও আমি আমার দুঃখ নিবারণ করিতে ত পারি নাই। এমন সকল যোগাযোগ অপেক্ষা করে যাহাতে আমার আদৌ হাত নাই। এ সকল দেখিলে ত স্পষ্টই বোধ হয়, এটি প্রমাণ করিতে বাক-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।

পুনঃ, জীব সকল কেন সৃষ্ট হইয়াছে, বা হইতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে গেলে ত স্থূল ছাড়িয়া কারণে যাইতে হয়। যদি, আমি কেন আসিয়াছি আমার সৃষ্টির কারণ বুঝিতে পারি তাহা হইলে সকলের আসার কারণ জানিতে পারিব। এই সোজা কথা বুঝিতে বেশী মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। এই এক আমির রহস্য ভেদ হইলে সকল আমির রহস্যই ভেদ হইবে। সুতরাং বাহিরের বিস্তৃত রহস্যের মধ্যে না তলাইয়া অন্তরের মধ্যেই অনুসন্ধানে লাগা ভাল ও একমাত্র সহজ পথ। ইহাই ভারতীয় আর্য্যপ্রথা। এই প্রথার মধ্যেই একটি সহজ সরল পথ পড়িয়া আছে যাহাতে আমি সকল জগত-রহস্যের চরম মীমাংসা করিয়া আমার জন্ম সফল করিতে পারি। এ বিষয়ে আমার কোন্ সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং আমি এই আমির মধ্যেই সমাহিত হইব, গুরু আমায় পথ দেখাইবেন। যখন অহঙ্কারের মত্ততায় আমার শ্রেয়ঃ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইব তখনই দুঃখের কশাঘাতে তিনিই আমার চৈতন্য সম্পাদন করিবেন। যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে দৃষ্টিহীন আত্মশক্তির অভাবে মুহ্যমান হইব তিনিই চৈতন্য শক্তির প্রেরণা দিয়া আমায় শক্তিমান করিবেন। আমি বেশ বুঝিয়াছি—যৌবনগর্ব্বে যে শক্তি চালনা করিয়া আমি আমাকে শক্তিমান মনে করিয়া সকল কর্ম্মে অগ্রসর হই, সাফল্যে মনে মনে দম্ভ করি, সে শক্তি আমার নয়। ঋতু পরিবর্ত্তনের মতই সে আসে আবার অন্তর্দ্ধান হয়। যদি আমার শক্তি হইত তাহা হইলে আমারই থাকিত কখনও অভাববোধ করিতাম না। শক্তি আমার যখন আজ্ঞাধীন নয় তখনই ত এটা প্রমাণ করিতেছে যে উহা আমার নয়। এখানকার জল হাওয়ায় যিনিই আসিবেন তাহাকেই ষড় ঋতুর মত শক্তির প্রভাব লাগিবে। এখানকার ভৌতিক পদার্থের যোগাযোগে যেমন শরীর মন কর্ম্মাদির উদ্যম, তেমনই তাহার আবার অভাবও আছে। যে যোগাযোগে আমি শক্তিমান, আমার ভাগ্য আমি উপার্জ্জন করি, সেই শক্তিই আবার যোগাযোগের অভাবে ক্ষীণ অক্ষমতারই পরিচয় হইয়া আমায় হতাশ করে। নৈরাশ্যের মধ্যে শক্তিহীন অপদার্থ হইয়া পড়ি। তখনই অহঙ্কার চমকিয়া উঠে, অজ্ঞানের খোলস খসিবার উপায় হয়। জড়তায় মুগ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় না। তখন দেখি তোমারই শক্তি তুমি দাও ত পাইব, না দিলে পাইব না। এই বোধ প্রভাতের পূর্ব্বদিকের সূর্য্যোদয়ের মত স্পষ্ট হইয়া উঠে, আর আনন্দ দেয়।

এখানকার মেয়াদ কতটুকু সময়। এই সময়ের মধ্যে বাল্য-কৈশোর-যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য। কয়টি লোক বার্দ্ধক্য পায়? প্রৌঢ়াবস্থায়ই বা কতজন পৌঁছায়? আবার যৌবনই বা কত জনের ভোগ করিবার মেয়াদ থাকে? তাহা হইলে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন আমি কতজনের গড়ে? কলের পুতুলের মত দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনযাপন ত অনেক বৃদ্ধেরও দেখিয়াছি। আমি কে বা কেন এ প্রশ্ন জাগেই বা কয়টি লোকের? যাহাদের জাগে তাহাদের মধ্যেই বা কতজনের অন্তরে সেটা তীব্রভাবে তাড়না করে? আর তাহাদের মধ্যেই বা কত জনের উহা জীবনে যথার্থ কাম্য হয়? যে পৃথিবীতে খাওয়া-পরার-সমস্যা সমাধানের জন্য জন-সমষ্টি লালায়িত—সেখানে কয়টি জীব, আমি কে, ও কেন, এজন্য মাথা ঘামাইতে যাইবে?—

হাঁ, যুক্তিযুক্ত কথাই এই যে তোমার সঙ্গে ভগবানের কোনও সম্পর্ক নাই। প্রকৃতির রাজত্বে তুমি প্রাকৃত জীব, ভোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান এই তিনটিতেই তোমার অধিকার। ইন্দ্রিয়-মন-শরীর লইয়াই তোমার কারবার, এখানে ভগবান বা ঈশ্বরকে কোথায় পাইতেছ?

তবে সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম, একথার তাৎপর্য্য—

সর্ব্বে ব্রহ্ম এর তাৎপর্য্য সরল,—ব্যবহারে, কর্ম্মে ব্রহ্ম কোথায়?—ব্রহ্ম যদি বলিতেছ তবে কর্ম্ম বলিতেছ কেন?—তোমার কর্ম্মের ব্যাপারে ব্রহ্মের সম্বন্ধ কোথায়? তারপর ভগবান বা ঈশ্বর সে ত সমষ্টির কথা, বিরাটের কথা। তুমি একটি জীব, তোমার নাম রূপ গুণ ও সংস্কারের মধ্যে তুমি বাঁধা, প্রকৃতির শক্তি লইয়া কর্ম্ম কর, ভোগ কর, জ্ঞানলাভ কর, মন, বুদ্ধি, চিত্তের সাহায্যে তোমার অহঙ্কারকে সম্বল করিয়া; এখানে ভগবানকেই বা পাইতেছ কোথায়? তাঁকে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধের মধ্যে কোন ভাবে পাও?

কেন বুদ্ধি দিয়া! বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিতে পার মাত্র যে তিনি আছেন কি নাই, তাও কল্পনার রঙ্ তার মধ্যে কতখানি তাকি বিচার করিয়া দেখিয়াছ? আগা-পাশ-তলা যার কল্পনার আশ্রয়ে চলিতে হইতেছে তার বুদ্ধি যে শুদ্ধ বুদ্ধি তার প্রমাণ কি? প্রতিষ্ঠা, ধন, মান ও ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভোগের মধ্যেই যার বুদ্ধি নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায় তার বুদ্ধিকে বিশ্বাস আছে কি?

এই যে সাধু মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন ভগবানই সৃষ্টির কর্ত্তা,—আর তাঁকে পাওয়া যায়।—তিনি পিতা, আমরা সন্তান,—আমরা তাঁর অংশ!

আহা, তাঁদের অনুভূতি যেটা সেটা তোমার ত শোনা কথা? তার সঙ্গে তোমার আসল সম্পর্ক কি? সত্যকে ধরেই না প্রত্যয়?—সত্যকে কি পাইয়াছ? কাজেই তোমার আত্মপ্রত্যয় কোথায়? তারপর যেখানে একটা হাট বসিয়াছে সেখানে কত মানুষ, কত গাড়ি, ঘোড়া, গরু, গাধা, ছাগল ইত্যাদি কত পশু, পক্ষী, কত রকমের কত কত মাল পত্র লইয়া কারবার চলিতেছে। হাটের ভিতরে যারা আছে তারা হাটকে এক রকম দেখে, আর হাটের বাহিরে আসিয়াছে যারা—তারা হাটকে আর এক রকম দেখে। এত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তেমনি, এই সৃষ্টির মধ্যে যারা আছে তারা এই সৃষ্টিকে এক রকম দেখে, যারা বাহির হইয়া গিয়াছে তারা আর এক রকম দেখিতেছে, যারা ভিতরে আছে তারা যে যার বিষয়টিই দেখিতেছে—সম্যক দেখিতেই পাইতেছে না কাজেই তাদের সবই আংশিক, আর যাঁরা সৃষ্টির ভিতর হইতে বাহির হইয়া গিয়া দেখিয়াছেন, তাঁরা সম্যক দেখিয়াছেন। আগা-পাশ-তলা সবটাই তাঁদের চৈতন্যের মধ্যে সম্যক দৃষ্টিতে ধরা আছে, তাঁদের সে দেখার খবর তোমার আমার কাছে কতটা সত্য—যতক্ষণ আমরা এর মধ্যে এক একটি সংকীর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া, সংস্কারের রাশি বাড়াইয়াই চলিয়াছি?

তারপর তাঁকে পাওয়া, সে কি টাকা কড়ি বিষয় পাওয়ার মত পাওয়া? আত্মার সঙ্গেই না তাঁর সম্বন্ধ! তুমি আত্মা, আগে তোমার এই তত্ত্ব সত্য হইয়া না উঠিলে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায়ই বা পাইতেছ? কল্পনায় ধরিলেই ত আসলে ধরা হইল না? বুঝিয়া দেখ—

চিত্তশুদ্ধি হইলেই ত তাঁকে ধরা যায় ?—

হাঁ, চিত্তশুদ্ধিটি কি ? চিত্তক্ষেত্রে যে সংস্কারের আবর্জ্জনা, ময়লা রহিয়াছে সে সব পরিষ্কার হইলে, পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি চিদানন্দ-স্বরূপ এ বোধ জাগিবে!—নাম রূপাদি সংস্কার, কল্পনার রাজ্য, যাহা কিছু মনোময় পদার্থ তাহার সঙ্গে জড়াইয়া আছে সে সকল পরিষ্কার না হইলে কি করিয়া স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইবে ? কল্পনায় সুখ থাকিতে পারে কিন্তু সত্য,—বস্তুলাভ অন্য কথা।—বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ দেখি!—

৯

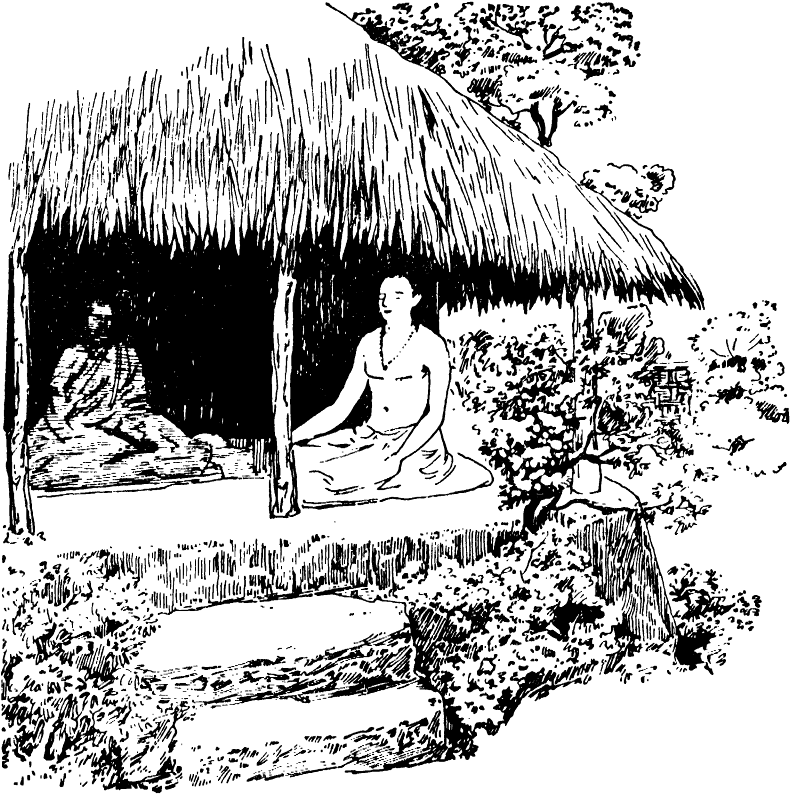
মহানন্দের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইবার পর, এক শুভ আশা, জীবনের সাফল্য,—কাল্পনিক হইলেও,—অনুভব করিয়া আমার অন্তরের মধ্যে একটি শান্তিময় প্রবাহ সকল সময় খেলা করিতে লাগিল। যেন সর্ব্বার্থসিদ্ধির আভাষ। আনন্দের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শক্তির অনুভব। আমার মধ্যে কত-কত মহৎশক্তির সম্ভাবনা বিকাশোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। মহানন্দের গুরুভাব তাহার মধ্যে বর্ত্তমান। এই অপূর্ব্ব সাধুটি চুপচাপ নিজ আসনে, আপনভাবেই সমাহিত, বাহ্যজগতের অস্তিত্ব তাঁহার কাছে আছে কিনা কে জানে! কে বুঝিবে কি ভাবে, কোন্ শক্তির প্রবাহ কোন্ পথে চালনা করিতেছেন।

নাগরিক জীবনে, নিজ গৃহে বসিয়া, আমরা কতপ্রকারের সাধু-সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই। এমন সব উদ্দেশ্য লইয়া, আমাদের নিকট তাঁহারা উপস্থিত হন,—অনর্থক বাক্যচাতুরীর অবতারণা করেন;—এমনই সাংসারিক ভোগ, আসক্তি এবং অর্থলোলুপতার পরিচয় দেন যাহাতে ত্যাগী সাধুসম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব সঞ্চিত হইয়া সরল গৃহস্থ-মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। ফলতঃ সাধু-সঙ্গের মহৎ ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। তাহাতেই বুঝি—গার্হস্থ্য জীবনে যথার্থরূপে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন কতটা গভীর তাহা অনুভব করিবার মনোভাবও আর নাই। স্বার্থপর জীবনদ্বন্দ্বে অবসাদগ্রস্ত এবং আসুরিকভাবে জাজ্বল্যমান এই যে এখনকার দুর্ব্বল সংসারী মানুষের মনোবৃত্তি, নির্ম্মল আনন্দ ও শান্তির আস্বাদনে বিমুখ হইয়া বোধ হয় দিবানিশি পুড়িতেছে,—কাহাকেও দেখাইবার নয়—জানাইবারও নয়। জানা নাই কোথায় সেই শান্তির ধারা যাহার স্পর্শে দগ্ধজীবন সুস্থ হয়, মধুময় হয় এবং শক্তিমান হয়। ভোগমূলক কর্ম্মের প্রবাহে এতটা ডুবিয়া থাকিলে সাধুসঙ্গ লাভ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?—কিন্তু একথাও ভুলিবার নয় যে এদেশে সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে কামকামী, সংসারমনা, অর্থাসক্ত সাধু সংখ্যায় অনেক হইলেও যথার্থ লোককল্যাণরত, ত্যাগী সন্ন্যাসীরও অভাব নাই, যাঁহারা এই নিরন্তর কর্ম্মক্লিষ্ট, দুর্ব্বল সংসারী মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যে সর্ব্বদাই জাগ্রত আছেন। যথার্থ সাধুসঙ্গ ব্যক্তিগত প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও ধর্ম্মরতির যোগাযোগ অপেক্ষা করে।

যাহা হউক মহানন্দের কুটীর-আশ্রমে যাওয়া আসা করিতে-করিতে অনেক কিছুই লক্ষ্য করিলাম। এমনই আশ্রমটির সংস্থান যে সাধুসঙ্গের গভীর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কেহ এদিকে

আকৃষ্ট হইবে না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত সেথায় অনাবশ্যকীয় কিছুই নাই। শয়নের সামান্য খাটিয়া বিছানা পর্য্যন্তও নাই, কেবল সেই যুবা সাধুটির একখান চেটাইয়ের উপর কম্বল বিছানো, অন্য সময়ে তোলাই থাকে, শয়নকালে পাতা হয়। তার উপর সাধারণকে আকৃষ্ট করিবার উপযোগী নানাভাবের বাক্যছটার আড়ম্বর না থাকায় সাধারণ কেহ বড় একটা ঘঁ্যাসে না। এই ভাবে তাঁহার নিজ আশ্রমটি অপূর্ব্ব কৌশলে বাহিরের অত্যাচার হইতে রক্ষা হয়।

যতক্ষণ স্থবিধা পাইতাম তাঁহার কাছে বসিতাম। আবাহনও নাই বিসর্জ্জন নাই।



কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদেরও প্রয়োজন নাই। কতক্ষণ বসিবার পর মনের সন্তোষ হইলে উঠিয়া আসিতাম। এই ভাবে অপার্থিব আনন্দের আভাষ পাইয়া তাঁহার প্রতি যতটা আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম—ততই তাঁহাকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহও বাড়িতে লাগিল। এসম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় এবং গুরুভাব সম্বন্ধে নিগূঢ় জানিবার জন্য একদিন সঙ্কল্প করিয়া যথাস্থানে আসন করিয়া বসিলাম। অন্যান্য দিন যেমন হয় অল্পক্ষণেই মনস্থির হইয়া গেল। তখন আমার প্রথম প্রশ্ন হইল :—

এখানে আসার পর যখন আমার মনস্থির হয়ে যায়, অনেক জটিল বিষয় সরল, আশানুরূপ মীমাংসাও সহজেই হয়, নানাদিক দিয়েই মনে হয় আপনিই আমার গুরু।

উত্তর: বুদ্ধি বা বিবেক জেগে উঠলে, যেখানেই আসন করে বসা যাক না কেন সেইখানেই চিত্তস্থির হবে,—আর মনের সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজেই হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: কিন্তু এখানেই যে আমি বিশেষ কিছু পেয়েছি,—

—তা ত নিজগুণেই পাওয়া গেছে। যে যে বিষয় মীমাংসার জন্য অন্তর ছট্‌ফট্‌ করেছে, স্থির একাগ্রচিত্তে বসবামাত্র অন্তরাত্মার প্রেরণায় সহজেই মীমাংসা হয়ে গেছে। ব্যক্তিবিশেষকে গুরুভাবে লক্ষ্য করলেও আসলে এ সকল ব্যক্তিগত জাগ্রত আত্মারই অভিব্যক্তি। গুরুভাবে মানুষকে ধরে টানাটানি করার রোগটি দুর্ব্বল হিন্দুসমাজে অধিকাংশ মানুষের সংস্কারগত।

সত্যই ত! অবস্থা-বিশেষে সাত্ত্বিকভাবে আকৃষ্ট হইয়া হঠাৎ কোনও সাধুকে গুরু বলিয়া আঁকড়াইবার প্রবৃত্তি আমাদের হিন্দুদের যেন জন্মগত। পরে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহারিক কোন দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া আবার অশ্রদ্ধা আসিতেও দেরী হয় না। অনেকগুলি সংসারী লোককে এরূপ হঠাৎ ভক্তিমান হইয়া গুরুগ্রহণ, আবার কোনও কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া গুরুত্যাগ করিতেও ত দেখিয়াছি। সেই কারণে আমারও গুরু করিবার প্রবৃত্তি ছিল না।

তবে কি আমার অদৃষ্টে যথার্থ নিষ্ঠা বা গুরুলাভ নাই?

জীবভাবের উন্নত অবস্থায়—ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে গুরু-শক্তি এলে তাকে ঠেকাবেই বা কে? আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ হলে কোন তত্ত্ববিকাশের অবস্থায় উপলক্ষ হয়ে যিনি সুমুখে আসেন, অন্তরে গুরুর স্থানে তাঁকেই দেখা যায়। সেই তত্ত্ববোধ উপলক্ষে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে আনন্দ-সম্ভোগ চলে, তারপর আবার অবস্থান্তর হোলে কাকে উপলক্ষ করে কোন্ তত্ত্ব ফুটবে কে জানে?

তবে কি গুরু এক নয়, এক একটি তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য ভিন্ন-ভিন্ন গুরুর দরকার?

মূলে আত্মা, গুরু বা ইষ্ট একই ত,—কিন্তু চঞ্চলমতি জীবের অসমান কর্ম্মবৈচিত্র্যের জন্য, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তিত্বের সহযোগ প্রয়োজন। তাদেরই একাধিক গুরু মিলে যায়। কারো-কারো এক গুরু উপলক্ষ করে সকল কর্ম্মই শেষ হয়, সকল তত্ত্বই সাক্ষাৎকার হয়। চিত্ত যার সত্যনিষ্ঠ, অনুভব সকল যার তীক্ষ্ণ, সর্ব্বব্যবহারে যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগ এবং দুর্ব্বলতাশূন্য, কর্ম্ম যার এক ধারায় চলছে এবং অন্তর্দৃষ্টি গভীর,—তারই একমাত্র ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ করে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। এক্ষেত্রে ভালমন্দ, বড় ছোটর কথা নেই। সকলকার কর্ম্মক্রম ত সমান নয় একমুখীও নয়। শক্তিমান সিদ্ধগুরু পেলে সেই একের দ্বারাই জীবন সার্থক হয়। আর উচ্চ আধার না হোলেই বা শক্তিমান গুরুর সাথে যোগাযোগ ঘটবে কি করে?

একটা কথা পরিষ্কার হইয়া গেল, আনন্দ পাইলাম,—কিন্তু আর একটা কথা মনের মধ্যে গোল পাকাইতে লাগিল,—সেটি গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ও ব্যবহারের তথ্য।

চিত্তের মধ্যে যখন কোনও তত্ত্বের স্ফুট উঠে, সেই তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য, সাক্ষাৎকারের জন্য প্রাণ যখন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, তখন পূর্ব্বে যাঁর সে তত্ত্ব উপলব্ধি হয়েছে তাঁরও অন্তরে সাড়া জাগে। তারপর আমাদের প্রকৃতি আছেন, যাঁর আসল কাজই হোলো সমধর্ম্মী একের সাথে অপরের যোগাযোগ ঘটানো, চুম্বকে লোহাতে যোগাযোগের মত, তিনি ঠিক তাঁদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।

তা হোলে এর মধ্যে আর একজনের হাত আছে!

আছে বৈ কি?—না হোলে পুরুষ প্রকৃতির রাজত্ব চলবে কেমন করে! যিনি চোরের চুরির যোগাযোগ, হন্তব্যের সঙ্গে হত্যাকারীর যোগাযোগ ঘটান, প্রণয়ীর সঙ্গে প্রণয়িণীর যোগাযোগ ঘটান, কর্ম্মীর সঙ্গে অভীষ্ট কর্ম্মের যোগাযোগ ঘটান,—সেই প্রকৃতিই অবলীলাক্রমে এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। এক্ষেত্রে দূর বা নিকটের কোনও প্রশ্নই নেই। এই ঘটাঘটির ব্যাপারে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে অবস্থিত বস্তু বা প্রাণীর নিশ্চিত যোগাযোগ ঘটে যায়। অপূর্ব্ব এই প্রকৃতি—যাঁকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়েছে,—তাঁকে এই ভাবেই স্পষ্ট ধরা যায়। পূর্ব্ব-পূর্ব্বদ্রষ্টা মহাপুরুষেরা এই ভাবেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারে তাঁকে ধরেছেন।—

সকল ব্যাপারেই তা হোলে প্রকৃতি মধ্যবর্ত্তিনী? না হোলে কি করে হবে?—সৃষ্টির ব্যাপারে গোড়ার কথাটি ভুললে চলবে কেন। মূল-সম্বন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের এমনই যে সুধু একের দ্বারা কিছুই হবার উপায় নাই। পুরুষের ইচ্ছা হয়,—আর প্রকৃতি, সেই ইচ্ছানুরূপ যোগাযোগ ঘটান। দুইয়েরই আনন্দ থেকেই প্রবৃত্তি বা স্ফুট উঠে,—আনন্দময় পুরুষের আনন্দ থেকেই ইচ্ছার স্ফুট উঠে—আর আনন্দময়ী প্রকৃতির আনন্দ থেকেই পুরুষের ইচ্ছানুরূপ যোগাযোগ ঘটাবার প্রবৃত্তি হয়—তাইতেই সৃষ্টির মধ্যে উভয়ের অস্তিত্ব ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই ভাবেই সার্থক হয়। এই থেকেই ত ভারতের সকল শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি। রূপকের আবরণে এই তত্ত্বই ত মূলে আছে।

তা হোলে, এর মধ্যে আবার গুরুতত্ত্ব এলো কোথা থেকে? সৃষ্টির গোড়া থেকেই, আপনহারা হয়ে জীব বহির্মুখী—প্রকৃতির রাজ্যে মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয় সম্পর্কে যত কিছু ভোগ সেই ভোগ কামনায়ই তার পুনঃ পুনঃ গতাগতি। তার মধ্যে থেকে প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটছে, আবার নানাবিধ কর্ম্ম ও ভোগের ফলে ক্রমে ক্রমে আত্মজ্ঞানও সঞ্চিত হচ্ছে। আত্মচৈতন্য যে ক্রমে স্বরূপচ্যুত হয়ে জীবভাবে এই ইন্দ্রিয়-বিষয়ের মধ্যে এসে কর্ম্মভোগে পড়েছেন, সেটা অনুলোম গতি,—আর ভোগান্তে যে ক্রমে চৈতন্য স্বরূপে মিলছেন সেটি বিলোমগতি। এই অনুলোম ও বিলোম গতিতে যাওয়া-আসা যেন অনন্তকাল ধরেই চলেচে। এখন গুরুর কথা—

এখানে এইভাবে গতাগতির ফলে, কর্ম্ম ও ভোগের চরম অর্থাৎ পরিসমাপ্তির অবস্থায় যে যে আত্মার এই সৃষ্টি-রহস্য ভেদ হয়েছে,—আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হোলেও যাঁরা পরমাত্মায় লয় হয়ে যাননি, তাঁদের উপলব্ধ তত্ত্ব সকল,—এবং যে ক্রমে তাঁদের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তার ধারা

নিরন্তর সূক্ষ্মভাবে আকাশের মধ্যে দিয়ে জীবসমাজে প্রবহমান রয়েছে। তাঁরাই সৎ গুরু। আত্মার দ্বারাই আত্মার মুক্তির পথ। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মাই গুরু। এখানে আত্মারামেরই খেলা। যা কিছু জ্ঞান কর্ম্ম এবং ভোগ এই সৃষ্টির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন চলছে বা সৃষ্টিকে গুলজার করে রেখেছে তা সবই আত্মায়-আত্মায় সম্পর্ক ধরেই,—কখনও একের সঙ্গে অপরের বিচ্ছিন্নভাবে নয়। তাইতেই সৃষ্টির সার্থকতা। পরমাত্মা এবং সৃষ্টির মধ্যে শক্তিমান, চৈতন্যমুখী জীব-সমূহের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্র হয়ে তাঁরা অবস্থিত। তাঁদের আত্মজ্যোতিঃ থেকে চৈতন্যরশ্মি প্রাকৃতিক নিয়মেই বৈরাগ্যবান, চৈতন্যমুখী, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি পুরুষের অন্তরে দীপ্তি দেয়। সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকালব্যাপী তাঁদের প্রভাব জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে।

পৃথিবীর টান, ধরিত্রীর টান, বড় টান—ধরণী সহজেই এখান থেকে একজন সন্তানকে কি একেবারে মুক্তি দিতে চান? নানা ভাবেই বাধা দেন। কারণ এ ভাবের উচ্চস্তরের জীব নিয়ে তার অনেক কাজ হয়। ত্রিগুণের অতীত হবার পূর্ব্বে গুণময়ী প্রকৃতির রাজ্যে, শেষ, সত্ত্বগুণের গণ্ডী ছাড়াতে গিয়ে মুমুক্ষু যাঁরা তাঁরা সর্ব্বশেষ বাধা পান। লোককল্যাণ, জীব-জগতের কল্যাণ কামনা করে বসেন। এই যে জগৎ সংসারে জীবকোটি অজ্ঞানের মধ্যে নিরন্তর ভোগ কামনা ও ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্ছে, তাদের অজ্ঞান দূর করে পরম পদ আত্মস্বরূপের অপার আনন্দময় অবস্থায়, তাদের উন্নীত করবার জন্য ব্যাকুল হন, সাযুজ্য, মোক্ষ এ সকল তাঁরা তখন চান না। তাঁরা পরমাত্মার সংস্পর্শে থেকে জগতের মধ্যে চৈতন্যের বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করতে চান। সেই গুরু-ধারার সঙ্গে নিরন্তর সংযোগের ফলে তাঁরাও এখানে গুরুপদ-বাচ্য। অপরাপর নবীন অধিকারীরা আত্মচৈতন্য স্ফুরণে তাঁদের সাক্ষাৎ প্রভাব ও সহায়তা পান। পরে তাঁরা আবার আদর্শ হয়ে যান,—এই ভাবে গুরুধারার পারম্পর্য্য রক্ষা হয়ে চলেছে, সৃষ্টির ক্রমবিকাশও চলেছে।

অপূর্ব্ব এই গুরুতত্ত্ব,—আজ যে বস্তু পাইলাম,—জানি না জন্ম-জন্মান্তরের কতটা সুকৃতি থাকিলে এ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। আমার জীবন ধন্য বোধ হইল। এখন যে বস্তু শ্রবণে পাইলাম, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হইলে, সৎগুরু সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিলে তবেই না আমার জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে। আমার মধ্যে কিন্তু ইহার পরেও আবার প্রশ্ন উঠিল—কুলগুরু প্রথার ব্যাপারটি কিরূপ ?

১০

এর পর কুলগুরুর কথা আর বিস্তৃতভাবে বেশী কথায় না গিয়া অল্প কথায় শেষ করিব। এখনকার সমাজে কুলগুরুর অস্তিত্ব, কুল-পুরোহিতগণের মতই শক্তিহীন। আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিবর্ত্তে বংশগত সংস্কারের বশেই চলিতেছে। এখন বর্ণাশ্রমের এবং বৃত্তির ব্যাভিচার ঘটিয়াছে, অধ্যাত্মমার্গে গতি কোথা ?—

তীব্র বৈরাগ্যের কাছে গৃহী কুলগুরু বা সন্ন্যাসী গুরুর ভেদাভেদ নাই। গৌণ বৈরাগ্যের অধিকারে কুলগুরুর সাহায্যে মন্ত্র দীক্ষার অনুষ্ঠান বংশগত সংস্কার ধরিয়া এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে। কুল অর্থে পার, বংশধারা, মহান সৃষ্টি প্রবাহ, জীবের মূল চৈতন্য-শক্তি প্রভৃতি বহু ভাবেই ব্যবহার আছে। কুল হইতে কৌল, যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন। যথার্থ সন্ন্যাসী, মন্ত্রসিদ্ধ, তান্ত্রিক কৌল এখন দুর্লভ,—কিন্তু এক সময় এদেশে কুলধর্ম্মের প্রাবল্য এবং কৌলগণের প্রভাব কম ছিল না। ক্রমে ঐ নামটি সম্প্রদায় গত হইয়া গিয়াছে। তন্ত্রের প্রভাব ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুলগুরুর প্রাধান্যও ক্ষীণ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন কুলপ্রথা অনুসারে কুলগুরু দীক্ষার ব্যাপার হিন্দু-সংসারে প্রবল নাই; যে যে সংসারে আছে—সেখানে প্রথা-হিসাবেই রহিয়াছে। জন্ম লগ্ন ও রাশি প্রভৃতির বিচারে জাতকের ইষ্ট নিরূপণ করিয়া মন্ত্র দিবার ব্যবস্থা। মন্ত্র বলিতে বীজ,—তাহার নানা ভেদ বৈচিত্র্য আছে। এই কুলগুরু দীক্ষার প্রথায়, জপাৎ সিদ্ধিই হইল আসল কথা; সাধন প্রণালীর মুখ্য কর্ম্ম হইল জপ, জপের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরশ্চারণ, অভিষেকাদি ক্রিয়াফল লাভের ব্যবস্থা আছে।

ইহা দ্বারা ভগবান লাভ বা ব্রহ্ম চৈতন্যে সমাহিত হইতে পারা যায় কি? মুক্তিলাভ হয়?

শক্তিলাভ ঘটে এটি সত্য,—ভগবান লাভ অন্য কথা,—ঈশ্বরলাভ কোনও ক্রিয়া-সাপেক্ষ নয়,—এ কথায় এখনও সন্দেহ আছে নাকি? যদি থাকে ত সে বড়ই মারাত্মক।

আমি বুঝিতে চাহিতেছি, এই যে, জপাৎ সিদ্ধি,—এই সিদ্ধি কি?—এ সিদ্ধি কি ভগবান বস্তু লাভ নয়?

তন্ত্রমতের যত কিছু ক্রিয়া,—সমাজে এতাবৎকাল প্রচলিত আছে,—সমস্তই শক্তি লক্ষ্য করিয়া। ফলে যথার্থ বৈরাগ্য এবং ভক্তির অবর্ত্তমানে কুলপ্রথায়, দীক্ষা-গ্রহণের উপকারিতা এবং জপাদি ক্রিয়াভ্যাসের ফল শক্তিলাভ,—উত্তর উত্তর ক্রিয়ার প্রবল অভ্যাসের ফল প্রবল শক্তিলাভ। শক্তি বলিতে মনঃশক্তি, তাহাতে উচ্চ উচ্চ জাগতিক ভোগ বাসনা পূর্ণ হইবার অনুকূল অবস্থা পাওয়া। সংযমের আঁট না থাকিলে বিপাকে পড়িতে হয়। তান্ত্রিক দীক্ষার প্রথম ক্রিয়াই হইল কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ।

উহা কিরূপ?

সাধারণ জীবের অধ্যাত্ম চৈতন্য শক্তি সুপ্ত। তাহার প্রমাণ জীবের এই বহির্মুখী গতি, ধনৈশ্বর্য্যের, সম্পদের আকাঙ্ক্ষা। নিরন্তর অভাব বোধ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, এবং অবিরাম পরিবর্ত্তনই যার গতি সেই পাশবদ্ধ অবস্থা। এসকল যে দুঃখের হেতু এ বোধই নাই। কুণ্ডলিনী জাগরণে অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয়। যে সকল পার্থিব বিষয়কে সুখের হেতু বলিয়া ধারণা ছিল,—অধ্যাত্ম জীবনে সেই সকল বিষয় দুঃখেরই হেতু এই অনুভূতি হয়। পূর্ব্বজীবন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অর্থ সম্পদাদি তুচ্ছ বোধ হয়। এই অবস্থাই হইল কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথম লক্ষণ। এই চক্ষে, স্থূল এই নয়নের দৃষ্টিতে যা এতদিন দেখা

হইয়াছে তা সবই ভুল, তখনই এটি বুঝিতে পারা যায় যখন উপনয়ন হয়। উপনয়নের তত্ত্বই এই অধ্যাত্ম চৈতন্যের উদ্বোধনে। কারণ নেত্রের উন্মিলন।

সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইবার তন্ত্র-মতে কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে। এই শক্তি জাগাইলেই যে, সব হইয়া গেল তাহা নয়। কোন ক্রিয়া শক্তির ফলে ঐশক্তি জাগিলেও, যদি উর্দ্ধগামী না হয়, অর্থাৎ যথার্থ ভগবানের লক্ষ্যে সকল আকাঙ্ক্ষা নিয়োজিত না হয়, তবে উহা আবার সুপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে, কারণ উহার প্রথম হইতেই বহুকাল সুপ্তভাবে থাকাই স্বভাবগত। তোমার বিষয়ে বা ভোগবাসনায় টানও থাকিবে,—আবার ভগবান-লাভের জন্য সাধনাও চলিবে, তাহা কি করিয়া হইবে। আর সে সাধনার ফলই বা কিরূপ হইবে ?—

তাহা হইলে ইহাতে কি গৃহস্থ জীবনে কোনও উপকার হয় না ?—

উপকার কিছু আছে বৈকি, না হইলে এখনও উহার ধারা এ সমাজে রহিয়াছে কেন ? গৃহস্থের তীব্র বৈরাগ্যের অভাবে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং বংশগত অভ্যুদয় কামনায় সস্ত্রীক মন্ত্র-গ্রহণ এবং জপাদি ক্রিয়ার ফলে মনঃসংযম এবং শক্তিলাভ ত হয়! বংশগত সংস্কার এই ভাবে বংশধরের পার্থিব কল্যাণের হেতু হয়! পিতৃপিতামহ যখন এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তখন আমাদেরও ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য,—এই সংস্কার বশেই মন্ত্র-গ্রহণ সম্পন্ন হয়। ইহাতে অকল্যাণ ত নাই-ই পরন্তু ইহ এবং পরকালের দুই কালেরই একটি সহায় ও সম্বল হইয়া রহিল, —যেহেতু কুল-গুরুগণের আদেশ বাণী এইরূপ যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্রগ্রহণ না করিয়া দেহত্যাগ হইলে পরলোকে গতি হয় না। মন্ত্র পাওয়া চাই-ই। মন্ত্রগ্রহণ না করিলে পশুজন্ম ঘোচে না। তন্ত্র-মতে সংস্কারহীন দেহগত বুদ্ধি জীবই পশু।

মন্ত্র কাণে পৌঁছাইলেই কি পশুত্ব ঘুচিয়া যায় ?

মন্ত্র বা বীজ, শব্দ মাত্র—সাধনের দ্বারা ঐ মন্ত্র বা বীজ, চৈতন্য শক্তিতে শক্তিমান হয়। শুদ্ধ চিত্তে, ঐকান্তিক যত্নে, যথার্থ ভক্তিভাবে, অতি গোপনে নিজ নিজ সাধনের দ্বারা মন্ত্র জাগ্রত করিতে হয়। তখনই তাহার দ্বারা পশুজন্মের শেষ হয় বা অনেক কিছুই হয়। শক্তিমান গুরুর নিকট জাগ্রত শক্তিমন্ত্র পাইলে,—এবং ভক্তিমান শিষ্যের মধ্যে সেই বীজ পড়িলে কালে তাহাতে কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। বীজ মাত্রেই শক্তিশালী বা জাগ্রত নয়। তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রবল চেষ্টা না থাকিলে যেমন বস্তু লাভ ঘটে না, সেইরূপ তীব্র আকর্ষণ অনুভূত না হইলে জাগ্রত মন্ত্র-শক্তিসম্পন্ন গুরুর যোগাযোগও ঘটে না—।

আমার এখন কুলগুরুর কথায় আর দরকার নাই। পার্থিব সুখ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, আধিপত্যলাভ, নানাবিধ শক্তি লাভ যেগুলি ভগবানের বিভূতি—আমার, তাহাতে প্রয়োজন নাই—এখন অনুগ্রহ করিয়া এটুকু সংশয়চ্ছেদ করুন,—যিনি বাক্য মনের অগোচর, মহান, যিনি শুদ্ধ বুদ্ধ এবং মুক্ত স্বভাব, অনন্ত চৈতন্যজ্যোতিঃ যিনি সর্ব্বব্যাপী, বিরাট, নিয়ন্তা স্রষ্টা, পাতা, ধাতা আমাদের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন প্রকারে গোচর নন, পূর্ণ সৎ চিদানন্দ ঘন যিনি তাঁহাকে আমাদের কোন প্রকারে ধরিবার সাধ্য নাই, অথচ তাঁর সঙ্গে সম্পর্কেই জগতের সকল বস্তুর

সম্বন্ধ ও আস্বাদন চলিতেছে,—তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ কি কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই? আমি ইচ্ছা করিলে বা চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে পাইতে পারি না,—তবে কি এই ভাবেই জন্ম, মৃত্যু, আর নানাবিধ তুচ্ছ মোহের অন্ধকারে আমি ক্ষুদ্রই থাকিব,—তাঁর সঙ্গে আমার ব্যবধান কি ঘুচিবে না?—

তোমার তাঁকে ধরিবার, জানিবার বা অনুভব করিবার সাধ্য নাই,—ক্ষুদ্র তোমার শক্তি তুমি তাঁহাতে পৌছাইতে পার না—ইহা সত্য—কিন্তু তিনি তোমার মধ্যে প্রকাশ হইতে পারেন, জন্ম-জন্মান্তরের ভেদ ব্যবধান ঘুচাইয়া আত্মসাৎ করিত পারেন।

মেঘে ঢাকা সূর্য্যও যেমন জগতের আলো যোগান, মেঘলোক ভেদ করিয়া তাহার আলো আমরা পাই,—একেবারে রাত্রির গাঢ় আঁধার হয় না তেমনি পরমাত্মার চৈতন্য জ্যোতির নিরবচ্ছিন্ন অভাব হয় না যদিও সাধারণের কাছে অজ্ঞান-আঁধারে কয়েকটা স্তর ঢাকা থাকে।

মহারাজের পত্র আসিয়াছে। আমার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। কালিকানন্দজীকে দিয়া লিখাইয়াছেন। আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে যে হাজারী পাণ্ডার হাতে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া যেন চলিয়া যাই। আর, কখনও তাঁর কোনও আশ্রমে, বিশেষত বৃন্দাবনের (রাধাবাগের) আশ্রমে আমি যেন আর প্রবেশ না করি। আশ্রমের নিকট আমার বিদায়। ভাষা আরও একটু কঠিন ছিল, আমি একটু সংযত ভাবেই বলিলাম। শিবানন্দ আনন্দিত হইল কি দুঃখিত হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, মুখখানি তার গম্ভীর হইয়া গেল।

আমি মুক্তি পাইয়া আর বিলম্ব করিলাম না। নাগ মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি নাই, চাষের জমিতে লোকজন লইয়া ব্যস্ত আছেন। তারপর মহানন্দের কুটীরাশ্রমে গিয়া একবার শেষ বিদায় লইয়া আসিলাম। তারপর লাঠি কম্বলাদি লইয়া পাড়ি দিলাম।

মনে মনে একটা বিষম বেদনা লইয়াই চলিলাম। সে বেদনাটুকু—ভুবনেশ্বরের মধ্যে এই যে দুই মাস কাল কাটাইলাম, এই ভূমির গন্ধ, জল এবং মুক্তবায়ু,—প্রাচীন শিবালয়-পূর্ণ স্থানের মাহাত্ম্যে মহীয়ান অনির্ব্বচনীয়, বিশাল এবং গম্ভীর জঙ্গল-বেষ্টিত নানা ধ্বংসরাশির করুণ দৃশ্যে পূর্ণ, সুন্দর ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র এবং তাহার কুণ্ডগুলি আমার প্রাণের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে;—ছাড়িবার সময় উহা অনুভব করিলাম। এইখানেই যদি জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দিতে পারিতাম! কিন্তু নিয়তি অন্যত্র টানিতেছে। যদি ঐ ব্রহ্মচারীর আশ্রম-সম্পর্কে এখানে না আসিতাম তাহা হইলে এতটা অশান্তি পাইতে হইত না। বোধ করি এত শীঘ্র যাইতেও হইত না।

আবার আক্ষেপও আছে;—কেন? কি প্রয়োজন এত ঘোরাঘুরি করিবার? এক স্থানে বসিয়া গেলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যায়। এমন স্থানে নিভৃতে বিশাল, নীরব এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় মনের সকল চাঞ্চল্য যেন স্বতঃই শান্ত হইয়া আসে। এইখানেই যদি থাকিতে পারিতাম তাহা হইলে আর কি প্রার্থনা ছিল!

তাহা কিন্তু হইবার নয়। সাত ঘাটের জল খাইতেই হইবে, গুরু অনেকই পাওয়া যায়,-

কিন্তু মর্ম্ম বুঝিবে কে?—এই ধরিত্রীর অন্তর্গত সকল বস্তুইত সেই অনন্ত চৈতন্য সত্তার দিকে লক্ষ্য করিতে ইঙ্গিত করিতেছে—প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুটি,—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুটি সেই সত্তার দিকেই লক্ষ্য করাইতে প্রেরণা দিতেছে কিন্তু সেদিকে ত আমি দেখিব না। দেখিলে ত আমার কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যাইবে, আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব। ছুটাছুটির ব্যাপার ফুরাইবে! হায়, হায়, কর্ম্ম না ছুটিলে, আমার প্রারব্ধ সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম্ম,—কর্ম্মফল ভোগ ছুটিবে কি করিয়া! দেখা ও শুনার ভোগ কত কত আরও আছে কে জানে।

এই সকল মহৎ সাধু-সঙ্গ—ইহার জন্যও প্রাণটা কাঁদিতেছে। যদি মহারাজের পত্র আরও অনেকদিন পরে আসিত ত বেশ হইত। কিন্তু সে পত্র এমনই পত্র—যে উহা প্রাপ্তিমাত্র আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। এমনই বিষয়ের স্বার্থ-বিষে জর্জ্জরিত এই পত্রখানি এবং তাহার এমনই উপদেষ্টা যাঁহার মুখ হইতে এই পত্রের নির্দ্দেশ আসিয়াছে। আবার যদি কখনও এই পুণ্য ক্ষেত্রে আসিবার যোগাযোগ হয় ত তখন আর ক্ষুদ্র স্বার্থ-জর্জ্জরিত কোনও অধিকারীর আশ্রমে নয়, কোনও মুক্ত স্থান, বিনাচুক্তিতে যেখানে থাকা যায়—এমন কোন মুক্ত স্থানে আসিব, কোনও বাধা না মানিয়া এই বিমুক্ত ক্ষেত্রে ডুবিয়া থাকিব।

ভুবনেশ্বরের নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেসনের দিকে যাত্রা করিলাম। অর্দ্ধেক পথে আসিয়াছি পিছন হইতে কে যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল। আমাকে একেবারে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল। দেখিলাম—সনাতন, পাণ্ডাদের একটি ছেলে। সে আমাকে ভালবাসিত,—আমার বড়ই অনুরক্ত ছিল। মাঝে মাঝে মন্দিরে গেলে সে আসিয়া আমার কাছে বসিত, কত কথাই কহিত। কিছু চাহিত না,—মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে যাইবার কথা বলিত। কলিকাতা যাইবার তার বড় ইচ্ছা। কে একজন তার আত্মীয় কলিকাতায় গিয়াছে। সেইখানেই আছে তাই তার মনের মধ্যে সেখানে যাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ঘরে তার মন টিকিত না। আমি যে ভুবনেশ্বর ছাড়িয়া চলিতেছি একথা সে জানিল কি প্রকারে? চুপি-সাড়ে এতটা পথ পিছনে পিছনে আসিয়াছে—আমি জানিতেও পারি নাই।

পরনে তার একখানি কৌপীন মাত্র, বাড়িতে যা পরিয়া থাকে তাই পরিয়াই আসিয়াছে। এখন কি করিয়া তাহাকে ফিরাই। আমার গতি ভঙ্গ হইল। তাহাকে নানা কথায় বুঝাইতে লাগিলাম যে—এখন তাহার আমার সঙ্গে যাওয়া হইতেই পারে না, আমার থাকিবার স্থান নাই—তাহাকে লইয়া গিয়া কোথায় রাখিব। আর একটু বড় হইলে কাজকর্ম্ম শিখিয়া কলিকাতায় গেলে ভাল হইবে। আমি যতই কিছু বলিনা কেন,—তাহার আর কোন কথা নাই কেবল, মু কড়িকতা জিব। তাহাকে দুই আনা পয়সা দিলাম,—আবার যখন আসিব তাহাকে লইয়া যাইব বলিলাম। তাহাতেও সে রাজী নয়। সুতরাং আমায় ফিরিতে হইল। সে ফিরিতে রাজী নয়। আমি দেখিলাম,—ভাল বিপদ,—কি করা যায়। কি করিয়া ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাইব।

আমি ফিরিলাম, দ্রুত ফিরিয়া অনেকটা দূর চলিয়া আসিয়াছি, দেখিলাম সনাতন ফিরিয়া

আমার দিকে আসিতেছে। আমি চলিতে লাগিলাম। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি—সনাতনের পিতা ও আর একজন চাদর গায়ে, লাঠি হাতে চলিয়াছে। ভাবিলাম বোধ হয়



তাহাকেই খুঁজিতে যাইতেছে। নিকটবর্ত্তী হইলে জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে তারা সনাতনের সম্বন্ধে কোনও সংবাদই রাখে না। সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিতে তাহার পিতা বলিলেন: মু ত সাক্ষী গপাড় যাউচি, এখঁড় যাই পারিব নি, ও শড়া কুথা, কি করুচি? যাউ, মরু—কঁড়করিমি।

মন্দ নয় ত। আমি আর কিছু না বলিয়া নিকটে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম। ততক্ষণ তাহারা চলিয়া গেল। পথে নিশ্চয়ই তাহাকে পাইবে এবং কিরূপে সম্ভাষণ করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, যদি মারধর করে। বেচারা সনাতনের কি নিগ্রহ।

অল্পক্ষণেই দেখিলাম সনাতন দৌড়াইতেছে—প্রাণপণে তাহাদের গ্রামের দিকেই ছুটিতেছে। বোধ হয় তাড়না পাইয়াছে। আর তাহাকে না ডাকিয়া আমি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া উঠিলাম।

সনাতনের পলাতক মন, গৃহে, যেখানে নিরন্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্ম এবং তাড়না ভোগ করিতে হয় সেখানে থাকিতে পারিবে না। আমার নিজের বাল্য-জীবনের যে দুঃসহ দুঃখময় অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে—তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় আমার জীবনের সঙ্গে যেন সনাতনের কোথায় একটি ঐক্য সূত্রের যোগাযোগ আছে, যাহা আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। বাড়ীতে আমারও মন বসিত না, বাড়ীর কাহারও আমার প্রতি স্নেহমমতা ছিল না, এক ঠাকুরমা ছাড়া আমার কাহারও উপর টান ছিল না। পিতা মাতা কাহারও স্নেহের ধারায় আমার বাল্যজীবন সিক্ত হয় নাই—অথচ আমার ছিল নাকি, সবিই ত ছিল। ছিল কেন এখনও ত আছে।

এখন কোথায় তাঁরা—আমিই বা কোথায়—কেহ আমার কথা ভাবে কিনা কে জানে। তবে এটুকু জানিতাম একজন আছে সে আমি ছাড়া আর কাহাকেও জানে না—সে বিষণ্ণ জীবন লইয়া পিত্রালয়ে প্রতি মুহূর্ত্ত আমাকেই স্মরণ করিয়া কাটাইতেছে।

পথে দ্রুত চলিতে লাগিলাম—। আরও কতকটা আসিয়া এক বৃক্ষতলে ছয় সাতজন বসিয়াছে দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। কথা কহিতেছে একজন,—গাছের গোড়ায় একটু উচ্চস্থানে বসিয়া খর্ব্বাকৃতি যুবা,—ছাইমাখা,—মাথায় চুলের পাক-বাঁধা। আর পাঁচজন নীচে তাঁহাকে ঘিরিয়া কথাও শুনিতেছে, আবার কি একটা বস্তু যেন নিরীক্ষণ করিতেছে। নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ঠাণ্ডা ছিল সেদিন, আকাশ মেঘে ভরা। কিন্তু বৃষ্টি যা হইবার কাল রাত্রে হইয়া গিয়াছে, ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতেছে। যে কয়েকটি মূর্ত্তি বসিয়াছিল তাহারা উড়িষ্যার লোক, তবে এ অঞ্চলের অর্থাৎ ভুবনেশ্বরের অধিবাসী নয়। বৈষ্ণব এবং শৈব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের লোক বলিয়াই বোধ হইল। গায়ে সকলকারই চাদর জড়ান—। মধ্যে একটু উচ্চ আসনে বসিয়া যিনি কথা কহিতেছিলেন—ঠিক তাঁহার সম্মুখে একজন স্থূলকায় ব্যক্তি, মাথার কেন্দ্রে কতকটা টাক পড়িয়াছে। তিনি হাতে গাঁজার জট হইতে বীচি বাছিতেছিলেন আর তাঁহার পাশে এক জন ভাং পিষিতেছিলেন আর একজন জল লোটা প্রভৃতি লইয়া ব্যস্তভাবে সহায়তা করিতে অগ্রসর। দেখিলাম, গাঁজাগুলি বাছিয়া ভাংএর সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইল এবং পেষণ চলিতে লাগিল। গাঁজা ও ভাং একত্র বাটিয়া খাইতে এই উড়িষ্যা মুলুকেই দেখিলাম। এতদিন এক

একটি নেশা কেহ কেহ উপভোগ করিয়া থাকেন দেখিতাম, এখন দুইটি তীব্র মাদক একটি বাটিয়া ছানিয়া পান করিবার এবং অপরটি যাহা অগ্নি-সংযোগে ধূমপানের জন্যই প্রসিদ্ধ



জানিতাম—এখন এই দুইটির একত্র সংযোগে পানের ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কি প্রচণ্ড নেশাই ইহারা বরদাস্ত করিতে পারে।

আমি কিছুক্ষণ ঐস্থানে ছিলাম। আমার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। ভাং পানের পর ইহারা কি করেন দেখিবার জন্যই বসিলাম। আমায় বসিতে দেখিয়া তাঁহারা বোধ হয় ভাবিলেন আমিও তাহাদের একজন। এ ভ্রম তাহাদের বেশীক্ষণ ছিল না। তাঁহাদের পানাদি শেষ হইলে যখন আমি কিছু ভগবৎকথা শুনিতে চাহিলাম, তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাহি করিতে লাগিলেন। পরে একজন বলিলেন, আমরা কি জানি, মূর্খ লোক, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনারা কোনও দেবতার উপাসনা করেন ত?

মধ্যস্থিত স্থূলকায় ব্যক্তিটি বলিলেন: মহাবিষ্ণু—আর তার উপর কোনও দেবতা আছেন নাকি?—

এইবার উচ্চাসনে জটা-বাঁধা যুবাটি গলার রুদ্রাক্ষ মালা দোলাইয়া হুঙ্কার করিয়া বলিল: ও কি কথা, শিব শিব, মহাদেব শঙ্কর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তার পর আর শ্রেষ্ঠ ভগবান কেউ আছে নাকি?—

আর একজন দুই একটি পান মুখে পুরিয়া, একটু গুঁড়ি হাতে ঢালিয়া বলিল: হাঁ, সকলকার দেবতা সকলের কাছে শ্রেষ্ঠ, যার যেমন ভক্তি। সকলেই বড়—কেহ ছোট নয়।

এমন যখন ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে তখন দেখি—একটি ওভারকোট জড়াইয়া একজন

কলিকাতার অজীর্ণ রোগী, শীর্ণকায় হাত দুটি দুই পকেটে রাখিয়া ধীরে ধীরে বড় রাস্তা হইতে এই দিকেই আসিতেছেন। বাঙ্গালী দেখিয়া মনে কেমন একটু আনন্দ হইল, কথা কহিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু আমি উপস্থিত কথা কহিলাম না। তিনি আমায় বাঙ্গালী সন্দেহ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। আমি তখন একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখানে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছেন বোধ হয়? তিনি, হাঁ, বলিয়া একটু জোর করিয়া হাসিলেন।

আমি বলিলাম: এই এঁদের কথা শুনছি,—

তিনি: ও গাঁজাখোর ঘোর মূর্খ পৌত্তলিক ব্যাটাদের কথা কি শুনবেন—ওদের কথা কি শুনবার মত, হ্যাঁ—

বুঝিলাম ইনি ব্রাহ্ম হইবেন। বলিলাম: এদের কথা শুনলে ত কিছু ক্ষতি নাই,—দেখা যাক্ না কি বলে এরা।

—এরা আকাট মুখ্যু, ফিলসফি পড়েনি, রিলিজানের কি বোঝে? ওয়ার্থলেশ্,—বলিয়া তিনি একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন।

তখন সেই প্রথম বক্তা—দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমার শিবের রূপ ব্যাখ্যান কর ত। তাঁর রূপ কি? কিরূপে ধ্যান কর বল ত?

উৎসাহে পূর্ণ হইয়া শৈবভক্ত আরম্ভ করিলেন,—কেন শিবের চারি হাত, পঞ্চ মুখ, দিগম্বর, ত্রিনয়ন, শুভ্রবর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি—

একটু মুচকি হাসিয়া সেই বৈষ্ণব সাধু তখন বলিলেন: এই ত সাকার রূপ, তিনি কখনও শ্রেষ্ঠ দেবতা হইতে পারেন, পাঁচ মুণ্ড, চার হাত, ত্রিনয়ন এ সকল যতই বড় হোক না কেন পূর্ণ শক্তিমান অনন্ত হইতে পারেন না। একটি রূপ কল্পনা করিলেই ত অনন্তত্বে বাধা পড়ে।

তখন শৈব জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমার বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপও ত সাকার। বল দেখি এই ভাবে ধ্যান কর কিনা?

আমাদের মহাবিষ্ণু, নিরাকার, বিশ্বব্যাপী, অনন্ত বিরাট সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ইত্যাদি—তাঁর কোন খণ্ডরূপ আমরা ধ্যান করি না।

দলের মধ্যে ফোঁটা তিলকমালা-বিহীন এক মূর্ত্তি তখন জিজ্ঞাসা করিল: অনন্ত—নিরাকার—বিরাট,—এ সকল যা বললে এ সকল ধ্যান কর কি করে?

তার মুখটি শুকাইয়া গেল—একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল: কেন ধ্যান হবে না, নিরাকার—যেমন আকাশ ঐ রকমই ধ্যান হয়।

তখন মধ্যস্থ যিনি, অনন্তের ধ্যান কর কি করে? এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিরাকার মহাবিষ্ণুর ভক্ত তখন বলিলেন: অনন্তের ধ্যান কি করা যায়?

তাহার আর সে ভাব নাই, এখন বেশ সাহস হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ পাইলাম।

কলিকাতার বাবুটি তখন একটু উতলা হইলেন,—গমনোদ্যত হইয়া আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : চলুন, আমরা ওদিকে গিয়ে একটু কথা কই, এ বেটাদের আবার ধর্ম্ম-মীমাংসা!

আমি হাসিয়া বলিলাম : আর একটু।

মধ্যস্থ ব্যক্তি তখন উৎসাহে, বলিতে লাগিলেন : ঠিক কথা। অনন্তের ধ্যান কি হয়? আমাদের মন বুদ্ধি সংকীর্ণ, বিশ্বব্যাপী অনন্ত সত্বাকে ধরতে পারবে কেন! বলত বাবু?—

বাবুর মুখে আর কথা নাই, আমার দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে একবার, চলুন চলুন বলিলেন।

আমি বলিলাম : আহা, ইহারা আপনার কাছে যে কথা উপস্থিত করেছে তার কি করলেন?

তিনি যা বলিলেন সে কথায় আর কান না দিয়া সেই মহাবিষ্ণু ভক্তের কথায় লক্ষ্য করিলাম। তিনি বলিলেন : আমরা মানুষ, ক্ষুদ্র মনে ছোট ছোট জিনিস নিয়েই ব্যবহার করি—লেখা পড়া যতই করি, পণ্ডিত হই, একশোটাও যদি পাশ দি তা হোলে সেই ছোটই থাকব, বিশ্বব্যাপী পরবিষ্ণু ভগবানের ধারণা করবার মত উপযুক্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় কখনও পাব না—সেইজন্য আমরা জ্যোতিঃ ধ্যান করি। মানুষের মূর্ত্তি ভগবৎ ধ্যানের উপযুক্ত নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনি কোন সম্প্রদায়ের?

আমরা মাধবাচার্য্যের। আমরা গুরুর কাছে ইষ্টকে মানুষ-মূর্ত্তিতে ধ্যানের উপদেশ পাইনি।

বাবুটির মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—একে রুগ্ন তাহার উপর একেবারেই রক্তশূন্য।

১১

এখনকার য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রবল প্রভাবে এদেশের প্রবীণ শিক্ষিত মানুষগুলির মধ্যে বিদ্যার অভিমান এবং অশিক্ষিতজনের প্রতি অবজ্ঞা এতটা প্রবল দেখা যায়, যাহা লক্ষ্য করিলে লজ্জিত না হইয়া থাকা যায় না। অথচ পাশ্চাত্য-সমাজে এমন হয় না। সেখানে যথার্থ বিদ্যাবান ব্যক্তি সমাজের সকল স্তরের মানুষের কোন না কোন প্রকারে উপকারে আসেন। অল্পশিক্ষিত জনের প্রতি উচ্চ শিক্ষিত লোকের ঘৃণা বা উপেক্ষা নাই।

একেই অর্থকরী বিদ্যা ও আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির জটিলতায় দুঃখ পাই, যথার্থ বলিতে কি, প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই আমরা সংসার, সমাজ ও ধর্ম্ম-জীবনে আন্তরিকতা হারাইয়াছি : আলস্য, অপাত সুখকর মিথ্যা বস্তুর কুহকে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন, আর সর্ব্বনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে আমরা কতটা শক্তিহীন তাহা বোধ হয় নিত্যই অনুভব করিতেছি, কিন্তু কেহ ভাবিয়াছেন কি এই দুর্নিবার ব্যাধি—সত্যই কি এই মজ্জাগত দুর্ব্বলতা রোগের

বিরাম কখনও হইবে না ?—সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার এই যে আমাদের এখনও এ বিষয়ে সচেতন হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কি আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য বঙ্গবাসীর স্বভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—যাহার প্রতিবিধানের সকল পথই আজ বিধাতার অভিশাপে বুঝি কঠিন ভাবেই অবরুদ্ধ।

এখন যাহা বলিতে ছিলাম—আমাদের এই প্রবীণ নূতন ভদ্রলোকটি, যিনি, স্বাস্থ্যলাভের জন্যই এখানে আসিয়াছেন বলিয়া জানিলাম, অধীত ফিলস্‌ফি কলিকাতার বাবুটি ;—ইঁহাদের সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার মহাবিষ্ণুর উপাসনা-সম্বন্ধে, জ্যোতিঃ ধ্যানের কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন। পরে যখন তাঁহাদের একজন, বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: বাবু, আপনারা বিদ্বান পণ্ডিত লোক, অপনারা ভগবানের কি ভাবে উপাসনা করেন, দয়া করে যদি বলেন ত কিছু শিখতে পারি। আমাদের গুরু মহারাজ বলেছেন, সকলকার কাছেই কিছু না কিছু শিক্ষা করবার আছে।

বাবু তাঁর অসুস্থ বিরস মুখখানি বিকৃত করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন: আমাদের কথা তোমরা কি বুঝবে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করছ যে, ফিলসফি পড়েছ ? তোমাদের পড়াশুনা কিছু নেই, মুখ্যু, গোটাকতক বাঁধা কথা শিখে তোতা পাখীর মত আওড়াতেই পার। তোমাদের শিক্ষা হবে কি করে, তোমাদের গুরুও ত গাঁজাখোর মুখ্যু ছোট লোক। তোমাদের মুটে মজুরী, ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকরী করবারই কথা, তা না করে গাঁজা খেয়ে সাধু সেজে লোককে প্রবঞ্চনা করছ। তোমরা বদমাস্, চোর, শঠ, ইম্পস্‌টার,—তোমাদের সঙ্গে কথা কইলে সময় নষ্ট। এই বলিয়া চলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন।

হঠাৎ যে এতটা তাঁর মেজাজ খারাপ হইবে ভাবি নাই—অজীর্ণ রোগীরা প্রায়ই ক্রোধী, খিটখিটে স্বভাব হয় জানিতাম,—মনোমত কিছু না হইলেই একেবারে জ্বলিয়া উঠেন,—ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু তাঁদের অসহ্য। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, এখানে তার ঔষধও আছে।

যেমন তিনি ঘৃণা-বিকৃত মুখে অগ্রসর হইবেন, একজন, যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—উঠিয়া এক লাফে তাঁহার সম্মুখে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বজ্র মুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বললেন বাবু! আমরা চোর, বদমাস, ছোট লোক, শঠ, ইম্পস্‌টার ?—যিনি এই কথাগুলি বলিলেন তিনি মূর্খ ত কখনই নন্, বরঞ্চ তিনি যে একজন পণ্ডিত তা তাঁহার স্পষ্ট উচ্চারণের ভাবেই বুঝা গেল।

কোথায় গেল বাবুটির সেই তেজ, দর্প, দুর্ব্বিনীত দাম্ভিক বচন, জিঘাংসার ঘনীভূত মূর্ত্তি, বাবুর মুখে রা নাই, চক্ষু নিস্তেজ, ভয়ে মুখখানি একবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে, মড়ার মত বিবর্ণ মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন:

দেখুন দিকি, অনর্থক এ সব কি ব্যাপার—অসভ্যতা, বর্ব্বরতা। ছেড়ে দাও আমার হাত। বলিয়া একবার হাত ছাড়াইবার বিফল প্রয়াস করিলেন।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সেই সাধুটি, আমার দিকে চাহিয়া, তাঁহার হাত না ছাড়িয়া বলিলেনঃ আপনার কাছেই আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনিই বলুন, এ বাবুটি আমাদের গুরুকে এবং সম্প্রদায়কে, আক্রমণ শুধু নয়, অযথা কুৎসিত গালি দিয়েছেন কিনা। ধর্ম্মের দরবারে যদি যথার্থ বিচার হয়ত বলুন কে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কে ছোট লোক, কে বদমাস্। বাঙ্গালী বাবুদের এ বড় অহংকার—।



লজ্জায় আমি মরিয়া গেলাম।

সাধু ব্যক্তি আমার লজ্জা অনুভব করিলেন, —তখন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেনঃ আপনারা কি মনে করেন? আপনাদের এই বিদ্যার চাপরাশ ভূতের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার পক্ষে কোনও সহায়তা করে—না বেশী করে দাসত্ব করবার, ক্রীতদাস হবার পথ প্রশস্ত করে দেয়? আপনি ফিলসফি পড়েছেন, সেই অহংকারেই সাধু-সম্প্রদায়ের উপরে এই নীচ মনোভাব পোষণ করছেন? এই কি ফিলসফি অধ্যয়নের পরিচয়? আপনার দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান কতটুকু? আপনারা ত পল্লবগ্রাহী। আপনার মত লোকের দর্শনশাস্ত্রে অধ্যয়নের অধিকার আছে বোলে আমরা স্বীকার করি না। যে মানুষ ইহ সর্ব্বস্ব, অর্থোপাসক জাতির পদলেহন করে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত এক পাও চলতে পারে না, তাদের ফিলসফি পড়ে কি ফল হয়—? একটু আভাষ মাত্র পেয়েছেন তাইতেই এই,—ধ্যান-ধারণা নেই, বিবেক বৈরাগ্য নেই, চিত্তশুদ্ধির

কোন উপকরণ সংগ্রহ না করে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গেলে এই রকমই ত হয়ে থাকে। শকুনির মত উঁচুতে উঠলেই কি হয়? মন সে বিষয় বিভব আর ভোগ বিলাসের জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে। সংযম কোথায়? নারীজাতিকে মাতৃজ্ঞান করতে শিখেছেন? ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য হয়ে টাকার পিছনে ইন্দ্রিয় ভোগের পিছনে ছুট্‌বেন উন্মাদের মত; আবার দার্শনিক পণ্ডিতও হবেন,—এ কি সম্ভব?—বলুন, আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি, কারা বদমাস্‌, কারা শঠ, কারা ইম্পস্‌টার। বলিয়া তাঁর হাতটি মৃদু নাড়িয়া দিলেন।

বাবুর মুখে এক অপূর্ব্ব ভাব—না রাগ, না দ্বেষ, না দম্ভ কেবল কতকটা ভয়-মিশ্রিত বিস্ময়ের চিহ্ন তাঁহার মুখে দেখা গেল—কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কি আপদ,—কি কুক্ষণেই তিনি এদিকে আজ বেড়াইতে আসিয়া ছিলেন। নিরুত্তর দেখিয়া প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় বলিলেন: আপনি রোগী, দুর্ব্বল বিক্ষিপ্ত চিত্ত, সেই জন্যই অসংযত বাক্‌,—দয়ার পাত্র। যে বিদ্যার অহংকারে আপনার সাধু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উপর এরূপ ঘৃণিত মনোভাব উৎপন্ন করেছে—সে বিদ্যার অধিকারে আপনার নিজের কি কল্যাণ হয়েছে বোলতে পারেন? ইহকালেরই বা কি ফল পেয়েছেন আর পরকালের জন্যই বা কি পাথেয় সঞ্চয় করেছেন? এইটুকু ত প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি যে অবৈধ ইন্দ্রিয় সম্ভোগের ফলে এরই মধ্যে শরীরটি জীর্ণ, রোগপূর্ণ করে রেখেছেন, স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য অর্থব্যয় করে এদেশ ওদেশ করে বেড়াচ্ছেন—যদি কিঞ্চিৎমাত্র স্বাস্থ্য ফিরে পান ত আবার সেই ভোগে লেগে যাবেন। এ বিদ্যার ত এই পরিণাম,—ধিক্‌ আপনার বিদ্যা, যে বিদ্যালাভ করে মানুষ হয়ে মানুষকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয় না, পশুর মত হিংস্র স্বভাব নিয়ে সমাজে থাকতে হয়! আপনার মত বিদ্বান ও পশুতে প্রভেদ কি? নিরুত্তর কেন,—বলুন বলুন, আপনার কথাগুলো সব কোথায় গেল?—

একটু জোর প্রকাশ করিয়া আবার তিনি হাত ছাড়াইয়া প্রস্থানের চেষ্টা করিলেন এবং শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন: ছেড়ে দাও আমার হাত, তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে চাই না, যেতে দাও বলছি আমাকে, আমি তোমাদের নামে পুলিশে নালিশ করবো, কেস্‌ আনবো, জেল খাটাবো, তখন দেখবে মজা, ভদ্রলোকের হাত ধরা কত সুখ।

যুবা সাধুটি, তাঁহার এ কথায় যে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন এরূপ বোধ হইল না, হাতও ছাড়িলেন না। স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন: আমরা যখন চোর, বদমাস্‌, ইম্পস্‌টার তখন সেই রকম ব্যবহার আমাদের কাছ থেকে আশা করাই উচিত—তাই-ই পাবেন। আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে যা খুসি বলুন, আমরা গ্রাহ্য করি না, কিন্তু আপনি আমাদের গুরুকে লক্ষ্য করে অযথা গালি দিয়েছেন, কুকথা বলেছেন, সেজন্য আমরা আপনাকে ক্ষমা করতে পারবো না। আপনারা গুরুহীন, ভ্রষ্টাচারী, অধঃপতিত—ম্লেচ্ছ-সংসর্গে কলুষিত, গুরু মহাপুরুষের মর্ম্ম কি বুঝবেন? আপনারা সঙ্ঘ শক্তিহীন,—সঙ্ঘের মহান ধর্ম্ম,—তার পবিত্রতা কি বুঝবেন? এই যে পাপ বাক্য আমাদের গুরু এবং সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে উচ্চারণ করেছেন—এর জন্য দণ্ড

আপনাকে নিতে হবে। যে মুখ থেকে আমরা গুরু-নিন্দা শুনেছি সেই মুখ থেকে পাপ রসনাকে চিমটে দিয়ে বার করে অগ্নিতে দগ্ধ করে ঐ পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।—আপনি প্রস্তুত হোন।

বাবুর মুখে এখন বিষাদের ছায়া স্পষ্ট, তবুও নরম হইলেন না। শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন: এটা মগের মুলুক নয়, ইংরেজ রাজত্ব, দরকার হয় ত তোমরা আদালতে অভিযোগ করতে পার, রাজাই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, একজনকে ধরে বেয়াইনি আটক করবার বা দণ্ড দেবার কোনও অধিকার তোমাদের নেই। ছেড়ে দাও আমাকে!—

তাঁহার হাত না ছাড়িয়াই যুবা সাধু বলিলেন: আপনি আমার কাছে অপরাধী। এমন দুর্ব্বল কাপুরুষ আমি নই যে নিজের সাধ্য থাকতে অপরাধীকে দণ্ড না দিয়ে ছেড়ে দেব, তার পর এক বিচার-ব্যবসায়ীর দারস্থ হব। সেখানে যার পয়সা বেশী সেই জয়লাভ করবে। সে সব আপনাদেরই শোভা পায়, আপনারা সভ্য বিদ্বান—আমরা আপনাদের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং শিক্ষায় বিশ্বাসী নই। আপনি প্রস্তুত হোন। পরে তিনি সাথীদের দিকে ফিরিয়া আগুন জ্বালাইতে ইঙ্গিত করিলেন।—

এতক্ষণ আমি এক দৃষ্টিতে এই দুজনের দিকে চাহিয়াছিলাম আর কথা শুনিতেছিলাম। এখন দলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—ইঙ্গিত মাত্রেই দলস্থ একজন ধুনির আগুনে বাতাস দিতে লাগিল, অপর একজন একখানা লম্বা কাঠ তাহাতে ফেলিয়া দিল। যুবা তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া। বাবুর মুখখানি আতঙ্কে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, আর তাঁহার প্রতিবাদের কোনও শক্তি নাই। কেবল দুই একবার আমার দিকে কাতর নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আমার এক একবার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল। সত্যই কি ইহারা বাবুটির জিভ টানিয়া পুড়াইবে নাকি? যদি তাহাই হয় তবে আমার কিছু কর্ত্তব্য আছে, এতটা কখনই হইতে দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যুবা সাধুটির মুখে সাত্ত্বিক ভাবের লাবণ্য এবং অন্তরের পবিত্রতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দ্বারা এমন একটা কাজ কখনও কোনও অবস্থায় হইতে পারে কিছুতেই বোধ হইল না—অন্তরে বুঝিলাম এটি তাঁর অভিনয়—কিন্তু এমনই তাঁর দৃঢ় সংযম এবং গম্ভীর ভাবটি, কিছুই বুঝিবার যো নাই।

এইবার বাবুটির চক্ষে জল আসিয়াছে—দেখিতেছেন এখানে তাঁর কোনও জারিজুরী খাটিল না, এখন নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছে যে ইহারা তাঁহার ব্যবহারে এতটা মর্ম্মাহত হইয়াছে যে প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবে না,—আর আমার দ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন প্রথম হইতেই সম্ভব হয় নাই, যেহেতু তাঁহার কোন মন্তব্যই আমি অনুমোদন করি নাই বরং তাহাতে বিরক্তির ভাবই আমার মুখে পরিস্ফুট দেখিয়াছেন। তথাপি সজল নয়নে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: এরা সত্য-সত্যই আমার জীবন্ত মুখে আগুন লাগাবে নাকি? এদের জেলের ভয় নেই?—

আমি মৃদু স্বরে বলিলাম: আপনিই এঁদের অপমান করেছেন,—মর্ম্মে আঘাত করেছেন;

সেটা ওদের বিষম লেগেছে। আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। জেলের ভয় যে এদের নেই সে ত আপনি বুঝতে পেরেছেন, এক্ষেত্রে ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না।

তখন তিনি সাধুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন: আমি না হয় এপোলজি চাইছি।

যুবা সাধুটি গম্ভীর ভাবে বলিলেন: আপনি যে অনুতপ্ত হয়েছেন তা বোধ হয় না, ওরকম মৌখিক এপোলজি আমাদের প্রাণে সাড়া দেয় না।

তিনি এবার সাধুর দৃঢ়তা দেখিয়া দমিয়া গেলেন। তখন জোড়হাত করিয়া বলিলেন: যথার্থই যদি আপনারা আমার কথায় মনে আঘাত পেয়ে থাকেন, সেজন্য আমি দুঃখিত এবং অনুতপ্ত—আমার অন্যায় হয়েছে, আমি এখন বুঝতে পেরেছি।

এবারে যুবা পুরুষ তাহার হাতটি পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন: যদি সত্য সত্যই আপনি বুঝতে পেরে থাকেন যে কি অন্যায় করেছেন—তাহোলে প্রতিজ্ঞা করুন ভবিষ্যতে আর কখনও ভাল করে না জেনে-শুনে সাধু সন্তদের, সঙ্ঘ এবং গুরুকে লক্ষ্য করে কোনও প্রকার অযথা কথা বলবেন না, কু-কথা মুখে আনবেন না।

তিনি জোড়হাতে বিনীতভাবে বলিলেন: তাই স্বীকার করছি।

তখন যুবা সাধুটি কোমল অথচ দৃঢ়ভাবে বলিলেন: আপনি জানবেন যে এই হিন্দুস্থানের সাধু-সম্প্রদায় কোন প্রকারে আপনাদের গৃহস্থ-সমাজের ক্ষতি ত কখনই করেন না, বরঞ্চ অশেষ কল্যাণই করে থাকেন। যদি বুদ্ধি বোলে কোনও জিনিস থাকে ত' বুঝে দেখবেন—সকল দিকেই এই ভারতের সাধু-সম্প্রদায় গৃহস্থের অশেষ কল্যাণের দিকে বহু বহু পূর্ব্বকাল থেকেই রত আছেন,—তার বিনিময়ে তাঁরা যা পান তা নগণ্যই মনে করবেন। ব্যক্তিগত অন্যায় যে কোনও সাধুর হয় না তা আমি বলছি না—সম্প্রদায়ের কথাই বলছি। এই সাধু-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি—আপনি আমি করিনি—এর সৃষ্টির মূলেও পরমাত্মার একটা অভিপ্রায় আছে। কি যে সেই অভিপ্রায়—তা বুঝতে চেষ্টা করুন। এই বিশাল জ্ঞান ও শক্তির রাজ্যে যে যে-তত্ত্বই অনুসন্ধান করে, সে অবশ্যই সেটা পেয়ে থাকে, পেয়ে আস্‌ছে, আর ভবিষ্যতেও পাবে। আন্তরিক ইচ্ছা করে লাগলেই হোলো। আপনি রোগী বোলেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—আপনি কি দৈব-শক্তিতে আরোগ্য বিশ্বাস করেন?

তিনি আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন: ওসব বুজরুকি আমি মানি না।

যুবা বলিলেন: না মানেন বা না বিশ্বাস করেন তাতে ক্ষতি নেই—একবার পরীক্ষা করে দেখুন না—এই একটি ঔষধ আপনাকে দি, আপনি কাল স্নান করে এটি ভগবানকে স্মরণ করে একটি মাদুলিতে ধারণ করবেন, ডান হাতে ধারণ করবেন, খেতে হবে না—এক দুদিনের মধ্যেই গুণ বুঝতে পারবেন। ছোট তামার মাদুলী একটা হাতে রাখতে কোনও অসুবিধা হবে না। অন্ততঃ তিনটি দিন রেখে, পরে যে জামা পরবেন তার বুকের পকেটে রেখে দেবেন, তা হোলেও হবে।

তিনি তাঁর আসনের ধারে একটি ঝুলি হইতে কি একটি বাহির করিয়া বাবুর হাতে

দিলেন। বাবুটি উহা হাতে লইয়া একবার দেখিয়া পকেটে রাখিয়া বলিলেনঃ আচ্ছা, পোরে দেখবো। পরে একটু হাসিয়া—আচ্ছা তা হোলে আসি—থ্যাংস্ মেনি থ্যাংস্—বলিয়া উন্নত মস্তকে নাকের ডগায় হাত ঠেকাইয়া গুটি গুটি চলিলেন।

দুই চার পা চলিয়া কি ভাবিয়া তিনি আবার ফিরিলেন। পুনরায় সেইখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনারা এই ট্যালিস্‌ম্যানের জন্য কত চার্জ্জ করবেন, যদি ফল পাওয়া যায়?

যুবা সাধুটি হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেনঃ এটা আমাদের কারবার নয়। গৃহস্থদের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত পাত্র বুঝলে আমরা এটা দিয়ে থাকি, এর জন্য চার্জ্জ করলে কোন ফল পাওয়া যাবে না। তবে আপনার পীড়া আরোগ্য হলে দুঃখী গরীবকে কিছু দান করবেন যদি ইচ্ছা হয়।

বেশ,—বলিয়া বাবুটি চলিলেন, এবং দুই চার পা চলিয়া আবার তাঁহাকে ফিরিতে দেখা গেল—এবারে নূতন কথা—আপনারা গাঁজা ভাং খান কেন?—না খেলে কি হয়, খেলেই বা কি হয়?

—আপনাদের মত ত আমাদের বাড়ী ঘর নেই, জলবৃষ্টিতে শরীরকে রক্ষা করবার স্থান সব সময় পাওয়া যায় না। শীত গ্রীষ্মে হয়ত বনে জঙ্গলে, মাঠে, পথে, নানা দেশে, নানা প্রকার জল বায়ুতে, মশার কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। খাবারও সব সময় পাওয়া যায় না, দুই চার দিন বিনা আহারেও কখনও কখনও কাটাতে হয়; হয়ত জুটলোই না।—আমাদের মধ্যে আবার কারো কারো অজগর বৃত্তি, কারো বা মাধুকরী বৃত্তি ইত্যাদি আছে, সেই জন্যেই গাঁজা বা ভাঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত হতে হয়, যাতে আমরা আমাদের তপস্যার উপযোগী করে শরীরকে গড়ে নিতে পারি। তপস্যার পক্ষে এই নেশাগুলি অশেষ ফলপ্রদ, আমাদের এইরূপ সংস্কার জানবেন—কিন্তু ভোগের পক্ষে নয়। ভোগের পক্ষে এইগুলি বিষময় ফল প্রসব করে, নানা রোগ উৎপন্ন করে।

বাবুটি সেই আর্দ্র তৃণগুল্ম-বিস্তৃত কঙ্করময় স্থানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেনঃ সত্য নাকি? তাইতো আমরা ত মনে করি ওগুলো নেশার জন্য খাওয়া হয়, তা—তাহোলে ত—বাস্তবিক আমরা ভুল বুঝে আপনাদের উপর নানা অবিচার করি। বাস্তবিক, তাইতো, তাইতো,—হয়ত তাহোলে এগুলোর একটা মেডিসিনাল্ কোয়ালিটি আছে।—আপনার কথা আমার এখন বিশ্বাস হচ্ছে বটে, তা হোলে ত আপনাদের খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়। আপনারা কদিন এখানে আছেন?

—কাল প্রাতে আর আমাদের এখানে দেখতে পাবেন না। বর্ষার চারমাস ছাড়া আমরা কোথাও ত্রিরাত্র যাপন করি না। ইহাই নিয়ম।

—তাইত, তাইত—আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আপনাদের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্ত্তা কই—তা তা আপনারা এত শীঘ্র—চললেন!

—আমাদের এই রকমই—বলিয়া যুবা একটু হাসিলেন।

বাবু আর একটু বসিয়া মাথা নামাইয়া নমস্কার করিয়া বিষণ্ণ মুখে উঠিলেন,—ধীরে ধীরে চলিলেন, আর ফিরিলেন না।

সম্মুখে এই যে ব্যাপারটি ঘটিয়া গেল তাহার আদ্যান্ত সবটাই আমার ভিতরে তোলপাড় করিতে লাগিল। আমিও গুটি গুটি তাঁহাদের নমস্কার করিয়া ষ্টেশনের পথে পাড়ি জমাইলাম। ঔষধে বাবুর কোনও ফল হইল কিনা, অথবা ঔষধটি মূলেই ধারণ করিলেন কিনা—সে খবর আর জানিতে পারিলাম না।

পরদিন কলিকাতায় পৌছিয়া কুলদাবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আনন্দে আমায় গ্রহণ করিলেন। কথা হইল পরদিন আমরা নবদ্বীপে যাইব। সেখানে একদিন থাকিয়া পরে সিউড়িতে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হওয়া যাইবে। পরে সেখান হইতে বীরভূমের পীঠস্থানগুলিতে যাওয়া যাইবে।

আমরা নবদ্বীপে আসিয়া যেখানে উঠিলাম সেটি একটি নারী এবং শিশু-আশ্রম। সেই প্রতিষ্ঠানের নাম মাতৃমন্দির। কুলদা বাবুরাই এই আশ্রমটি সাধারণের নিকট ভিক্ষালব্ধ অর্থে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এর একটু বিশেষত্ব আছে, এ ধরণের প্রতিষ্ঠান আমাদের বাঙ্গালায় আর কোথাও আছে কিনা আমি জানি না।

১৯১৪-১৫ সালে আমরা কুলদা বাবুর ভাগবত-বক্তৃতা, কলিকাতার নানা স্থানে, —অনেক-বারই শুনিয়াছি। সেই সময়ে ভাগবৎ-প্রসঙ্গে বক্তৃতার পর—শেষে পৃথক ভাবেই এই প্রতিষ্ঠানটির কথা সর্ব্ব সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রোতৃবর্গের নিকট বলিতে কয়েকবার শুনিয়া ছিলাম। নবদ্বীপে মেলা মহোৎসব উপলক্ষে সেথায় বহু নরনারীর সমাগম হয়। সে সময়ে অনেক পথভ্রষ্ট নরনারীও আসে। তাহাদের মধ্যে বহু গর্ভবতী নারী লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের সমাজ হইতে পলাইয়া এখানে গোপনে ভ্রূণ-হত্যাদি পাতকে লিপ্ত হয়। অবৈধ প্রণয়ের কণ্টক মনে করিয়া এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সন্তান প্রসব করিয়া কেহ পথে ফেলিয়া, কেহ গঙ্গায় ফেলিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে অনেকগুলি জীব, এই জগতের আলোক দেখিবার পূর্ব্বেই পরলোকে পুনঃ প্রস্থান করে। প্রতি বৎসর যে পরিমাণে এইরূপ শিশু হত্যা হয় তাহার সংখ্যা অল্প নহে। কুলদা বাবু প্রমুখ কয়েকজন মহাপ্রাণ এবং ভক্তিমান কর্ম্মযোগী এই অসহায় শিশুগুলি রক্ষায় কৃতসংকল্প হইয়া এই মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এদিকে সাধারণের দৃষ্টি এবং সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থ ও উপকরণের সাহায্যে শিশুগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের যে এই কর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহার মূলে ছিল ভগবৎপ্রেরণা। ইতিমধ্যে অনেকগুলি শিশুকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া তাঁহারা যথাশক্তি প্রতিপালনের ভার লইয়াছেন। এখানে বিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে যথারীতি প্রসবের ব্যবস্থা আছে। যতদিন মাতৃক্রোড়ের আশ্রয় প্রয়োজন মনে করেন, ততদিন শিশুদের সঙ্গে জননীদেরও প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে, পরে পৃথক করা হয়। যে সকল জননী অতঃপর সৎভাবে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে

এখানে থাকিতে চান, এখানে তাঁহাদের জন্য পৃথক বিভাগে কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। ক্রমে ক্রমে এখানে অনেককেই এই আশ্রমের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন দেখা যাইতেছে। আশ্রমে আট দশটি জননীর সন্তান লইয়া থাকিবার মত ব্যবস্থা এখন হইয়াছে, ক্রমে বিস্তৃতির আশাও আছে।

আমরা সন্ধ্যার পর নবদ্বীপ পৌঁছিয়া আশ্রম-সংশ্লিষ্ট কার্য্যালয়ে উঠিলাম। মাতৃমন্দির হইতে ইহা পৃথক। পুরুষ কর্ম্মীরা এবং বাহিরের কেহ আসিলে এখানে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। অত্যন্ত সহজ ও সরল জীবনযাপন-প্রণালী, ভোগ-ব্যসনাদির জটিলতা নাই। যতটুকুতে প্রাণধারণ করা যায় ততটুকুই আছে। কুলদাবাবু কর্ম্মোপলক্ষে আসিলে এইখানেই থাকেন। এখানে এখন উপস্থিত হইয়াই কুলদাবাবু সহকর্ম্মিগণের নিকট সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলেন। তাঁহারা প্রয়োজনীয় সকল খবর একে একে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কতটা কাজ হইয়াছে, মাতৃমন্দিরের নানাবিষয়ের নানাপ্রকার ব্যবস্থা, এই সব। শুনিলাম, প্রসূতিরা কেহ কেহ প্রসবের পর দশ বারো দিন থাকিয়াই একটু সবল হইলেই আর থাকিতে চায় না, পলাইতে চায়। কেহ কেহ সুযোগ সুবিধা বুঝিয়াই ইতিমধ্যে পলাইয়া গিয়াছে। সেই জন্য মেয়েদের প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়, এই সকল দূষিত, অপরিণত বুদ্ধি নারী, জননী নামের অযোগ্য হইলেও বিধাতার বিধানে আজ তাহারা জননী। নিজ গর্ভজাত সন্তানের প্রতি ইহাদের কোন মমতা বা স্নেহ নাই। যতদিন না সুস্থ হয়, দুর্ব্বলতা যতদিন থাকে ততদিন বাধ্য হইয়া তাহারা আশ্রমে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে বল পাইলে তখন যাইবার ইচ্ছা জানায়। যতদিন থাকে অধিকাংশ মায়ের সন্তান-পালনে উপেক্ষা ব্যতীত আর কোনও আগ্রহ তাহাদের দেখা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষ যতদিন পারেন ততদিন তাহাদের সন্তানের উপযুক্ত পুষ্টির জন্য, মাতৃস্তনের জন্যই আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। যখন মায়েরা নিতান্তই নিজ সন্তানের প্রতি বিরূপ হয়, তখন অগত্যাই কৃত্রিম উপায়ে গো-দুগ্ধাদির সাহায্যে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হয়। তবে অর্থাভাবে এবং যথার্থ উপযোগী উপকরণের অভাবে, সময় সময় দক্ষ সেবার্থীর অভাবেও, সুশৃঙ্খলায় স্বাস্থ্যধর্ম্ম অনুমোদিত উপায়ে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ সম্ভব হয় না। সেইজন্য এবিষয়ে দেশবাসীর অধিক পরিমাণে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। পনেরো ষোল বৎসর পূর্ব্বের কথা লিখিতেছি, জানিনা এখন সে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কি রকম।

যাহা হউক অত্যন্ত মশার উপদ্রবে রাত্র কাটাইয়া পরদিন প্রাতে, গঙ্গাস্নানে গেলাম। সেখানে গঙ্গার অবস্থা শোচনীয়। বাঁধান ঘাট হইতে নদীগর্ভ প্রায় এক মাইল পথ। প্রাচীন ঘাটটি অনেকটাই জীর্ণ। ঘাটের পাটে, একপার্শ্বে অতি ক্ষুদ্র জীর্ণ একখানি কুটীর। তাহার আচ্ছাদন কতকটা চট্‌, কতকটা টিনের জীর্ণাংশ, পাতা দিয়া নিম্নাংশ ছাওয়া তাহাও আর চলেনা, এমন ভাব। দেখি তাহার মধ্যে একটি ক্ষীণ শরীর, তপঃক্লিষ্ট, যুবা মূর্ত্তি। শীর্ণকায় তপস্বী সম্পূর্ণ উলঙ্গ, সম্মুখে একটু খোলা প্রায় দুই হাত চতুষ্কোণ, একটি ঝাঁপের দরজার মত, প্রয়োজন মত বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত করিবার ব্যবস্থাও আছে। দেখিলাম, এখন হাতে গাঁজার ছিলাম্

নামানো, ধ্যান-স্তিমিত নেত্র,—বাহিরের কিছুতেই লক্ষ্য নাই, বসিয়া আছেন। আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, আরও অনেকে আসিল গেল, বাহির হইতে প্রণামও করিল, কোন



দিকেই লক্ষ্য নাই, হাতের ছিলাম্‌টি হাতেই আছে—অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে একবার হাত উঠাইয়া মুখের কাছে ধরিয়া সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া একটু টান দিলেন, ধোঁয়া বাহির হইল না। আবার হাত নামাইয়া স্থির হইলেন। প্রায় একঘণ্টা পর আমি স্নানের জন্য চলিয়া গেলাম

বেশ আরামেই স্নান করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তিনি ঠিক সেই রকমই বসিয়া আছেন।

হাতে আমার ভিজা কাপড়, মাথায় ভিজা গামছা জড়ানো। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, কোনও কথা নাই। একজন আসিয়া প্রণাম করিয়া হাতের একটি পাত্রে দুধ আনিয়া ছিলেন, সম্মুখে পাথরের উপর রাখিয়া দিলেন। পরে, পাত্রটা থাক এখন, পরে নিয়ে যাব,—বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পিছনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি এঁকে চেনেন নাকি?

তিনি: চিনলাম আর কোথা?—তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক, গলায় কণ্ঠির মালা।

আমি: কতদিন এখানে আছেন?—

তিনি: দুই বৎসর ত দেখছি, এই গঙ্গার ধারে,—পূর্ব্বে বরিশালে ছিলেন, জমিদারের একমাত্র সন্তান, বিবাহ হয়েছিল। বৈরাগ্য দেখেই বাপ বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে বিপরীত হোলো।

আমি: খাওয়া দাওয়া চলে কি রকম—?

তিনি: উনি ত আসন ছেড়ে কোথাও যান না—আমি একপো করে দুধ এনে দি—আর কেউ কখনও কিছু দিলে, ফলমূল, মিষ্ট। তাত বড় খেতে একটা দেখি না—কাউকে দিয়ে দেন। কথা কন, খুব কমই।

আমি: কিছু উপদেশ কাকেও দেন না?—

তিনি: না—কখনও ত দেখিনি, শুনিও নি। বেশী জেদাজেদি করলে বলেন—সৎপথে থেকে সংসার-ধর্ম্ম কর, ভোগ বিলাস যাতে এসে পড়ে এমন বেশী অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা কোরোনা—সন্তানদের কখনও মিথ্যা শিখিও না,—এই সব।

আশ্রমে আসিয়া দেখি কুলদাবাবু দুইজন বৈরাগীর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। একজন ভেকধারী গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, হৃষ্টপুষ্ট শরীর। আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনিও একজন—আলাপ করুন।

এমন সময়ে খোল-করতাল বাজাইয়া নাম করিতে করিতে ক্ষুদ্র একটি নগর কীর্ত্তনীয়ার দল আসিয়া প্রবেশ করিল। গান থামিলে কুলদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রকম, আজ কত হোলো?

একধামা চাল ও একটাকা নয় আনা পয়সা মহাজনদের ঘরে পাওয়া গেছে।

এ আশ্রমের অর্থসংগ্রহের যতগুলি উপায় আছে এই নগর-কীর্ত্তনই তাহার অন্যতম। ইহারা কীর্ত্তন করিয়া নগরের গৃহস্থবাড়ি হইতে ভিক্ষা,—চাল, ডাল, কাপড়, পয়সা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে জমা দেয়। পাল, পার্ব্বণে বেশ কিছু পাওয়া যায় অন্য সময়ে তত হয় না। পূর্ব্ব বঙ্গের বৈষ্ণব মহাজন অনেকেই নবদ্বীপ ধামে বাড়ি করিয়াছেন—তাঁহারাই বেশী দান করেন। এখানকার পুরাতন অধিবাসিগণের নিকট বেশী পাওয়া যায় না। তাঁহাদের এরূপ সৎকর্ম্মের উপর আস্থা নাই।

যিনি নূতন ভেক লইয়াছেন, কুলদাবাবুর অনুরোধে তিনি গান করিলেন। মধুর কীর্ত্তন, কণ্ঠ মধুর তাহার উপর অন্তরের বৈরাগ্য ও প্রবল ভগবৎ-অনুরাগ—বায়ুমণ্ডল মধুময় করিয়া তুলিল। প্রথম দুই লাইন আমার কানে এখনও বাজিতেছে,—

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হার,—

সমস্ত দ্বিপ্রহর কীর্ত্তনানন্দে কাটিল, তারপর বৈকালে একবার ঘাটের দিকে চলিলাম,—সেই সাধুটির কাছে।

গিয়া দেখি, দ্বার বন্ধ ছিল, এখন খুলিলেন—আমি নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলাম।

অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া আপন মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে, অতি ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সসঙ্কোচে বলিলাম: আপনার কাছে এসেছিলাম—দয়া করে যদি কিছু বলেন,—

হাসিতে হাসিতে বলিলেন: বাবা, আপনার পথ ত হোয়েছে, ঐ ললাটে দেখছি বেশ পরিষ্কার রাস্তা পড়েছে বাবা, গুরু সঙ্গ ত হয়েছে, ভিতরে আনন্দের ত অভাব নেই।

আমি: মন স্থির হয় নি,—ক্ষণেকের জন্য হয় ত কখনও হোলো, কখনও হোল না।

তিনি: এই যে বসে আছি বাবা এর মধ্যে যে কী চাঞ্চল্য তা কি বলবো, চলে ফিরে বেড়ালে ত আর কথা নেই—ঝড়ের মত উলট-পালট করবে। ক্ষণস্থির—।

—আপনি দয়া করুন, তাহাই চাই আমার, তাহলেই আমার হবে।

—দয়া ঐ খোলের ভেতর থেকেই আসবে—যেমন যেমন চাই ঠিক তেমন করেই তিনি যোগাড় করে নেবেন—কেন চঞ্চল হবে তার জন্য। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর আবার বলিলেন: অহংকার নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি তাই এত দণ্ড—এই রকমই চলেছে কতদিন। আমি তপস্যার জোরে পাব এর চেয়ে ভুল বুদ্ধি আর নেই—সেই ভুল করেছি বাবা। এত অহংকারের জোর, এখনও, এসব বুঝতে পেরেছি তবুও কিছুতেই নিস্তেজ হয় না। আমিও ছাড়বার পাত্র নয়।

১২

নবদ্বীপে তিনটি সাধুর দর্শন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রথম এই সাধুটি সংযতবাক্, সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন না অথচ মনে হয় সব কথাই শুনিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আরও কিছু কথা হইয়াছিল—যে সূত্রে হইয়াছিল সেইটি আগে বলিব।

দ্বিতীয়,—নামটি তাঁহার জানিবার সুযোগ হয় নাই, এক ব্যক্তি, তখন শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটেই থাকিতেন—গঙ্গার ধারেই পরিচয় হইল। সাধু ত বটেই—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বলিয়াই বোধ হইল। গলায় মালা আছে। এম-এ, বি-এল, উকিল প্রৌঢ়বয়স্ক, স্ত্রী-বিয়োগের পর

বৈরাগী হইয়া নানাদেশ, বিশেষত· বৈষ্ণব তীর্থগুলি ঘুরিয়া এখন এইখানেই কয়েক বৎসর যাবৎ আছেন। শুনিলাম, নানা শাস্ত্র, পুরাণ, যোগশাস্ত্র, উপনিষদাদি রীতিমত তাঁহার অধ্যয়ন করা আছে। শরীরটি কৃশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুটি যেন জ্বলিতেছে, হাসিয়াই কথা কন।

যেদিন প্রথমে সেই ঘাটের উপরে কুটীর মধ্যে সাধুটির কাছে গিয়াছিলাম—পরদিন ভোরেই উঠিয়া গঙ্গার ধারে গেলাম। দরজা বন্ধ দেখিয়া নামিয়া সৈকতের উপর বেড়াইতে লাগিলাম। হাত দুটি পশ্চাৎদিকে বদ্ধ, একখানি পাতলা রেশমের সাদা চাদর গায়ে জড়ানো, কদমফুলের মত কাঁচাপাকা ঘন চুল, খালি পায়ে একটি মূর্ত্তি আমার সম্মুখেই বেড়াইতে চলিয়াছেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া আমাকে দেখিয়াই তিনি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। মনে হইল আলাপের ইচ্ছায় তিনি হয়ত এরূপ গতি শিথিল করিয়া থাকিবেন,—আমি যখন তাঁহার কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম তিনি হাসিয়া আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। আমাকেও তাই করিতে হইল।

তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনাকে পূর্ব্বপরিচিত বোধ হচ্ছে যে!

আমি বলিলাম: হোতে পারে, কিন্তু আমি আপনাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখেছি বোলে ত মনে হয় না!

তিনি ছাড়িলেন না, আমি অগ্রসর হইতে তিনি পা চালাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: পূর্ব্বে কখনও এখানে এসেছিলেন কি? আমি স্বীকার করিলাম। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার এখানে আসিয়া প্রায় মাস দুই ছিলাম।

মহাপ্রভু পাড়ায় যেতেন কি?—

কীর্ত্তন কিম্বা ভগবৎকথা শুনতে কখনো কখনো গিয়েছি বৈকি!

তবেই ঠিক হয়েছে—সেইখানেই দেখেছি আপনাকে, আমার মনে আছে।

তারপর নানাকথা। সেই নানাকথার মধ্যে তিনি আমার এবং আমি তাঁহার সম্বন্ধে উভয়েরই অবিশেষ কতকটা পরিচয় হইল।

দেখিলাম, যতদিন না মানুষের সেই পরাবস্তুর সাক্ষাৎকার হয় ততদিন সঙ্গ-কামনা, দুর্দ্দমনীয় লোক-সঙ্গের স্পৃহা ছাড়া যায় না বা নিষ্প্রয়োজনীয় বাক্য-আলাপেরও বিরাম হয় না। আমার সঙ্গে তাঁহার কথা আরম্ভ পরিচয় প্রভৃতি লোকসঙ্গ-লালসা হইতেই—বাক্যেরও সংযম নাই। এমন কথা সকল অবতারণা করিতে লাগিলেন যাহা নিতান্তই এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার এত কথার মধ্যে ঐটুকুই পাইলাম। শেষ, যখন আমি ফিরিবার চেষ্টায়, গতি সংযত করিলাম—তখন তিনি বলিলেন: নাঃ আর এগিয়ে যাওয়া যায় না, বিশ্রী দুর্গন্ধ, না? একেবারে গঙ্গাতীরটি নরক করে তুলেছে, একটু বিচারও নাই, ব্যবস্থাও নাই।

ফিরিতে ফিরিতে আমি বলিলাম: এতো সনাতন ব্যবস্থা, গ্রামের বাইরে ফাঁকাতেই ত ঐ কর্ম্ম চিরকালই চলে আসচে।

আগে এতটা ছিল না—এই কয় বৎসর ভয়ানক লোক আমদানি হোতে আরম্ভ হয়েছে, যত পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গাল বেটারা নবদ্বীপে এসে একেবারে পয়মাল করে তুল্লে।—বুঝেছেন ?

আমি উত্তর না করিয়া সম্মুখের দিকে একটু দ্রুত পা চালাইলাম।

তিনিও গতি দ্রুত করিলেন এবং পুনরায় বলিলেন: আর আসল নবদ্বীপ ত এটা নয়, তাই এসব চলছে।

আসল নবদ্বীপ আবার কোথা, আপনি বলেন ?

সেও বহুকাল গঙ্গার ভাঙ্গনে ওপারে গিয়ে পড়েছে।

তবে এই যে মহাপ্রভুর বাড়ি, শ্রীবাসাঙ্গন এই সব তখনকার বোলে, নানাস্থান দেখায় ?

ওত ব্যবসা। জানেন না বিশ্বম্ভরের বাপ জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি, শ্রীবাস বাড়ি, গঙ্গাধরের টোল এসব কি ঐ রকম কোটাবাড়ি ছিল ? সবই মাটির ঘর। চালা ঘর, খড়ের ছাউনি ছিল। ধনবান না হোলে কি কেউ তখন কোটা করতে পারত ?

আমি ভাবিতে লাগিলাম, দেখিয়া তিনি বলিলেন: আপনার কি আমার কথায় সন্দেহ হচ্চে নাকি ? আমি বলিলাম: একটু সন্দেহ এই হচ্চে যে হয়ত বাড়িগুলি চার পাঁচশো বছরের নয়, কিন্তু সেইস্থানেই হয়ত এখনকার বাড়িগুলি পরে কোনও সময় হয়ে থাকবে।

আসলে স্বধু বাড়ি নয় সমস্ত নবদ্বীপ নগরটাই বহুকাল পূর্ব্বে গঙ্গা গ্রাস করে বোসে আছেন। এখন এই চারশো বছরের মধ্যে গঙ্গার গতি কতটাই পরিবর্ত্তন হয়েছে—কেউ কেউ বলে, এখান থেকে আড়াই ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তর কোণে আগেকার নবদ্বীপ ছিল। আগেকার নবদ্বীপ এর চেয়ে ঢের বড় নগর ছিল, এত ছোট ছিলনা। এক সময় সমস্ত গৌড় মণ্ডলের রাজধানী সেখানে ছিল।

আমার মনে হয় গঙ্গাও যেমন সরে-সরে গেছেন, নগরটিও সেই রকম সরে-সরে বর্ত্তমান জায়গায় এসে পড়েছে।

কথা কহিতে কহিতে আমরা সেই ঘাটের সম্মুখেই আসিয়াছি, দূর হইতে দেখিলাম, তাঁর ঘরের আগড় খোলা, দুই একজন স্বমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

আমাকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমার সঙ্গী বলিলেন: আপনি বুঝি এঁর কাছে যাচ্ছেন ? আমি বলিলাম: হাঁ তাই বটে। আমরা হয়ত আজই বৈকালে না হয় কালই চলে যাবো, আর দেখা হবে না,—একবার দেখে আসি।

তিনি বলিলেন: চলুন আপনাকে আর এক সাধুর কাছে নিয়ে যাই, দেখবেন কেমন লোক। এঁর সঙ্গে এরপর কোন সময় দেখা করবেন। ইনি ত কথা বড় একটা কন না—এঁর কাছে কি পাবেন ?—

দেখিলাম, এঁর কাছে এখন দুএকজন লোকও দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিলাম, ইত্যবসরে একবার তাঁর সেই সাধুর কাছে যাওয়া যাক্‌না। বলিলাম: বেশ, চলুন দেখে আসি।

সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি যেখানে থাকিতেন তাঁর বাড়ির কাছেই একটি কোটাবাড়িতে এই সাধুটি থাকেন। আমরা গিয়া দেখিলাম—ছুই তিনজন লোক বসিয়া আছে তিনি তাহাদের সহিত কথায় ব্যস্ত। আমরা প্রণাম করিয়া একটু দূরে উপবেশন করিলাম। তিনি লক্ষ্য করিলেন এবং হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মুণ্ডিত মস্তক, শিখা নাই, গৈরিক বস্ত্রে দেহ আবৃত, প্রৌঢ়বয়স্ক, ক্ষীণশরীর, গৌরবর্ণ সাধুটি। .গলার আওয়াজটি খুব জোর, বেশ তেজস্বী মূর্ত্তি। আসনে বসিয়া একটি যুবকের দিকে ফিরিয়া কথা বলিতেছিলেন। সম্মুখের উপর পাটির ছুটি দাঁত নাই।

মৃত্যু-সম্বন্ধে কথা হইতেছিল।

তিনি বলিতেছিলেন: আসলে যারা বদ্ধ জীব, স্থূল বিষয় নিয়েই ভুগছে, সাধারণত তারা দেহত্যাগের সময়—তাদের অহং জ্ঞানকে হারিয়ে ফেলে।

যুবকটি জিজ্ঞাসা করিল: বিষয় নিয়ে ভুগছে কি ?

তখন তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া বামহাতের তালুতে ডানহাতের তর্জ্জনী ও অনামিকা এই ছুইটি অঙ্গুলীর আঘাত করিতে-করিতে বলিলেন: আমাদের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তাই হোল বিষয়। বিষয়ের এই অর্থটি সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে, ভুললে চলবে না। যা কিছু আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই, গন্ধ পাই, স্পর্শ এবং আস্বাদন করতে পারি—এক কথায় এ সমস্তই হোলো বিষয়। তারপর, ইন্দ্রিয়কে চালনা করে মন—কাজেই মনের ধর্ম্মই হোলো বিষয়-ঘাঁটা, বিষয় নিয়েই তার সংকল্প বিকল্প যা কিছু চলছে। বেশ করে বুঝে যেও, এখন এই মনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আমাদের এই অহংটি, অহং বোলতে 'আমি' এই জ্ঞান বা বোধটি, নিরন্তর বিষয় কামনাই করছে। প্রাপ্তিতে আমার সুখ, অপ্রাপ্তিতে ছুঃখ এই মনে করছে। এই যে বিষয়-ঘটিত সুখ ছুঃখ ভোগ করা তার নামই হোলো বিষয় নিয়ে ভোগা। বুঝলে ?—

যুবকটি বলিল: হাঁ ওটা বুঝেছি, কিন্তু এখানে সকলকারই অহংকার ত প্রবলভাবেই দেখা যায়, আমি আমার বোধ এটা খুবই তীক্ষ্ণ,—তবে ও অবস্থায় অহং জ্ঞানকে হারিয়ে ফেলে কি রকম ?

উত্তরে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন:

আমাদের অহং সত্ত্বা ত চৈতন্য স্বরূপ, তাঁর সঙ্গে জড় বিষয়ের সম্পর্ক কি ? আত্মার আসল বিষয় হোলো তত্ত্ব জ্ঞান, আর আনন্দ,—এই আত্মার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটছে কি রকমে। মধ্যে ইন্দ্রিয়গণের চালক মন থাকার জন্যই আত্মার সঙ্গে বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটছে। আত্মা যেন তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভুলে প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়ের মধ্যেই পূর্ণ আনন্দকে খুঁজছেন, কেমন এই ত জীব-জগতের সম্বন্ধ ব্যাপার ? কাজেই জড় বস্তুতে অভিনিবেশের ফলেই স্থূল বস্তুতে প্রয়োজন বুদ্ধি এসেছে। ইট, কাঠ, মাটি, পাথর, সোনা, রূপা প্রভৃতি আবার স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিতে মমতা বুদ্ধি নিয়ে নানাপ্রকার ভোগ চলছে, যার ফল মৃত্যু।

এই মৃত্যুটি কি?—বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ-ত্যাগ, নয় কি? জড় বিষয়গুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে অবলম্বন করে এই যে এতকাল কাটানো হয়েছে, তার ফলে দেহ বা ইন্দ্রিয়াদিতেই আত্মবুদ্ধি হয়ে গেছে। যাদের—আমি বলতে এ দেহ বা ইন্দ্রিয়ই এই জ্ঞান হয় তাদের, দেহ-নাশেই আমার নাশ এই কল্পনাই দৃঢ় হয়ে যায়। তখন দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে বা সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরেই আর তারা অহং তত্ত্বে চেতন অর্থাৎ আমি আছি, এই জ্ঞান জাগ্রত রাখতে পারে না। একটি স্থূল দৃষ্টান্তে এটি বেশ বুঝা যায়। যেমন,—যারা শারীরিক পরিশ্রম করে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে যারা শ্রমজীবী, তারা যেমন পড়ে অমনি ঘুমায়। শুলে আর জেগে থাকতে পারে না। একেবারে গাঢ় নিদ্রায় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে,—রাতকাবার করে দেয়,—সেই রকম।

প্রশ্ন : তা হোলে জাগ্রত স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থার সঙ্গে কি ঠিক জীবন মৃত্যুর তুলনা হয়!

উত্তর : তুলনা কি, আসলে তাইত ঠিক। একই অবস্থা, কেবল অল্প-বিস্তর কালেরই প্রভেদ। একটি অল্প কাল, অপরটি দীর্ঘকাল এই যা। আর একটিতে শরীর-ক্রিয়া চলে, অপরটিতে চলে না—একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। অহংকে মন ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়ে যখন জগতের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তখন হোলো জাগ্রত অবস্থা, তারপর জ্ঞানশূন্য নিদ্রিত অবস্থা হোলো সুষুপ্তির অবস্থা; আর জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থার মাঝের যে অবস্থা তা হোলো তন্দ্রা। সে অবস্থায় জাগ্রত অবস্থার স্পষ্ট বিষয় ভোগাদি ব্যবহার বা কর্ম্ম নাই বটে কিন্তু তার আভাষ আছে, আবার ওদিকেও সুষুপ্তির লয় বা অজ্ঞান নাই কিন্তু তার আভাষ আছে। তেমনি, জীবন ও মৃত্যুর মাঝেও ঠিক ঐ এক অবস্থা আছে তাকে জীবনও বলা যায় না, মৃত্যু বা অহং কর্তৃত্বের লোপ ও বলা যায় না।

প্রশ্ন : সে অবস্থা কতক্ষণ, জানা যায় কি?—

উত্তর : অত্যন্ত শ্রমক্লান্ত ব্যক্তির গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তি যেমন অল্প কালের মধ্যেই আসে স্বপ্ন বা তন্দ্রাবস্থা তার অতি অল্পক্ষণ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই ক্রমে। স্থূল থেকে কারণে যেতে হোলে সূক্ষ্ম অবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হয় অন্য পথ নাই, এদিকেও সেই রকম অত্যন্ত স্থূল বিষয়াসক্ত জীবের অল্প সময়ের মধ্যে অহং লয় পায়। আবার, যেমন শারীরিক শ্রমবিমুখ যারা, শরীরের চেয়ে মস্তিষ্কের কাজ বেশী করেন তাঁদের যেমন গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তি চট্ করে আসে না, বিলম্বে নিদ্রাকে পান, তেমনি যাদের মন কতকটা বিষয়মুখী, কতকটা চৈতন্যমুখী তাদের অহং লয় দেরিতেই হয়। মৃত্যুর পর তাই অধিক চিন্তাশীল জীবের অহং বহুকাল জাগ্রত থাকে, সহজে লয় হয় না।

প্রশ্ন : আচ্ছা, কেউ কেউ বলেন, মৃত্যু বড় ভয়ানক, আবার কেউ কেউ বলেন মৃত্যু শান্তিময় অবস্থা—কোনটা সত্য?

উত্তর : মৃত্যু সকলকার সমান নয়। যারা সংসারে বড় কষ্ট পায়, দুঃখ-দরিদ্র্য ভোগ, রোগ, শোক ইত্যাদিতে কাতর হয় তাদের মৃত্যু কি রকম জান,—উৎকট শারীরিক এবং

মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে এমন যে রোগী তার যদি গভীর নিদ্রা আসে সেই নিদ্রা সুখের না দুঃখের ?

প্রশ্ন : তাহোলে কি মৃত্যু যথার্থই জীবন কালের চেয়ে এতটা শান্তিময় অবস্থা ?

উত্তর : তাতে সন্দেহের অবসর কোথা ! তবে ঠিক মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—যখন বুঝতে পারে যে এইবার এ শরীরটি ছাড়তেই হবে,—মায়ার টান যার যতটা তার ততই এ শরীর ছাড়তে কষ্ট বোধ হয়। দুঃখ এত হয় যে চক্ষে জল পড়ে। কেউ কেউ কিছুতেই শরীর ছাড়বে না, ভয়ঙ্কর অনিচ্ছা-প্রকাশ করে। যতই বুঝতে পারে যে এ যাত্রায় আর থাকা চলবে না, ততই কাতর হয়,—শেষে, মৃত্যু-মূর্চ্ছা এসে তাদের ভয়, দুঃখ এ সব থেকে পরিত্রাণ করে। জীবনের এপার থেকে ওপারের ব্যাপার যা কিছু তা তো কল্পনা ! আবার যার মন যেমন তার কল্পনার বিষয়ও সেই রকম। আসলে চৈতন্যের রাজ্যে দুঃখ ভোগ কোথা ? ভয়ের ক্রিয়াই বা কোথায় ? শরীর থাকলে স্নায়ুগুচ্ছ থাকে তারপর স্মৃতিকে আশ্রয় করে—তাইতেই না ভয়ের ক্রিয়া, হৃদ্‌পিণ্ডে তার ঘাত-প্রতিঘাত ! শরীর নেই তো ভয়ঙ্কর কি ?—ভয় তো শরীরকে নিয়েই। হিন্দুদের জন্মান্তর বাদের সবটাই ধর্ত্তব্য নয়। কর্ম্মের জটিলতা যার আছে তার জন্ম আবার হবে— আসলে, জীবের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে জগৎকে তারা ভালবাসে, —না এসে থাকতে পারে না। আসলে যার ইচ্ছা হয় সে আসে, যার হয় না সে ঈশ্বরত্ব পায়।

প্রশ্ন : আমার মনে হয় যার কাজে গলদ আছে তারই ভয়ের কল্পনা।

উত্তর : আসলে সবই ত কল্পনায় দেখা। বাস্তবকে বিশ্লেষণ করলে আসলে থাকে কল্পনা মাত্র। যে সূত্রে যে ভয়ের কল্পনা করে সেই সূত্রেই সে কল্পনাকে মূর্ত্তিমান দেখে— তারপর কালে যেই সেটি কল্পনা বা মিথ্যা, এই জ্ঞান হয়ে যায় তখন শান্তি।

প্রশ্ন : ভূত প্রেতের ব্যাপারও তাহোলে সত্য ?—

উত্তর : সত্য কেন হবে না। অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিকাশ হয় নি, একটা কোন জটিল ভোগ-বিষয়ে গাঁট পাকিয়ে রেখেছে—যারা সুখ বোলতে ইন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না, এমন এক শ্রেণীর জীব ত আছে, তারাই দেহত্যাগের পরই প্রেত-অবস্থায় তাদের প্রিয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের ফলে সেই স্থানের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, সূক্ষ্ম ভাবে সেই সেই ভোগের আস্বাদ নেবার জন্য।

প্রশ্ন : এই যে বোল্‌লেন বিষয়মুখী মন-প্রধান জীবের অহং জ্ঞান চট্ করে লোপ হয় ?

উত্তর : হ্যাঁ, যাদের অতি জড় বুদ্ধি সাধারণত তাদের তা তো হয়ই। তবে যারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একটি কোনও বিশেষ বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না, তার অহং জ্ঞানের সঙ্গে সে তাকে এমন ভাবে জড়ায় যে তা খোলা ত চট্ করে ঘটে না তাই তাকে গাঁট পাকিয়ে রাখা বোলেছি, তারাই দেহত্যাগের পর স্বপ্নাবস্থার মত প্রেত-লোকে সেই বিষয়ের কল্পনায় চেতন থাকে। আসলে মৃত্যু নানা রকমেরই আছে, যেমন জীবন নানা রকমের আছে। তার মোটামুটি একটা হিসাবে চলে, খুঁটিয়ে বুঝতে হোলে তাই নিয়ে

বেশী ঘাঁটতে হয়,—অনেক কিছু সহ্য করতে হয়, তাতে লাভ নাই। জীবন কালের কর্ম্মই হোলো আসল এবং বলবান,—তাইতে লক্ষ্য থাকলে সবই যখন ঠিক হয় তখন আবার অত শত ভাবনা কেনো বলোতো দেখি ? কর্ম্মানুসারেই ত আমাদের গতি।

প্রশ্ন : আচ্ছা রোগের সঙ্গে জীবনের ভোগ আর মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ আছে কি ?

উত্তর : নেই ত কি—নিশ্চয়ই আছে। যার শরীরের যে যন্ত্রের অথবা যে ইন্দ্রিয়ের ভোগ বেশী তার সেই ইন্দ্রিয়-শক্তি ক্ষয় তত বেশী, তার তাই থেকেই মৃত্যু-রোগ উৎপন্ন হয়, যাতে তাকে শরীর ছাড়তে হবে। ভোগের বৈষম্য থেকেই ত আমাদের রোগের উৎপত্তি, আর এটাতো বুঝতে সহজ যে, যার যে ইন্দ্রিয় ব্যাপারে লালসা বেশী, তার সেই ভোগ থেকেই রোগ জন্মাবে, আর দেহ-ত্যাগের সময়ে সাধারণ ভাবে সেই ইন্দ্রিয় ভোগ ব্যাপারের অলীকতা তার চৈতন্যে প্রতিপন্ন হবে। তাইতেই তাকে সেই ভোগটি ত্যাগ করতে সাহায্য করবে। এখানে ত সেই অধঃস্তরের জীব থেকে আরম্ভ করে সর্ব্বোচ্চ স্তরের, দেবভাবের জীব পর্য্যন্ত সব রকমই আছে, কাজে কাজেই জীবন ও মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পরের অবস্থাও নানা রকমেরই আছে। এটা কর্ম্ম ও ভোগের অকূল সমুদ্র, সিদ্ধান্তেরও সমুদ্র। এক একটি জীব, চিন্তা ও কর্ম্ম-হিসাবে যেন এক একটি জগৎ।

প্রশ্ন : আচ্ছা যাদের হঠাৎ মৃত্যু হয়,—বা অকালেই মরে ?

উত্তর : যাদের ভোগের প্রাবল্য ঘটেনি, বিষয়ের সঙ্গে ঘোরতর সম্বন্ধ ঘটেনি অথচ শরীরের সকল যন্ত্রই সতেজ আছে তাদের ত' অকালে মরবার কথা নয়। ইন্দ্রিয়-ভোগের অবসর ঘটেনি, যাদের সকল ইন্দ্রিয় সতেজ আছে এমন অবস্থায় যদি মৃত্যু-যোগ উপস্থিত হয় বুঝতে হবে,—শরীর-যন্ত্র; ফুস্‌ফুস, হৃদ্‌পিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি কোন না কোন শরীর-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা বা অপূর্ণতাই দেহত্যাগের কারণ,—সেই সূত্র ধরেই তার মৃত্যু-রোগ উৎপন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন : আচ্ছা অপঘাত মৃত্যুর বেলা ?

উত্তর : অত্যন্ত অস্থির-চিত্ত, চঞ্চল প্রকৃতি যাদের অথচ বিবিধ প্রকার ভোগের অবকাশ ঘটেনি—কোনও শরীর-যন্ত্র দুর্ব্বল না থাকলেও—কাল পূর্ণ হোলে তাদের অপঘাত সূত্রে দেহত্যাগ।

প্রশ্ন : আর শিশুদের ?

উত্তর : তাদেরও কোন শরীর যন্ত্রের দুর্ব্বলতা থেকেই মৃত্যু-রোগের উৎপত্তি। সকল শিশুর সকল যন্ত্রই-ত সুস্থ বা সতেজ নয়। পিতার বীজ দুর্ব্বল হোলে, পিতার কোনও যন্ত্র দুর্ব্বল থাকলে সন্তানকেও সেই পাপ ভোগ করতে হয়। আয়ুক্ষীণ, অকাল মৃত্যু ত তারই ফল—এ যে সহজ সত্য।

প্রশ্ন : তাহোলে ত দেখা যাচ্ছে—ভোগের ব্যাপারে প্রকৃতির সহজ নিয়মের মাত্রা অতিক্রম করলেই রোগ, শোক, দুঃখ অশান্তি যত কিছু সহ্য করতেই হবে !

উত্তর :—এই জ্ঞানটিই সার,—ভোগ ও কর্ম্মের ব্যাপারে। সৎ-ধর্ম্ম আশ্রয় করলে যেমন

গুরু, তাঁদের প্রভাব কতটা কল্যাণকর, লোক-সমাজে কতটা হিতকর, অসতেরও তেমনি প্রভাব। যথেচ্ছাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অসংযত কর্ম্মীরা তাদের অসৎ ভাবের সকল কর্ম্মের বীজ দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের মধ্যে ছড়ায়। এই ভাবে অসতের দল বাড়ে। প্রথম থেকেই প্রকৃতির নিয়মানুগ হোলে জীব আপনা-আপনিই মুক্তির রাজ্যে গিয়ে পড়বে, কিন্তু মানুষের মধ্যে বুদ্ধি আর স্বাধীন কর্ম্মবৃত্তি থাকায় মানুষ এমনই অন্ধ যে ইচ্ছার খেয়ালে প্রকৃতির সহজ নিয়ম ভাঙ্গতেই প্রবৃত্ত হয়—তার ফলে ঘা খেয়ে-খেয়ে প্রকৃতির নিয়মেই যখন সে বিজ্ঞানমুখী হয় তখন প্রকৃতির সকল নিয়মই মাথা পেতে নিতে শেখে, আবার যারা তার মত যথেচ্ছাচারে রত—তাদের উপদেষ্টা হয়। এত আগাগোড়াই দেখা যায়। শরীর-ঘটিত সকল ব্যাপারে মিতাচার হোল যথার্থ মনুষ্যত্ব। সেটা জন্ম-জন্মান্তরীণ উৎকর্ষেরই বিশিষ্ট ফল। উন্নততর জীবনের গতিই হোলো প্রকৃতিকে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুকে অতিক্রম করে, আত্মজ্ঞান বা মুক্তির দিকে। অবাধ ভোগ, যথেচ্ছাচার যেখানে সেখানে সংযমের শক্তি ও আনন্দময় ফল পাওয়া যাবে কি করে? আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ভোগ ও কর্ম্মময় জগতে সংযমেরই মহিমা প্রচার করেছেন, উদ্দেশ্য ভোগে ডুবে থাকতে দেবেন না। জীবন-ব্যাপারে আমাদের যখন ভোগ ও কর্ম্ম ব্যবহার সংযত হয় তখনই জীবনের অন্তরে গুরুত্বের প্রতিষ্ঠা। সকলদিকেই তাঁর শক্তি অতীব মধুর, কল্যাণময় ফল প্রসব করে। ইহ এবং পর দুই কালেই সেই জীব আদর্শ হয়ে অপরাপর বহুতর উন্নতিকামী জীবের লক্ষ্য স্থল হয়ে থাকেন, তাঁরাই গুরু। তারপর চিৎ-শক্তির পরাকাষ্ঠা হোলে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি। যেমন এখানকার সিভিলিয়ানেরা,—সকল বিভাগে কর্ম্ম করে শেষে গভর্ণর হন; এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রাটিভ্‌ হেড হয়ে যান।

প্রশ্ন: আচ্ছা, এ যেমন হোল প্রিভিন্সিয়াল গভর্ণরের সঙ্গে গুরুর তুলনা, তাহোলে ভাইস্‌রয়্‌ কে হবে?

উত্তর: এখানে যদি বলি,—অবতারই হোলো ভাইস্‌রয়্‌ যদিও অবতার বলতে তাঁর স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়াই বুঝায়, রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌ নয়।

প্রশ্ন: অবতার যদি না মানি?

উত্তর: সে কি? এদিকে এত ভূতপ্রেত মানলে, তাদের অস্তিত্ব বুঝলে, স্বীকার করলে, আর ঈশ্বর অবতার এ সব বুঝবেনা কেন? অবতার না মান জগদ্‌গুরু বোলে ত মানতে পার?

প্রশ্ন: তা ঠিক বটে, কিন্তু অবতার মানার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা কুসংস্কারের ধারার মধ্যে এসে পড়তে হয়। জানেন ত এখনকার ইংরাজ-গুরুর প্রভাবিত সভ্য-জগত ভক্তিমার্গের উপর কতটা হেয় দৃষ্টি ফেলে রেখেছেন—এখনকার সভ্য-জগতের সাহিত্যে ভক্তিমার্গের কোনও আলোচনাই নাই। দাস আমরা—হাজার বছরের উপর—প্রভুর আনুগত্যই আমাদের দীর্ঘ জীবনের কারণ। সাহেবরা না বোল্‌লে আমরা মানতে পারবোনা, মাপ করবেন।

উত্তর: বেশ ত, কুসংস্কার যদি মনে হয় ত কু-গুলা বাদ দিয়ে নেবে। বিজ্ঞানের চালনিতে

চেলে নেবে—বিচার করে মানতে গেলে সুবিচার করতে হবে। অপ্রাপ্ত অবস্থায় সবই ত যুক্তি-মূলক অনুমান। যারা যে বস্তু দেখেছে, পেয়েছে, আর তাদের জীবনে যা প্রকাশ পেয়েছে তারাই হোলো আচার্য্য বা গুরু, লোক-শিক্ষায় ব্রতী। এজগতে তাদের চরিত্রই হোলো আদর্শ।

প্রশ্ন ঃ দেখুন অকপটেই বলছি,—এই ইংরাজী শিক্ষায় আমরা বিশ্বাসটা হারিয়ে প্রত্যেক জ্ঞান, ভক্তি, অনুভূতিমূলক বিষয়কে অবিশ্বাস করতেই শিখেছি যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দাসত্ব কালে ঘটেনি। তাই—জীব অবস্থার পরাকাষ্ঠাই হোলো ঈশ্বর বা ভগবৎ প্রাপ্তি, এটা মানতে বা বিশ্বাস করতে আমাদের ইংরাজ-বিধি-দত্ত-জ্ঞান ততটা বাধা পায় না—কিন্তু ঐ অবতার,—

উত্তর ঃ কেন, তফাৎটা কি বুঝে দেখলেই ত হোলো। এখানকার কর্ম্মে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে, বিচার বা অন্যান্য রাষ্ট্র বিভাগে কর্ম্মদক্ষতা লাভ করলে শেষে কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হওয়া আই, সি, এস্-এর চরম সার্থকতা, ভাইস্‌রয়্ কিন্তু তা নয়। তাঁকে হোম্ থেকে নির্ব্বাচিত করা হয়। এবং সেইখান থেকে আসা চাই-ই। সকল বিভাগেই তাঁর শক্তি অবাধ, তিনি এখানকার সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রকর্ম্মের নিয়ন্তা—তেম্‌নি এদিকে অধ্যাত্ম-রাজ্যের জগদ্‌গুরু বা অবতার। অবশ্য অবতার ঠিক ভাইস্‌রয়্ নয়, প্রতিনিধি নয়—অবতার বোলতে স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়াই বুঝায়। জীব অবস্থার চরম হোলো গুরুত্ব এবং ভগবৎপ্রাপ্তি,—তারপর কর্ম্ম-ক্ষয়ে তাঁরা ভগবানের সাঙ্গোপাঙ্গ হয়ে যান। আবার তাঁতে লয়ও হয়ে যান। অবতার ত জীব-অবস্থার পরিণতি নয়। সাক্ষাৎ গোলোক বা নিত্যধাম থেকে তাঁর নিজ ইচ্ছায় তিনি অবতীর্ণ হন। সময়-সময় তাঁর ইচ্ছায় আবার তাঁর সেই সাঙ্গোপাঙ্গের কেহ এ জগতে আসেন, কোনও উচ্চ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাঁরা হন জগদ্‌গুরু।

প্রশ্ন ঃ তিনি প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারীর দ্বারাই ত কাজ করতে পারেন, নিজে মানুষ হয়ে আসতে যাবেন কেন?

উত্তর ঃ যিনি রাজার রাজা, রাজেশ্বর তিনি তাঁর রাজ্যে আসবেন—তাঁর খুসি তাঁর ইচ্ছা,—কোন কর্ম্মবাধ্যতাসূত্রে তিনি বাধ্য ত নন! কেন, তিনি সবই ত পারেন—তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা—তাঁর মানুষ হয়ে এ জগতে আসার মধ্যে বাধা কি?

যুবা বলিলেন ঃ তিনি আসেন কখন?

উত্তর ঃ কখন আসেন,—বলা কিম্বা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়,—তবে আসেন, এসেছেন পূর্ব্বে-পূর্ব্বে কতবার, তার প্রমাণ আছে।

আবার যুবা প্রশ্ন করিলেন ঃ আচ্ছা, তাঁর নিজের আসা আর প্রতিনিধি বা জগদ্‌গুরুর আসার কোনও বিশিষ্ট লক্ষণ আছে কি, যা দিয়ে ঠিক ধরা যায়?

উত্তর ঃ আছে বৈকি! প্রতিনিধি যাঁরা আসেন তাঁরা বিশেষ বিশেষ অধিকারীর মধ্যে

আলো দেন, তাঁরা যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তার তাৎপর্য্য হোলো যে একমাত্র ভগবানই জীবের পরম গতি, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তুকে পাওয়াই জীবের চরম লক্ষ্য, তাঁরা সেই অনুরূপ সাধন পথেই আলো দেখান। আর যখন তিনি স্বয়ং আসেন তখন অধিকারিভেদ রাখেন না, সকলকেই বলেন—আমাকেই ভজনা কর, আমি সেই বস্তু যাকে তুমি চাও, যাকে আশ্রয় করলে কৃতার্থ হবে, আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এই হোলো দুয়ের পার্থক্য।

সেই যুবা স্থির হইয়া সকল কথা শুনিবার পর বলিল: দেখুন, আবার বলি,—ইংরাজী-সভ্যতার হাওয়ায় আমরা যেটা প্রত্যক্ষ নয় তাকে ত অবিশ্বাস করতে শিখেইচি আরও, বিচার-বুদ্ধিতে যে বস্তু ধরা যায় না, তাকে কল্পনায় ভেবে অনন্তের পথে ধেয়ে যেতে যে সরল বিশ্বাস আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সম্বল করেছিলেন, তাও আমরা এখন উপেক্ষা করতেই শিখেছি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তা গ্রাহ্য, তা ছাড়া সবই ত্যজ্য,—অবিশ্বাসের মধ্যে ফেলে দিতেই আমরা অভ্যস্ত। তাই চট করে এই সব অবতার-কথা মেনে নিতে পারবোনা, যদিও এসব শুনতে বা কল্পনা করতে বেশ লাগে।

তিনি বলিলেন: তা কি করে পারবে,—জীব-চৈতন্য কতদূর প্রসারিত হলে তবে গুরু, ঈশ্বর বা অবতার-জ্ঞান হয়। অপক্ক, বিশ্বাসহীন অবস্থায় শুধু মেনে নিলে উল্টা উৎপত্তি হবে যে। কতটা শক্তিমান হোলে তবে বিশ্বাস বস্তুটি আসে। বিশ্বাসহীনতা দুর্ব্বলেরই সম্বল, তাদের যুক্তি বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হোলো অবলম্বন। প্রমাণ ব্যতীত তাদের চলবার যো নাই।

যুবাটি তখন ধীরে ধীরে কহিল: দেখুন, আসলে এসকল তত্ত্ব সত্য হোক বা না হোক ভগবানের সম্পর্কে কল্পনা যে কতদূর প্রসারিত হতে পারে তারই একটা মহৎ দৃষ্টান্ত। আমার এখন এই মনে হচ্চে। আপনি গভর্ণর, ভাইস্‌রয়্‌ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে কেমন বেশ সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন আসলে কি ঐ ভাবের ব্যাপার ঘটে?

তিনি: আহা, এই যে এখনকার এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ্‌ সিস্‌টেম্‌ এটাও ত সভ্যতার ক্রমবিকাশেরই ফল। এ সব এলো কোথা থেকে, মানুষের সৃষ্টি মনে কর নাকি? চরাচর বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে যে সকল গুহ্য নিয়ম রহস্যের মত ঢাকা আছে, মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি সংকীর্ণ বোলেই না তার উদ্ঘাটন সম্ভব হয় না। সভ্যতার উৎকর্ষে, উপযুক্ত রকম উন্নত হোলে মানব-সমাজের বিশিষ্ট চিন্তাশীল জীব যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কতক কতক প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন সেই সকল প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পদ, মানব-সমাজে ব্যবহারিক ভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সহায়তা করে। আসলে এখানে কেউ অবান্তর বা কোন নূতন জিনিসের কল্পনা বা সৃষ্টি করতে পারে না। যা সৃষ্টিতে কোন না কোন ভাবে আছে, তারই আভাষ পেয়ে মানুষ কিছু আবিষ্কার করলে, আর তাই সভ্য-সমাজের মধ্যে এতটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। মানুষের সৃষ্টি ঐ কলের পুতুল অবধি। সৃষ্টির বিরাট শক্তি ব্যাপারের অতি অযোগ্য ক্ষীণ অনুকরণ। মানুষের সৃষ্টি, এ বড় দাম্ভিকের, অজ্ঞানের কথা। না হোলে দেখ এই গ্রাভিটেশন্‌, ইলেক্‌ট্রিসিটি,

এয়ারপ্লেন্, টেলিগ্রাফ, গ্রামোফোন্, রেডিয়াম্, ওয়ারলেস্, জাহাজ, রেল,—এ সব, মানুষের স্থূল দৃষ্টির বাইরে প্রকৃতির যে অসীম সৃষ্টি-কৌশল রয়েছে তার কতটুকু, তুলনাই হয় না। তার কতটুকু মানুষ পেয়েছে বা কাজে লাগিয়েছে। ধর না এই যে বিদ্যুৎ, স্পেস্-এর মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ পরিপূর্ণ,—সেটা কাজে লাগাতে কত মাথা-ফাটাফাটি, কত ডাইনামোর প্রয়োজন, কত কত জিনিসের যোগাযোগ অপেক্ষা করে।

যুবা: স্পেস্-এর মধ্যে যা আছে সে ত' স্থির (ষ্ট্যাটিক্) বিদ্যুৎ,—ডায়নামিক্ নয়ত, কাজে লাগাতে গেলে,—

তিনি: আহা, তা হোলেই ত দেখতে পাচ্চ ষ্ট্যাটিক্-কে ডায়নামিক্ করতে এখনও কোনও সহজ পন্থা আবিষ্কার হয়নি, কিন্তু প্রকৃতি কি ভাবে বিনা আড়ম্বরে, ঐ ষ্ট্যাটিক্-কে ডায়নামিক্ করে নিয়ে কাজ চালাচ্চে সে গুহ্য রহস্যের সন্ধান কি মানুষে এখনও পেয়েছে? এখন যে টুকু আবিষ্কার হয়েছে,—আমাদের ত বেশীর ভাগ মানুষই অজ্ঞান, তাই আমরা মনে করি অনেকটাই হয়েছে। আসলে বিজ্ঞানের উন্নতির এতটা যে অহঙ্কার, এতটা উন্নতি, তাতে মানুষের কী দুঃখ দূর হয়েছে? এই সব উন্নতির ফলে মানুষে মানুষে আক্রোশ, স্বার্থপরতা, জীবনদ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছে। এ উন্নতি কি উন্নতি?

যুবা ব্যক্তি বেশ প্রফুল্ল ভাবেই বলিল: আগেকার তুলনায় এখনকার এত উন্নতি স্বীকার করতে হয় বৈ কি! এখনকার এই উন্নতির সময় থেকে তখনকার দিন তখনকার অবস্থার কথা মনে করলে যেন সে সময়টায় জগৎ বেশী অন্ধকার ছিল মনে হয়।

তিনি: কিন্তু এখনকার এই আলোকে অল্প-বয়সে চোখের মাথা খাবার কেমন সুবিধা হয়েছে বল দেখি? কত কত বালক-বালিকার চশমার দরকার হয়ে পড়েছে। রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য এই চারটে জিনিস জগৎ থেকে কতটুকু তোমার এই আলোকের সময় কমেছে আমায় দেখিয়ে দাও।

যুবা: না তা পারবো না, সে বরং আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী। তবে কেবল এইটুকু বোলতে পারি যে তখনকার চেয়ে এখন লেখাপড়ার চর্চ্চা লোকের মধ্যে ছড়িয়েছে। না হোলে আগেকার লোকের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, সরল জীবন-যাপন-প্রণালী, বেশী পরিমাণে মনুষ্যত্ব তাঁদের ছিল। মনের জটিলতা সাধারণের মধ্যে এতটা ছিল না। মনে হয় এই স্কুল কলেজ থেকেই ছেলেদের শরীর ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে—খুব কম ছেলেই দেখা যায় স্কুল কলেজের কুসংসর্গের প্রভাব থেকে বাঁচতে পারে—এসব এখন বোঝা যাচ্চে। এখন এ দেশের বাপগুলি ছেলেদের যথার্থ কল্যাণের দিকে নজর দেওয়ার চেয়ে,—কি-সে ছেলে গোটাকতক পাস করে, বিয়ের বাজার গরম করবে, আর কাছে থেকে শীঘ্র-শীঘ্র কিছু পয়সা আনবে এই চিন্তা মুখ্য হয়েছে,—তারপর ছেলের শরীরে ঘুণ ধরুক বা মরুক উচ্ছন্ন যাক্ দেখবার দরকার নেই। মোটের উপর আমাদের জেনেরেশন্-এ এই পিতাগুলি স্বর্গে না গেলে এদেশের কোন সুবিধা নাই। এটা আমরা বুঝেছি যে—দেশে এত উকিল আর ডাক্তার বাড়াতে দেশের অপকার যতটা হয়েছে,

উপকার তার চেয়ে ঢের কম হয়েছে একথা বোলতে পারি। উকিল আর ডাক্তার এত না বেড়ে যদি এর দ্বিগুণ ইঞ্জিনিয়ার আর সায়েন্টিষ্ট্ বেশী হোতো তা হোলে আমরা বেঁচে যেতুম। এই দুর্দ্দিনে, জানেন, কামান্ধ স্বার্থপর পিতারা এখনও ছেলেদের উকিল আর ডাক্তারীতে পাঠাচ্ছে। ছি, ছি,—

তিনি: দেখ, কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখবে এই দুই বৃত্তি নিতান্তই নিস্তেজ হয়ে পড়বে, এমন অবস্থা দেশের হবে, কেউ আর উকিলকে ডাকবে না, ডাক্তারদেরও হায় হায় করতে হবে। (১৯১৭।১৮ সালের কথা) প্রকৃতি কখনই বেশীদিন মানুষের এ ব্যভিচার সহ্য করবে না।

যুবা: কি করে যে হবে বুঝতে পারি না,—দেশের লোকের মরাল্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কতটা উঁচু হোলে তবেই না ঘরে ঘরে উকিল ডাক্তারের প্রয়োজন বোধ কমবে,—এ মোহ কাটবার কোনও লক্ষণ ত বর্ত্তমানে দেখিনা, আমার বিশ্বাস হয় না।

তিনি: আমরা ঠিক বুঝতে পারি না—কি থেকে কি হয়, তবে এখনকার এই বিষম ভোগ, ব্যভিচারের উন্মাদনা, দেশ জুড়ে শরীর-নীতি, পারিবারিক-নীতি, সমাজ-নীতি, যা কিছু ধর্ম্ম বোলে সমাজে আছে তাই ভাঙ্গবার প্রবল উত্তেজনা,—এর চরম অবস্থায় এসে পড়েছে। অপেক্ষা কর, কি মূর্ত্তিতে যে আসবে তা ঠিক এখন বলা যাবে না, তবে এর প্রতিবিধান সুমুখে আসছে। এই যুদ্ধের বাজারে টাকা কত সস্তা হয়ে পড়েছে দেখেছ? এর পরিণাম যে কি ভয়ানক তা কেউ এখন দখতে পাচ্চে না। সর্ব্বনাশ এমনি করেই আসে। আবার সুদূর পশ্চিম দেশেও এত যন্ত্র উদ্ভাবন ও পরিচালন,—লোক-হত্যার কাজে নিয়োগ কি ভয়াবহ ফল-প্রসব করবে কে বোলতে পারে। তাহোলে দেখ, নিম্নস্তর পশু থেকে আর রাজ্যের উচ্চতম মানুষ পর্য্যন্ত হিংসা-রাজের জীব, হিংসার দ্বারাই জীবনের উদ্দেশ্য বজায় রাখছে। আগেকার পৃথিবীর যত ভয়ানক হিংস্র প্রাণিবংশ লোপ হয়ে তাদের গুণগত অস্তিত্ব মানুষের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে গেছে, হত্যা করা কতকালের মানুষের অভ্যাস, হত্যা করে-করে নিজেদের এখন যন্ত্রের সাহায্যে বিরাট ভাবে হিংসা, প্রতিহিংসার অধিকারী করে তুলেছে। দেখনা এই পশুরাজ্যে যা নখ, দাঁত, শিং—সভ্য-মানুষের রাজত্বে—সেগুলি, তীর-ধনুক, কুঠার, বর্শা, ভোজালে, তলবার, আর এখনকার আরও উচ্চ সভ্যতায় সেগুলি বন্দুক, পিস্তল, কামান, আবার চরম উৎকর্ষ তার পয়েজনাস্ গ্যাস্-এর আবিষ্কার।

যুবা: অবশ্য এ দিকে যাই হোক কিন্তু লাইফকে এন্‌জয়্ করতে ওরাই জানে,—এ সব মানুষ-হত্যার ব্যাপার ছেড়ে দিলে কিন্তু ওরা বিজ্ঞানের কতটা উন্নতি করছে, তার শত ভাগেরও একভাগ আমাদের প্রাচীন বা আধুনিক কোনও ভারতেই হয় নি।

তিনি: প্রাচীন ভারতীয়েরা ভূত বা পদার্থ-বিজ্ঞানের সন্ধানও জানতেন, প্রয়োজন হোলে কাজেও লাগাতেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে; তবে তাঁরা এ সম্বন্ধে ডিটেল্‌ড্ ইন্‌ফরমেশন্ বিশেষ রেখে জাননি। সামান্য যা আছে মারণ, উচাটন, ভূত-বশীকরণ ইত্যাদি প্রায়ই এখন অব্যবহার্য্য। অবশ্য এই পরাধীন অবস্থায় এক শ্রেণীর লোকের কাছে এর কোনও মূল্য নেই

মনে হয়,—কিন্তু এই বিশাল সৃষ্টির রহস্য—সৃষ্টির মধ্যে জীবের উৎপত্তির কারণ, মানুষের উৎপত্তি এবং বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণতি, ভোগায়তন শরীর, ইন্দ্রিয়াদির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ভোগ ও কর্ম্মের রহস্য, পাশবদ্ধ অবস্থার বিচার, মুক্তি ও তাহার পথ—স্রষ্টা বা ঈশ্বর, স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধ এ সমস্ত অতি গভীর-তত্ত্ব সকল প্রাচীন ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। আমি আর-আর জড় পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা, চিকিৎসা, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন ইত্যাদি বহুতর জ্ঞানের বিভাগ ছেড়ে দিচ্ছি,—যার পর আর জ্ঞান নেই, মানুষের চরম জ্ঞান যে আত্ম-তত্ত্ব বা ভগবৎ-তত্ত্ব-পরিচয়, সভ্যতার চরম উৎকর্ষের অমৃত ফল তা এই ভারতই জগৎকে দিয়েছে। ভগবানকে কত রকমে, পার্থিব সর্ব্ববিধ সম্পর্কে, এত প্রকারে আস্বাদনে, আবার সকল সম্পর্কেই তাঁর সার্থকতা এ কোন্ জাতি অনুভব করেছিল? তুচ্ছ স্বল্প বিদ্যার মোহে এ সকল অবিচার করলে চলবে কেন?—কোন্ সভ্যতায় এতটা চৈতন্যের প্রসার হয়েছিল। লঘু গুরু জ্ঞানহীন ব্যক্তি এ সকল উড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু বিচারবান উন্নতিকামী যাঁরা, তাঁরা কখনও এ সকল আগেকার গৌরব এখন এর মূল্য নেই বোলে তুচ্ছ করতে পারবেন না। যাঁরা এতটা গভীর চৈতন্যে সমাহিত হয়ে প্রকৃতির গুহ্যতম রহস্যের আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন—সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত দর্শনের তত্ত্ব-সকল আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, তাদের কাছে রেল্‌ওয়ে, এয়ারপ্লেন্, ইলেক্‌ট্রিসিটি, গ্রামোফোন্, রেডিও, গ্রাভিটেশন, রিলেটিভিটি-র, সন্ধান কি ছিল না? এ সকল আবিষ্কার কঠিন বস্তু ছিল?

যাদের যেমন প্রকৃতি তাদের সভ্যতার গতিও সেই দিকে। এখনকার পাশ্চাত্যের মত এক সময়ে ভারতেরও সাম্রাজ্য বিস্তারের মোহ প্রবল হয়েছিল। তারপর সেই গতির মোড় ফিরে গেল। ক্রমে আত্ম-জ্ঞান ভগবদ্ভক্তিই এখানে বড় হয়ে গেল। মোক্ষমার্গের সঙ্গে ভোগ-আসক্তি রাজ্যের বিবাদ বাধলো, ইহ-র সঙ্গে পরকালের বিবাদে ভারতের বাহুবল নিঃশেষিত হয়ে গেল। কিন্তু এখনও পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মানুষ পদার্থ-বিজ্ঞানের রাজ্যে যা কিছু আবিষ্কার করেছেন তা ইহকালের সুখস্বচ্ছন্দ, অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের কাজে, ভোগবিলাস প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের কাজেই তার উপযোগীতা। ইহলোকের সুখ ব্যতীত জগতে তাদের আর কিছুই কাম্য নেই, কিন্তু ভোগ-সুখের আয়তন-বৃদ্ধি ভারতের জ্ঞানীরা চাইতেন না। তাঁদের কর্ম্মকে এবং ভোগ-মূলক যা কিছু ব্যবহারকে তাঁরা সংক্ষেপ করতেই চাইতেন। তাঁরা ভাল মতেই এটা বুঝেছিলেন যে এই সংসারে সুখ, স্বচ্ছন্দ আরামের কুহক থেকে যতটা নিবৃত্তির দিকে যাওয়া যায়, কর্ম্মকে যতটা কমিয়ে আনা যায় ততটাই পারমার্থিক কল্যাণ। তাঁদের ইহ-সর্ব্বস্ব-বুদ্ধি ত ছিলনা, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি, চৈতন্য, পর বা পরামার্গেই গতি পেয়েছিল। তাঁদের জীবনগতি আলোচনা করলে এইটিই পরিষ্কার ধারণা করা যায়। তাঁরা যে বস্তুকে মুখ্য করে দেখেছেন তারই ডিটেল্‌ড্ ইন্‌ফরমেশন্ রেখে গেছেন। হিন্দু-ধর্ম্মের চতুরাশ্রম কি অপূর্ব্ব সংস্কার! ভারতীয় সভ্যতার মৃত্যুর কি অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। তাঁরা কেউ ঘরের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত হয়ে দেহত্যাগ করতে চাইতেন না। সকলেই বাণপ্রস্থ

বা সন্ন্যাস অবলম্বন করে শেষ জীবন পরমেশ্বরের চিন্তায়, বনে দেহত্যাগ করতেন।—মৃত্যুকে তাঁরা পরমগতির সহজ পথ বোলেই দেখেছিলেন—সেটা কোন শোক বা মোহের ব্যাপার ছিল না পরন্তু জীবনের পূর্ণ পরিণতি এবং চরম সার্থকতা বোলেই জানতেন। ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এইখানেই। কিন্তু আর এখন পূর্ব্বের মহান আদর্শ নেই, এখন পদার্থ-বিজ্ঞান, ধন-বৃদ্ধি, এই সকল পাশ্চাত্য-আদর্শ কাজ করছে। পার্থিব জীবন-দ্বন্দ্বে জয়ী হবার প্রবল প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি হোতে আর বাধা নেই। তুমি শীঘ্রই দেখবে, পাশ্চাত্যের ভারতীয় শিষ্যেরা এখন ঠিক ঐরকম নানা আবিষ্কারে জগতের মাঝে ভারতবাসীর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে, এটি সত্য, সন্দেহ নেই—নিশ্চয়ই হবে। তবে এটা ঠিক জানবে এই জীবন দ্বন্দ্বে এতটা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করবার শক্তি সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জন না করলে বাঁচা মুস্কিল হবে। অল্পায়াসের এই পঙ্গু জীবনকে, কঠিন দ্বন্দ্বসহ না করলে শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়বে। এক দিকে ত এর মধ্যেই ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে।

যুবা: মৃত্যুর কথা আরো একটু আছে,—মৃত্যু যখন আমাদের হবেই,—এ জানা কথা, তবুও মৃত্যুকে এত ভয় হয় কেন বলুন দেখি, এই ভয়টা এড়ানো যায় কি করে?

তিনি: চিরকালই যার তুচ্ছ ইন্দ্রিয় বিষয়ের ব্যাপারেই কাট্‌লো, জীবনে কখনও কোনও মহৎ চিন্তা যদি না হোয়ে থাকে, কোনও বড় জিনিসের আস্বাদন না পেয়ে থাকে, তাহোলে মৃত্যুভয় যাবে কি করে? মহৎ কিছু আশ্রয় না করলে মৃত্যুভয় যাবার নয়। দেখ, এখানে মানুষ তিন রকমে উন্নতপ্রাণ বা মহান আশ্রিত হতে পারে। প্রথম, আমি কে ও কেন? এই জিজ্ঞাসা যার জাগে আর এই অনুসন্ধানই জীবনের মুখ্য কর্ম্ম হয়,—দ্বিতীয়,—প্রকৃতি হোক বা ভগবান হোক, অবলম্বন করে এই বিশাল সৃষ্টি-প্রবাহের অনন্তশক্তি, অনন্ত বৈচিত্র্যময় উৎসের অনুসন্ধানে, জীবন-গতি চালনা করলে, আর তৃতীয়—মানুষ হোয়ে মানুষের দুঃখ দূর করা, সেবাব্রত অবলম্বন করলেও মহৎ আশ্রিত হওয়া যায়। সকল মানুষ যে একই সত্তা, একের দুঃখে আমার দুঃখ, এই অনুভব যার হয় তিনি মহৎ। স্বার্থকে পরার্থে বিস্তৃত করা। এই তিনটি উপায়ে মানুষের অস্তিত্ব মহান হয়। মৃত্যুভয় এড়াবারও এই তিনটি প্রধান উপায়। আসন্ন মৃত্যুতেও যদি এই তিনটির একটি ভাব জ্ঞানে আসে তাহোলেও মৃত্যু ভয় এড়ানো যায়। কিন্তু সারা জীবন অন্যকর্ম্ম করে সেই সময়ে মনে এ ভাব আসাও মুস্কিল।

সারা জীবনে যে-বিষয়ের আস্বাদনে প্রবৃত্তি হোলোনা এখন, এই সঙ্কট সন্ধিতে সেদিকে মন না যাবারই কথা। তবে এই তিনটি মহৎ বিষয়ের কথা জেনে রাখা ভাল। এর মধ্যে আত্মাকে ধরা এবং প্রকৃতিকে ধরা স্বভাবের মধ্যে দিয়েই হয় সুতরাং মধ্যে অবিশ্বাস বা সংশয় এসে নিজের জ্ঞানলব্ধ প্রমাণকে এবং বিশ্বাসকে নষ্ট করে না। কিন্তু ভগবানকে ধরা, বিশ্বাস করা, অবলম্বন করা বড়ই কঠিন, কারণ একমাত্র বিশ্বাস ছাড়া তার আর অন্য প্রমাণ নেই। ভগবান-সম্বন্ধে মানুষের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানই নেই। যাঁরা ইন্দ্রিয়-বিষয়কে অর্থাৎ বাহ্যভোগের বস্তু তুচ্ছ করে—তাঁকেই জীবনের অবলম্বন করেছেন এমনই যে ব্যক্তি তাঁদের কথাই ভগবানের অস্তিত্বের

একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু ভক্তের কথা তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ হোতে পারে, তোমার-আমার কাছে ত অনুমান মাত্র। আমরা পরীক্ষা-বুদ্ধি নিয়ে হয়ত ব্যাপারটা দেখতে যাব। কাজেই এর উপর দাঁড়ানো শক্ত।

যুবা: আচ্ছা, ভক্তি-শাস্ত্রে ত দেখতে পাই কর্ম্ম ও বিষয় ভোগাদি ত্যাগ না করেও ত ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখা যায়। তিনিই কর্ত্তা, তিনিই সব করাচ্ছেন, আমরা যন্ত্র মাত্র এই জ্ঞান থাকলেই হোলো।

তিনি: বিপদ ত ঐখানেই। 'আমি'কে কেন্দ্র করে যত-যত কাজ হচ্চে সে সকলের কর্ত্তা আমি, এই যে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান, এটা যাবার নয় যতক্ষণ না আমাকে গ্রাস করবার মত বিরাট একটি 'আমি'র সাক্ষাৎকার হয়। তা হবার আগে পর্য্যন্ত ভগবান কর্ত্তা মুখে বলা যেতে পারে, কাজের বেলা তার জায়গায় আমার এই 'আমি'টিকেই দেখা যায়। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত চাঁদের কর্ত্তৃত্বই প্রবল—তা যাবার নয়, এও সেইরকম। সেই যে তিনি, আছেন এবং সকল ক্ষেত্রে কর্ত্তারূপেই আছেন, তাঁর অস্তিত্বের জ্ঞান, তোমার আমার কোথা? কল্পনায় ত কাজ হবে না। পদে পদে ভ্রম, অবিশ্বাস, এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, কাজেই যিনি ভগবানকেই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য করে, তাতেই সকল আকাঙ্ক্ষা সমর্পণ করবেন, তিনিই নিজের মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করবেন, তারই জন্ম, জীবন ও মৃত্যু সার্থক হবে সন্দেহ নেই। সাধারণের ত এদিকে লক্ষ্য নেই, নিজের যেটুকু দেহ, মন, বুদ্ধি, শক্তি আছে তাইতেই মশ্‌গুল, সমস্ত জীবনটা তার মধ্যেই ঘুরলেন; কাজেই—

যতনে যতেক ধন, পাপে বাটায়নু সব পরিজন মেলি খায়,
মরণকো বেরি, কোইনা পুছসি, করম সঙ্গে চলি যায়।

যুবা: আবার, 'শেষ সমন ভয়ে তুয়া বিনু গতি নাহি আরা—' এও ত আছে।

তিনি: কার আছে, কে বোল্‌ছে একথা?—যিনি একথা বোলছেন তিনি বোলতে পারেন, তিনি জীবনে তাঁকে আস্বাদন করেছেন, কাজের যেটুকু গলদ আছে এই সময়ে সেটুকু কাটিয়ে নিতে হবে। তাই এ আত্মনিবেদন। কিন্তু চির জীবন যে ব্যক্তি তাঁর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করেই এসেছে—তার গতি কি হবে?—তার সেই 'আমি' ত এখন কর্ম্মফলাধীন।

যুবা: তাই ত! ভগবান না ভজিয়ে আপনারা ছাড়বেন না দেখছি। অন্য কোনও উপায়ে যখন হোলো না তখন মৃত্যুভয় দেখিয়ে কার্য্যোদ্ধার!

১৩

আমরা নবদ্বীপ হইতে কালই যাইব, সুতরাং গঙ্গাতীরের সেই কঠোর তপস্বীর নিকটে একবার যাইতে মনস্থ করিলাম। সুযোগ করিয়া বৈকালের দিকে তাঁহার নিকট গেলাম এবং ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎও পাইয়াছিলাম।

বিশেষ কিছু বলিতে নারাজ,—সেদিনের মেজাজ নাই, আজ আর এক রকম দেখিলাম। এঁর বিশেষত্ব এই যে তিনবার তাঁর সাক্ষাৎ পাইলাম, তিনবারই তিন রকম মানুষ। শেষে যে মানুষটি পাইলাম, তাঁহাকে নিতান্তই সর্ব্ববিষয়ে বিরক্ত বলিয়াই বোধ হইল।

তাঁহার ভাবটি এইরূপ,—কেন, এত কথা কহিবার জন্য ব্যস্ত কেন,—যে সব কথা আলোচনা করিতে চাও, নিজেই একটু সেগুলি ভাবিয়া দেখনা কেন? অনর্থক প্রশ্ন করিয়া একজনকে উত্ত্যক্ত করিবার প্রয়োজন কি? সকলকার সঙ্গে সকল কথা কহিতে মন বাধা দেয়—ইচ্ছা হয় না। আবার মনের কথা কহিবার লোক কোথায়!

আমার এই ভাবটি ভালই লাগিল,—কারণ অভিজ্ঞতার ফলে, সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখিয়াছি যে তাহাদের জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। এত রকমের এত কথার অবতারণা করে যে ইচ্ছা হয় তাহাদের স্পষ্টই বলিয়া দি যে, বাপু,—আগে বাজে কথাগুলা ছাড় দিকি, কোন্ কথা প্রয়োজন, কোন্‌টাই বা নিষ্প্রয়োজন আগে সেইটি ঠিক কর তারপর জিজ্ঞাসায় আসিও।

সাধু দেখিলেই যেন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মুখ চুলকায়। অনর্থক গ্রাম্য কথার এতটা প্রভাব প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়,—আবার তার মধ্যে এমন এক রকমের মানুষ আছেন যাঁরা কথা কওয়ার দিকে না গিয়া, শুনিতে ভালবাসেন। শুনিবার আসক্তি তাঁহাদের এত যে, আড্ডায় অসার গ্রাম্য আলোচনা শুনিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে আসর জমাইতে আসেন। শ্রোতা না হইলে যেমন কোন পালা জমে না—এই গ্রাম্য কথাবাগীশদের আসরে শ্রোতার অভাব থাকিলে সে দিনের আসর যেন বৃথা হইয়া যায়। বিশেষত পল্লীগ্রামের অধিবাসী যাঁরা, তাঁহাদের অনর্থক কথা কওয়া এবং কথা শোনার বাই অনেকটা বেশী,—সেই কারণে সাধু পাইলে, অন্ততঃ নানা প্রকার নূতন কথা শুনিবার জন্য তাঁহারা সাধু-সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। সাধারণ সাধু হইলে বেশ বনে, যথার্থ তপস্বী হইলে উভয় পক্ষেরই ভাব-বৈষম্য উপস্থিত হয়—তাহার পরিণাম অশান্তিকর।

এ ক্ষেত্রে এইটুকু বুঝিলাম যে, সম্ভবত এখানকার সেইরূপ কোন কোনও বাক্যবিশারদের অত্যাচারে ইঁহার বিরক্ত হইবার কারণ ঘটিয়া থাকিবে,—সেই কারণে আমাকে আজ আমল দিতেছেন না।

অবশ্য শেষে আমার ঐকান্তিক যত্নে কথা কিছু বলিয়াছিলেন,—তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—সাধু দেখিলে বা পাইলে তাহার সঙ্গ করা ভাল বটে, কিন্তু তিনি কথা কহিবার অবকাশ না দিলে, কিছু জিজ্ঞাসার অধিকার বা অনুমতি না দিলে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু উহা অন্যায়,—উহাতে তাঁহাকে বিরক্ত করা হয়। সাধু বিরক্ত হইলে সাধুসঙ্গের কোনও সুফল লাভ ঘটে না। সাধু পাইলে, যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, তবে তাহার অবসর খুঁজিতে হয়, আর আন্তরিক হইলে তাহা পাওয়াও যায়। তখনই যথার্থ লাভ হয়।

আমাদের যে শক্তিটুকু আছে, তাহার অধিকাংশ অযথা বাক্য-ব্যয়ে ফুরাইয়া যায়, আমরা যদি বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা অভ্যাস করি তাহা হইলে অনেকটা শক্তি-সঞ্চয় করিতে পারি।

যাহারা বেশী কথা কয় এবং অনর্গল বকে, তাহাদের প্রকৃতি ভীরু,—অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত,—নাড়িতে তেজ নাই, সেই কারণেই তাঁহারা বেশী কথা কহিয়া স্নায়ুগুচ্ছ সতেজ রাখিবার চেষ্টা করে। বাক্যের শক্তি অসীম এবং অসাধারণ। অযথা বাক্য যেমন শক্তিক্ষয়কারী, অযথা আহারও সেইরূপ, যে ব্যক্তি যা তা বলে, আর যা তা খায়—তাহার পরিণাম ভয়াবহ। বাক্য এবং ভোজনে সংযম সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন,—সর্ব্ববিধ সাধনার গোড়ার কথা। ভোজনে সংযমের প্রয়োজন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে যিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের মধ্যে ভ্রম উৎপাদন করেন, ধর্ম্মরাজ্যে তিনি অপরাধী, সুতরাং দণ্ডার্হ।

নানাস্থান ভ্রমণ, এ জগতে কর্ম্মক্ষয় করিবার একটি চমৎকার পন্থা। উহার উপকারিতা আছে এবং উহা শারীরিক এবং মানসিক দুই দিকেই কল্যাণপ্রদ। তবে কোন বিশেষ সাধনার সময় ভ্রমণ বা নানাস্থানে গতিবিধি ভাল নয়। সে সকল উপযুক্ত ক্ষেত্রে সহজ নিয়মেই সমাধান হইয়া যায়। তাঁহার এখন আসন হইতে নড়িবার উপায় নাই, আসন তাঁহাকে স্থির রাখিতেই হইবে, যতদিন কোনও বিশেষ প্রেরণা না আসে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে সকল ব্যভিচার সংস্কার-গত হইয়া গিয়াছে, সে সকল সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য, জানিনা কতকাল একাসনে থাকিতে হইবে।

তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি আর না বসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহারই কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যত হইলাম। তিনি তখন বলিলেন: বাবা শুভ ইচ্ছা রাখবেন, দয়া যেন থাকে। এই এক সত্য—এ জগতের কারো সঙ্গে তিল পরিমাণ মনের গোলমাল থাকলে ইষ্টলাভ হবে না, সকলেরই আশীর্ব্বাদ চাই। একটি শিশু বা ক্ষুদ্র বালক পর্য্যন্ত আমার কোনও ব্যবহারে দুঃখ পাইলে, আমার বিরুদ্ধে কোনও ভাব পোষণ করিলে আর আমার ইষ্টলাভ হবে না, এটা মনে রাখবেন। জীবে জীবে কি যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—তা এর মধ্যেই পাবেন।

এবার কুলদাবাবুর সঙ্গে সিউড়ি যাইতেছি। নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া,—সেখান হইতে ছোট লাইনে বর্দ্ধমান। এ লাইনে গাড়ীর স্প্রিং নাই; সুতরাং ধাকা ও ঝাঁকানী খাইতে খাইতে আড়ষ্ট শরীর লইয়া বর্দ্ধমান হইতে অণ্ডালে আসিলাম। সেখান হইতে লুপ লাইনের গাড়ীতে সিউড়ি যাইতে হইবে। আমি যাইব বক্রেশ্বর পীঠে, সিউড়ির আগে দুবরাজপুর ষ্টেশনে নামিয়া ক্রোশ দুই হাঁটিলেই পৌছানো যায়। কিন্তু এখন কুলদাবাবুর বাড়ী যাওয়া হইবে কাজেই প্রথমে সিউড়ি যাওয়া গেল। কুলদাবাবুর অতিথি হইয়া দুই দিন ছিলাম।

সিউড়ি নগরটি বেশ, শুখ্‌নো খট্ খটে, উঁচু জায়গায়। কোটাবাড়ি অনেক, অনেকটা মেদিনীপুরের মত। কুলদাবাবু তাঁহার অন্তরঙ্গ দুই একজনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তার মধ্যে ওখানকার লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, তাঁর কথাই বেশ মনে আছে। বেশ লোকটি, তাঁহার উদ্যোগেই ওখানকার পাঠাগারের উন্নতি। তিনি যখন আমার চিত্রশিল্পে অধিকারের কথা শুনিলেন তখন ধরিয়া বসিলেন, এখানে থাকিয়া কিছু ছবি আঁকিয়া দিলে বড় ভাল হয়। আমি

বলিলাম: এখন মনটা বড়ই খারাপ—গোলমালের মধ্যে থাকতে পারবো না। এই যুক্তি তাঁর মনঃপুত হইল না; বলিলেন: ধুত্তোর মন খারাপ, রেখে দিন আপনার মন খারাপ। ও সব পরে করবেন এখন আমরা ছাড়ছি না।

আমার তরফের যুক্তি আমি যতই দেখাই না কেন, তাঁর সেই ধুত্তোর,—রেখে দিন ও সব আপনার—। এই বোল ছাড়া আর অন্য কথা নাই। শেষে সাব্যস্ত হইল আমার মাথার ঠিক নাই। যে দুদিন ছিলাম তাঁহার পাঠাগারই ছিল আমার প্রিয় আশ্রয়। দেখিলাম কুলদাবাবু এখানেও কোন কোন লোক-হিতকর কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট আছেন।

কুলদাবাবুর ঘর-কন্নার কথা একটু বলা দরকার মনে করি। তিনি যখন কলিকাতায় নানা কর্ম্মে থাকেন, কিম্বা বাহিরে কোথাও কর্ম্ম-ব্যপদেশে ঘোরা-ফেরা করেন তখন তাঁহার পরিবার-বর্গ এখানেই থাকেন। তাঁর সকল কর্ম্মই একসূত্রে বাঁধা,—একই উদ্দেশ্য লইয়া তাঁর সকল প্রচেষ্টা সম্ভাবিত করিতেছে। ভাগবত-ধর্ম্মই তাঁর জীবনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে মূল অবলম্বন। বাহ্য ব্যাপারে আসক্তি তাঁর অন্য কিছুতেই দেখিলাম না, একমাত্র তামাকের ধূমপান ছাড়া।

সিউড়িতে দুই দিন ছিলাম। কুলদাবাবুর বাড়ীতেই আহার করিতাম। তাঁহার সংসারে এই আহারের মধ্যে কোনও বিলাসিতা নাই। বোলতার টিপের মত মোটা ভাত, এবং অতি সাধারণ উপকরণ দুই তিনটি। শেষে দেশীয় আম, কাঁঠাল এবং দুগ্ধ। ছেলেপুলেরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট বটে, বেশ স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াতেই মানুষ হইতেছে। চমৎকার সেকেলে ধরণের গৃহস্থ। কুলদাবাবু এই বিংশতি শতাব্দীর অন্তর্গত সভ্যজগতের লোক, কিন্তু কোথাও তাঁর ঘর সংসার বা সাংসারিক ব্যাপারে, বেশভূষায় বা আসবাবে, তাহার কোনও প্রকার পরিচয় নাই। অথচ তিনি যে চেষ্টা করিয়া এ চালটি বজায় রাখিয়াছেন তাহাও নয়। যেমন চলছে চলুক,—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন আধুনিক বস্তু তিনি নিজ সংসারে প্রবেশ করান নাই। সহজ নিয়মে যেটা আসিয়া পড়িয়াছে, যেমন চা খাওয়াটা,—তাহাতে বৈরাগ্য নাই। ছেলেপুলেরা, অবশ্য বয়সের তারতম্যে, নগ্ন শরীরে, ধূলামাটি মাখিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, বেশ স্বচ্ছন্দে মানুষ হইতেছে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে নারী যাঁহারা, সকলেই পূর্ণ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করেন। সংসারের সকল কর্ম্মই মেয়েদের হাতে করিয়া করিতে হয়। কোনও কর্ম্মের জন্য বাহিরের লোক নাই। শেষ এইটুকু দেখিলাম, কোন দিকেই কুলদাবাবুর সংসারে, গতানুগতিক প্রথায় প্রয়োজন নিরসন ব্যতীত কোন প্রকার আধুনিকতা প্রবেশ লাভ করে নাই। আমার মনে হইল দেশের সকল সাধারণ গৃহস্থ পরিবারই এই ধরণের।

যাহার জন্য আসিয়াছি, তৃতীয় দিনে তাহার কথা পাড়িলাম। এইবার আমায় বক্রেশ্বরে পাঠিয়ে দিন কিম্বা পথটি বলিয়া দিন এই অনুরোধ করিলাম। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে আর চলে না তখন একটি লোককে সঙ্গে দিয়া বিদায় দিলেন।

সিউড়ি হইতে বক্রেশ্বরের যে পথ, উহা প্রশস্ত এবং নয়ন-বিমোহন। দুই ধারে বড় বড় গাছ। অর্জ্জুন গাছই বেশী। অশ্বত্থ, পাকুড়, কাঁঠাল, তেঁতুল প্রভৃতি বড় জাতের গাছ

চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ওধারে সকল জমিই উঁচু নীচু, ঢেউ খেলানো,—মালভূমি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই বীরভূম ও বাঁকুড়ার সর্ব্বত্রই। কোথাও কোথাও মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের মত লাল মাটিও আছে। নিম্ন বঙ্গের স্যাঁৎসেতে ভাব একেবারেই নাই। প্রভাতে মেঘলা আকাশের সঙ্গে পথের দুই ধারে ঘন পত্র শাখাময় তরুর সারি এবং দূরস্থিত গভীর শালবনের একটা আশ্চর্য্য ঘন সম্বন্ধ আছে, যাহা পথিকের মনকে ভুলাইয়া দেয়। পথশ্রমের আভাষও মনে আসিতে দেয় না। আবার তাহার মধ্যে যখন মাঝে মাঝে সূর্য্য উদয় হন, অকস্মাৎ তরু গুল্ম-লতাপূর্ণ বনভূমির শোভা পরিবর্ত্তিত হয়, মনে হয় যেন বিশ্ব-আত্মার সকল প্রকাশটুকুই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, অস্পষ্টতা কোথাও নেই, যেন স্পষ্ট নিঃসর্গের অস্তিত্ব রৌদ্রজ্বালার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তরুতল ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া দীপ্তাংশু জ্বালাময় করিয়া দিয়াছে ; প্রায় দুই ক্রোশের মাথায় একটি



বাঁকের মুখে একটা বিশাল অর্জ্জুন গাছ, তাহার তলায় দুই চারিজন লোক বসিয়া কথা কহিতেছে, তামাক খাইতেছে, আর দূরে মাঠের দিকে মাঝে মাঝে চাহিতেছে। সেখানে হাল কাঁধে দুজোড়া গরু, চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম : বক্রেশ্বর কোনদিকে যাব ?

আপুনি কোন গাঁয়ের বট ?

কলিকাতায়ই আমাদের ঘর।

কিসের লেগে বক্কোমুনির থানে যাইছেন? মানত আছে বটে?

পীঠস্থান কি না—তাই।

যান্ ক্যান্নে হৈ সোজা হো বাঠে, গাঁয়ে যেঁয়ে উঠবেন গা। হোই যে গাঁ দিশছে।—কোথা হোতে আইছেন?

সিউড়ি থেকে আজ আসছি, বলিয়া পা চালাইলাম; পশ্চাতে শুনিলাম,—মনিষটা ভাল বটে গো! এবারে বড় রাস্তা ছাড়িয়া বামে চলিলাম। ধূ-ধূ মাঠ, দূরে দূরে গ্রাম এক এক খানি দেখা যাইতেছে, ঘন রেখার মত। উঁচু-নীচু মাঠ, তার মাঝে দুই একটি বড় গাছ। বহু দূরে ঈষৎ নীল রেখা, কোন পাহাড় হইবে। দেখিতে দেখিতে বক্রেশ্বরে আসিয়া পৌছিলাম। কুলদাবাবু বলিয়া দিয়াছিলেন, কালীবাড়ীতে গিয়া উঠিবেন। তাহাই আমি করিলাম।

বড় না হইলেও ছোট নয়, মন্দিরটি আধুনিক বাঙ্গলা মন্দিরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। জগদম্বার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা-নিবাসী কোন বড় ব্যবসায়ী ব্যক্তি, সাধু, সন্ত, গৃহস্থ যাঁহারা এই তীর্থে আসিয়া নিজেদের অসহায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের একবেলা প্রসাদান্ন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী এখানে আছেন, তিনিই পূজা, ভোগ, রাগ, সেবাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। নামটি বোধ হয় পুণ্ডরীকাক্ষ। কেবল মুখে হাসি, ভাল লোকটি। ত্রিশ বত্রিশ-এর মধ্যেই বয়স, শান্ত, সাত্ত্বিক প্রকৃতি।

আগে কেহ এখানে খবর দিয়াছিল কিনা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আসিয়া দেখিলাম কোন প্রকার পরিচয় বা এখানে থাকিবার জন্য স্থানের কোনরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইল না। ব্যবস্থা সব যেন পূর্ব্ব হইতেই ঠিক হইয়া আছে।

এখানে পাপহরা বলিয়া একটি প্রবাহ আছে, তাহার তীরে শ্মশান। পাপহরার কথা বলিবার পূর্ব্বে এখানে যে ছয়টি কুণ্ড বা উষ্ণ জল-প্রবাহ আছে তাহাদের পরিচয়ই প্রথম, যেহেতু ঐ কুণ্ড কয়টির ধারাগুলি হইতেই পাপহরার জন্ম।

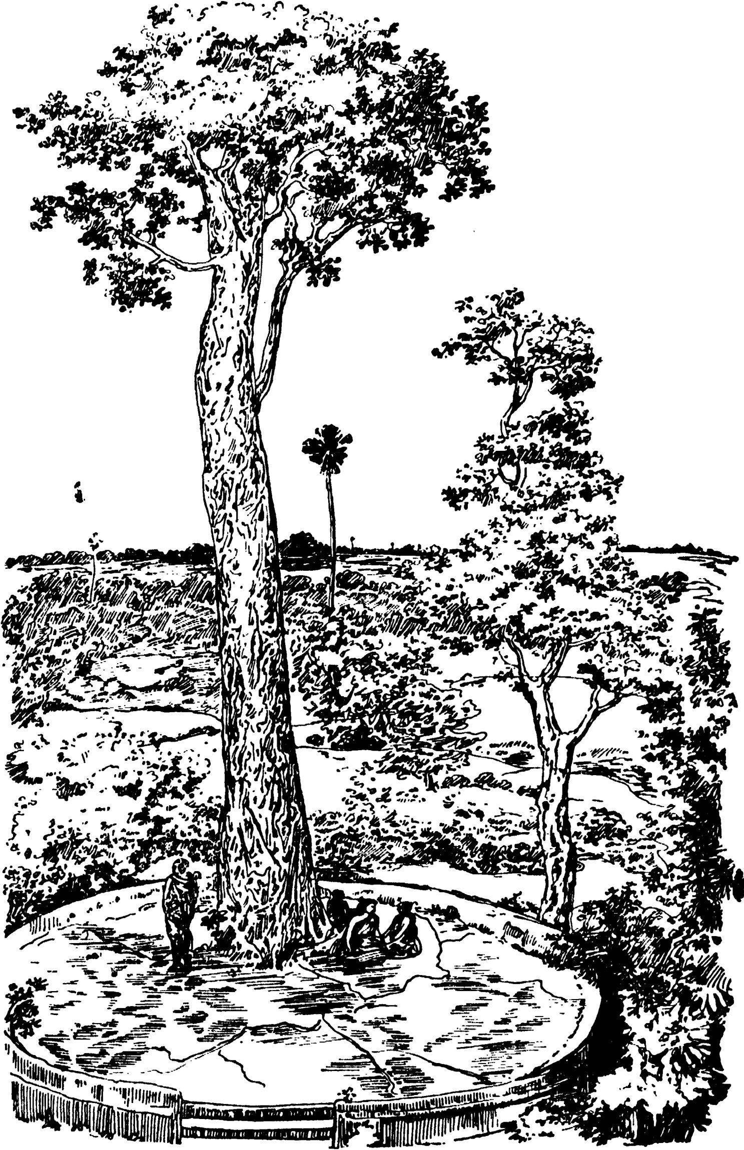
পাপহরাকে গঙ্গা বলিবার প্রথাও আছে। আসল গঙ্গার সঙ্গে পাপহরার ভৌগোলিক কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু একটি বিষয়ে কিছু সম্বন্ধ আছে অস্বীকার করিবার নয়। সদ্যপাতক-সংহন্ত্রী, এই যে গঙ্গার গুণ, ভাবের দিক দিয়াই হোক বা বিজ্ঞানের দিক দিয়াই হোক,—জলের গুণেই হোক বা ধর্ম্ম-সংস্কারের গুণেই হোক, স্নান করিলেই শরীর ও মনের উপরে তাহার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়। আবার অধিক দিন স্নান অভ্যাস করিলে শরীর নীরোগ হয়,—পাপহরারও সেই গুণ স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, যদিও আগে শুনিয়া বিশ্বাস করি নাই। অনেক রোগী বহু দূর দূরান্তর হইতে এই পাপহরায় স্নান করিতে আসে এবং ফলও পায়। যাত্রীর সংখ্যা প্রত্যহ এখানে খুবই কম, তবে মাঝে মাঝে বেশ হয়। স্নান এই পাপহরায়, আর আহার কালীমার প্রসাদান্ন। রাত্রে সামান্য কিছু জলযোগ। দিনমানে কোনদিন কিছু-কিছু ফাউ জুটিত সে কথা পরে বলিব।

অন্নগত প্রাণ বলিয়া কালীবাড়ীর কথা প্রথমে বলিলাম, যেহেতু সেইখানেই দৈনন্দিন অন্নের ব্যবস্থাটা ছিল বলিয়াই দুই মাসকাল নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্ধন্দ্বে কাটাইতে পারিয়াছি। বক্রেশ্বরে আসিয়া বক্রেশ্বরের কথাই প্রথম এবং প্রধান। ইহা অবশ্যই প্রথমে জানা ছিল যে এখানে সতী-অঙ্গ পড়ার জন্য এ পীঠস্থানের মাহাত্ম্য কম নয়, বক্রেশ্বর ভৈরব এই স্থানের অধিপতি। তাহার উপর আবার মহাযোগী অষ্টাবক্র এইস্থানে সাধন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহা সিদ্ধপীঠ। তন্ত্রমতে মহা মহা কঠিন সাধন-সকল এই সিদ্ধপীঠে বহুকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সিদ্ধাসন এখানে বহুকাল হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছে তবে এখন আর এখানে কোন সাধক নাই।



সিদ্ধপীঠের চিহ্ন এখন যে কয়টি এখানে আছে তাহার মধ্যে যে এক বিশাল নিদর্শন এখনও রহিয়াছে তাহা বোধ হয় আর অন্য কোনও পীঠে নাই। একটি উচ্চ প্রকাণ্ড গোলাকার বেদী, মধ্যে একটি বিশালায়তন মহীরুহ। এত লম্বা গাছ কোথাও আমি দেখি নাই। ক্যালিফর্ণিয়ার জঙ্গলে যে দানবাকৃতি বৃক্ষের কথা শুনি, এটি তার ছোট ভাই। কাণ্ডটি ফাটিয়া ফাটিয়া, অসংখ্য গভীর রেখাপাত করিতে করিতে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, মধ্যে কোথাও শাখা বা পত্র নাই। শীর্ষদেশে কতকটা শাখা পত্র সমন্বিত, প্রায় একটি ছাতার মত। উপরের দিকে চাহিলে মাথার পাগড়ি খসিয়া পড়ে। পাতাগুলি বেশ বড় বড়, ছোট নয়, অনেকটা সেগুণ পাতার মত, আকৃতিটি একটু বিভিন্ন ধরণের। ঐ বেদীতেই অনেকানেক সাধু মহাপুরুষের পায়ের ধূলা পড়িয়াছে। গাছটি যে কত কালের তাহা ওখানকার কেহই জানে না। আমি ১৯১৫।১৬ সালের কথা

বলিতেছি, এই বিশাল শমী বৃক্ষটি কত বড় বড় ঝড়-ঝাপটা খাইয়া এখনও নিজ শক্তিতে দাঁড়াইয়া আছে—ইনি যে কত কালের, কত কত ব্যাপারের সাক্ষী তাহা কেহ জানে না।



এখন ইহার চারিদিকেই জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। ইহার পরেই বিশাল বটবৃক্ষ। ঠিক অষ্টাবক্র মুনির সিদ্ধাসনের উপরেই। তার পাশেই কুণ্ড। সর্ব্বত্র কুণ্ডগুলি যেমন হইয়া থাকে, এখানেও তাই কুণ্ডগুলি বাঁধানো,—পাঁচ ছয়টি সিঁড়ি নামিয়া কুণ্ডের জলে হাত দিতে হয়।

অল্প বিস্তর সকল কুণ্ডই উষ্ণ। এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলিই বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য, গোড়ার এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না। যত পীঠস্থান বা তীর্থ আমাদের এই ভারতবর্ষে আছে সেগুলির স্থান-মাহাত্ম্য যথার্থই উচ্চ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। বিচারে নিঃশেষ সত্য বলিয়াই ইহা স্থির, যাহার মধ্যে কোনও প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই কুণ্ডটি বক্রেশ্বর ভৈরবের মন্দির-পার্শ্বেই। এক সময়ে এখানে বহু তান্ত্রিক সাধকের অবস্থিতি ছিল। এখন অর্থাৎ যখন কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি ওখানে উপস্থিত হইলাম, তখন দুইটি মূর্ত্তি ওখানে দেখিলাম, অবশ্য সে দুইটিই আমায় কিছুমাত্র আকৃষ্ট করিবার যত্ন করেন নাই, শ্রদ্ধা আমারও কিছু হয় নাই কাজেই ঘনিষ্ঠতাও হইতে পায় নাই। এই দুই জনের মধ্যে কোনটি আসল, কোনটিই বা মেকী তা চিনিয়া লইবার শক্তি ত আমার মত লোকের না থাকারই কথা,—তথাপি বিচক্ষণতার অভিমান ত আমার কিছু আছেই, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ঠিক করিলাম ইহার মধ্যে একজন ভাল অপরটি মেকী। যেটিকে ভাল অনুমান করিলাম, অর্থাৎ প্রথমেই দুই চারিটি কথা শুনিয়া, অপর জনের সঙ্গে তুলনায় কিছু ভাল বলিয়া লইতে আমার মন পছন্দ করিল, তার নাম বৈদ্যনাথ বা বোদে পাগলা। আর যাঁর প্রতি আমার মন বিমুখ হইল তার পূর্ব্বাশ্রমের নাম অনুকূলচন্দ্র। জাতি আগুরী অর্থাৎ উগ্র ক্ষত্রিয়। এখন রাঙ্গা কাপড় পরিয়া সেই নামটিতে আনন্দ-যোগে অনুকূলানন্দ হইয়াছে। মূর্ত্তিই মানুষের প্রকৃতিগত গুণাবলীর পরিষ্কার আলেক্ষ্য, অবশ্য দেখিতে যে জানে। যে জানেনা, তাহার কাছে অনুকূলানন্দ স্বামী প্রথমেই গ্রাহ্য হইবেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের কোন আকর্ষণই নাই। কালো রং, ঢ্যাঙ্গা, রোগা, গোঁফদাড়ী মুখ ভরা, গলার আওয়াজ খাদের ষড়জ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত তিনটি পরদার মধ্যেই খেলে, তাহার উপরে উঠিতে দেখি নাই। কিন্তু অপরটির মূর্ত্তি রাজসিক, শক্তিহীন হইলেও লাল রংটা এখনও আছে, খর্ব্বাকৃতি, সম্মুখের নীচের পাটির তিন চারিটি দাঁত নাই। তাহার কিছু কৈফিয়ৎ সঙ্গে সঙ্গেই আছে,—সকলেই বলে বাঁধিয়ে নিতে, ছোঃ, আমার ওসব পছন্দ নয়,—রামোঃ, কি হবে দুটো দাঁত বাঁধিয়ে, লোককে দেখানো যে আমার বয়স হয় নি। যদিও আমার দাঁত পড়ার অন্য কারণ আছে ;—আমার এই



শ্রাবণে বিয়াল্লিশ কম্‌পিলিট হবে। খুব অসুখ করেছিল কিনা!—খুব ভুগেছিলুম, বাঁচবার আশা ত ছিল না। উঃ সে কি ভীষণ যন্ত্রণা,—শালা ডাক্তারগুলো খুব আরোক খাইয়েছিল, সেই থেকেই ত দাঁতগুলো গেল।

আরও একটি কথা তার মুখ হইতে প্রায়ই বাহির হইয়া যাইত,—ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি যখন তখন কি কোনও শালাকে গ্রাহ্য করি। কোন বেটাবেটির সাহায্য আমি চাই না। তাঁর গলা মুদারা ও তারা দুই গ্রামেই চলে, সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ যথেষ্টই আছে, প্রায়ই তার পরিচয় পাইতাম।

আমাদের এই বস্তিনাথ যেখানে সেখানে পড়ে থাকেন, কোথায় কখন থাকেন, রাত কাটান তা কেহই খোঁজ করি নাই। কিন্তু এই অনুকূলানন্দ থাকেন যেখানে সে স্থানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দরজাহীন ঘরের একটি আনলায় তাঁর কাপড় চোপড় ঝোলানো থাকে। কম্বলের একটি পরিষ্কার বিছানা সেখানে দেখা যায়। সেটি শয়নের সময় পাতা হয়, অন্য সময় বেশ গুছিয়ে তুলে রাখা হয়, একটি মাদুর তার উপরে একখানি আসন পেতে তিনি দিনমানে বসেন। কালীবাড়িতে প্রসাদ পাবার ঘণ্টা বাজলেই, বেশ মাজা উজ্জ্বল একটি ঘটী নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। দেহগত সকল ব্যবহারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ একটি গোছালো গিন্নী-ভাব তাঁর সব সময়েই দেখা যায়।

সকালে তাঁকে নদীতীরে বেড়াতে দেখা যায়। প্রত্যহ তাঁর এ সৎ-অভ্যাস অনুযায়ী এ কাজটি ঠিকই হয়, ব্যতিক্রম হয় না, কোন দিন দেখি নাই। তারপর একটু চা পানের অভ্যাস আছে। তার জন্য তোড়-জোড় তাঁর অভাব নাই। গাঁজা, চরস, তাঁর ঠিক সময়মত সেবন করা অভ্যাস আছে। সে সময় বস্তিনাথকেও দেখা যায় কারণ এই মহৎ অভ্যাস তাঁর বড় কম দিন নয়। আবার এই সময় ছাড়া দুজনের প্রীতিও থাকে না। বস্তিনাথের মুখে কারো নিন্দা শোনা যায় না কিন্তু অনুকূলানন্দর মুখে বস্তিনাথের নিন্দা শোনা যায়। বেটা ছোট লোক, রাজবংশী, বেটা মুখ্‌খু, ওর আবার কি হবে!—এই রকম।

এই দুই মূর্ত্তির বক্রেশ্বর ভৈরবের মন্দিরে অধিষ্ঠানকালে, আমি যখন আসিয়া কিছুদিন থাকিবার অভিপ্রায় জানাইলাম, বৈদ্যনাথ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, মুখে তাঁর বড় প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল, কিন্তু অপর জন মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিলেন: এখানে থাকা কি সুবিধা হবে? জায়গা কোথা, আমার এই টুকুর মধ্যে দুজনের ত জায়গা হবে না। শুনিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন: ক্যানে, জায়গার অভাব কি,—মন্দিরের পিছনে লম্বা উঁচু দাওয়া রঁইছে ত বটে,—আরও কত ঘর রঁইছে, থাকবার ভাবনা হবেক্ ক্যানে?

অনুকূলানন্দ তখন বলিলেন: হাঁ, আমি তাই বলছি,—আমার এখানে জায়গা কম কিনা? দুজনের থাকা—

বক্রেশ্বর মন্দিরের পিছনে লম্বা বারান্দা, তার ছাদ ঢালু, বেশ উঁচু দাওয়ার মত। দেওয়াল ও ছাদ সবই পাকা, বেশ মোটা খুঁটি, সেজন্য দাওয়ার সঙ্গে তার মিলটা বেশী

চওড়া প্রায় ছয় হাত, লম্বা চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেখানে অনেক লোকই থাকিতে পারে। সেইখানেই আমার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। দিনমানেও ঐখানে থাকিতাম।

তখন বর্ষা, শ্রাবণ মাস। প্রখর রৌদ্র বেশী দিন ভোগ করিবার সুযোগ হয় নাই। বাহিরে শিবালয়ের উচ্চ ভূমি হইতে নামিয়া কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ সারি সারি চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকেই প্রাচীর বেষ্টিত, একদিকে জলে নামিবার কয়েকটি ধাপ, সেদিকটা কতকটা খোলা। চতুষ্কোণ, বড় চৌবাচ্চার মত। ফুটন্ত জল অবিরাম উঠিতেছে এবং একটি প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া পাপহরার অঙ্গে যাইয়া মিশিতেছে। সকলগুলিই এক রকম। কুণ্ডগুলির এক দিকে পথ, অপর দিকে বেলগাছ, তাহাতে ছোট ছোট ফল ধরিয়াই আছে। দুই চারিটা আম, জাম, জামরুল গাছও আছে। কুণ্ডগুলি এবং পাপহরার মধ্যে যাতায়াতের পথ, উঁচু-নীচু, ঘন তৃণ-গুল্ম আচ্ছাদিত, কেবল চলিবার স্থানটুকু কাঁকর মাটি, পাথরে ঢাকা। পাপহরার ওপারে দক্ষিণে শ্মশান, বাকি সকল স্থানই জঙ্গলময়, একেবারে নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বক্রেশ্বর পীঠস্থানের চতুর্দ্দিকেই নানাপ্রকার ধ্বংসাবশেষ। মন্দির, আবাসস্থান, ইষ্টক-নির্ম্মিত নানাপ্রকার গৃহ সকল যেভাবে ইতস্ততঃ বিস্তৃত দেখা যায়—উহা এক সময় ঘন জন-সন্নিবিষ্ট পল্লী ছিল,—বহু লোকের অবস্থিতির চিহ্নসকল এখনও জীবন্ত দেখিতেছি। এই ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব লোপ হইতে এখনো অনেক দিন যাইবে। অশ্বত্থ ও বট এই দুইটি বৃক্ষই খুব শীঘ্র শীঘ্র এই সকল কীর্ত্তিধ্বংস লীলার সহায়তা করিয়াছে। এখানে ম্যালেরিয়া নাই, কিন্তু মশার উপদ্রব অত্যন্ত এবং অসহ্য।

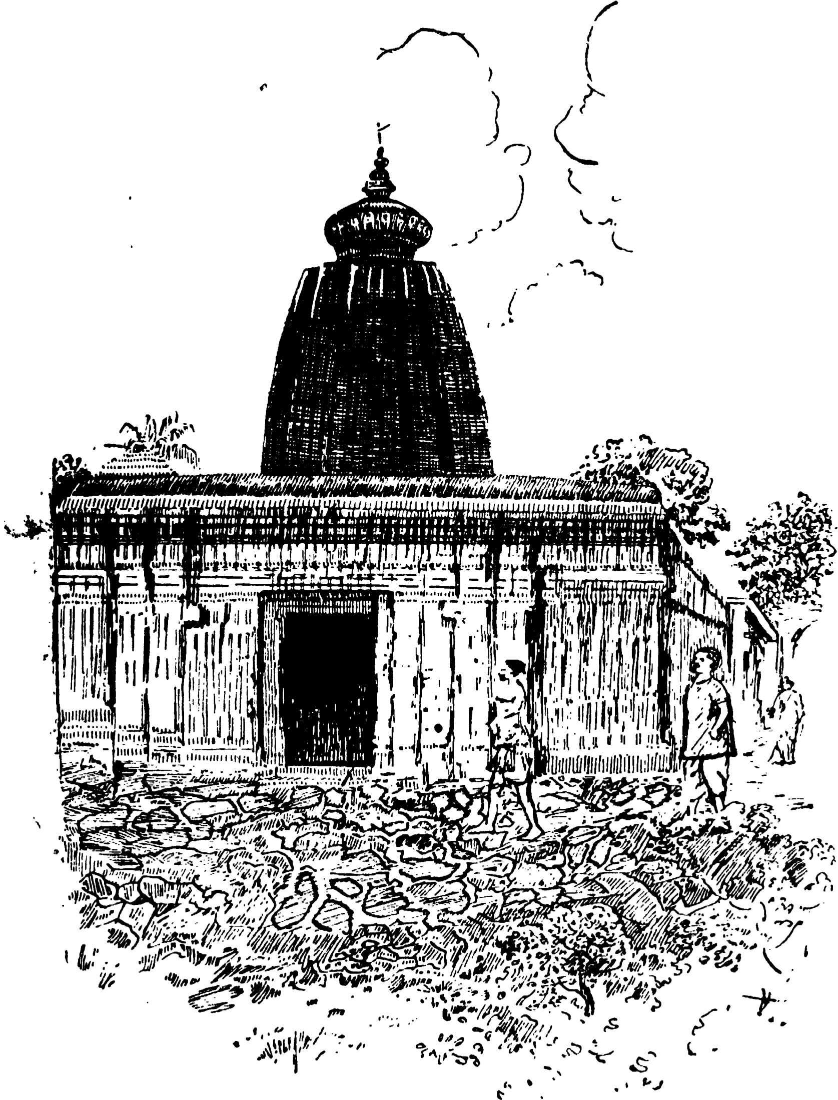
যদি প্রাচীন কালের কথাই ধরা যায়,—এই অষ্টাবক্র মহাযোগীর আশ্রমটি বড় কম ছিল না। এখানে কম করিয়া সহস্রাধিক আনুষ্ঠানিক যোগী, ব্রহ্মচারী, প্রবর্ত্তক, শিষ্য সেবকাদির অধিষ্ঠান ছিল। বহু ধনবান গৃহী, বণিক, নরপতির যাতায়াত ছিল। এখানকার যত প্রতিষ্ঠান, একসময় কাশী, কোশল অবধি বিস্তৃত হইয়া যোগমার্গের কত শত সহস্র মানুষের বিশিষ্ট আকর্ষণের বস্তু ছিল। সাধনের যে সকল বিশিষ্ট ক্ষেত্র ভারতে আছে, এক সময় এ ক্ষেত্রটি তাহাদের তুলনায় বড় কম ছিল না।

১৪

বক্রেশ্বর শিবমন্দির, মহাযোগী অষ্টাবক্র স্থাপিত সেই পুরাতন মন্দির নয় যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্ত্তি বা বিগ্রহ সেই বটে। প্রাচীন মন্দিরটি প্রাচীন কালেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তারপর আবার অবস্থানুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়বার হইয়াছে তাহা জানা যায় না। এখনকার মন্দিরটি অতি সাধারণ, দক্ষিণের মন্দিরের সরলতম অনুকরণ; কেবল চূড়া হইতে মধ্যস্থান পর্য্যন্ত পল দেওয়া আছে। তারপর সাধারণ ঘরবাড়ির দেওয়ালের মত। দ্বারের কোন শিল্প-বৈশিষ্ট্য নাই। ভিতরে প্রবেশ করিলে ছোট অন্ধকার একটি সমচতুষ্কোণ নাটমন্দিরের অবয়ব। তার পরই অন্ধকারময় গর্ভগৃহ।

এই মন্দির-অধিষ্ঠিত প্রাচীন লিঙ্গের পূজার ব্যবস্থা পাণ্ডাদের উপর বহুকাল হইতেই আছে।

পাণ্ডাদের বংশ কম নয়। তাঁহাদের পুতিতুণ্ড উপাধি, ব্রাহ্মণ-বংশীয়। এই উপাধির ব্রাহ্মণ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কেবল দক্ষিণ বাঙ্গলায় আমার মাতুলেরা কয়েক ঘর বর্ত্তমান। যাহা হউক এখানকার পাণ্ডারা সকলেই গৃহস্থ। তাঁহাদের এক এক ঘরের উপর



পালাক্রমে এক এক দিনের পূজা ভোগরাগ প্রভৃতি নির্দ্ধারিত আছে। সেদিনকার যাত্রিদলের নিকট যত কিছু পূজার জন্য পাওনা, প্রণামীর টাকা পয়সা ইত্যাদি সমস্তই সেই পাণ্ডার। প্রতিদিনই প্রাতে একদল পাণ্ডা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া হল্লা করিত, সেটা প্রায় আড়াই প্রহর অবধি চলিত। ভোগ আরতি কাজগুলি শেষ হইতে প্রায় দুইটা হইত। যাত্রিদল বেশী

থাকিলে, বেলা আরও বেশী হইত। পূজার ব্যাপার যাহাই হউক না কেন, বক্রেশ্বর শিবের নিত্য পায়সান্ন ব্যতীত অন্য কোনও ভোগের ব্যবস্থা দেখি নাই।

ওখানে, মন্দিরের পশ্চাতে দাওয়ায় আশ্রয় লইবার পর দুই চার দিন গত হইলে একদিন কালীবাড়ী হইতে প্রসাদ পাইয়া আসিয়া বসিয়াছি,—একজন পাণ্ডা ছোট একটি থালায় ঢালা পায়সান্ন আনিয়া বলিল : প্রসাদ, নিয়ে নিন।

কোন পাত্র না থাকার কথা যখন আমি বলিলাম, তখন তিনি বলিলেন : এই পাত্রই এখন আপনার কাছে থাকুক কাল লইয়া যাইব। বলিয়া চলিয়া গেল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখি আমাদের বৈদ্যনাথ আসিতেছে। এইমাত্র এক সঙ্গেই আমরা কালীবাড়ীতে প্রসাদ পাইয়াছি। আমি ডাকিলাম এবং প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম।

বৈদ্যনাথ বলিল : তা হবেক্ নাই—আপনি খান কেথে। আপনার লেগে আইচে আমি লিব কেনে ?—

আমি বলিলাম : এই মাত্র খেয়ে আসছি,—

বাধা দিয়া বৈদ্যনাথ বলিল : আমুও ত আপনার সঙ্গেই খাইচি।

তাহা হইলে কি করা যায়—শেষে দুজনে মিলিয়া প্রসাদটি শেষ করিতে হইল।

সেই অবধি প্রত্যহ একটি থালায় পায়সান্ন প্রসাদ আসিত, একদিনও বাদ যায় নাই। এখন বৈদ্যনাথকে লইয়াই কথা।

জিজ্ঞাসা করিলাম : বৈদ্যনাথ, তোমার ভৈরবী আছে শুনলাম।

আছেই ত, বটে। কাল বাদে পরশু যাবগা, লিয়ে আসব হেথায়। কেনে, আপুনি ভৈরবী লন নাই ?—আপনাদের সাধন কেমন ?

আমি বলিলাম : আমার অন্য পথ বৈদ্যনাথ, তবে তোমাদের ভজন সাধন দেখতেই এখানে এসেছি। একবার তোমরা আমায় চক্রে নিয়ে যাবে ?—

তাতে কি, আপুনি এলেই ত হয়, তবে আমাদের চক্রে গেলে পঞ্চ-মকার করতে হয়। আপনি করতে পারবেন ?—আপনি ত মদ মাংস খান না। আমি বলিলাম : শুধু দেখবো। তখন বৈদ্যনাথ বলিল : তা হবেক কেনে, বাপু—অন্য বৈরাগীদের আমাদের ভিতর নিতে লারবো। বাধা আছে। তবে চক্রেশ্বর * যদি লন তবেই হতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : নদীতীরে ঐ শ্মশানে যে একজন উলঙ্গ সাধু থাকেন তাঁর কি ভাব ?

বৈদ্যনাথ : ও যে অঘোরী,—উনি ত খ্যাপা বাবা ওঁর কথা ছেড়ে দেন।

আমি : ওঁর ভৈরবী নাই ?

বৈদ্যনাথ : না, ওঁর ওসব দরকার নাই, উনি সিদ্ধ।

আমি : কতদিন উনি এখানে আছেন ?—

বৈদ্যনাথ : আমি ত বছর দেড়েক দেখছি, উনি ত বরাবর থাকেন না, মাঝে মাঝে চলে যান।

* চক্রের মধ্যে একজন প্রধান থাকেন, তিনিই চক্রেশ্বর।

আমি : কোথায় ?—বৈদ্যনাথ বলিল : তা বোলতে লারী, চলুনা ওঁর কাছে, যাবেন ? আমি বলিলাম : যাব বটে এক সময় কিন্তু এখন নয়। সেদিন যে তাড়া করে ছিলেন একজনকে, জলন্ত চেলাকাঠ নিয়ে—আমার ভয় করে, ওরকম ভয়ঙ্কর রাগী লোকের কাছে যেতে। তোমরা যখন যাও কিছু বলেন না ?—

বৈদ্যনাথ হাসিয়া বলিল :—ওঁর রাগ কোথা ?—রাগবেন কেনে,—মাঝে মাঝে সকলে যে জ্বালাতন করে, বাবা ওমুক দাও, ফলনা দাও, তুসকো দাও, আবার রোগ সারিয়ে দাও এসব বোলে যে জ্বালাতন করে। তা একটু ভয় দেখিয়েছেন।

আমি বলিলাম : উনি কি রোগ ভাল করতে পারেন ? কব্‌রেজী জানেন বুঝি ?

বৈদ্যনাথ : খার কোবরেজী, ওঁর কোবরেজী জানতে হবেক কেনে,—ওঁর যে ভগবান, যাকে যা বলেন, যাকে যা দেন তা ঠিক হয়। সেবারে একটি মানুষকে একেবারে খেয়ে দিলেন ?

আমি : খেয়ে দিলেন ? কি রকম, তাকে মেরে কাঁচা খেয়ে ফেল্লেন না কি ?

বৈদ্যনাথ বলিল : তা হবেক কেনে, সে যে ওকে এখান হতে উঠাবার জন্যে কোম্পানির সাহেবকে বোলেছিলো গো। তাই তাকে খেয়ে দিচেন। তিন রাত্তির গেল না, কলেরা হয়ে মোলো গা। বাবাকে চটালেই মুস্কিল। সে মরবে, তাকে যমের ঘরকে যেতে হবেক যে।

আমি বলিলাম : তা হোলে কাজ নেই অমন লোকের কাছে গিয়ে, কি বল বদ্যিনাথ ?

বৈদ্যনাথ : তা আপুনি চলুন না কেনে, কিছুই হবেক নাই। আপুনি ত ভাল মানুষ বটে।

আমি : যদি যাই ত তোমারই সঙ্গে যাবো, একদিন বুঝে সুঝে যাবো। আচ্ছা, উনি ত দিনের বেলায় বেরোন না, সমস্ত দিনই কি ঐ কুঁড়ের মধ্যেই থাকেন ?

বৈদ্যনাথ : তাই তো থাকেন, কদাচ কোন দিন বেড়িয়ে পড়েন, কিন্তু ঐ শ্মশান থেকে আর কোথাও যান না। এক একদিন সকাল থেকে জলেই পড়ে আছেন। কখন ডুবছেন কখনও উঠচেন কখনও ভেসে চললেন মড়ার মত। ওঁয়ার কথা বলেন কেনে।

আমি : আচ্ছা, তুমি কি ঠিক জানো উনি তান্ত্রিক নন ?

হাঁ গো, ঠিক জানবোনা কেনে,—তাহোলে ত ভৈরবী থাকতো। এতদিন ত এখানে রইছেন কখনও ত কোন ভৈরবীর সঙ্গে কিছু দেখলাম না। একবার এক ভৈরবী খ্যাপাবাবার কাছে গিয়েছিল, তখন ঘরের মধ্যে ছিলেন, তারপর বেরিয়েঁ এসে এক ঠাঁয়ে বোসলেন গা। ভৈরবী মেয়েটিও বোসলো। তার পর, অনেকক্ষণ আমরা এদিক থেকে দেখছি,—বেলা শেষ হয়ে এসেছে, ভৈরবী চক্ষের জল মুছতে মুছতে চোলে এলো। তার পর আর কাউকে দেখি নাই।

আমি : আচ্ছা, উনি খান কি ? বৈদ্যনাথ : খাবেন একবার রাত্রে। কোন রাতে হয়ত খেলেন না। দেখেছি যদি খান ত ঐ রেতেই খান।

আমি : তুমি রাত্রে কখনও গিয়েছ ? বৈদ্যনাথ : হেঁ, যাবনাই কেনে, আমায় ত উনি ভালবাসেন বটে। দিনে যাই রেতে যাই, আমায় কখনও কিছু বলেন না।

ওঁর সাধন ভজন কি রকম দেখেছ ?—

ওঁর আবার সাধনের কথা কন কেনে, উনি ত সিদ্ধ,—ওঁর ও সব কিছু করতে হয় না।

তোমায় কি বলেন ? কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে কি ?

আমার কি দরকার, আমি জিজ্ঞাঁসবো কেনে ?—যাই পেণাম দিয়ে বসি, আর তামাকটা আসটা পেসাদ পাই,—কখনও বা কারণ করলাম, তা এক কলসী খেলেও কে বোলবেক যে বাবা কারণ খেঁইচে। একবার একজনরা শবদাহ করতে যাই ছিলো, আমার সামনে দেখেছি, একটি কলসী খাঁওয়া করায়ে দেইছিলো। যেমন বাবা তেমনি বাবা, কিছুই নেশা হোলো নাই। কতকক্ষণ পর একবার প্রস্রাব করলেন, ব্যাস্। ওঁর কারণ করা দেখে তাদের নেশা ছুটে গেল গা। বলে, বাবা, এমন কুথাও দেখি নাই।

আচ্ছা বিত্তনাথ, তোমার এসব কি মনে হয়, ঠিক করে আমায় বল দেখি !

বৈত্তনাথ মাথা চুলকাইয়া বলিল : শক্তি আছে বৈকি ? অথচ কোনও ভৈরবীও নাই, কোন শক্তি সঙ্গে রাখেন না। তবে সত্য বোলতে কি,—ও সব ভূত-সিদ্ধি মনে হয় বটে গো ! না হোলে এমনটা পারবেক কেনে ! কি বলেন আপনি ?

তোমার ওঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা খুব না ?—

তা হবেক নাই, অতটা ক্ষমতা। কিন্তু কোনও দোষের কথা বোলতে লারবো। কোন দিন কিছু দোষ ত দেখলাম না মশয়। উনি শিব বটে গো। দেখবেন, আপুনি ত যাবেন দেখবেন।

বৈত্তনাথের কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল বাড়িয়া গেল বটে কিন্তু ভয়ও তার সঙ্গে কম ছিল না। ভাবিলাম, বৈত্তনাথকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র যাইব। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম : আচ্ছা কখন গেলে দেখার সুবিধে হবে বল দেখি ?

হাসিয়া সে বলিল : হোই দেখেন দেখি, আপনার যখন ইচ্ছা তখনই যাবেন।

আচ্ছা রাত্রে সুবিধা হয় না ?—

হবেনা কেনে,—উনি ত ঘুমান না, ওঁর ঘুম নাই। আজ এতদিন আইচেন আমরা কখনও ওঁকে ত শুতে দেখলাম না।

সারা রাত করেন কি ?—

কখনও চুপ করে বসে থাকেন, কখনও ঘুরে বেড়ান ঐ শ্মশানে জঙ্গলে, যেখানে খুসী।

তবে চল আজই রেতে যাব।

আজ যে আমি সাঁইতে যাব গা। ভৈরবীকে আনতে, বোললাম না ?—

তা হোলে তুমি এলে পর তখন হবে, কি বলো ?—

তাই করবেন। আপুনি একলা যান না, কি হবে খেয়ে ফেলবে না কি, বাঘ না ভালুক ?—

ঐ যে বোললে। উনি খেয়েওছেন যে। কি জানি আমার একলা যেতে ভরসা হচ্ছে না। কেমন একটা সঙ্কোচ হোচ্চে—। তা হোলে থাক্ তুমি ফিরে এলেই হবে তখন।

আমি বোলে রাখি, বৈদ্যনাথ বলিল,—শেষে আমায় দোষ দিবেন না,—আমার দেরী হোয়েও যেতে পারে। দুই চার দিন হয়ত হবেক।

এত দেরী হবে কেন ?—তুমি ত বোললে তাকে নিয়েই চলে আসবে।

বৈদ্যনাথ বলিল: তবে আপনাকে বলি। তাকে চেলা কঠের বাড়ি মাথায় খুব পিটে দিইছিলাম, সেটা ঘা হোইচে। সে কেমন আছে জানলাম না। হয়ত বা হাসপাতালে লিয়ে যেতে হবেক।

এমন মারলে যে ঘা হোয়ে গেল ?—

তা হবেক নাই। কথা শুনে না যে। একগুয়ে মেয়ে বটে যে। বোললাম এখন যাসনা, আমি দুচার দিন পরে রেখে আসবো গা। তা শুনবেনি,—আমার কথা। তাই দিলাম একঘা কসিয়ে—যা মরগা যা, চুলায় যা। সেইত গেছে গো।

বৈদ্যনাথ পরদিন সাঁইতে গেল, আমি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলাম। মধ্যে মধ্যে খ্যাপা বাবার গতিবিধি লক্ষ্যও করিতেছিলাম। দিনমানে তাঁহাকে বড় একটা কুটীরের বাহিরে আসিতে দেখি নাই।

সে দিন ঘোর ঘনঘটা করিয়া বর্ষা নামিয়াছে। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিতেছে। কাপড় আর শুকায় না। আমার বারান্দার ছাদ হইতে টপ্ টপ্ জল পড়িতেছে। একলা চুপ্ করিয়া বসিয়া আছি। দুই চারিজন যাত্রী আসিল এবং এইখানেই আশ্রয় লইল। তাদের সঙ্গে একটি নারী। একটি ছোট ছেলেও আছে। সঙ্গে তাদের দুজন বেশ জোয়ান পুরুষ। দেখিয়া ভদ্রঘরের মনে হয়।

একজন আসিয়া কাছে বসিয়া বলিল: আজ খুব বাদল নেমেছে। তাইত—বলিয়া আমি একটু সরিয়া তাহাকে স্থান করিয়া দিলাম। নিজে ঠিকমত জায়গা করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিল,—এসো, বোসো না, এই যে জায়গা আছে। কিন্তু ছেলেটি ও তাহার মা দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া সে বেশ আরামে একটি বিড়ি ধরাইল।

আমি তখন বলিলাম: তাঁদের একটু স্থান করে বসতে দিন না,—দাঁড়িয়ে ভিজছেন যে, দেখছেন না ?

বিড়িটা মুখে রাখিয়াই সে ব্যক্তি—হাত দিয়া এক কোণে দেখাইয়া বলিল: বোসো না, তোমরাও বোসো না কেনে।

বুঝিতে পারিলাম না এ দুজনের সঙ্গে নারীর কি সম্বন্ধ। দেখিলাম,—ইহার কথায় নারী একটুও নড়িল না, ঠায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল। তা দেখিয়া প্রথম লোকটি উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিল: চ্যান্দড়কলা! আবার এখানেও সুরু করে দিইচ। জায়গা ত রইয়েচে, বোসো গা না কেনে!

স্ত্রীলোকটি কোন কথা কহিল না, বালকের হাত ধরিয়া মাথার কাপড়টা একহাতে একটু টানিয়া দিল মাত্র। তাহাতে সেই মরদটি আমার দিকে চাহিয়া বলিল: দেখলেন, এটি সহজ মেয়্যা নয়। এই কথা শুনিয়া নারী একটু চঞ্চল হইল, এবং তাহার নিকটে একপা অগ্রসর হইয়া অস্পষ্ট ভাষায় কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। তাহাতে লোকটি একটু চীৎকার করিয়া বলিল: এখনও পাণ্ডারা আসে নাই,—তারা এলে তবে না বাবার কাছে পূজা দেয়া হবেক ততক্ষণ তুমি দাঁড়ায়ে থাকবে নাকি? পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল: হাঁ মশয়, পাণ্ডারা কখন আসবে এখানে?



আমি বলিলাম: আজকে বড় বৃষ্টি নেমেচে কি না তাই হয়ত আসতে দেরী হয়েছে। না হোলে অন্য দিন ত এমন্ন সময় এসে পড়ে সবাই।

সঙ্গে তাঁদের একটি পুঁটলি ছিল, সেটা ভিতরে রাখা ছিল, মেয়েটি তখন ছেলের হাত ধরিয়া ভিতরে দাওয়ায় উঠিয়া আসিল এবং সেই পুঁটলিটির উপর বসিল। ছেলেটি এই অবসরে মায়ের হাত ছাড়াইয়া একটু খেলার চেষ্টায় আমাদের দিকে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

এতক্ষণে বৃষ্টি একটু ধরিল,—আর সঙ্গে সঙ্গেই পুতিতুণ্ডি মহাশয়েরা দুই একজন দেখা দিলেন।

পাণ্ডা তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনারা কুথা হতে আইচেন?

আমরা দুবরাজপুর হতে আসছি,—মানত আছে বাবার কাছে।

বৃষ্টি থামিবার পর, পাণ্ডাদের আগমনে এবং আরও দুই তিন দল যাত্রীর আবির্ভাবে মন্দির-প্রাঙ্গণ প্রাণময় হইয়া উঠিল। আজ যে ভাবে বাদ্‌লা নামিয়া প্রভাতের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহাতে কেহ ভাবিতে পারে নাই, আজ এখানে অধিক জন-সমাগম হইবে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, অন্য দিনের তুলনায় আজ লোক-সমাগম অনেক বেশী। অনুকূলানন্দ স্বামী, বেশী যাত্রী প্রার্থনা করেন। কারণ, প্রাকৃতিক সহজ নিয়মেই, পাণ্ডাদের সুবিধা হইলে তাঁরও আপনা-আপনি অনেক খানি সুবিধা হইয়া যায়। যেহেতু যাত্রিমাত্রেই দেবতার পূজা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেবস্থানের আশ্রিত সাধুদেরও লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে আকর্ষণটা দেবতা অপেক্ষা সাধুদের উপর বেশীই দেখা যায়, কারণ তুলনা করিলে মন্দির অভ্যন্তরে ঠাকুর-দেবতা অপেক্ষা বাহিরের সাধুদের বেশী জীবন্ত মনে হয়। তা ছাড়া পুত্রপ্রাপ্তি, স্বামী বশীভূত করা, ননদ বা শাশুড়ীর মুখ বন্ধ করা, জুয়ায় টাকা জেতা, উৎকট ব্যাধি আরোগ্য এসব বর ত মন্দিরের ঠাকুরের কাছে পাওয়া যায় না,—লোক-কল্যাণের জন্য সাধুরাই এ সকল করিয়া থাকেন। আমাদের অনুকূলানন্দ মহাশয় চা, চরস তামাক গাঁজাদির খরচা এবং সময় সময়, দূর দূরান্তর তীর্থ ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ এই ভাবেই করিতেন—এবং বলিতেন ইহাতে কোনও দোষ নাই,—কারণ এরা ইচ্ছা করিয়াই দেয়। না দিলে আমাদের চলবে কি করে, ভগবান ত আমাদের প্রতিপালনের জন্যই গৃহীদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আরও একটি ব্যাপার এখানে আছে, সেটি ভৈরবী-সন্ধান। অর্থাৎ কোন তান্ত্রিক সাধুর যদি ভৈরবীর প্রয়োজন থাকে তিনি একবার এই সকল স্থানে অনুসন্ধানে আসেন। তাহা তন্ত্রমতের ভৈরবীদের মধ্য হইতেও পাওয়া যায়, আবার গৃহস্থ নারী-যাত্রিগণের মধ্যেও পাওয়া যায়। কি রকম তাহা বলিতেছি।

তাঁর মূর্ত্তিটি মন্দ নয় তবে ভৈরবের উপযুক্ত নয়—কৃশ, অনেকটা ক্ষীণ,—বয়স আন্দাজ পঞ্চাশের কাছাকাছি, দুর্ব্বল শরীর, লাল কাপড় পরা, হাতে ত্রিশূল, কপালে সিন্দূরের প্রকাণ্ড একটি ফোঁটা, অধিকাংশ-পাকা গোঁফ দাড়ি। সঙ্গে একটি বোচকাও আছে—তার মধ্যে আসনাদি পূজার নানা উপকরণ আছে, তিনি আসিয়া একস্থানে আসন করিয়া বসিলেন। কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, আপন মনে, নিজ কর্ম্মেই ব্যস্ত। দুই একজন তাঁহার কাছে যাওয়া-আসা করিতেছে, তিনি কিন্তু কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন না। ক্রমে একটি লোক তাঁহার কাছে আসিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল, কিন্তু তিনি যে তাঁহার কথায় বেশী মনোযোগী তাহা বোধ হইল না, কতক্ষণ পর সে ব্যক্তি উঠিয়া গেল। আজ প্রথমেই নারী-সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, লোকটি তাঁহাদের মধ্যেই একজন, চিনিতে পারা গেল। অল্পক্ষণ পরে তিনি আবার আসিয়া কথা আরম্ভ করিলেন।

এমন সময়ে আমাদের প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল, কাজেই উঠিতে হইল। সেখানে ঘণ্টা খানেক দেরী হইল। আহার শেষে যখন আসিয়া স্বস্থানে বসিলাম তখন প্রায় দুইটা হইবে।

দেখিলাম, সেই ভৈরব নিজ আসনে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, তাঁহার ডানদিকে কিছু দূরে সেই নারী পৃথগাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁর সঙ্গে যে দুইটি ভদ্রলোক ছিলেন তাঁরই একজন সেই ছোট ছেলেটিকে কোলের কাছে ধরিয়া, তার সঙ্গে কত কথা কহিতেছেন। কিছু খাবার তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কেমন? আরও খাবে? তোমায় আরও দিব,—চল তোমায় ওদিকে নিয়ে যাই,—খাবার দেবো, খেল্না দেবো, চল, বড় ভাল ছেলে তুমি।

বলিয়া ছেলেটিকে লইয়া একদিকে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় ছেলেটি, মা, ঐ মা, বলিয়া একবার তার মার দিকে দেখাইয়া দিল। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি, তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন,—তিনি সেই মেয়েটির দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, বসিয়া-বসিয়া এই সব লক্ষ্য করা একটা মহা-পাতক, আজ আর আমার আসন শান্তিপূর্ণ নয়,—আমার প্রাণ আর কিছুতেই সেখানে থাকিতে চাহিল না, উঠিয়া পড়িলাম এবং মন্দির-প্রাঙ্গণ পার হইয়া বাহিরে আসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

অনেকগুলি যাত্রিবাহী গরুর গাড়ি হাজির হইয়াছে। গাড়োয়ানেরা সব খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত—কারণ তাহার পরেই গাড়ী ছাড়িতে হইবে। অনেকে বহুদূর হইতে আসিয়াছে—ফিরিতে রাত্র হইবে। আমি আরও দূরে, গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম।

বেলা চারিটার মধ্যে আন্দাজ সব মিটিয়া গিয়াছে, অনুমান করিয়া আমি ফিরিলাম। আসনে আসিয়া দেখিলাম মন্দির-প্রাঙ্গণ ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। আমি অল্পক্ষণ বসিয়াই নদীতীরে বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া উঠিলাম। বাহিরে আসিয়াই অনুকূলানন্দ স্বামীর ঘরের কাছে দুইজন ভদ্রলোককে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়াই অনুকূলানন্দ বলিলেন, এই যে, শুনেছেন এঁদের কথা?

আমার আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না—এক ব্যক্তি বলিলেন, এখানে একটি জোয়ান মেয়্যা মানুষ, সঙ্গে একটি ছেলে, এসেছিল দেখেছেন?—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কি ব্যাপার বলুন দেখি? অপর ভদ্রলোকটি বলিলেন: মশয়, আর বলবোই বা কি। আমাদের ঘরের একটি বিধবা মেয়্যা তার ছেলের সাথে এখানে পূজা দিতে আঁইছিলেন, তারই তল্লাসে আমরা আঁইছি।

সঙ্গে কি তাঁর আপনার জন কেউ ছিল না?—

না—হাঁ, ছিল বটে, তবে তারা আমাদের কেউ নয়। আমি যেটুকু দেখিয়াছিলাম সমস্তই বলিলাম। শেষে ভৈরবের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত।

এঁ্যা,—শেষে ভৈরবের খপ্‌পরে পড়েছে—যাঃ, তারা কখন বেরিয়েছে, কোন্ দিক দিয়ে গেল মশয়—অ্যাঃ!

বলিলাম: আর আমি ত কিছুই জানি না।

তাঁহারা অতিদ্রুত প্রাঙ্গণ পার হইয়া রাস্তার দিকে দৌড়াইলেন।

অনুকূলানন্দ বলিলেন ঃ—দেখেছেন, কেমন মজা! আর ঢং করে খোজা-খুঁজি করা কেন? এ সব ত এখানে আকৃচার,—ছোঃ।

ব্যাপার এখানে এই পর্য্যন্তই,—তারপর সব চুপ্ চাপ।

নদীতীরে গিয়া হাঁপ ছাড়িলাম বটে কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা গ্লানি, বেদনার মতই কষ্টকর, অনুভব করিতে লাগিলাম। ছেলেটিকেই বা তাহারা কোথায় লইয়া গেল? এমন একটা ব্যাপার এখানে এত সহজেই ঘটিয়া গেল, কেহ কিছুই অনুভব করিল না।

পরদিন সকালে বৈদ্যনাথ তাহার ভৈরবী লইয়া আসিল। মাথায় তাহার ব্যাণ্ডেজ, প্রকাণ্ড একটা জটা প্রায় জানু পর্য্যন্ত লম্বা। বয়স প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ হইবে। কাল-কোল, মোটা-সোটা গড়ন, বেশ ভাল মানুষটি বোধ হইল। ডান হাতে ত্রিশূল আর তাহার বাঁ হাতে একটি বোচকা। দেখা হইতেই বৈদ্যনাথ বলিল ঃ ঘা'টা খুব হঁইচে গো,—ভিতরে পোকা হঁই গেছে,—হাঁসপাতালে লিয়ে যেতে হবেক না কি,—দেখুন দেখি?



আমি বলিলাম যে, ও এখন আর খুলে কাজ নেই, বাঁধা আছে ভালই আছে। এখানে ওরকম বাঁধা ত হবে না।

হাঁ, তাই বটে গো,—বলিয়া সে আমার কথায় সাড়া দিল। তাহার ভৈরবী মিহি সুরে বলিল ঃ ভিতরে পোকাটা লড়চে গো, বড়ই বেদনা হঁইচে।

যাহা হউক এখন খোলাখুলি ভাল নয় বলিয়া আমি আমার আসনে আসিলাম, এই যে এক অশান্তি লইয়া বৈদ্যনাথ হাজির হইল তাহাতে সেই অঘোরী বাবার সঙ্গে দেখা শুনার চিন্তা যেন নিবিয়া গেল। কি করিব,—এক সময় একলাই যাইব ভাবিয়া ঠিক করিলাম। মনের মধ্যে যেন একটু সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। উপস্থিত, বৈদ্যনাথের ভৈরবী ঘায়ের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে,—তাহার প্রতিকার কিরূপে হইবে, কোনো উপায় এখানে হইতে পারে কিনা

তাহার ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যনাথ যাকে দেখিতেছে তাহারই নিকট উপদেশ চাহিতেছে। ঠিক করিয়া কেহ কিছুই বলিতে পারিতেছে না, তবে সকলেই এই এক কথা বলিতেছে যে তাহাকে এখানে আনা ভাল হয় নাই। নিরুপায় হইয়া, কোন দিকেই কাহারও এ বিষয়ে সহানুভূতি না পাইয়া বৈদ্যনাথ হতাশ ভাবে বলিয়া বসিল,—যা করেন বাবা বক্রোমুনি, বাবা বক্রেশ্বর যা করেন, এই খানেই থাকবো গা।

বলা যত সহজ, বিশ্বাস করিয়া যন্ত্রণা সহ্য করাটা তত নয়। ভৈরবী যখন যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে থাকে তখন বৈদ্যনাথ বলে: আবার কি সিউড়ি পানে যাব নাকি, সেই খানকে হাঁসপাতালে গেলেই ভাল হবেক, কি বলিস তুই ?

ভৈরবী বলে: যা করবার কর ক্যানে, আমি ত আর সইতে নারি।

পরদিন প্রাতে যখন আসন ছাড়িয়া বাহির হইলাম তখন দেখি, মন্দিরের পশ্চাতে একটি ভগ্ন অট্টালিকার বারান্দায় ভৈরবী শুইয়া আছে, একখানা মাদুর পাতা, মাথায় শিয়রে পুঁটলি। আর বৈদ্যনাথ পাশে বসিয়াছে,—মাথার ব্যান্ডেজ খোলা—মৃদুমৃদু বৈদ্যনাথ দু একটি কথা কহিতেছে। বল্, বল্, কথা বলিসনাই কেনে।

যখন গিয়া দাঁড়াইলাম শুনিলাম তখন, ভৈরবী বলিতেছিল: আমি রা কাড়বো নাই। আমায় দেখিয়া বৈদ্যনাথ স্বর একটু চড়াইয়া জোর গলায়, ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল: দেখুন ত ঠাকুর মশয়, এত করে বলছি তুই চল, তোরে রেখে আসি গা,—তা বলে রা কাড়বো নাই।

মাথার বাঁধন খোলা কেন ? খুলে রাখা ভাল নয়,—

কাল সারারাত হোতে যন্ত্রণায় মরচে—এখন একটু শুইয়েঁ পড়েছে।

আপনি একবার দেখুন দেখি, বলিয়া ভৈরবী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। আমি কি দেখিব,—বুঝিই বা কি—মহা মুস্কিল !

মাথাটি আমার চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দেখাইয়া সে বলিল: দেখুন ত পোকা দেখা যায় কি না, ভিতরে যেন কিল-বিল করে গো।

বেশ লক্ষ্য করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বুকটা ধড়ফড়্ করিয়া উঠিল। একটা লম্বা, গভীর প্রায় তিন ইঞ্চি কাটা মুখটা কতকটা ফাঁক, তাহার মধ্যে একটা সাদা পোকা, লম্বা প্রায় এক ইঞ্চি, কিল-বিল করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। একটা সন্না হইলে উহা টানিয়া বাহির করা যাইত, কিন্তু এখানে কোথায় সন্না পাওয়া যাইবে। যেই সে জীবটি ভিতরে ঢুকিয়া গেল, তখন ভৈরবী—ঐগো, ঐগো আমায় সারারাত ধরে খাঁইচে, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল: ওটাকে বার করে দেন, ঠাকুর মশয়। মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছ হঁইচে যে গো।

নিরুপায় হইয়া আমি বৈদ্যনাথকে বলিলাম: তুমি এঁকে সিউড়ির হাঁসপাতালে নিয়ে যাও। ডাক্তার দেখেই ব্যবস্থা কোরবে। এখানে থাকলে খারাপ হয়ে যাবে, ভিতরে পোকা হয়েছে যখন,—এর ব্যবস্থা করা দরকার।

তাই যাবোগা, বলিয়া বৈদ্যনাথ দাঁত মুখ খিচাইয়া ভৈরবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: তুই মরিস নাই কেনে, মরে যানা তুই, আমায় জ্বালাইতে আইচিস্। হয় তু মর, নয় আমি মরি। ভাল আপদ হঁইচে।

ভৈরবীর আর সহ্য হইল না, আর চুপ করিয়া থাকিতেও পারিল না,—মনের ক্ষোভ এবং রাগে উত্তেজিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল: তুইই ত আমার এদশা করলি,—তোর লাজ লাগে না, আবার রা কাড়িস্, ঐ মু নিয়ে, গাল পাড়িস, তু রাক্ষস, আমায় পোড়ায়েঁ খাঁইচিস, খেঁয়ে দে আমায় তু।—মলে ত বাঁচতাম, একেবারে মেরে ফেল্, চুলায় দিঁয়ে নিশ্চিন্দ হঁগা যা।

বৈদ্যনাথের মুখে আর রা নাই,—মুখ শুকাইয়া গেল—গলার আওয়াজ তখন খাটো করিয়া বলিল: চল্ তোকে এখুনি দিঁয়ে আসবো গা,—

আমি বলিলাম: সেই ভালো, যাও তুমি একটা গাড়ি দেখে নিয়ে এস—

ভৈরবী বলিল: আর গাড়ি কেনে বাবু—আমি হেঁটেই যাব গা, গাড়ি ভাড়া ও আবার কোথাকে পাবেক, এই টুকুত পথ, আমি পায় পায় চলে যাব।

আলগা করিয়া ব্যাণ্ডেজের কাপড়টা মাথায় জড়াইয়া দিলাম,—বোচকাটি বৈদ্যনাথ একহাতে লইল, আর একহাতে তাহার হাত ধরিয়া চলিল। কাল রাত হইতে কিছুই খায় নাই—এই ক্ষীণ শরীর লইয়া কেমন করিয়া আড়াই তিন ক্রোশ পথ যাইবে। একটা ছাতাও নাই। রৌদ্র অবশ্য তত ছিল না। মেঘলা আকাশে মাঝে মাঝে দেবতার আবির্ভাব তাও অল্পক্ষণের জন্য। কিন্তু যদি বেশীক্ষণ রৌদ্র হয় তাহা হইলে চলা অসম্ভব হইবে। তখন কোথাও আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই।

উহারা চলিয়া গেলে আমি একবার পাপহরার তীরে শ্মশানের দিকে গেলাম,—মনটা খারাপ, আকাশের মতই মেঘাচ্ছন্ন। চক্ষের সুমুখে এই সব বিসদৃশ ব্যাপার, আমি ত দেখিতে চাহিনা—কিন্তু দেখিতেও হইবে, অল্প-বিস্তর দুঃখ ও তাপ তাহার সঙ্গে মনের ভিতর আসিয়া লাগিবে। প্রতিবিধানের হাত নাই সেইজন্য মন আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আমার 'অহম্' নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবে না। নিজের মধ্যে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেই হইবে। ঘরের অশান্তি ছাড়িয়া এখানে এসব আবার কিসের দুর্ভোগ?—যেখানেই যাও না কেন এসব ত সঙ্গেই থাকে। ভিতরে থাকে বলিয়াই বাহিরে দেখিতে, শুনিতে, স্পর্শ করিতে হয়। এসব বুঝিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়। বুঝা না বুঝার এই একই ত ফল দেখিতেছি।

ওপারে দেখি সেই অঘোরী বাবা—একটা গাছের তলায় বসিয়া আছেন। যাই একবার দেখি কি ভাব—ভয়ের লেশমাত্র মনে আসিল না। এখন একলাই আছেন। এই অবস্থায়ই যাওয়া ভাল। গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

আমার দিকে একবার চাহিয়া আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন—কোন কথা বলিলেন না।

আমারও প্রথমে কোনও কথা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না। বসিয়া তাঁহার মূর্ত্তিটি দেখিতে লাগিলাম।

স্থূল দীর্ঘ শরীর, শ্যামবর্ণ, মাথার চুল খুব ছোট ছোট, উদরে মেদের পরিমাণ কম নয়। তাহার উপর উলঙ্গ,—বিশাল চক্ষে নিম্ন দৃষ্টি, স্থির অচঞ্চল শরীর। যেন পর্ব্বত একটি, গম্ভীর প্রকৃতির উদার বক্ষে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, কত কাল তাহার ঠিক নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়াই দেখিলাম। তিনি এবার একটু নড়িলেন, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন : এখানে কি মনে করে ?

মুখে আমার কথা যোগাইল না, কি বলিব হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম। কতক্ষণ পর উত্তর একটা মনে আসিল বটে কিন্তু এতক্ষণ পরে বলাটা শোভনীয় মনে হইল না তাই চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি কিন্তু আর চুপ করিলেন না, মুখ খুলিলেন : তোর কি চাই এখানে—শালা—তোরা ত বামনা, ব্রহ্মা-বিষ্ণুর পা পূজো করবি, বছর বছর একটা করে জন্ম দিবি,—কোম্পানীর জুতা খাবি, মেগের কাছে এসে তম্বি করবি—থাকবি। এখানে কিরে শালা। বল্, এখানে তোর কি দরকার ?—

তাঁহার এপ্রকার ক্রোধ বা কোপের ভাষায় আমার কিছুমাত্র ভয় হইল না। মনে হইল বৈদ্যনাথ যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক,—উনি কি রাগ করেন, ওঁর রাগ নাই। বাস্তবিকই তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ক্রোধের লেশ নাই, অথচ মুখের কথাটায় যেন কতনা ক্রোধ এবং বিদ্বেষের রং লাগানো। যেন আগুনের আকার। অপূর্ব্ব এই চরিত্র !

প্রাণের মধ্যে আমার এক অপূর্ব্ব আনন্দের রোল উঠিল। যেন এক পাত্র অমৃতধারা আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উপর ঢালিয়া দিল এবং উহার স্পর্শমাত্রেই এক ঘন শীতল প্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। কি অপূর্ব্ব সুখ এবং শান্তি অনুভব করিলাম। এই ভাবে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইয়া গেল—আমি কতক্ষণ আপনার মধ্যে আপনি মাত্র রহিলাম, বাহিরের সঙ্গে কোনও যোগ রহিল না।

১৬

আশ্চর্য্য এই সাধুর ভাবটি। মুখে দুর্ব্বাক্যের স্রোত চলিতেছে,—যে-কেহ কাছে দাঁড়াইয়া শুনিলে ভাবিবে যে তিনি ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা,—ভয়ঙ্কর বিদ্বেষের বশেই একজনের প্রতি তাঁহার এই অশ্রাব্য কটু সম্ভাষণ অনর্গল বাহির হইতেছে,—কিন্তু তাঁহার এই বাক্য-বাণ যাহার উপর আসিয়া লাগিতেছে তাহার প্রাণের মধ্যে পরম প্রীতি ব্যতীত অন্য কোন ভাবেরই উদ্দীপন হইতেছে না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম সেদিন বৈদ্যনাথ ইঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, অর্থাৎ ওঁর কি রাগ আছে ? উনি যে সিদ্ধ পুরুষ।—ইহা যে কেমন সত্য তাহা আজ এখন প্রত্যক্ষই অনুভব করিলাম। এ কি অদ্ভুত ভাবসিদ্ধি,—দুর্ব্বাক্যের মধ্য দিয়া তিনি

আমার প্রাণের মধ্যে অমৃত সিঞ্চন করিতেছেন। যেন আমার কত কালের, কত প্রিয়তম বন্ধু,—আপনার জন, কে ইনি? যিনি এই প্রথম সম্ভাষণেই আমাকে একেবারে তাঁহার প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তারপর সেদিনের কথা আরও কিছু যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কতকটা বলিব।

ওরে শালা,—বলনা, কি কত্তে এখানে এলি? শালা, তুমি সাধু ঘাঁটতে এসেছ,—আমার সঙ্গে মাংটামো,—হারামজাদা, তোর সর্ব্বনাশ হবে যে রে,—বল শালা বল?—কি মনে করে এলি তুই বল?—

এক একটি অপ্রীতিকর বাক্যের মধ্যে মহাপ্রীতির উৎস অনুভব করিতেছিলাম। যখন তিনি থামিলেন আমি আনন্দের নেশায় টলমল, আমার গা দুলিতে লাগিল। একবার সুমুখে একবার পিছনে দুলিতে দুলিতে, আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমি কি যে বলিলাম তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিলাম না,—কিন্তু তিনি তাহার পর যাহা বলিলেন তাহা আমার মনে আছে।

অঘোরী: আচ্ছা তুই আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দে। এত ধর্ম্মের—এত ব্যাপার থাকতে তুই তন্ত্রের কথা শোনবার জন্য, তন্ত্রমতের সাধনপ্রণালী জানবার জন্য অত ব্যস্ত হয়েছিস কেন?—

আমি: লোকে তন্ত্রকে যতটা হেয় মনে করে, ঘৃণ্য মনে করে আমায় ধারণা আর নিশ্চিৎ ধারণা তন্ত্র তা নয়—এর মধ্যে মহৎ কিছু আছে আর নিশ্চয়ই আছে, যা আমায় জানতেই হবে। না জানতে পারলে যেন আমার মুক্তি নেই। এইই আমার ভিতরের কথা।

তোর ধারণা যেটা সেটা তোর অনুমান ত?

হয় ত তাই কিন্তু সে অনুমান গভীর সত্যকে ভিত্তি করেই, আমার বিশ্বাস।

ও বিশ্বাসও একেবারেই ফাঁকা। আমি বলিলাম: কেন?

তোর সত্য যে গভীর সেটাও ত তোর অনুমান? এখন অনুসন্ধান করতে গিয়ে, তোর মতে যেটা ভালো নয় এমন কিছু যদি দেখতে পাস তাহোলে ত সেটা মানতে পারবিনা বা বিশ্বাস করবিনা—কেমন নয় কি?

তাহোলে কি সত্য সত্য এমন কিছু আছে নাকি এই তন্ত্র সাধনের মধ্যে?

সে কথা ত নয়, এখনকার কথা এই যে, তুই এমনই একটা তন্ত্রধর্ম্ম খুজচিস যার সঙ্গে তোর মনোগত ধারণার সম্পূর্ণ মিল আছে?

তন্ত্রধর্ম্ম সম্বন্ধে এতাবৎকাল যা শুনেছি ও পড়েছি তাতে মোটামুটি একটা ভাব ত ভিতরে গড়ে উঠেছে বটেই—আর তাইত স্বাভাবিক; আর সেটা যে আমার সংস্কারগত ভাব থেকেই উৎপন্ন তাওত স্বাভাবিক।

সবই স্বাভাবিক তাত সকলেই মানে,—এখন তোর কথা তাহোলে এইতো দাঁড়াচ্চে—তোর আদর্শ ধর্ম্ম মত যা তা তুই তন্ত্রধর্ম্মের মধ্যেই পেতে বা সফল করতে চাইচিস? নয় কি?

এর পর আর না বুঝিয়া থাকিবার যো নাই। যা সরল সত্য তা এই যে আমার ধর্ম্মাদর্শকে

তন্ত্রোক্ত সাধনের মধ্য দিয়া সার্থক করিতে চাই আর সেই জন্যই আমি তন্ত্রমতের সাধুসঙ্গের অভিলাসী হইয়াছি। এমনি সুধু কৌতূহলবশে যে জানিতে চাহিয়াছিলাম তাহা নয়, তার সঙ্গে আরও যে খানিক গুহ্য কারণ ছিল তাহা আজ এই কথোপকথন সূত্রে পরিষ্কার হইয়া গেল।

তখন আবার একটা প্রশ্ন হইল যে, তন্ত্রধর্ম্মের উপর আমার এই সহজ শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ এর মূল কোথায়? আমরা শাক্ত বংশের সন্তান, আমাদের পিতৃপুরুষের এই ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক সাধনলব্ধ জ্ঞান বা সিদ্ধির মহিমা সংস্কারগত হইয়া আছে—আমাদের মত বংশধরগণের মধ্যে সময় ও সুযোগেই চিত্তক্ষেত্রে সেগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং অনুসন্ধানে ব্রতী করায়। আমাদের রক্তের মধ্যে এই শক্তিমার্গের সাধনা বা উপাসনার বীজ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই কথায় আরও জানা গেল যে একই সাধনের ধারা আন্তরিক ও ব্যবহারিক ভাবে বংশানুক্রমে চলে যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বংশধরেরা অন্তরে অন্তরে দেশকালোপযোগী বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করিয়া লন তাঁহাদের বিশিষ্ট মনোধর্ম্মের প্রেরণায়। ধর্ম্ম যেমনই হউক না কেন একটা বংশের মধ্যে তার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া গেলে তার ধারা বন্ধ হইয়া যায়,—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বংশের ধারাও লুপ্ত হয়। এই ভাবে সৃষ্টিতে বংশ-বৃক্ষের বীজ হইতে বিশাল মহীরুহে পরিণতি, শেষে কালের হাতে তাহা নিঃশেষে লোপ পাইয়া যায়।

তন্ত্রমতের সাধন দেখতে এয়েছ শালা,—জোচ্চোর। যে মতের উপর তোর শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আন্তরিক টান নেই তার সাধন প্রণালী দেখবার তোর কি অধিকার রে শালা চোর। তোকে কে তা দেখাবে?—অ্যাঁ,—বল শালা, সাধন প্রণালী, পদ্ধতি, প্রকরণ দেখে তোর কি ফল হবে?

তাও ত বটে, প্রকরণ, প্রণালী বা সাধনপদ্ধতি দেখিয়াই বা আমার কি লাভ?—তার সিদ্ধির ফল যা, তার সঙ্গে ত আমার সিদ্ধির কোন ভেদ নাই, সেই অদ্বয় চৈতন্যে, নিত্যানন্দ ভাবে স্থিতি, আত্মায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি—নাই বা দেখিতে পাইলাম তন্ত্রমতের সাধনপদ্ধতি।

এই ভাবের কথাই মনের মধ্যে চলিতেছিল। তিনি আবার আরম্ভ করিলেন, এই শালা, অমাবস্যার রাতে একলা শ্মশানেতে মড়ার বুকের ওপর বসে জপ করতে পারবি? তুই মদ খেতে পারবি, বল শালা,—মাছ মাংস তৃপ্তি করে খেতে পারবি,—সেঁটে খেয়ে দেয়ে, কোমরে জোর করে ন্যাংটো হয়ে মেয়ে মানুষের সঙ্গে লাগতে পারবি? তারপর উঠে নির্ব্বিকার চিত্তে চন্দ্রামৃত পান করতে পারবি? শালা তুমি তন্ত্রের সাধন দেখতে এসেছ শালা, —ঘানি কীট!

বৈদ্যনাথের কাছে শুনিয়াছিলাম উনি অঘোরী,—তান্ত্রিক সাধনের কথা উনি জানিলেন কি করিয়া। অবশ্য জানা আশ্চর্য্য নয়—তন্ত্রের ব্যাপারে এতটা সম্যক জ্ঞান ইঁহার যখন আছে—তখন আর ভাবনা কি?—মনে বড়ই আনন্দ পাইলাম—পর পর তিনি নিজ গুণে সকল কৌতূহল মিটাইয়া দিলেন। সে অবশ্য শেষের দিকে।

আমরা কি সকল ব্যাপার জানিবার অধিকারী? ভাবিয়া দেখিলে একথা বেশ বুঝিতে পারি, আগুবাড়িয়া আমরা অনেক অনেক গভীর তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাই, জিজ্ঞাসু হই, আবার তাই লইয়া বিজ্ঞের মত পাঁচ জনের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক ও মতামত প্রকাশও করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এ কথাটা প্রায়ই মনে আসে না, যে-বিষয়টি লইয়া আমি এতটা শব্দ করিতেছি, সেটির আলোচনায় কিম্বা সেই তত্ত্ব উপলব্ধিতে আমার কতটা অধিকার। আমি কতটা প্রস্তুত হইয়া এই গভীর তত্ত্ব বিষয় দর্শনে অগ্রসর হইয়াছি।

সাধন আমাদের জীবন অর্থাৎ আমাদের জীবনে জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত যাহা কিছুই করিতেছি তাহাই ত সাধন। এ সংসার স্থূল কর্ম্মজীবনের সবটাতেই আমার প্রয়োজন, যেমন, চৈতন্য মার্গে, মনঃশক্তির সহায়ে সহজ নিবৃত্তির পথে এবং অধ্যাত্ম জীবনের প্রয়োজন। এই দুইটিই যতক্ষণ আমার পূর্ণ একটি জীবন বোধ না হইতেছে ততক্ষণ আমি কোন গভীর তত্ত্বে অধ্যাস লাগাইতে অনধিকারী। লাগাইলেই কি হয়? চীৎকার করিয়া ডাকিলেই কি সাড়া পাওয়া যায়? এখানে গলার জোরে কিছু হইবার নয়। বরং আওয়াজ খাটো করিয়া, লক্ষ্য স্থির করিলে অনেক বেশী কাজ হয়। কত ভাগ্য ফলে মানুষের স্বর নম্র হয়। বিজ্ঞান বা দর্শনের অভিমান-বিষে জর্জ্জরিত মন একটা বিশাল আয়তন সত্তার আভাষ না পাইলে কি সহজে শান্ত হয়? আমি দেখিতেছি মহাশক্তিমান একজন পুরুষের কাছে বসিলে আমাদের মত একজন শান্ত হইয়া নিজ অক্ষমতায় সচেতন হইতে পারে। সাধুসঙ্গের ফলে আর কিছু যদি নাও হয় এটুকও পরম লাভ।

এখন এই মহান শক্তিধর মানুষটির মুখে পর পর যে কয়েকটি কথা শুনিলাম তাহাতেই আমার মনের বক্র গতি সোজা হইয়া গেল।

ওরে শালা বলত, তোর বিদ্যে কতটুকু,—কটা পাশ করেচিস, কত বই পড়েছিস?—

আমি নিঃসঙ্কোচে বলিলাম: আমার বিদ্যা কিছুই নেই—যেটুকু পড়েছি তা পরিচয় দেবার মত কিছুই নয়, আপনি ক্ষমা করুন আমাকে—

ওরে, এ শালার আবার মৌখিক বিনয়ও আছে—এ্যাঁঃ—বল দিকি ও সব ঢং ছেড়ে দিয়ে—তোর মনে এখনও পড়াশুনোর গোমোর আছে কিনা?—সত্যি বলবিরে শালা, খবরদার,—হ্যাঁ।

আমি দেখিলাম যে তিনি আমার মনের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখিতেছেন,—বলিলাম: দেখুন, কখনও কখনও আমার একটু অভিমান আসে বটে কিন্তু তাকে আমি কখনও প্রশ্রয় দিই নি। ছেলেবেলা থেকে দর্শন শাস্ত্র, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় যে যোগ সাধন, সে সম্বন্ধে কৌতূহল আর পড়া শুনা বা আলোচনা করবার প্রবৃত্তি খুবই প্রবল ছিল, আর তাইতেই এ পথে কিছু কিছু জ্ঞানের আভাষ যেন পেয়েছি মনেও হয় বটে কিন্তু আমার চিত্ত এখনও রাগ দ্বেষ মুক্ত হয় নি,—আকাঙ্ক্ষা লোভ লালসা এ সব ঠিক আগেকার মতই আছে, আর এমন অবস্থা আমার ত হয়নি যাতে মনে হয় যে আমার সব পাওয়া হয়েছে কিম্বা স্থায়ী ভাবে আমার

কর্ম্মশক্তি চৈতন্যমুখী হয়ে অবিচ্ছেদে সেই দিকেই যাচ্ছে,—কাজেই এমন অবস্থায় আমি যে মহা দুঃখিত—এই অনুভবটাই বেশী হয়,—কেমন করে তা হোলে আমি অহংকার মনে মনে পোষণ করতে পারি।

ওরে শালা বেদো,—এ যে বেশ আসল দোষের কথাগুলো সামলে বল্লি—সাধারণ লোকের চেয়ে তোর ধর্ম্মোজ্ঞান বেশী আছে এ কথাটি যে চাপা দিয়ে গেলি রে শালা, আমার কাছে মাংটামো?—আঁ্যা।

সে কথাও পূর্ব্বে আমার বেশী বেশী মনে হোতো বটে, এখনও হঠাৎ পূর্ব্ব-অধ্যাসের ফলে কখনও কখনও হয়ত মনে এলো, তবে আমি ও ভাবকেও কেটে দিই। এখন আমার বোধ হয় আর ও কথা বেশী মনে আসে না বা দাগ পড়তে পায় না।

কেন?—কি তোর কাটান মন্তোর বলত দেখি?—

সেটা এই, এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে জীব মূলে স্বভাবে এক হোলেও ব্যবহারে সকলকার জীবনের উদ্দেশ্য সমান হয়। প্রত্যেকের কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন আলাদা, বিদ্বান, পণ্ডিত, মুখ্যু, চাষা-ভূষা, উঁচু-নীচু সমাজে যত জীব, সবাই পৃথক ভাবে জগৎ দেখছে, বিষয় ভোগ করছে। কাজেই এখানে এ অহংকারের স্থান নেই যে আমি ওর চেয়ে বেশী জানি বা আমি ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেনঃ তবুও একটু আছে কিনা, ওরি মধ্যে সামান্য রকমের একটু,—অবিশ্যি অত বড় করে দেখা না দিক্; বল শালা ঠিক করে—ওরি মধ্যে একটু আছে কিনা—

আমি বলিলাম: হাঁ, বোধ হচ্চে যেন আছে। ঠিক বলেছেন আপনি—ওটা যেন—

তিনি চীৎকার করিয়াই বলিলেন: ঐ টুকু এককালে প্রকাণ্ড হবে রে শালা, বিষের ছোবল মারবে—এখন তোলা রইলো।

তার পর আবার বলিলেন: তোর গুরুগিরি করবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে কিনা টের পেয়েছিস? ঠিক বলবি,—বল শালা, কেমন ধরেছি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বিকট হাসিয়া আমার চক্ষের উপর তাঁর সেই তীব্র দৃষ্টির একটি আঘাত করিলেন। উহা আমার অন্তরে লাগিয়া আনন্দে বিহ্বল করিয়া তুলিল। বলিলাম:

অন্তরে আবার দেখুন আমার এ বিশ্বাস ও আছে যে ইচ্ছা করিলেই গুরু হওয়া যায় না। মানুষ সমাজেও অর্থকরী বৃত্তিতে যেমন অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, বেশ্যার কাজে সকলেই যথেষ্ট পারদর্শী হতে পারে না, তেমনি অধ্যাত্ম ধর্ম্মে যে কেউ ইচ্ছা করলেও গুরু হতে পারেন না। পরমহংস দেবের উপদেশে এটুকু খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। ভগবানের অভিপ্রায় এর মধ্যে যদি থাকে তবেই সিদ্ধকাম হয়ে মানুষে গুরু হতে পারে। এ ছাড়া আমার আরও একটি বিশেষ ধারণা সম্প্রতি হয়েছে—যে অধ্যাত্ম পথে গুরু এক, সেই তিনি ছাড়া আর কেউ গুরু নেই, হয়নি, হবে না, হতে পারে না।

তিনি বলিলেন: শালা আবার শাস্তোরের ঢেকুর তুলছিস?—বল শালা ঠিক করে,—ওরি মধ্যে, তাঁর শুভ ইচ্ছা কল্পনা করে, যদি ভবিষ্যৎ জীবনে দরকার হয়, তিনি যদি তেমনি বিধান করেন এই বোলে, একটু গুরুগিরির ইচ্ছে, ধরি মাছ না ছুঁই পানির মত, বল শালা ঠিক করে—এমনি একটু ইচ্ছে, সরু শিকড়ের মত ভিতরে জেগে আছে কিনা!—



বলিলাম: সত্য—এটুকুও আছে যেন বোধ হচ্ছে এখন। সর্ব্বনাশ,—আমি কিন্তু এটা চাই না।

শুনিয়া তিনি এমন আকাশ-ফাটা হাসি আরম্ভ করিলেন বোধ হয় পাপহরার ওপার হইতে স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল।

এমন সময় প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। আমি কিন্তু উঠিতে চাহিতেছি না, দেখিয়া তিনি বলিলেন,—কৈ উঠ্‌লিনা যে,—

আমি বলিলাম: খাওয়ার ইচ্ছা নেই, ক্ষুধাও নেই, তৃষ্ণাও নেই, সব যেন ভরে রয়েছে।

তিনি: যা যা শালা—নিয়ম রক্ষে করতে হবে না,—তোর জন্যে যে সকলে বোসে আছে।

কাজেই আমি উঠিলাম।

আহারের পর পাপহরার তীরে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন প্রায় আড়াই প্রহর বেলা। অঘোরী আর সেখানে নাই,—তবে শ্মশানের কিছু দূরে এক ভৈরব ও ভৈরবী সামনাসামনি দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে দেখিলাম। দুজনেই জোয়ান। অঘোরীর সঙ্গে এদের কি কিছু সম্বন্ধ আছে?

আমার ইচ্ছা হইতেছিল একবার ওদিকে যাই, দেখি তিনি কোথায়, কিন্তু এই যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া আর যাইতে পা উঠিল না।

আমি অন্যদিকে যাইতে ছিলাম। পুণ্ডরীক, কালীবাড়ির ম্যানেজার, তিনি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন,—চলুন আজ আপনার আসনে গিয়া কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্।

আহারের পর আমি নিকটেই এখান-সেখান করিয়া বেড়াইতাম। বলিলাম: চলুন একটু ঘোরা যাক্।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুণ্ডরীক চলিলেন। আমি যাইবার সময় সেই নবাগত ভৈরব দম্পতিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি এঁদের জানেন, অঘোরীর সঙ্গে এঁদের কিছু সম্বন্ধ আছে কি? অনুমান করিয়াছিলাম হয়ত চেলা হইবে। কিন্তু পুণ্ডরীকের মুখে শুনিলাম তা নয়,—এখানে এঁরা এই প্রথম এসেছেন। এখন আমরা দেখিলাম, আমাদের পিছনে পিছনে তারা দুজন আসিতেছেন।

দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ দাঁড়াইয়া গেল। আমিও দাঁড়াইলাম।

তাঁহারা একজন আগে একজন পিছে আসিয়া পুণ্ডরীকের সুমুখে পৌছিলেন। ভৈরব প্রথমে কথা বলিলেন: আমরা কামরূপ থেকেই আসছি, এখানে কিছু দিন থাকবার ইচ্ছা। —শুনিয়া পুণ্ডরীক যেন বিশেষ চিন্তিত হইয়াই বলিলেন:

আমরা কালীবাড়ির লোক, বক্রেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আপনি মন্দিরে গিয়ে, দেখেশুনে একটি স্থান ঠিক করে নিয়ে থাকতে পারেন—এখানে সাধুসন্ত যাঁরা আসেন তাঁরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে নিয়ে থাকেন, কারো অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। বলিয়া পুণ্ডরীক, ঠাকুর-বাড়ির দিকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারাও সেই দিকে চলিলেন। তখন পুণ্ডরীক ভৈরবকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনাকে কি বলে আমরা ডাকবো?

তিনি বলিলেন:—আমার নাম সিদ্ধ করালী। বলিয়া তিনি মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমরাও রাস্তার বাঁকের দিকে চলিলাম।

বাঁক ফিরিয়াই এখানে একটি সুন্দর দৃশ্য চক্ষে পড়ে। একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ এবং বট গাছ, একসঙ্গে দুইটি। তাহার তলে ক্ষুদ্র একটি মন্দির। এত ছোট যে তাহার মধ্যে মানুষ বা কোন জীবজন্তু ঢুকিতে পারিবে না। কোন বড় মন্দির গঠন করিবার পূর্ব্বে,—প্রাচীন কালে এই ধরণের ছোট একটি মন্দিরের ছাঁচ মিস্ত্রিরা আগে গড়িয়া লইত। পরে ইহা বড় মন্দির গড়িতে সাহায্য করিত। বড় মন্দির গড়া হইয়া গেলেও ছোটটি আদর্শরূপে থাকিয়া যাইত। এ রকম অনেক স্থানেই আছে; আর, ইহার সঙ্গে অনেক কিছুরই সৌসাদৃশ্য আছে। বড় একটা কিছু করিয়া গড়িবার পূর্ব্বে ছোট মনোমত একটি আদর্শ গড়া এ প্রদেশের বহু প্রাচীন রীতি।

এই বক্রেশ্বর পীঠে এমন কোনও মহান শিল্প বা স্থাপত্যের চিহ্ন এখন নাই যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে এস্থান শিল্প-গৌরবে কোন সময় সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু এই শ্যাওলা-ধরা পুরাতন ক্ষুদ্র আদর্শটি দেখিয়া কত কথাই না মনে আসিতেছে।

কতকগুলি ডোমের মেয়ে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে, নদী তীরের জঙ্গলের মধ্যে, সঙ্গে ছোট বড় কয়েকটি ছেলেও আছে। গাছ হইতে ফল পাড়িয়া খাইতেছে, মনের আনন্দে

বেড়াইতেছে আর গান করিতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে আর তাহার ভাষা লক্ষ্য করিলে, সভ্যতা-অভিমানী কাহাকেও দ্বিতীয়বার শুনিতে হইবে না। তাহাদের মনের মধ্যে আনন্দ—একটি অপূর্ব্ব বন্য রাগিণীর সঙ্গে এই অশ্রাব্য শব্দগুলি মিলিত হইয়া তাহাদের কণ্ঠ হইতে যেন অমৃত ঝরিতেছে। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সে গান প্রাণকে আকর্ষণ করে। কি করুণ সুর! যে



ভাষার মধ্যে প্রিয়কে যথেচ্ছাচারী, লম্পট এবং অক্ষম বলিয়া অনুযোগ করা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তির ব্যবহার-দোষে নারী স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে, তাহার বর্ণনা যে গানে করা হইয়াছে, তাহার ভাষা নাইবা লইলাম!

অপেক্ষাকরা কষ্টকর বিশেষত আমার মত যারা চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ তাদের পক্ষে। এই যে অঘোরীর কাছে একটু আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি, আবার কতক্ষণে দেখা হইবে এখন তাই চিন্তা। লোভ লাগিয়াছে। যেন তাঁর কাছে আমার গুপ্ত রত্নাগারের চাবি আছে, তিনি খুলিয়া দিলেই আমার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে।

সন্ধানে আছি আবার কতক্ষণে দেখা হইবে। বাহিরে একবার আসিলেই হয়, গিয়া ধরিব। যে দুজন ভৈরব-ভৈরবীকে দুপুরবেলা দেখিয়াছিলাম তাহারা এখন দেখি তাঁহার কুটীরের দিকে আনাগোনা লাগাইয়াছে। দেখিলাম, ইহারা থাকিতে ত আমার সুবিধা হইবে না, আমি চাই তাঁকে নিরালায় একলা ভোগ করিতে। চলিয়া গেলাম নদীতীরে—অনেক দূর। যখন আর ইহারা থাকিবে না তখন যাইয়া ধরিব। রাত্রেই খুব সম্ভব দেখা হইবে, তখন ত আর কেহ থাকিবে না, বেশ হইবে।

রাত্র এক প্রহরের মধ্যেই এখানকার সব নিশুতি, আর কেহ জাগিয়া থাকে না। বিশেষত এ জায়গাটা গাঁয়ের বাইরে। কেহ বড় একটা এদিকে ত আসে না, কেবল শবদাহ করিতে যাহারা আসে তাহারাই এদিকে রাত্রে থাকে। এখানকার নিস্তব্ধতা ভয়ঙ্কর,—একটি উপভোগের বস্তু। কালো আকাশে অগুন্তি তারা জ্বলিতেছে—আর সে গাঢ় কালিমার ছায়ায় যেন পৃথিবী ছাইয়াছে। দূরে দূরে গাছগুলি ঘোর কালো তারপর আকাশের ছবি। এই সময় একবার অঘোরীবাবার উদ্দেশে বাহির হইয়াছি। কবিতার ভাষায়—যেন অভিসারে চলিয়াছি—সাপ-খোপের ভয় এখানে খুব আছে কিন্তু আমার তা বড় একটা মনে আসে নাই। মেয়েলি কথা একটা শুনিয়াছিলাম ছেলেবেলায়,—সাপের লেখা, আর বাঘের দেখা। যে বয়সে, যে রকম মনের অবস্থায় এটা শুনিয়াছিলাম—তাহাতে উহার সার সত্যটি সেই যে একবার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া বসিল আর টলিল না। এখনও বিশ্বাস স্থির আছে যে মৃত্যুটি যদি সাপের কামড়েই হইবে এরূপ লেখা থাকে তাহা হইলে আর কোন রকমেই তা এড়ানো যাইবে না, আর যদি ভাগ্যক্রমে বাঘের সঙ্গে এই নিরস্ত্র-জাতির কাহারও চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ঘটে তবেই বুঝিতে হইবে ভবযন্ত্রণার হাত এড়াইবার সময় আসিয়া উপস্থিত। সুতরাং বিনা প্রতিবাদেই সম্মোহিত হইয়া অস্তিত্ব-লাপের সুযোগটি তাহাকে দেওয়াই ভাল।

পারহরার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, ওপারে শ্মশানে একটা চুলি জ্বলিতেছে। যে আলো হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় সৎকারের মধ্য-অবস্থা, বেশ জোর আলো আছে—তবে উচ্চশিখা নাই—চারিদিক হইতেই ছোট ছোট অনেকগুলি শিখা উঠিতেছে, জোর বাতাসে যেন এক একবার নিবিয়া যাইবার মত হইতেছে। দেখা গেল, চুলিটার একটু দূরে দুটি লোক। একটি উবু হইয়া বসিয়া আছে, অপরটি লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া। আর চুলির শিয়রে দাঁড়াইয়া অঘোরী—এক হাতে লাঠি অপর হাতে চিমটা। আর কাহাকেও দেখা গেল না। ভাবিয়া

লইলাম যে আজ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা খুবই অল্প। অবশ্য দাহ করিতে শ্মশানে দুটিমাত্র লোক আসে নাই। আরও অনেকেই আছে, তাহারা হয়ত কাছেই কোথাও আড্ডা করিয়াছে।



এখানে প্রায়ই অনেক দূর গ্রাম হইতে শব লইয়া সৎকার করিতে আসে। যাহারা আসে তারা এই সংকারের সঙ্গে নিজেদেরও বেশ একটু কারণানন্দ দিয়া সৎকার করে। তাতে

শোক-মোহের আঁচটিও তাদের গায়ে লাগিতে পায় না। এ অঞ্চলের সংস্কার এই প্রকারই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে আমি কি করিব তাহাই কতক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। ফিরিয়া যাইব, না একবার দেখিব ভাবিতেছি—। বোমা-ফাটার মত একটা আওয়াজ হইল, শবের মাথাটি ফাটিল। এমন সময় দেখিলাম উলঙ্গ অঘোরী তাঁহার পার্শ্বে যে একটি নরকপাল পাত্র পড়িয়াছিল—ক্ষিপ্রহস্তে উহা চিমটা দ্বারা উঠাইয়া লইলেন এবং শবের মাথা হইতে যে গলিত তরল মস্তিষ্ক পড়িতে লাগিল—সেইখানে ধরিলেন। প্রায় আধ-পাত্র পূর্ণ হইল। তিনি হাতটি টানিয়া লইলেন, তারপর কুটীরের দিকে চলিলেন। আমি তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ওপারে গিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন,—বলিলেন : এই শালা, তুই রাত দুপুরে এখানে কি করতে এলি ?—অ্যাঁ!

আমি বলিলাম : দিনমানে দেখা পাওয়া ত সহজ নয়, খুঁজতে হয়!

তিনি আর কোন কথা না বলিয়া তাঁর কুটিরের দিকেই চলিলেন, আমিও না দাঁড়াইয়া তাঁহার পাছ লইলাম। তিনি কুটীরে ঢুকিলেন, আমিও ঢুকিলাম।

ভিতরে আলো—একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। পাশেই একটা বড় মানপাতায় ভাত বাড়া আছে, ধোঁয়া উড়িতেছে। হাঁড়িটিও পাশে রাখা আছে।

তিনি কপালপাত্রটি ভাতের কাছেই রাখিলেন। তার পর আমায় বলিলেন : তুই কি আমার খাওয়া দেখতে এলি নাকি,—তিনদিন পরে আজ অন্ন ভোগ।

আমি বলিলাম : আজ আমি তাহোলে আসি,—আহারের পর ত আপনি বিশ্রাম করবেন ?

তিনি বলিলেন : এখানে বিশ্রামের কি দেখলি রে শালা,—তোদের মত আমরা খেয়ে উঠে মাগ নিয়ে শুয়ে পড়ি না রে শালা—দেখনা, এসেছিস ত বসে দেখ খাওয়ার পর কি রকম বিশ্রাম। বোস্ ঐখানে বোস্।

মাটির মেঝেতে একটি ময়লা মাদুর পাট করা পাতা আছে—তাহাতেই আমি বসিলাম। এমন সময় দুজন লোক দরজায় উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল : বাবা কারণ এসেছে এইখানেই সেবা হবে কি ? তিনি বলিলেন : নিয়ে আয় এদিকে।

একটা মাঝারী গোছের কলসী তারা আনিয়া বসাইয়া দিল। ঘরের কোণ দেখাইয়া তিনি বলিলেন : পাত্রটা আন এদিকে। পাত্র আসিল। তিনি সেই কলসের উপর কারাঙ্গুলী চালনা করিয়া তাহাদের বলিলেন : তোদের পাত্র কোথা ? তাহারা পাত্র আনিল, তিনি উহাদের পাত্রটি ভরিয়া দিলেন তার পর উহাদের পান করিতে আদেশ দিয়া কলসীতে চুমুক দিয়া সবটুকুই শেষ করিলেন। প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধ—চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—যাহারা কারণ আনিয়াছিল তাহারা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল—তিনি না, হাঁ, কিছুই বলিলেন না তেমনি বসিয়া আছেন—তাহারা চলিয়া গেলে তিনি কথা কহিলেন।

তোর মতলবখানা কি বল দিকি ? আমি বলিলাম : ওখানে ভাত যে জুড়িয়ে গেল ?

তিনি বলিলেন : যাকৃগে কারণানন্দ চলেছে এখন খাবার ঝোঁক নেই,—তুই খেয়েছিস্ ?

আমি বলিলাম : হাঁ, রাত্রে একটু সামান্য জলযোগ করি, তা সে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

তিনি বলিলেন : তা হোক, তোর ত পেটে খিদে আছে। আমি স্বীকার করিলাম, পরে বলিলাম : তা ক্রমে ক্রমে ক্ষুধা-বোধও আর থাকবে না।

তিনি : খাওয়ার জিনিস দেখলে লোভ হয় না ? খেতে ইচ্ছা করে না ?

আমি : তা হয় ত হয়,—কিন্তু সংযমও ত দরকার ? খাওয়ার ধান্ধায় ত থাকার দরকার নেই !

তিনি : সংযম কাকে বলে ? ক্ষুধার সময় খাবার দেখ্‌লে খেতে ইচ্ছা হবে, তাই চেপে রাখার নাম সংযম না কি ?—কি বলিস্ ?

আমি : লোভ এলে কি তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত ? তাহোলে ত আরও প্রবৃত্তির আগুন জ্বলে উঠ্‌বে।

তিনি : তুই যে ক্ষুধার সময় জোর করে না খেয়ে থাকবি, আবার তাকে সংযম বল্‌বি এ যে অবাক কথা বলিস্—কোথা থেকে এ রকম সংযম শিখলি ?

আমি বলিলাম : ক্ষুধার সময় যদি আমি আহার সংযম না করি তবে কখন সংযম অভ্যাস করবো, খিদে পেলে পর পেটভরে খেয়ে সংযম হয় নাকি ?

তিনি : আচ্ছা, কাম-ইন্দ্রিয় সংযমের বেলা কি রকম সংযম অভ্যাস করিস্ বল্‌তো ?—সেও ত ঐ রকম, শরীরে মনে স্বাভাবিক কামের প্রবল উত্তেজনা রইলো, ভোগের উপকরণও স্বমুখে রয়েচে, অথচ সেই সময় কসে ল্যাঙ্‌ট এঁটে থাকার নামই তোদের সংযম না কি,—কেমন ? খুলে আমায় বল্ দিকি ?

আমি : আমার প্রবৃত্তিকে যদি প্রশ্রয় দি তাহোলে সংযম হবে কি করে ?

তিনি : প্রবৃত্তিটার আসলে উৎপত্তি কোথায় ? আমায় বল্ আগে।

আমি : মনেই ত প্রথমে প্রবৃত্তিকে দেখতে পাই।

তিনি : তারপর ? আমি : শরীরে তার ভোগ !

তিনি : তাহোলে প্রবৃত্তির গোড়া ত মন, সংযম কোন্ খানে কাজ করে ? আমি : সংযম ত মনেই হবে !

তিনি : বেশ ত বল্লি, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমের বেলা কসে ল্যাঙ্‌ট আঁটতে যাস্ কেন ? তাতে কোথায় সংযম রক্ষা হয় ?

আমি : মনেই হোলো আসল প্রবৃত্তি কিন্তু শরীরেও ত বেড়া দিতে হয় ?

তিনি : শরীরে বেড়া দেওয়ার ফলে আর কামের প্রবৃত্তি শরীরে আসে না তুই এই কথা বলছিস—বল দিকি ঠিক করে এত বেড়া দেওয়ার পর তোর মধ্যে কোন প্রকার সুযোগ পেলে বা তিলমাত্র উপলক্ষ হোলে কামের উত্তেজনা হয় কিনা ?

আমি : তা হয় !

তিনি : স্বপ্নে স্খলন হয় কিনা ?

আমি : কখনও কখনও হয় বটে।

তিনি : যুবতী মেয়ে দেখলে ইন্দ্রিয়-সুখের উপাদান বলে মনের মধ্যে রং দেখায় কিনা ?

আমি : তাও হয় বটে।

তিনি : তবে তোর সংযমের উপকারটা হয় কোনখানে, ল্যাঙ্‌ট-আঁটার ফলই বা কি ? ভেবে দেখেছিস।

আমি : আমার ধারণা, এখন হয়ত কিছুদিন এমনই কিছু কিছু সাড়া পাওয়া যাবে, পরে অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর কোনও চাঞ্চল্য থাকবে না।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন : তুই কি মনে করেছিস যে কাম-ইন্দ্রিয়কে ল্যাঙ্‌ট এঁটে জয় করে ফেলবি ? তুই জানিস এই কাম প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় উত্তেজনাটা কি, তোর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ?

আমি : প্রজা-বৃদ্ধির জন্যই, সৃষ্টির ধারারক্ষার জন্যই এই কাম-প্রবৃত্তি এইটুকু মাত্র জানি।

তিনি : একবার সংসর্গে একটি ফোঁটায় ত একটা সৃষ্টি হয়ে যায়, কিন্তু এত বড় উদ্দাম প্রবৃত্তি, এতটা শক্তি সারা জীবনেও যেন এর আশ মেটে না, এমন ধারা এক একটি প্রবাহ প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার সার্থকতা কি ? প্রকৃতির তুল্য হিসাবী কেউ আছে না কি ? তিনি এমনটা করলেন কোন্ প্রয়োজনে ?

আমি : এটা আমার মধ্যে একটি প্রশ্ন আছে, এখনও এর কিছু বিশেষ উত্তর পাইনি। এর উত্তর আমি দিতে পারবো না, আপনিই যখন এটা তুলেছেন—আমার মনে হয় আপনার দয়াতেই আমি এর মীমাংসা পাব।

তিনি : আচ্ছা, বল দেখি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রথম কোন্‌টি ?

আমি : বাক্, রসনা।

তিনি : শেষ ইন্দ্রিয় কোন্‌টি ?

আমি : উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গ।

তিনি বলিলেন : কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়ে যে যে শক্তির কাজ হয় সেগুলি কি বস্তুত পৃথক পৃথক মনে হয় ?

আমি : একটিই শক্তি,—কর্ম্মের বেলায় পৃথক পৃথক যন্ত্রের মাঝ দিয়ে কাজ হচ্চে।

তিনি : বেশ বল্লি, এখন বল মন আর প্রাণ এর বিশেষ কি ?

আমি : মনকে ইচ্ছাশক্তি বলতে পারি আর প্রাণ, শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শরীরের সকল ক্রিয়াই সম্পন্ন করচে, কিন্তু মূলে পৃথক নয়, প্রাণেরই একভাগ মন হয়ে আমার যাবতীয় কর্ম্ম চালাচ্চে।

তিনি : বেশ, এখন বোঝ এই 'আমি' বোলে যে সত্ত্বা, কর্ম্মজগতে মন বুদ্ধি প্রভৃতি

অন্তঃকরণের মধ্যে দিয়ে এখানে কর্ম্ম-ভোগাদি করছেন এর মূলশক্তি, বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র ব্যাপ্ত হয়ে উপস্থ ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ক্রিয়া করচে না কি? এটা অনুভব করতে কি কিছু গোলমাল আছে?

আমি বলিলাম: না, এটা পরিষ্কার বুঝতে পারি।

তিনি: তাহোলে বুঝে দেখ্, যে আদি চৈতন্যশক্তি আমাদের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বুদ্ধি থেকে সুরু করে ক্রমশ সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রামের মধ্য দিয়ে সর্ব্ববিষয়ে শক্তিমান করে রেখেছে। যোগশাস্ত্রের মতে সেই আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত যার ক্রিয়া অবাধ, তাকে তুই কি মনে করিস? তন্ত্রমতে সেই কুণ্ডলিনী।

এই যে আমাদের প্রাণ, কামময়, কাম-বীজই হোলো আদি, এই শক্তি সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে স্থিতি বা পুষ্টি এবং লয় বা মুক্তি পর্য্যন্ত এক একটি জীবের জীবনে কাজ করছে। অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এর সঙ্গে। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের জীবনই হোলো এই কাম, একে তুই ল্যাঙট্ দিয়ে বশ করবি কি করে?

আমি বলিলাম: নীচ থেকে উপরের পথে, ধ্যান-ধারণার পথে চালাবার জন্য এই চেষ্টা, এ ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

তিনি: তোর মধ্যে জীবসৃষ্টির যে বীজ আছে তাকে বেরোবার পথ দিবি নি? প্রকৃতি তোর মধ্য দিয়ে যে কয়টি জীব-সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন তার অনুকূল পথে না গেলে তোর ইষ্টলাভ কেমন করে হবে? তুই প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বা জগতের কি কল্যাণ করবি?

আমি বলিলাম: ধরুন আমি যদি স্থূল-সৃষ্টি বাড়াবার দিকে না গিয়ে উচ্চমার্গে আমার চৈতন্য শক্তিকে চালনা করি?

তিনি: আগে তোর প্রকৃতিগত, কর্ম্মবীজকে না ফুটিয়ে অন্য পথে চৈতন্য-শক্তিকে চালনা করতে পারবি কেন? সেটা যে অসম্ভব হবে, কেউ কোথায় কখনও তা পেরেছে কি? শালা বড় তালেবর হয়েছেন, স্থূল-সৃষ্টি বাড়াবেন না কেন? সেটা কি ফেলনা নাকি?

আমি: পুরুষার্থটা কি কিছুই নয়? আমার যদি তাতে ইচ্ছা না হয়?

তিনি: তাহোলে বুঝবো তোর ধ্বজভঙ্গ হয়েছে,—তুই অপব্যবহার করে তোর ইন্দ্রিয়-শক্তি নষ্ট করেছিস, তাকে ঢাকা দেবার জন্যে, লোকের চক্ষে ধূলো দেবার জন্যে ঢং করে সাধু সাজছিস। আমোলো, এ শালা বলে কি? প্রকৃতির বিশাল শক্তি-সমুদ্রের মধ্যে কোথায় একটা নগণ্য বুদ্বুদের আবার পুরুষার্থ? ওরে শালা, তুই যে তারই অভিপ্রায় সিদ্ধ করতেই এসেছিস এটা কোন অহঙ্কারে ভুলে গেলি রে। স্থূল-সৃষ্টির বীজ থাকতে সংসার-আশ্রম ছেড়ে সন্ন্যাস-আশ্রমে গিয়ে কত কত সন্ন্যাসী-বাচ্ছা কাটতি করে গৃহীদের ঘাড়ে হাগ্‌চে দেখতে পাস নি? তুই শালা যে আকাশ থেকে পড়লি দেখতে পাচ্চি, অঁ্যাঃ—

আমি বলিলাম: প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, আমরা তার বিরুদ্ধে যেতে

পারি না বা আমরা তার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছুই করতে পারি না, আমি এই বলছি যে যদি আমি একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করতে যাই—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন : তুই যেটুকু শক্তি নিয়ে এসেছিস আর সেই সঙ্গে তোর কর্ম্ম-সংস্কার অনুযায়ী সকল ব্যাপার যেখানে ফোট্‌বার সুবিধা হবে এমনি ক্ষেত্রে তিনি তোর জন্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের যোগাযোগ করে দিয়েছেন। তুই শিশুকালে মার কোলে যেমন মানুষ হয়েছিস, তোর অভাব অভিযোগ সকল ব্যাপার তোর মারই দেখবার ভার ছিল। তুই কি জানতিস, কিসে কি হয়? ঠিক তেমনি বড় হোয়ে গর্ভধারিণীর অধিকার ছাড়িয়ে যে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি নিয়ে যে তোর পথে চলেছিস বলে মনে করছিস সেটাও আর এক মার কোলে। শিশুকালের গর্ভধারিণী মা যেমন তোকে ধরা দিয়েছেন যে তিনিই তোর প্রতিপালনের কর্ত্তা, তাঁর কাছ থেকেই তোর প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেয়েছিস, যেন সহজ নিয়মে আপনা-আপনি পেয়েছিস, এখন বড় হোয়ে, জ্ঞানবান হয়ে, তোর আত্মশক্তির উপর আস্থা বাড়াবার জন্যেই এই প্রকৃতি মা তোকে জানতে দিচ্ছেন না যে, তিনিই তোর সর্ব্বকর্ম্ম ও বুদ্ধি[illegible], তোর মনে হচ্চে যেন তুই আপনিই নিজ শক্তিতে যাচ্ছিস? কর্ম্ম কচ্ছিস, ভোগ কচ্ছিস, কত বড় বড় কাজ কচ্ছিস। ঠিক এই রকম জানবি সকলকার জীবনেই ঘটচে। না হোলে এটা বুঝতে পারিস না যদি তোরই সকল ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকবে তবে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে তোর এত বাধা আসে কেন, বা কোথা থেকে আসে সেই বাধা। প্রকৃতি জননীর কাজই হোলো আড়ালে থেকে তোর স্বরূপটি তোকে জানিয়ে দেওয়া, তোকে তোর আত্মস্বরূপে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, মুক্তি দেওয়া।

আমি অনেকক্ষণ নির্ব্বাক এবং স্থির হইয়াই রহিলাম, আর কোন কথা কহিতে প্রবৃত্তি হইল না। তাঁর কথার মধ্যে আমার প্রকৃতিময় জীবনধারার স্বরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম। তত্ত্ব উপলব্ধির আনন্দ পাইলে আর কে প্রশ্ন করিয়া শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইতে চায়? যিনি চান তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই কারণ তখন আমার আর প্রশ্ন ত আসেই না। যেন সকল অভাবই পূর্ণ। মনে তখন ক্রমে ক্রমে এই ভয় আসে—যদি এই অবস্থা, এই অনুভূতি আবার কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িয়া হারাইয়া বসি।

তিনি কিছুক্ষণ পর বলিলেন : কিরে, তোর মুখবন্ধ হয়ে গেল যে?

আমি তবুও চুপ করিয়াই রহিলাম। আমায় নিরুত্তর দেখিয়া তিনি উঠিয়া ভোজনে বসিলেন, বলিলেন : তুই তাহোলে ঐ নিয়ে থাক, আমি এবার কিছু খেয়ে নি।

নরকপাল পাত্র হইতে সেই শবের মাথার ঘিয়ের সঙ্গে অন্ন পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগিলেন। ভোজন শেষ হইলে অবশিষ্ট অন্নগুলি পাতা-সুদ্ধ বাহিরে কুকুরের মুখে ধরিয়া দিলেন। আহার তাঁর শরীরের অনুপাতে এতই অল্প দেখিলে বিস্ময় লাগে।

তিনি আসিয়া বসিলে আমি বলিলাম : আপনার চেয়ে আমি অনেক বেশী খাই।

তিনি বলিলেন : আমার খাওয়া ত শেষ হয়ে এসেছে আর তোদের এখন কত খেতে

হবে। কতক্ষণ চুপচাপ, তারপর তিনি বলিলেন: আচ্ছা বলতো আমায় তোর ল্যাঙট্-এঁটে ত ইন্দ্রিয়-জয় হবে, আর রসনা জয় হবে কি করে? রসনার তৃপ্তি তোর কাম্য কি না?

এঁর কাছে ক্ষুদ্রতম ছিদ্রটুকু, কিছুই এড়ায় না—বলিলাম: আমি বুঝি যে কামেন্দ্রিয় জয়ের সঙ্গে রসনার অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কিন্তু মনে হয় মাঝে মাঝে একটু রসনাকে প্রশ্রয় দিলে বোধ হয় তত ক্ষতি হবে না। আমি ত নিজে ইচ্ছামত খাদ্য সংগ্রহ করি না,—যেমন জোটে তার মধ্যেই রসনার সম্বন্ধে ঐটুকু হিসাব রাখি।

তিনি: দেখ্ শালা,—তোর ইচ্ছে করে উল্টো রাস্তায় যাবার ফল। যেটা তোর কুরাস্তা, যে পথে তোর যাবার কোনও দরকার নেই, পাঁচ জনের দেখাদেখি সে রাস্তায় গেলে ভিতরে কত রকমের আপোষের হিসেব কল্পনা করতে হয়।—শালা জোচ্চোর।

আমি বলিলাম: আমি গৈরিকধারী সন্ন্যাসী হবার জন্যে ত ঘর ছাড়িনি, সে উদ্দেশ্য কোন কালেই আমার নেই। কিন্তু সংযম যে আমার গার্হস্থ্য জীবনেও দরকার—

তিনি বলিলেন: [দেখ্ তোর যতটা ক্ষুধা তোর খাবার প্রবৃত্তিও ততটাই হবে আর ততটা খেলে তোর পুষ্টি হবে, উপকার হবে, শরীর নীরোগ থাকবে কিন্তু লোভে পড়ে যদি রসনার স্থখের হিসেবেই খাওয়াটা হয় তাহোলে প্রকৃতির অবাধ্য হতে হোলো—তার ফল রোগ। তোর যতটা প্রাণ-অগ্নি বা হজম শক্তি—তুই লোভের বশে তার অতিরিক্ত বোঝা চাপালে তোর স্বাস্থ্য ভঙ্গ যদি না হয় ত আর কার হবে?] এই সহজ বুদ্ধির ব্যাপারটায় এত গণ্ডগোল কেন জানিস্?

যদি তাই জানবো তাহোলে এত ভুলই বা হবে কেন? এত দণ্ড ভোগই বা কেন?

দেখ্ [যৌবন এমনই একটা মধুময় কাল, মধু বলতে মদও বুঝায় রে,—বেশ সর্ব্বশক্তিমত্তার একটা নেশায় জীবকে বিভোর করে। আর স্থখের চরম হোলো মৈথুন, স্পর্শ-শব্দ রূপ, রস, গন্ধ এক সঙ্গে ভোগ হয়। এর চেয়ে বড় পার্থিব স্থখ ত আর তিনি কিছুতেই দেন নি। দুটি প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয় এক হয়ে যেন একটি সত্তা হয়ে যায়।]

[অন্যান্য যত কিছু স্থখ, কোনটা স্থধুই শব্দের, কোনটা স্পর্শের, কোনটা স্থধু রূপ নিয়েই, কোনটা বা স্থধুই রসে, কোনটি বা গন্ধে—কিন্তু কোনটাতে পূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলির স্থখ নেই এই এক মৈথুনেই সেটা আছে, আদি রস এই মৈথুন, সেটা স্থষ্টির মূল কারণ।] জীব-স্থষ্টির প্রকৃষ্ট সময়ই হোলো যৌবনে, কাজেই স্থষ্টির কাজে এই মৈথুন পরম স্থখময়। জীব-স্থষ্টির নেশা কাট্‌লে তখন উচ্চ উচ্চ ভাবের বিকাশ, ভাবস্থষ্টি ও নানা প্রকার রসস্থষ্টি আরম্ভ হয়। তখনই চৈতন্যের প্রসার। তিনি এমনই একটা উন্মাদনা এই যৌন-সম্পর্ক মধ্যে দিয়েছেন যাতে করে সন্তান-কামনা না করলেও এতে তাঁর স্থষ্টি-প্রসারের কাজ হয়ে যাবে। এড়াবার যো নেই। মানুষ বুদ্ধি করে যত রকমই ফিকির করুক তাঁর উদ্দেশ্য ঠিকই সিদ্ধ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: এই যে ইন্দ্রিয়-স্থখের বিনিময়ে স্থষ্টির সহায়তার কথা বোললেন সে স্থখটি ত শরীর আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কোনও তত্ত্ব-অনুভূতির যে আনন্দ সে কি এই মৈথুনের চেয়ে উচ্চস্তরের নয়?

তিনি বলিলেন : তাতে ত কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু বিপদ এইখানেই যে মানুষের মধ্যে একদল, বেশ বড় একদল আছে যারা ইন্দ্রিয়-সুখটাকেই মুখ্য বোলে ধরে নিয়েছে। সুধু ধরে নেওয়া নয় একেবারে সংস্কারগত করে ফেলেছে,—ধরেছে এমন করে যেন ঐ কাজের জন্যই বেঁচে থাকা,—

আমি বলিলাম : অবশ্য অত্যন্ত জড়বুদ্ধি মূর্খ প্রকৃতির—

বাধা দিয়া, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন : ওরে শালা বোকারাম তুই যে আকাশ থেকেই পড়লি !—তুই পাগলামী করিসনে। তোদের ঐ সোভ্যা ভদ্দোর ইঞ্জিরী-পড়া, এডুকেটেড্ বিদ্যা বুদ্ধিমান সমাজের মানুষই বেশী বেশী এই দলের। [যারা যথার্থ অসভ্য বা মূর্খ, খেটে খুটে খায় তারা অনেক সংযত ভাবে ইন্দ্রিয় ভোগ করে, তারা এখনও প্রকৃতির বশে অনেকখানি চলে, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ বেশী ঘনিষ্ঠ এটা কি তোরা জানিস না অথচ সহরে থাকিস ! আচ্ছা বল দেখি, পুরুষত্বহীনতা, অজীর্ণ, হৃদ্‌রোগ, স্নায়ুরোগ, পক্ষাঘাত, বাত, মূত্ররোগ, যক্ষ্মা—এসব রোগ ভদ্দোর লোকের বেশী না ছোটলোকের মধ্যে বেশী ?]

সেটা সত্য—ঐ সব রোগ ভদ্দোর লোকের মধ্যেই বেশী,—তা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে বুঝা যায়।

তুই এটা বুঝিস্ না বিদ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে বেশী পরিচয় না হোলে, বেশী সভ্য না হোলে,—ইন্দ্রিয়-সুখের এত ব্যভিচার আসবে কোথা থেকে ? সরলবুদ্ধি অসভ্য মূর্খেরা ওসব অবৈধ ইন্দ্রিয়-চালনার প্রবৃত্তি, সাহস পাবে কোথা থেকে ? এই শালা তুই সয়তানের পরিচয় জানিস নি, সে যে বিদ্যাবুদ্ধিতে ভগবানের দোসর, সে কি মুখ্যু অসভ্যের দল নিয়ে ব্যবসা করে ?

আমি : আপনি কি বলেন যে কামেন্দ্রিয় এবং রসনাদির সংযম সংসার থেকে একটু পৃথক বা আলাদা হয়ে সাধন করবার দরকার নেই ?

তিনি : কেন ঘরে থেকে সংযমে বাধাটা কোন্ খানে। ঘরে যদি বাধা থাকে বাইরেই বা বাধাহীন হবে কি করে ? যেটা যথার্থ বাধা সেটা ত তোর সঙ্গেই আছে, থাকবেও। তন্ত্রমতে যে সাধন সেটি যে তোর গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরই অনুকূল,—আমি তোকে তা গ্রহণ করতে বলিনি, তবে তুই নাকি তন্ত্রমতের সাধনের উদ্দেশ্য জানতে চাস্ তাই বলছি।

আমি : বাস্তবিক ধর্ম্মের নামে বা সাধনের জন্য পঞ্চ-মকারের অনুষ্ঠান, যেটা রাজসিক ও তামসিক ভোগ এবং অধর্ম্ম বলেই আমরা জানি, ধর্ম্ম বোলে সেই সব নিয়ে সাধনের যথার্থ উদ্দেশ্যই বা কি জানতে কৌতূহল হয় বৈ-কি। এক ধর্ম্মে যেগুলি ত্যাগ করবার উপদেশ, অন্য ধর্ম্মে সেই সকল সাধনেরই অঙ্গ বোলে উৎসাহ দেওয়া কেন হোলো সেটা কি আলোচনার বিষয় নয় ? এ সব আমাদের সকলেরই জানা ভালো করেই দরকার,—আমার তাই মনে হয়।

তিনি বলিলেন : এটা ভালো বুদ্ধি,—কত বড় ভাগ্য-ফলে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ইচ্ছা হয় তারপর ওসকল জানবার চেষ্টা মানুষের আসে, তাকে কি ফেলতে আছে ? তুই দেখনা কেন এমন সুন্দর ব্যবহারিক ধর্ম্ম, এমন সহজ ও সত্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম আর কোথায়

আছে, মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এই তন্ত্র-শাস্ত্রের সাধন, কোনও অবান্তর, কোন বাজে আড়ম্বর নেই। দেখ্ না, মানুষের যৌবন এলেই সাধনের আরম্ভ,—সেই সাধনের এমন পুষ্টিকর স্বাভাবিক উপকরণ, মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সাধনের এই অনুষ্ঠান আর কোন ধর্ম্মে নেই, প্রবৃত্তিমার্গেই তন্ত্রের সাধনা যা নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই।

[সব ধর্ম্মের যে উদ্দেশ্য, তন্ত্রের ধর্ম্মেও সেই উদ্দেশ্য,—মুক্তি, জীবের স্বরূপে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি।] যখন পাশবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন জীব, পাশমুক্ত হোলেই শিব। এখন এই পাশ জোর করে ত মুক্ত হওয়া যায় না, এর একটি ক্রম আছে, সেই ক্রমে, সেই ধারায় চলতে পারলে পাশমুক্ত হওয়া সহজ হয়ে আসে। আর তাই হোলো তন্ত্রের ধর্ম্ম। যে চৈতন্যশক্তি এই জগৎ প্রপঞ্চ ভেদ করতে পারেন সেটি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রথমে সুপ্ত থাকে। অবিকশিত অবস্থায় থাকে। যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের জ্ঞান থাকে না, জাগ্রত হোলে তবে 'আমি' জ্ঞান, জগৎ-বিষয় জ্ঞানে আসে, সেই রকম এই কুণ্ডলিনী শক্তি যখন সুপ্ত, আত্মচৈতন্য এ সকল জগৎ প্রপঞ্চের কারণ জ্ঞানও তখন সুপ্ত,—অবিকশিত অবস্থায় থাকে। এটি বৈজ্ঞানিক সত্য।

তিনি : তন্ত্রধর্ম্ম আসলে যোগশাস্ত্র অনুগত ধর্ম্ম, এর মধ্যে নৈতিক আবর্জ্জনা কচাকচি এ সব নেই বোলেই নীতি-ধর্ম্মের গোঁড়ারা তন্ত্র-সাধনকে ঘৃণা করেন, হীন ভাবেন।

আমি : নীতিকে আবর্জ্জনা বোল্লেন? সকল ধর্ম্মের প্রথম ধাপই হোলো নীতি, নয় কি?

তিনি : ঐ নীতি শাস্তোরের শাসনেই ত সকল ধর্ম্ম বিকৃত হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যেখানে সেখানে নীতির প্রয়োজন বা উপযোগীতা কোথায়?—প্রত্যেক ধর্ম্মেই ঐ নীতির বোঝা চাপানোর ফলেই না মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে আর তাতেই না এত ভণ্ডামো, মিথ্যাচার সমাজে নির্লজ্জ ভাবে চলে যাচ্চে, যার প্রতিবাদের শক্তি পর্য্যন্ত মানুষের আজ নেই। তন্ত্রের সাধনে সেই জন্যে এত নীতির বাড়াবাড়ি নেই কারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিয়েই এর আসল কাজ, আর তারি সঙ্গে সম্বন্ধ।

জীব-ধর্ম্মে যৌবনে যে প্রবৃত্তিগুলি জেগে উঠে তাই নিয়েই এই তান্ত্রিক-সাধন আরম্ভ। যৌবনে প্রথম আকাঙ্ক্ষার বস্তু কি? পুষ্টিকর খাদ্য। যে সময়ে যে সমাজে তন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল সে সময় মদ খাওয়া সাধারণের মধ্যে প্রচলন ছিল। শরীরে স্ফূর্তি বাড়াবার জন্যে এক সময়ে একটা ঐ রকমের একটা না একটা নেশা বা মাদক জগতে সকল সমাজেই প্রচলন ছিল। ওটা দোষের ব্যাপার ছিল না। মদের দোষ আছে, সর্ব্বকালেই আছে, সেটা কিন্তু যিনি খান পাত্রের সেই গুণেই ঘটে থাকে। যার যেমন প্রকৃতি বা গুণ মদ খেলে তার সেই ভাবেরই উদ্দীপন হয়। স্বাভাবিক শরীর, মনের স্ফূর্ত্তির জন্যই ওটার ব্যবহার তখন ছিল, এখনও আছে। সেই জন্য মদটাকে প্রথমেই রেখেছিল যেটাতে স্ফূর্ত্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তারপর মৎস্য, মাংস। পুষ্টিকর খাদ্য-হিসাবে মৎস্য-মাংসের কথা কোন শাক্তকেই আর বেশী করে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

আমি : শাক্ত ছাড়া আরও যাঁরা আছেন, তাঁদের—

তিনি ঃ সকলেই শাক্ত,—যে শক্তি চায়, উপাসনা করুক না করুক প্রত্যেকে শাক্ত, আমি জানি তখনকার দিনেও যেমন এখনও তেমন সব মানুষই অন্তরে শাক্ত। জীবের প্রথম প্রবণতা শক্তিমুখী, যে অস্বীকার করবে সে ভণ্ড মিথ্যাচারী।

অঘোরীর বচন বড় কটু। অনেকগুলি লোকপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু, যাঁহারা সাধারণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর সাধু বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। তাঁর এখনকার তান্ত্রিক ভৈরব বা কাপালিকদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা নাই। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট যাহা শুনিলাম—যে যে কারণে তাঁরা অশ্রদ্ধেয় তাহা আমার ভাষায় বলিতেছি।

তন্ত্রমতে সাধন-পথে অগ্রসর হইলে, ঠিক মত নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন চলিতে থাকিলে, কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হয়। সেই সময়ের গুণে অনেকেরই অভিচার ক্রিয়ার উপর অত্যন্ত প্রবল অনুরাগ উপস্থিত হয়। মনের মধ্যে শক্তি-চালনার প্রবৃত্তি দেখা যায়। অবশ্য তাহা লোকের উপকারের জন্যই করা, এইরূপ একটা মনোভাব প্রথমে তাঁহাদের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু মানুষের স্বভাবে যত কিছু রাগ-দ্বেষও ত তাহাদের মধ্যে আছে সুতরাং তাঁরা নিজের স্বার্থে ক্রমশ তাহা প্রয়োগ করিতে থাকেন। প্রধানত চারটি প্রবল শক্তির চালনা তাঁহারা করেন এবং নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া উৎসন্ন যান। মারণ, উচাটন, বশীকরণ ও স্তম্ভন। এছাড়া অন্য যা কিছু তাও সব ভূতসিদ্ধির ফল। অনেকটা ম্যাজিক কিম্বা ভেল্কিবাজীর মত,—তাহা দেখিয়া অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি মানুষেরা মোহিত হয়,—ইহাতে কর্ম্ম-কর্ত্তাদের সাধন-জীবনে কিছু ক্ষতি হয় বটে কিন্তু খুববেশী হয় না। কিন্তু উচ্চ উচ্চ শক্তির চালনা যাঁরা করেন, আমাদের সকল মানুষের উপর শক্তি-প্রয়োগ করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করেন,—তাঁহাদের আর দুর্গতির সীমা থাকেনা। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের উপর হাত দিলেই তার ফলভোগ করিতে হয়। সৃষ্টির মধ্যে সে নিয়ম তো অলঙ্ঘনীয়—জীবের পক্ষে কল্যাণকর। তাহাতে যে কল্যাণ দেখিতে পায় না তাহার বুদ্ধির উপর কতকটা সয়তানী প্রভাব আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। বাস্তব যাহা কিছু তাহার উপর নিরন্তর অধ্যাসের ফলে অহং শক্তিগত হয়—তাহাই সয়তানী।

তন্ত্রের মধ্যে আত্মজ্ঞান বা মুক্তির সাধনই মুখ্য,—অভিচারাদি গৌণ এবং অবান্তর। পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের মধ্যে যেমন সাধনাদির উপায় এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুন্দর উপায় বলা আছে,—আবার বিভূতিপাদও আছে কিন্তু সেটা ত মুখ্য নয়। তন্ত্রের পথে রজ ও তমগুণী কতকগুলি সাধক আসিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গোপনে গোপনে অভিচারের পথে যায়। অহং শক্তিমান—এই পরিচয় পাইয়া শিষ্য-সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য, অর্থ, নানাপ্রকার ভোগ সুখের এবং প্রতিপত্তির লোভ তাহাদের জীবনে জীবন্ত হইয়া উঠে। তখন কোথায়

থাকে মোক্ষসাধন আর কোথাই বা থাকে ইষ্ট লাভ। তখন রজ আর তমোগুণের মেলা অবাধে চলিতে থাকে। ফলে আয়ুকাল শেষ হইলে, তখন তাহাদের যে দুর্গতি হয় সে আর বলিবার নয়।

সাধারণ মানুষে যে তাদের দেখিলে ভোলে, তাহার কারণ সাধন-অবস্থায় তাহাদের শরীরে লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। মানুষ মাত্রেই, যাহাদের আত্ম-চৈতন্যের বিকাশ হয় নাই তাহারা রূপে সহজেই মজে। উজ্জ্বল চক্ষু, জটাজুট, শরীরে লাবণ্য দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, সেই রূপের প্রভাবে তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়ে। কাজেই তাহাতে সাধকের অহংকার বাড়িয়া যায়। তারপর যাহা হয় তাহা লইয়া আলোচনায় ফল নাই।

আমি প্রশ্ন করিলাম : সাধকের ভৈরবী রাখার উদ্দেশ্য কি ?

তিনি বলিলেন : উদ্দেশ্য এই যে, পুরুষ-অভিমানী প্রকৃতি যাদের তাদের নারী-প্রকৃতির সংযোগের ফলে আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধের কাজে সহায়তা করে, দুইটি আত্মার মিলনে যে মহৎ ফল উৎপন্ন হয় তাহাতেই দুইটি জীবনই সার্থক হয়। যথার্থ সাধকের লাম্পট্য-দোষ থাকে না তারা একটিতেই কাজ শেষ করতে পারেন। নরক ঘাঁটা ত উদ্দেশ্য নয়,—উদ্দেশ্য আমার বাহ্য কামময় জীবনের পরিসমাপ্তি, আপ্তকাম হওয়া। এমন সাধন এই তন্ত্রের মধ্যে আছে যাতে ঊর্দ্ধরেতা হয়ে, বিনা ভৈরবীতে কোন স্ত্রীসঙ্গ না করে সিদ্ধিলাভ করা যায়। কিন্তু সে সব এখনকার দিনে ত কেউ চায় না, স্থূল ইন্দ্রিয়ের এতটা মোহ যে তাদের মোটেই উঁচু পথে লক্ষ্য যাবেই না।

আমি : ইচ্ছা থাকলে কেউ কি ঊর্দ্ধরেতা হোতে পারে ?

তিনি : তা কি করে পারবে। যাদের কর্ম্মক্ষেত্রে জীব-সৃষ্টির অল্পবিস্তর যোগাযোগ রয়েছে—তাদের ঊর্দ্ধরেতা হবার সুযোগ ঘটবেই না। জন্মজন্মান্তরের কর্ম্ম-প্রবণতা শেষ না হোলেও কেউ ঊর্দ্ধরেতা হোতে পারবে না।

আসলে ঊর্দ্ধরেতা হওয়াটাই উদ্দেশ্য নয় ত, উদ্দেশ্য হোলো আমাদের আনন্দময় জীবন, দুঃখ থেকে নিবৃত্তি। তা যখন আমাদের যৌবনে নারী-আসক্তি সহজেই আসে তখন তাথেকে জোর করে মনকে ফেরাবার প্রবৃত্তি তন্ত্র-শাস্ত্রে অনুমোদিত নয়। অস্বাভাবিক রাস্তায় যাবার কোন দরকার নাই। তা সম্ভবও নয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে যাদের মস্তিষ্ক উর্ব্বরা তারা একটা নূতন কিছু করবার বা দেখাবার জন্যেই একবার বেয়েচেয়ে দেখে—যদি টপ্ করে একবার ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়। যদি পরিমিত নারী-সঙ্গ করা যায়, তার ব্যভিচার না হয় তাহোলে মানুষের অধ্যাত্মমার্গে প্রাপ্য যতটা উন্নতি সবটাই নির্ব্বিবাদে আসবে। তারা মানব-জীবনের ফল ষোলো আনাই পায়। বাড়াবাড়িটা সকল সময়েই খারাপ। বেশীর ভাগ মানুষের ভোজনের ও ইন্দ্রিয়-সুখের লোভ এতটা প্রবল থাকে যে জীবনের অন্যান্য কর্ম্ম গৌণ হয়ে থাকে—তারা ঐ দুটির জন্যই অন্যান্য কাজ করে। তারা ফলভোগও কম করে না, প্রকৃতি তাকে দিয়ে বিস্তর জীব-সৃষ্টি করিয়ে নেন, প্রতিপালন করিয়ে নেন—আবার সেই সন্তানের

দুর্ব্যবহার দ্বারা তাকে দণ্ডিত করেন। মোটকথা তারা ইন্দ্রিয় সুখকে মুখ্য করে যে কষ্টভোগ করে তাতে সে-জীবনে তাদের চৈতন্য হয়ে যায় যে যথার্থই সুখের ব্যাপার নয়। এর শাঁশ বাদ দিয়ে ছোবড়াটাই খাওয়া হয়েছে। ফলের যেমন ছোবড়াটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় তারপর সেটিকে তফাৎ করে শাঁশের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে হয়—তেমনি, এমন কত কত জীবের জীবনে সুখ ঐ খোসা বা ছোবড়াটি দিয়েই মিটছে। ছোবড়া বা খোসার মধ্যেও ফলের স্বাদ কতকটা আছে কিন্তু সেটাত খাদ্য নয়। আবার অনেক ফল আছে যার খোসা বাদ না দিয়ে খাওয়া চলে। এই রকম ফল এমনই মধুর যে এর খোসাটারও আকর্ষণ আছে। ফল খোসা-সুদ্ধ খেলেও ভিতরে তার আসলটা শরীরের কাজে লাগে, অসারটা আপনিই বেরিয়ে যায়। এই কাম-ফলও সেই রকম, খোসাসুদ্ধ খেলেও সময়ে তা আলাদা হয়ে যায়। তাদের কথা বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলচি,—যাদের জীবনে যৌবনের ক্ষুধা ;—ভোজন ও ইন্দ্রিয়-সুখে পর্য্যবসিত নয়, যারা আরও কিছু উচ্চ উচ্চ জ্ঞান এবং ভোগের আকাঙ্ক্ষা রাখে তাদের ঊর্দ্ধরেতা হওয়া শক্ত নয়। পরিমিত যৌন-সম্বন্ধ থাকলেও তারা যত বেশী উচ্চ আদর্শের পানে এগিয়ে যায় ততই তাদের রেত ঊর্দ্ধগামী হোতে থাকে—তার ফলে তাদের নানা তত্ত্ব উপলব্ধি হয়—আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়, জগতবাসীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। স্থূল শরীরে যে মৈথুনের সুখ তার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। তারাই তখন সেটা বুঝতে পারে,—দেহাভিমানী মানুষে কি করে তা বুঝবে। তাদের তা বোঝাতে যাওয়া যে অন্যায়। যাদের চৈতন্য শরীরের গণ্ডী ছাড়ায় নি তাদের সঙ্গে ওসব প্রসঙ্গ চলে না। কাজেই, যত রকমের মানুষ এই সৃষ্টিতে আছে তাদের মধ্যে শরীরের ক্ষুধা ও রিরংসার কারবার যাদের জীবনে মুখ্য নয় তাদেরই ঊর্দ্ধরেতার ফলাফল ভোগ হয়। ঊর্দ্ধরেতা হব বোলে তাদের সঙ্গে নারী থাকলেও কসরৎ করবার প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্ত্তিতাই তাদের উচ্চ উচ্চ শক্তি এবং জ্ঞানের অধিকারী করে দেয়। জগৎসমাজে তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়, অনেকেই তাদের অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। তাদের মধ্যেই পৌরুষ প্রবল হয়। এই পুরুষ ভাবই সাধারণের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। একটা মানুষের পিছনে, তাকে তুষ্ট করবার জন্য কত শত লোকের কত আগ্রহ, এটা যেখানেই দেখা যাবে সেইখানেই বুঝতে হবে এই একটি পুরুষ, এতগুলি লোকের আশ্রয় হয়ে আছেন। তা যে কোন বিভাগেই হোক,—সেই ব্যক্তিকেই নায়ক বলা যায়।

আচ্ছা তন্ত্রে বিবাহ আছে কি ?—

আছে বৈকি ! তবে সে বিবাহ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূল। জাতি-বংশ, গোত্র, গাঁই এ সকলের অস্বাভাবিক বালাই নাই। শৈব-বিবাহ যথার্থ বিবাহ,—তার ফল কখনও এখনকার ভণ্ড আর্য্য বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের মত বিষময় হয় না।

আমি : বর্ণাশ্রমীদের ভণ্ড বলা যায় না, তারা মনে-প্রাণে যা বিশ্বাস করে সংস্কারমত তাই করে আসছে ত ?

তিনি : ভণ্ড ছাড়া আর কি বলবো। ব্রাহ্মণ-বংশের কথাই ধর্‌না রে শালা। তোরা কতবড় ভণ্ড—বেদের মতও রাখিস্ আবার তান্ত্রিকমতও মানিস্, দীক্ষা নিস্। এক উপনয়নেই ত কর্ম্মজীবনের সকল কাজ হোতে পারে, সে পথের অনুসরণ না করে কুলগুরুর কাছে আবার তান্ত্রিক দীক্ষার কি প্রয়োজন? 'ওঁ'কার জপ করলে যে ফল পাওয়া যায় অন্যান্য বীজের ক্রিয়াতেও সেই ফল পাওয়া যায়। মন্ত্রকে জাগ্রত করা সাধকের নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তা যে মন্ত্রই হোক না কেন। এইত গেল ধর্ম্মজীবনের ভণ্ডামো। তার পর—

আমি : আগে ত বৈদিক-আচার প্রচলিত ছিল, কেন বলুন দেখি এর সঙ্গে আবার তান্ত্রিকতা এলো?—

—আগে যখন, শরীর মনের তেজ ছিল, পশ্চিম-দেশের জল-হাওয়ার গুণে তাদের সূর্য্য-উপাসনা-প্রধান ঐ বৈদিক জীবনেই নিষ্ঠা ছিল। তারপর নড়তে নড়তে তন্ত্রপ্রধান এই বাঙ্গলায় এসে পড়তেই ছন্নমতি ধরবার সুযোগ এলো। বাঙ্গলার তান্ত্রিকদের সঙ্গে ক্রমে পরিচয় হোতে লাগলো। তাদের সংসর্গের ফলে বেশীদিন থাকতে থাকতে তন্ত্রের ধর্ম্মে বৈদিক ব্রাহ্মণের অনুরাগ দেখা দিতে লাগলো। আগে ত তন্ত্রের কোন পুঁথিই সংস্কৃত ভাষায় বা অক্ষরে লেখা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা তাদের বিদ্যা প্রকাশ করলেন তন্ত্রধর্ম্ম গ্রহণ করে আর সংস্কৃত-ভাষায় তাকে পুঁথিতে লিখে। তখন শিব আর্য্যদের নুতন অর্থাৎ শেষের দেবতা। ঐ শিবের মুখ দিয়েই তন্ত্রের যা কিছু মাহাত্ম্য বলানো হোলো—ব্রহ্মাকে শ্রোতা করে,—আবার পার্ব্বতীকে দিয়ে কতক বলানো হোলো। এইভাবে আগম-নিগম-এর সৃষ্টি করে তন্ত্রসারে তার চূড়ান্ত করা হোলো। অথচ বৈদিক আচার ছাড়বার নয়, ওটা প্রাচীন, জাতিগত সংস্কারের ধর্ম্ম, পৈতৃক ধর্ম্ম তখন সহজেই আপোষ হোলো, গার্হস্থ্য-আশ্রমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈদিক দীক্ষার কাজ আর গৃহস্থ হয়ে দার পরিগ্রহ করে তখন তন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে তান্ত্রিকমতে সাধন করতে বামুনেরা ব্রতী হোলেন, নিয়ম করলেন। তারপর বৌদ্ধ-প্রভাব। বৌদ্ধেরা শেষের দিকে এই তন্ত্রমার্গকে প্রধান অবলম্বন করেছিল যে। এর আসল কথা হোলো বৈদিক ব্রাহ্মণের দল ধর্ম্মের কারবার চুটিয়ে করবার ব্যবস্থা করলেন এই তন্ত্রকে ধর্ম্মাঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে। মন্ত্র হোলো গুহ্য। ব্যাপার আরও চমৎকার হোলো যখন ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম একত্র হোলো, ক্রিয়াকর্ম্ম বাড়লো। হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণদের উপজীবিকার সুবিধা এইভাবেই হয়ে গেল। তবে পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ যাঁরা তন্ত্রধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন এর মধ্যে যথার্থই ধর্ম্ম-জীবনের গোড়া থেকে আগা পর্য্যন্ত সবটাই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূল। কৃচ্ছ্র সাধনের অসারতা সম্যক প্রতিপন্ন হয় এই তন্ত্রমার্গে। শঙ্কর আচার্য্য সেইজন্যই, প্রবাদ আছে যে তন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারেন নি বা করেন নি। সূক্ষ্মভাবে তাঁরা বুঝেছিলেন ভোগ যোগ একত্রই ধর্ম্ম। আর এই ক্রমই প্রকৃতির এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার স্বভাবের সঙ্গে মেলানো। জীবলীলার ক্রমবিকাশ এই তন্ত্রের আদর্শের মধ্যে ধরা আছে। তন্ত্রের প্রতিপাদ্য সকল তত্ত্বই দৃঢ় অবিসংবাদিত নির্ম্মল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আসলে বৈদিক আর্য্যব্রাহ্মণদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ খুব নীচু হয়ে গিয়েছিল বোলেই তখন তন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করা সম্ভব হোলো। বৈদিক আচারবান্ আর্য্য ব্রাহ্মণ এদেশে এসে খুব বেশী দিন আর পিতৃ-পিতামহের আচার-জ্ঞান ও বীর্য্যে অধিকারী থাকতে পারলেন না। বাঙ্গলা মাটির এমনই গুণ। আবার বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধিকারে তন্ত্রের উন্নতি যতটা হয়েছিল অবনতিও কম হয়নি। অভিচারীর ক্রিয়াশক্তি এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেক কর্ম্মে তার ব্যবহার হোতো। ঈর্ষা-বিদ্বেষ-রাগ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ, নারীকে অবলম্বন করে সমাজের মধ্যে যথেচ্ছাচার, এ সকল অভিচার সহায় করে একেবারে চরমে উঠেছিল। তখন নারীসমাজে সতীত্ব বোলে কোন আদরণীয় বস্তু ছিল না। আদরণীয় ছিল ভ্রষ্টাচার। তাই ধর্ম্ম, তাই কর্ম্ম, তাই কাম্য, তাই সব। এসকল বড় কমদিন চলেনি। এই তন্ত্রের ব্যভিচার শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা একটা ধাক্কা পেয়েছিল, তারপর দ্বিতীয় ধাক্কা এলো চৈতন্যদেবের সময়ে। সেই ধাক্কায়ই—এটির গোড়া একেবারেই আলগা করে দিলে। বাঙ্গলায় তখন থেকে তন্ত্রের প্রভাব হীনবল হোতে হোতে বর্ত্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে যেমন এদিকে তন্ত্রের ধর্ম্ম উঠে গেল তেমনি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সতেজে গজাতে লাগলো, আর তন্ত্রের অনেকগুলি আবিষ্কার,—গুহ্য একাঙ্গ মৈথুনতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রভৃতি আত্মসাৎ করে নিয়ে অঙ্গ বাড়াতে লাগলো। সহজিয়া, বাউল, আউলাদি সম্প্রদায় ত তন্ত্রের ভাঙ্গা-হাটের মাল, বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মহাজনদের গদিতে জমা হয়ে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, তন্ত্রের সকল ব্যাপার এত গুহ্য কেন?

তিনি: প্রথমে গুহ্য ছিল না, প্রথমে তন্ত্রের সাধন সহজ এবং সাধারণের উপযোগীই ছিল,—কিন্তু যখনই এই মৈথুনাদির প্রকরণ নানাপ্রকার এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব ফলাফল আবিষ্কার হোতে লাগলো, তখন থেকে এটা গোপন করবার নিয়ম হোলো, কারণ অন্য সম্প্রদায়ের কাছে এসব ক্রিয়া ঘৃণার বস্তু বলে, অবজ্ঞার বিষয় বলে ধারণা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। অল্প লোকেই এর মধ্যে থেকে সার বস্তু পেয়েছে, বেশীর ভাগই বিপথে গিয়েছে, ব্যভিচার করেছে। কামের যত কিছু বিকৃতভাবের অভিব্যক্তি হোতে লাগলো, গুহ্য রাখাতে এই দোষ হয়ে গেছে, গোটা কতক সঙ্কেত ছাড়া, এই কামরাজ্যের বিচিত্র রহস্য সাধারণের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। স্ত্রী-পুরুষের মিলে এই যে রমণ, এর মধ্যে শরীর-ধর্ম্মেই সাধারণের প্রবৃত্তি। কিন্তু শরীর-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত প্রেম বলে যে একটি স্বর্গীয় সুখ আছে তা সাধারণের কাছে গুপ্ত, অপ্রকাশিত, অজ্ঞাত। সাধারণ মানুষের শরীরগত বা ইন্দ্রিয়গত সুখের সংস্কার পুরুষানুক্রমে এতটাই প্রবল যে এই সব স্থূল শরীরের সম্পর্কশূন্য হয়েও কত বড় একটি সুখের উপায় আমাদের আছে—তার কল্পনাও যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আজ এই তান্ত্রিকদের কিম্বা এই সহজিয়াদের সর্ব্বনেশে কাম-সাধনের বিকৃতি দেখলে অবাক হোতে হয়। যে ধর্ম্মে দু-একটি লোক সিদ্ধ হয়,—তারপর তার পদ্ধতি কতকটা বিকৃত হয়ে আসে, শেষে এই রকম শোচনীয় পরিণাম হয়—এদেখে কি মনে হয় না যে এটা যারা আবিষ্কার করেন তাদেরই জন্য। এই কারণেই আরও গুহ্য রাখার ব্যবস্থা।

আমি বলিলাম: আমার মনে হয় এসব গুহ্য রাখা খুবই অন্যায়।

তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন: ওরে শালা, তখনকার দিনে কি এখনকার মত ছাপাখানা ছিল, না বিদ্যার এতটা প্রচার হয়েছিল যে সাধনের এ সকল গুহ্য রহস্যময় ব্যাপার সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সাধারণের কাছে পৌঁছে যাবে। আর তাতে লাভই বা কি হোত! হাজারে একটা মানুষ সাধনের পথে যায় কি না যায়। তা ছাড়া শরীরের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী; প্রাণশক্তির ক্রিয়া আর অনুভবের নানাস্তর, স্থূল সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বা বুঝানো যাবে কি করে। অনুভবের কি ভাষা আছে? তার উপর কাম-মার্গের ব্যাপার কতই না জটিল,—লিঙ্গ থেকে মস্তিষ্ক অবধি অন্তরস্থ প্রাণমার্গে তার ক্রিয়া; রেত বা ধাতুক্ষরণের কত প্রকার ভেদ, অন্তঃক্ষরণ বহিঃক্ষরণ, কেমনভাবে কোন্ কোন্ ক্রিয়ার ফলে, বহির্গতি বন্ধ করে অন্তরমার্গে গতিমান করা যায়, এ সকল ব্যাপার প্রকৃতি যখন গুহ্য রেখে দিয়েছেন তখন কেন তাকে অত প্রচার করবার জন্যে মাথা ব্যথা তোর বল্ দেখি! এই কামকলা যা নিয়ে এই বিরাট সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ব্যাপার দিবারাত্র চলচে তার যত রহস্য, মানুষের শরীরের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা থেকে সুরু করে কামের উদ্দীপন, যে ভাবে দুজনের উপর দুজনের চৈতন্য থেকে আরম্ভ করে মনের ভিতর দিয়ে শরীরের উপর টান—তারপর মৈথুনে দুটি এক হয়ে যাওয়া, তারপর প্রাণশক্তির ঘন স্পন্দনের উদ্দামলীলা, শেষে উভয়ের স্খলন। যে ক্রমে প্রথম থেকে শরীরের নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়িগুলির ভিতরে যে যে ভাবের ক্রিয়া হয়—তার প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রত্যেক ফলটি কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? এ সকলই অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার,—পূর্ণ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থূল তুচ্ছ বাস্তব প্রমাণ দিয়ে এসব লোক-সমাজে কি করে প্রকাশ করা যাবে। কামের প্রথম প্রেরণা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ পরিণতি পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার তাই তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়; এসকল কি করে সব মানুষকে ন'কড়া ছ'কড়ার হিসাবে বুঝানো যাবে, তুই আমায় বল্ দিখি?

আমি: আচ্ছা, সহজ-বুদ্ধিতে মানুষের যৌবন এলে, নারী হোলে পুরুষের উপর আর পুরুষ হোলে নারীর উপর একটা আকর্ষণ হয় ত। সেটা কি সুধুই কামের ব্যবহার চরিতার্থ করবার জন্যে—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: অন্য কথা পরে শুন্‌চি, আগে একটা ভুল তোকে শোধরাতে হবে। তুই যে বল্‌লি নারী আর পুরুষ ওটা ভুল হোলো, নারী-প্রকৃতি আর পুরুষ-প্রকৃতি নারী ও নর এই কথা বোলতে হবে।

আমি: ও আপনাদের কথার বাড়াবাড়ি—যে রকম বলেই হোক বুঝাতে পারলেই হোলো।

তিনি: ফের শালা তুই না বুঝে পণ্ডিতি করছিস্! এ প্রকৃতির রাজ্যে পুরুষ কেউ আছে নাকিরে শালা। কথায় যাকে পুরুষ বলছিস্ সে ত প্রাকৃত জীব। লম্বা লম্বা হাত খানেক করে লিঙ্গ থাকলেই কি পুরুষ হয়? অংশত পুরুষের যে গুণ তা নারীতেও ত আছে। দেখতে পাচ্চিসনে এক ভগবানকে সকলেই চাইচে!—কেন চাইচে? সেই একমাত্র পূর্ণ পুরুষ বোলেই

চাইছে। যদি কেউ পুরুষ এখানে থাকতো সকলেই তাকে চাইতো। পুরুষের প্রথম এবং প্রধান গুণই হোলো সে সকলেরই আশ্রয়, সকলেরই তাকে চাই, না পেলে নয়। পুরুষ এক, পুরুষে দুই সহ্য করতে পারে না, বিশ্বাস করে না। প্রকৃতির কোলে আমরা যত জীব, এই পৃথিবীর মাটিতে জন্মেছি সবাই প্রকৃতি পুরুষের গুণের অতীব ক্ষুদ্র কণা-প্রমাণ অংশ নিয়ে। তারি ঠেলা এমনি যে আমরা আবার আমাদের স্বতন্ত্র পুরুষ বলে পরিচয় দিচ্চি। কি লজ্জা! এক সদাশিব পুরুষ আর কেউ পুরুষ আছে নাকিরে? গুণ ধরে বিচার করলে এই প্রাকৃত পুরুষের নারীর সঙ্গে সম্বন্ধের বেলা মাত্র ঐ গুণটুকু দেখতে পাওয়া যায়,—নারী-সম্পর্কে তার অধিকার পূর্ণ রাখিতে চায়—সেখানে আর কারো অধিকার সে জানে না। নারীরও ঠিক ঐ গুণটি আছে,—সেও তার ভর্ত্তার অন্য নারী-সঙ্গ, পতির উপর অন্য মেয়েমানুষের প্রভাব সহ্য করতে পারে না,—এই যে পুরুষের গুণ এত মেয়ে-মদ্দ দুয়ের মধ্যেই রয়েছে। একমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রেই এটার পরিচয়। মিলনের জায়গায় দুটি একতন্ত্র। মানে বুঝে কথা বল্‌লে ত গায়ে লাগে না, এখন আসল পুরুষ আর প্রাকৃত পুরুষের তফাৎ বুঝেছিস্?

আমি: এসব ত বৈষ্ণব-দর্শনের কথা বোলেই আমার জানা আছে।

তিনি: সব দর্শনের মোদ্দা কথা এক যে রে শালা,—তত্ত্বে পৌঁছালে সবই এক রকম। পথের প্রকরণ, পদ্ধতি, যা আলাদা। তাই না তুই তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি দেখতে এসেছিস্!

আমি: শরীর-তত্ত্বের সঙ্গে সাধনের ত বিশেষ সম্পর্ক আছে।

তিনি:—সাধন ত শরীর নিয়েই, কাজেই সুস্থ শরীর সুস্থ মন না হোলে সাধনের মানে হয় না। বিকৃত শরীরে সাধনের মানে শরীরের চিকিৎসা। কোবরেজী ওষুধের বদলে শরীরে ভিতরকার নিয়মের, বায়ুর গতি স্থির করে তাকে স্বাস্থ্যের তালে চালানো। সাধন-বস্তুটি এমনই কল্যাণকর, যে তাতে আর কিছু হোক বা না হোক শরীরে স্বাস্থ্য পূর্ণমাত্রায় আসবেই আসবে। সাধন করছে অথচ শরীর খারাপ, বুঝতে হবে মরণের সাধন হচ্ছে, জীবনের নয়। সাধনের প্রথম প্রত্যক্ষ ফল হোলো স্বাস্থ্য,—আনন্দময় মানসিক অবস্থা। সকল বিষয়েই আনন্দে পরিসমাপ্তি। মহা দুঃখের ব্যাপার হোলেও সাধকের প্রাণে সেই দুঃখের কারণ-জ্ঞান উদ্‌ভাসিত হয়—তার ফল আনন্দ। এই দুটি হোল স্পষ্ট লক্ষণ।

১৯

বক্রেশ্বরের আকর্ষণ ইতিমধ্যে আমার অন্তরে গভীর ভাবেই রেখাপাত করিয়াছে, ঐ অঘোরী সাধুটিকে উপলক্ষ করিয়া। আমার ধ্যান-জ্ঞান এখন তিনিই। কি গভীর আকর্ষণ তাঁর, সর্ব্বক্ষণই আমার অন্তরে তাঁহার মূর্ত্তি এবং তাঁহার কথাই উঠিয়া অনন্যমনা করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁর প্রকৃতির অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। কখন দেখি এমন গম্ভীর যে সে মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে সাহস হয় না। কেমন একটা ভয়, যাহা তাঁহার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আসিবার পূর্ব্বে ছিল, সেই ভয় আমায় পাইয়া বসে। অথচ ভয় করিবার মত কোন ব্যবহারই তিনি আমার সঙ্গে করেন নাই। বিশেষভাবে বাহিরের মূর্ত্তি দেখিয়াই এটা হয়। কথা কহিলেই আর সেভাব থাকে না। এমন চক্ষু তাঁহার, আমার মনে হয় তাঁর পূর্ণ দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু চক্ষু তাঁহার সাধারণত অর্দ্ধনিমীলিতই থাকে, তাহাতে তাঁহার অক্ষি-গোলকটি যে কতবড় তাহা সাধারণের লক্ষ্য হয় না। উহা প্রত্যক্ষ হয় তখনই যখন তিনি ক্রোধের ভাবে কাহারও উপর দৃষ্টিপাত করেন। তখন সকলকেই চক্ষু নামাইতে হয়। আমি অনেক সাধু-মূর্ত্তিই দেখিয়াছি—সহজ ভাবে নয়—বিশেষ ভাবেই দেখিয়াছি,—বালককালে প্রথম স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁহারা হামেশাই তাঁহার কাছে যাতায়াত করেন—বোধ হয় তাঁরাও সেই চক্ষুর বিশেষত্ব ধরিতে পারেন কি না আমার সন্দেহ আছে। তারপর একটি পাঞ্জাবী সাধু হরিদ্বারে দেখিয়াছিলাম। তারপর ইঁহাকে দেখিলাম, পরবর্ত্তীকালে তারাপীঠের বামা-খেপার মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম এই যে চারিটি মূর্ত্তি, প্রত্যেকেরই বিশালায়ত চক্ষু এবং পূর্ণজ্যোতি-বিশিষ্ট কিন্তু কারো সঙ্গে কারো চক্ষু-রেখার মিল নাই। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইঁহার চক্ষু সর্ব্বদাই রক্তবর্ণ এবং স্থির প্রশান্ত। তিলমাত্র চাঞ্চল্য তাহাতে নাই, বোধহয় পলকও নাই। আমার মনে হয় না ইঁহার চক্ষে কখনও পলক দেখিয়াছি। এত স্নেহ তাঁহার পাইয়াছি—তথাপি এক এক সময় ভয় তাঁর মূর্ত্তি দেখিয়াই আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু কথা কহিলে একেবারে প্রেমের উৎস ছুটিত।

কখনও দেখিতাম এমন নিরপেক্ষ, যেন কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কোনও কালে ছিল না বা হইবেও না, এমন ভাবটি। জগতের সঙ্গে তাঁর যে কোনও সম্বন্ধ নাই ইহা বুঝিতে কাহারও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। তখন যদি কেহ কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য লইয়া আসে ত কখনও কথা কহিতে সাহস হইবে না। একদিন এইরূপ একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক পথে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন: এখানে এক অঘোরী আছেন, কোথায় থাকেন জানেন? আমি তাঁহাকে লইয়া তাঁর কুটীরের দ্বারে উঠিলাম। দেখিলাম, তিনি বসিয়া আছেন, একেবারেই উদাসীন, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধই নাই। লোকটি প্রণাম করিয়া বসিল, তিনি কিন্তু স্থির নিশ্চল, কোন দিকেই দেখিলেন না, বা কিছুই বলিলেন না। আমি দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। তার পর আমার মনে হইল হয়ত ইঁহার কোনও গোপনীয় কথা থাকিতে পারে, আমার সরিয়া যাওয়াই ভাল। চলিয়া আসিলাম। অনেকক্ষণ পর, তিনি ফিরিতেছেন দেখিলাম। আমায় দেখিয়া তিনি নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কি রকম মানুষ বলুন ত, আমার আসা ত বৃথাই হোল। উনি ত কিছুই বলেন না, আর আমারও কথা কইতে সাহস হোল না, প্রবৃত্তিও হোল না। আপনি জানেন উঁনি কি কথা কন্ না?

আমি বলিলাম: কন্ বই কি! আপনার যা জিজ্ঞাসা—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: আর মশাই, অনেক কিছুই ত বলবার ছিল কিন্তু আমার তাঁর মূর্ত্তি দেখেই ত হয়ে এলো,—কথা কইব কি? ওঁর কাছে বশীকরণের কিছু পাওয়া যাবে মনে করেই ত এসেছিলাম—কিন্তু এতে যে ওঁর কতটা লাভ ছিল তা হয়ত তিনি বুঝলেন না, কাজেই আমায় ফিরে যেতে হোলো।

কি রকমের লাভ জিজ্ঞাসা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উত্তরে তিনি বলিলেন: আমি এর জন্য ওঁকে দুই শত টাকা পর্য্যন্ত দিতাম।

হায় সাধুসঙ্গ-কামি!—তোমার পোড়াকপাল!

একদিন প্রাতে, প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া অঘোরীর সন্ধানে বাহির হইলাম, দেখিব সকালের দিকে কিভাবে থাকেন, কি করেন ইত্যাদি। নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখিব যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারিব। কুটীরে গিয়া দেখিলাম শূন্য কুটীর, দ্বার ত খোলাই থাকে, কখনও বন্ধ দেখিলাম না। বাহিরের পানে এদিক-ওদিক চাহিতে দেখিতে পাইলাম—ভুলো (?) ডোম, ঐদিক হইতে আসিতেছে। ইহাকে হামেশাই এখানে দেখা যাইত। অঘোরীর একজন অতি অনুগত ভক্ত। শ্মশানের কাজকর্ম্ম করিত, দু' চার আনা পাইত আবার কারণ প্রসাদও পাইত। সে ছাড়া অঘোরী বাবাজীর সন্ধান আর তেমন করিয়া কেহ রাখিত না, কাজেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: কোথায় তিনি?

সে বলিল: হোই দেখেন গা, কাল রাত হতে পড়ে রইচেন শ্মশানে যেঁয়ে। আমি পুনরায় বলিলাম: কাল রাত্রে কি সেইখানেই ঘুমিয়েছিলেন নাকি?—সে বলিল: ওঁয়ার কি ঘুম আছে নাকি, ওমনিই পড়ে রইছেন।

আমাদের কলিকাতা মহানগরীর সভ্য অধিবাসিবৃন্দ যাদের পল্লীগ্রামের শ্মশানের অভিজ্ঞতা নাই,—নিমতলা, কেওড়াতলা, কাশীমিত্র অথবা কাশীপুরের শ্মশান ছাড়াইয়া যাহাদের অভিজ্ঞতা অধিক দূর যায় নাই—রাত্রের কথা থাক, তাহাদের দ্বিপ্রহরে দিবালোকে পল্লীশ্মশান যে কি রূপ ধারণ করে তাহা বুঝানো সহজ নয়। বিশেষত এই বীরভূমের শ্মশান। এমন ভয়ঙ্কর শ্মশানের দৃশ্য বোধ করি অন্যস্থানে নাই। যাঁহারা বীরভূমের শ্মশান দেখেন নাই তাঁহাদের জানিয়া রাখা ভাল যে, বীরাচারের প্রত্যেক স্থান, তান্ত্রিক সাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিয়া প্রত্যেক মহাপীঠস্থান শ্মশান-সংশ্লিষ্ট।

আসপাশে জঙ্গল, নদীতীর অবধি বিস্তৃত। অস্থি, নরকপাল, দগ্ধ অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ড, ইতস্তত ছড়াইয়া রহিয়াছে। কাক, চিল, শকুন, শৃগাল, কুকুরের অবাধ গতাগতি। ছোট ছোট শিশু বা বালক-শব এখানে অনেকেই দাহ করে না, গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে, তারপর চলিয়া যায়। শৃগাল কুকুরেরা সন্ধানী লোক, শ্মশান জনশূন্য হইবার পর মুহূর্ত্তেই মাটি আঁচড়াইয়া দেহটি বাহির করিয়া তাহারা ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া ফেলে। কেবল অস্থিগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে। ছোট ছোট গাছপালা চারিদিকেই, তাহার

আড়ালেই ইহারা আপনার কাজ সারিয়া লয়। কোথাও কতকটা চুলির গর্ত্ত কাটা, তাহার উপর আধপোড়া কাঠকয়লা ছড়ানো। কাঁথা, ছেঁড়াকাপড়, কাণাভাঙ্গা কল্সীর ছড়াছড়ি। এমনই স্থান এখানকার শ্মশান।



অঘোরীর কুটীর হইতে কতকটা গিয়া দেখি তিনি একটি ছোট গাছের পাশে শবাসনে শুইয়া আছেন। একটি হাত মাথায় উপাধানের কাজ করিতেছে। দেখিবামাত্র আমার মনে হইল যোগীশ্বর মহাদেব কি এইভাবেই শ্মশানে শুইয়া থাকিতেন? আপন ধ্যানে আপনি

বিভোর হইয়া জগৎ প্রপঞ্চের কথা ভুলিতেন। এমনই অবস্থায় কি জগদম্বা আপন দক্ষিণ চরণ তাঁহার হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছিলেন?—ভাবিতেছিলাম, কি ধাতুতে এসব মানুষ গড়া! বুঝিতে পারিনা, কেমন করিয়া আমাদেরই মত একজনের এমন অবস্থা হয়! কেন বুঝিতে পারি না,—বুঝিতে বাধা কি? বাধা সেইখানে যেখানে আমরা আত্মদোষ নির্দ্ধারণে উদাসীন, পরদোষ অনুসন্ধানে উদ্দাম এবং অতি তৎপর। তাহার উপর যেখানে আমরা ভণ্ড, কাপুরুষ, প্রেমহীন, অতীব স্বার্থদুষ্ট মন লইয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ থাকি। আমরা কেমন করিয়া এ তথ্য সমাধান করিতে পারিব? এ তথ্য সমাধান না হইলেও কিন্তু ইহার আকর্ষণ অনুভব কিছু কম করি না। ভাবিতেও আনন্দ, প্রত্যক্ষ করিতেও আনন্দ, পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রকাশ করিতেও আনন্দ। যদিও জীবনে একবার, কয়েকদিনের জন্য ইঁহার সঙ্গ পাইয়াছিলাম, তাহার ফল জীবনে স্মৃতির মধ্যে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

আস্তে আস্তে তাঁহার মাথার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম,—কতক্ষণ দাঁড়াইয়াই রহিলাম। তিনি জানিতে পারিলেন কি না তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গিয়া তাঁহার পাশে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে তিনি চাহিলেন, আমায় দেখিলেন বটে কিন্তু কোন কথাই নাই। আমারও কিছু বলিবার মত কথা ছিল না। বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণই কাটিল, এইবার তিনি নড়িলেন, একদিকের পা মুড়িলেন। আমার ধৈর্য্য কতটা তাহারই যেন পরীক্ষা চলিতেছে।

ব্যাপারটি যা আমার মনে হয় তা ঠিক নয়। বসিয়া বসিয়া কত ভাবিতেছিলাম, অবশ্য এই আঘারীর কথাই। তাঁর সংসর্গে আমার মধ্যে মূলে কিছু সৎভাবের প্রেরণা অথবা সাধন-পথে কিছু আলো পাইলাম কিনা, কতটুকু স্থূল, এবং অসতের মোহ কাটাইতে পারিয়াছি। তাহার উপর আত্মপ্রসাদও আমার মধ্যে প্রত্যেক উপলক্ষে কেমন করিয়া আসে, তাহাও লক্ষ্য করিতেছিলাম, সম্মুখের ওই আদর্শটিকে কেন্দ্র করিয়া আমার চৈতন্য ক্রমে আত্মগত হইতে লাগিল, বেশ বুঝিতে পারিতেছি, 'আমি' এই বোধটি মাথার মধ্যে কোনস্থানে অনুভব হইতেছে। চকিতের মধ্যে যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। কি নিধিই হারাইলাম। হায়!

সম্মুখে অঘোরী তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন,—আমার দৃষ্টির উপর তাঁর দৃষ্টি পড়িবা-মাত্রই আমায় আবার আনন্দে আকুল করিয়া তুলিল।

এমনই সময় সৎকারার্থে শব লইয়া একদল লোক আসিয়া একেবারে আমাদের অতি নিকটেই খাটিয়াখানি নামাইল। আমার অন্তরের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন,—পরে তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: বেরো শালা তুই এখান থেকে। কেন এখানে এলি তুই, যা, চলে যা এখান থেকে, আমি এদের সঙ্গে ভাল থাক্‌বো,—তোর মত এরা মনে মনে অত শত হিসেব করে না। আমার এদের সঙ্গ ভাল লাগে। বেরো শালা, যা বলছি, তুই এখনই যা।

এমনই যা যা বার কতক বলিলেন, যে আমায় উঠিতেই হইল, আমি জোর করিয়া কিছুতেই

থাকিতে পারিলাম না। কিছুতেই আমার ওখানে বসা আর সম্ভব হইল না। ইহা লইয়া মনে একটু দুঃখ হইল বটে, কিন্তু আসনে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে সকল রহস্য ভেদ হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম কেন তিনি আমায় ঐ সময় উঠাইয়া দিলেন।

আসিয়া দেখি মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা হাতে এক লাঠি, একটি বাউল মূর্ত্তি নাচিতে নাচিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ আবার কি ভাব!—আমার মনটি বিরস ছিল, সদ্য সদ্য অঘোরীর তাড়া খাইয়া মনের বেদনা মুখে বেশ ভাল রকমই প্রকট ছিল।



একি, আবার গোমরা মুখ কেন,—সাধু মানুষের হোলো কি?

আমি বলিলাম: এমন কিছু না, আপনি এখানে কোথায় এসেছেন, জান্‌তে পারি?

তিনি বলিলেন: আমাকে ভাগাবার চেষ্টায় আছ কেন বাবা, আমি কি অপরাধ করেছি?

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম: বসুন না, আমার সে অভিপ্রায় নয়। এমনিই আমি মনে করেছিলাম হয়ত অন্য কোথাও এসেছেন, কোনও পরিচিত,—

তিনি হাসিয়া বলিলেন: তা বাবা, আমার পরিচিত ত কেউ নেই এখানে, তার জন্য তোমার ভাবনা নেই। অপরিচিত হোলেও আমি বেশ সকলের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারি, এখানে শুনলাম যে দুই একজন আছেন, তাই না আলাপ করতে আসা!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনারা কোন্ সম্প্রদায়ের,—জিজ্ঞাসা করতে পারি?

হাঁ, তা পারবে না কেন, আমরা সহজ মানুষ, আমাদের সম্প্রদায় এখন মরে গেছে বাবা।

আমার মনে হইল,—এই মানুষটির সঙ্গে আলাপের জন্যই অঘোরী আমায় এত জোর করিয়া উঠাইয়া দিলেন। আরও মনে হইল এঁর সঙ্গ আমার সুধুই অভিপ্রেত নয়, অন্তরের কাম্য। চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িয়া সহজিয়াদের কথা এক সময় কতই না ভাবিয়াছি।—এই সব ভাবিতেছি, বাউল একটি গান ধরিলেন,—

ডুব্‌তে কি সবাই পারে,
রূপসাগরে তরঙ্গেতে যায় রে ভেসে।

এই গানের এক লাইন শুনিতে শুনিতেই আমার সংজ্ঞা লোপের উপক্রম হইল। আনন্দের প্রবাহ চলিতে লাগিল। আমি ডুবিয়া গেলাম।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বাবাজী আসিয়া আমার আসনের নিকটেই বসিলেন। বলিলেন: আপনি যে আমাদের আপনার জন দেখেই আমরা চিন্‌তে পারি।

আপনি কি জ্যোতিষ জানেন?

আরে বাবাজি, জ্যেতিষ শাস্তোর কি এতবড় জিনিস, একজনের পরিচয় জানতে হোলে শাস্তোর ঘাঁট্‌তে হবে। আমাদের ওসব বালাই নেই। প্রেমের ঠাকুর হৃদয়ে সব সময়ে হানা দিচ্ছেন, কে কোন্ দলের মানুষ তা তিনিই জানিয়ে দেন।

আমি বলিলাম: এখানে তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি দেখবো, সাধকদের সঙ্গে মিশবো বোলেই এসেছি। এখন এমন এক সাধুর পাল্লায় পড়েছি—

ওসব কেন বাবা, যে যে-রাজ্যের লোক নয় তার সেই রাজ্যে ঠোকর মারবার দরকার কি?

জানতে ইচ্ছা হয় ত? আমি বলিলাম: জানলেই বা দোষ কি?

দোষ এই যে খানিকটা ঘুরণী পথে গিয়ে ঘোর পাক খেয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে। আরও জেনে রাখো বাবা তোমার সংসার বেশ ভাল রকমই আছে।

আমি বলিলাম: সে কি? আমার ইচ্ছা এই ভাবে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়ে জীবনের দিন কাটিয়ে দেবো।

মনে ত হয় বাবা, কিন্তু তা হোতে দেয় কৈ! তোমার সত্ত্ব আর কিছু রাখবে না বাবা, সবটাই নিংড়ে বার করে নেবে, তবে ছাড়বে।

খুলে বলুন, আমি ভাল রকম জানতে চাই।

আরে বাবাজি, তোমার এত কষ্টের, এত যত্নের বেঙ্কোচোয়্যো কোথায় থাকবে এসব বাবা, যখন তিনি ঘানিগাছে জুড়ে পিষিয়ে তেল বার করে নেবেন। হাঃ হাঃ হাঃ!



এ লোকটা বলে কি, আমার এত যত্নের তপস্যা নষ্ট হইয়া যাইবে?

আরে বাবা, যন্ত্রটা যে আসলে প্রবাহকে বেঁধে রাখবার কাজেই রয়েছে, যেটা একেবারেই অসার—যার কোনও দরকারই ছিল না। তা যখন এটা হোয়েছে ভালই হোয়েছে—এতে

একটা তাঁর অভিপ্রায় রয়েছে যে। তা বাবা জেনে রাখো, তোমায় ঘরে ফিরে অনেক লম্বা পাড়ি দিতে হবে, সংসার ঘাড়ে করে।

এখন একথা সব আমার কানে ভাল লাগিতেছিল না, বরং বিসদৃশই লাগিতেছিল। তিনি সেটি বুঝিয়া ফেলিলেন, বলিলেন: চল বাবা এখান থেকে একটু উঠে পড়ি, চল মন্দিরের আঙ্গিনায় যাই,—ফাঁকা আছে।

যন্ত্র-চালিতের মতই চলিলাম। তিনি বলিলেন: ঐ গাছতলায় জঙ্গলের মধ্যে একটি ভাঙ্গা বিগ্রহ আছে দেখেছো কি বাবা,—

আমি ত দেখি নাই, কোনখানে? চলুন যাই,—

কুণ্ডের ধারে ধ্বংসোন্মুখী উঁচু ইষ্টক-নির্ম্মিত অলিন্দের সারি, তাহার উপর অসংখ্য গাছপালা শিকড় গাড়িয়াছে, তাহার পাশেই জঙ্গল। সেই জঙ্গলে অনেকগুলি শৃগাল বাস করিয়া থাকে। তাহার পরেই কতকটা বনপথ।

আমরা সেই বনপথ ধরিয়া চলিলাম—পথে আমার আর কথা কহিতে ইচ্ছাই হইল না। ভবিষ্যতে আবার সংসারের আবর্ত্তে পড়িতে হইবে শুনিয়া অবধি প্রাণে আনন্দ আর নাই। সঙ্গী বাবাজী আমার দুঃখটি অনুভব করিয়াছেন বুঝিয়াছি। যখন তিনি দাঁড়াইলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: এইখানেই নাকি?

হাঁ, আর একটু এগিয়ে আসতে হবে। এই দেখ বাবা,—

দেখিলাম সত্যই একটি অতি প্রাচীন পুরুষ-মূর্ত্তি ভগ্ন এবং স্থানচ্যুত। নীচের দিকে পদ্মাসনের কতকটা আড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকগুলি গাছ শিকড় গাড়িয়াছে, তাহার চারিদিকেই টুক্‌রা টুক্‌রা অনেকগুলি পাথর। বেদী যেখানে ছিল সেখানে একটি উঁচু ঢিপি ছাড়া আর কিছুই নাই। সম্ভব এখানে একটি মন্দির ছিল। কোন সময় হয়ত এই বিগ্রহের পূজা হইত। তারপর ধ্বংসের বন্যা আসিয়া সব শেষ করিয়া দিয়াছে।

তিনি একখান পাথরের উপর বসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন: এস ভাই বসা যাক্,—আজ তোমায় বড় দুঃখ দিয়েছি—ছেলে মানুষ কিনা, সংসার এখন রহস্যই হয়ে আছে কিনা, তাইতে এ কথায় এতটা বেদনা-বোধ হয়েছে। আসলে কিছু নয় দাদা, সবই চমৎকার, যেমন এপিঠ তেমনি ওপিঠ।

২০

বাউল বাবাজির গলাটি মিষ্ট, তাহার উপর ভাব-রসে তাঁর প্রাণটি পূর্ণ সেইজন্য তাঁর গান শুনিলে চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়। আমার সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎ উক্তি শুনিয়া মনটি যে

খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহা যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তখন নাচিয়া নাচিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া একটি গান ধরিলেন।

সহজ পথে উছট্ লাগে, ওরে মন কাণা;
(ও) তুই আপনি সহজ না হইলে সহজের পথ পাবি না।

এই গানটি সত্য সত্যই মন্ত্রের কাজ করিল। আনন্দের প্রবাহ চলিতে লাগিল, সেই সঙ্গে মনের অবসাদ, বক্রগতি এবং জড়তা সব কিছু স্থির, সহজ হইয়া গেল। কেমন করিয়া সহজ ব্যাপারকে আমরা জটিল করিয়া মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করি তাহা বুঝিয়া বিমল আনন্দ প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দিল। অন্তরে নিজের গলদ ধরা পড়িলে এমনই হয়। আমরা নিজের কাছে কতটা যে অহেতুক অপরাধী, যদি একবার স্থির অবস্থায় অনুসন্ধান করি তাহা হইলে অন্তরে সবটাই পরিষ্কার দেখিতে পাই, যাহার ফলে অনেক অহেতুক দুঃখ এবং অবসাদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। আমার নিজের বেদনা ত এড়াইতে পারি, আবার অপরের বেদনা এবং দুঃখ অনেকটুকুই মোচন করিতে পারি। তার আরও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিশ্চিৎ ফল এই লাভ হয় যে আমাদের ব্যবহার অপরকে মনঃপীড়া দিতে পারে না। কিন্তু এমনই আমাদের সংসর্গজ সংস্কার, আমাদের 'অহম্' এমনই দুষ্ট ভাবের আবরণে কঠিন, তাহা সহজে ঘটে না, আমার গতির সঙ্গে বাহ্য বিষয়ের আপোষ করিতে মনকে লইয়া আমি এমনই ব্যস্ত এবং সমাহিত যে সে কঠিন আবরণ মুক্ত করা আরও কঠিন হইয়া পড়ে।

দুইটি পঙ্‌ক্তি গান করিয়া তিনি থামিলেন। আমি বলিলাম: চলুক না, থামলেন কেন? তিনি বলিলেন: ঐ টুকুই যথেষ্ট, আর বেশীতে কাজ কি? তখন আমি বলিলাম: কেন বলুন দেখি আপনি দু'লাইনের বেশী গান করেন না? এই একটু আগে কেমন একটি সুন্দর গান ধরলেন, কি চমৎকার তার ভাব, কিন্তু ঐ দু'লাইন—তারপর চুপচাপ। কেন? সবটা গাইলে ক্ষতি কি?

তিনি একটু হাসিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন: আসল গান ত ঐ টুকুই। গানের আসল কথাটা ত ঐ দুটি পঙ্‌ক্তিতেই বলা হয়ে গেছে, তারপর যা, তা-ত কেবল কথার ঝুড়ি, কবির রচনা আর বুদ্ধির কারিগরী। কথার গাঁথুনী বা বাঁধুনী দিয়ে আসল ঐ দু'লাইনের ব্যাপারকেই ফলাও ব্যাখ্যা করা হয়েচে ভাবের সামঞ্জস্য বজায় রেখে—সেগুলো না থাকলেও হোতো—কোন ক্ষতি ছিল না। ভেবে দেখনা দাদা, ঠিক কিনা। কেবল,—

আমি বলিলাম: তা বোধ হয় অনেক সময়েই ঠিক বটে, তবে প্রথম দু'লাইনেই ত আসল ভাবের সব টুকুই প্রকাশ হয় না, কাজেই পরবর্ত্তী কথায় সেইটা—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: আরে দাদা ভাই—ওটা টেনে বাড়ানো হয় মাত্র,—আমার মনে হয় বাড়াতে গিয়ে ফল ভাল হয় না যদিও পোঁ ধরা হয় বটে। আত্মচৈতন্যের প্রেরণা যেটি তা প্রথমটুকুতেই থাকে, তারপর কবির যেমন শক্তি আছে আবার সেই শক্তির ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারও ত আছে। আত্মার মধ্যে থেকে একটি যে ভাবরসের প্রকাশ হয়, বিদ্যুতের চেয়েও সে ক্ষণস্থির

প্রকাশ, তাই হয় প্রেরণা বুদ্ধির ক্ষেত্রে পড়লে। প্রথমে যখন সেই প্রেরণা বুদ্ধির ক্ষেত্রে পড়েই একটি রূপ পায়, কবি তখন সেই অনুভূতি তাঁর সংস্কারগত বুদ্ধি দিয়েই ধরতে যান। সংস্কারের যে পুঁজি, তার অভিব্যক্তিই ভাষা, আর ভাষার উপর কবির আধিপত্যই সকলের চেয়ে বেশী। তখন কবি ভাষাকে ধরেই তাঁর প্রেরণাকে ব্যক্ত করতে যান। সত্যের পরশ টাট্কা টাট্কা ভাষার প্রথম উদ্যমকে ধরেই যেটুকু ব্যক্ত হোলো,—তার ভাবরস হয় গাঢ়, তারপর মূলে যে চৈতন্যের জ্যোতি তা ক্রমে ভাষার ছাঁচে যেমন ম্লান হয়ে আসে অমনি কবি তার সংস্কারগত বুদ্ধির তাপ দিয়ে তাকে অনেকটা সতেজ রাখবার চেষ্টা করেন, তাই সেগুলি পরবর্ত্তী লাইনের মধ্যে থেকে বিস্তৃত হয় বটে কিন্তু তাতে আর সে গভীর ভাব থাকে না। কারিগরী, ভাষার বাঁধুনী, নীতিকথা, তত্ত্বজ্ঞান এ সব পাওয়া যায় প্রচুর কিন্তু আসলটা ফুরিয়ে যায়, বড় জোর সুরকে ভাষার সঙ্গে জোড়া হয় বোলে কতকটা রেশ যেন থাকে মনে হয়। কিন্তু আমার পক্ষে দু'লাইনই যথেষ্ট,—ভাই, কেমন ? কথাগুলো মনোমত হোলো না বুঝি ?

আমি হাসিয়া বলিলাম : হবে না কেন, কথা হয়ত ঐ বটে, তবে গানকে এত বড় করা হোলো কেন ? তারও ত একটা উদ্দেশ্য আছে ? তিনি বলিলেন : হাঁ হাঁ, তা-ত আছেই। অনেকক্ষণ ধরে সুরের সঙ্গে বাক্য বা শব্দ-চাতুরী ভোগ করাও ত অনেকের উদ্দেশ্য থাকে কিনা ? আরে ভাই দেখতে পাও না, যারা যে জিনিষটা ভালবাসে, তার কথাও সে বেশী করে বোলতে চায়, কেউ শুনুক না শুনুক। একটু সত্যের স্পর্শ বা আভাষ যে পেয়েছে তাকে যথাশক্তি প্রকাশ করেই তার সুখ। ভাষা দিয়ে তাকে ফেনিয়ে-ফেনিয়ে যতটা বাড়াতে পারে সে চেষ্টার ক্রটী হয় না। দুনিয়ায় মানুষে বড় বেশী কথা কইতে ভালবাসে, নয় কি ? কোন একটি ভাবকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করতেই ত আমাদের জীবের মরণ ঘনিয়ে আসে ! সময় কাটে কিসে, কি নিয়ে থাকা যায়, বল ত ভাই, হাঃ হাঃ—

এ এক প্রকার অদ্ভুত পাগল দেখিতেছি—

আমাদের কথা বেশ চলিতেছিল—এমন সময় দেখি পথের দিকে এক অপরূপ ভৈরবী মূর্ত্তি ; প্রৌঢ়া, রক্তাম্বরধরা ধীরে ধীরে আসিতেছেন। বাউল আমার সম্মুখেই বসিয়াছিলেন ; তাঁহার পিছনেই পথ, তার পরেই অনেকটা উঁচু নীচু জমি, গাছপালায় পূর্ণ। তিনি দেখিতে পাইলেন না, যিনি আসিলেন তিনি একেবারেই বাউলের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তিটি—দেখিলে আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষত তাঁহার চক্ষু দুটি, এমন করুণা-মাখানো চক্ষু আমি দেখি নাই। পথশ্রমে রক্তাভ মুখমণ্ডল, তাহাতে যেন জ্যোতির্ম্ময়ী। সে মূর্ত্তি দেখিলে মহাপাপিষ্ঠের প্রাণেও শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। আমি তাঁহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া-ছিলাম, বাউল বাবাজী আমার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া পিছনে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিলেন।

আঃ—মহেশ্বরী মায়ী ! বলিয়া বাউল বিস্ময়-আবেগে চীৎকার করিয়া পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। আমারও প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধা হইয়াছিল, তারপর যেন ভক্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার

করিল, কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না। এখানে ঐ টুকুই আমার গলদ হইয়া গেল। ভিতরে প্রশ্ন উঠিতে বিলম্ব হইল না যে কেন, আমি প্রণাম করিতে পারিলাম না।

তাহার উত্তর এই যে ভৈরবী-সম্বন্ধে আমার যে ধারণা এতাবৎকাল পোষণ করিতেছিলাম তাহা মোটেই ভক্তির অনুকূল নয়। তান্ত্রিক সাধক এবং ভৈরবীদের উচ্চ স্তরের পবিত্র জীবন



বলিয়া ধারণা এখনও আমার হয় নাই। আরও একটি গুহ্য ধারণা মনের মধ্যে আমার বদ্ধমূল ছিল যে ভৈরবীরা এক শ্রেণীর ভ্রষ্টা নারী, সমাজে পতিতা, তান্ত্রিক সাধক ছাড়া আর কোনও সমাজে তাহাদের স্থানও নাই, প্রয়োজনও নাই। এ পর্য্যন্ত কোন ভৈরবীই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নাই। সেই কারণেই এই ভৈরবী আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও তাঁহাকে প্রণাম করিতে

পারিলাম না। তবে এই ভৈরবী হইতেই আমার পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হইয়াছিল,—সে কথা পরে বলিতেছি।

দীর্ঘ প্রণামান্তে বাউল বাবাজী যখন উঠিলেন তখন ভৈরবী তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার কথায় যেন পূর্ব্ববঙ্গের একটা টান ছিল, যাহাতে বুঝিলাম তিনি সম্ভবত ও দেশেরই মানুষ হইবেন। আমার দিকে লক্ষ্যও করিলেন না। তাঁহার গলার আওয়াজ কোমল বটে কিন্তু ক্ষীণ নারীসুলভ দুর্ব্বল কণ্ঠ নয়। প্রত্যেক শব্দগুলি দৃঢ় এবং স্পষ্ট এবং পরিমিত। আমার জীবনে যত নারী দেখিয়াছি, দেশে-বিদেশে কোথাও এরূপ মাধুর্য্য এবং তেজস্বিতার একত্র সমাবেশ দেখি নাই। বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ভৈরবী-সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করিতে ছিলাম, অন্তরের মধ্যে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি কথা কহিতে কহিতে বক্রেশ্বর মন্দিরের দিকে চলিতে লাগিলেন, আর বোধ করি বাউলকেও তাঁহার মনের অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইয়া চলিলেন। আমার মধ্যেও তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণের একটি আকর্ষণ অনুভব করিলাম, কিন্তু আপাতত সে ইচ্ছা দমন করিলাম। বাউল একবারও আমার অস্তিত্বের কথা বোধ হয় স্মরণে আনিতেও পারিলেন না। ক্ষণেক পূর্ব্বে কত মতে কত আনন্দের কথা আমার সঙ্গে তাঁহার হইতেছিল, আমার সঙ্গে যেন তাঁহার সম্বন্ধ অনেকটা ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল,—সে সম্বন্ধে আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। ত্যাগী মানুষ যাঁরা, তাঁদের ত এরকম সামাজিকতা বাহ্য সৌজন্যের বন্ধন নাই, যা না হইলে আমাদের সভ্য-সমাজে চলে না। আমি কি মনে করিয়া বা কোন্ অধিকারে তাঁহার নিকট এটা দাবী করিতেছি তাহা নিজেও বুঝিতে পারিলাম না। একটু অভিমানের ধোঁয়া উঠিয়া বেশ কতকটা আমাকে যেন পীড়িত করিল। বাঃ এ ত বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমার জড়তা ত কম নয়, উহা এতটাই আমায় পাইয়া বসিয়াছে যে প্রবাসে সাধুসঙ্গ করিতে আসিয়াও আমার তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই। মনের গোলমাল ক্রমে যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বাউল ও নবাগতা মহেশ্বরী ভৈরবী চোখের আড়াল হইবার পর আমিও উঠিব কি বসিব ভাবিতেছি,—এখন মন আমার অনেকটাই গ্লানিশূন্য বোধ হইতেছিল। পথের দিকে লক্ষ্য করিতে দেখি, আবার একজন আসিতেছেন। তিনি ভৈরব, লাল কাপড় তাঁরও, হাতে সরু ত্রিশূল আর একটি লাল কাপড়ের বুচকি। হন হন করিয়া সম্মুখেই আসিয়া পড়িলেন। আমি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতেই তাঁহার মুখের দিকে দেখিতেছিলাম,—তিনিও আমার মুখের দিকে চাহিয়া, তারপর একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন: মহেশ্বরী মা এদিকে গেছেন, আপনি দেখেছেন কি?

আমি: হাঁ,—মন্দিরের দিকেই গেছেন, এইমাত্র দেখেছি।—শুনিয়া তিনিও সেই দিকে চলিয়া গেলেন।

আমারও আর বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। অল্পক্ষণ থাকিয়া উঠিলাম। সেখান হইতে বক্রেশ্বর মন্দিরে আসিতে পথে বাঁকের মুখে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ নজরে পড়ে। দেখিলাম,

তাহার তলে ছায়ায় তিনটি মূর্ত্তি। বুঝিলাম—বাউল আছেন, মহেশ্বরী আছেন আর এই মাত্র যিনি আসিলেন তিনিও আছেন। আমি তাঁদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পাশ কাটাইয়া মন্দিরের রাস্তা ধরিলাম।



একেবারে আমি আমার আসনে আসিয়া পৌছিব এই ছিল অভিপ্রায়, কিন্তু যখন তাঁহাদের অতিক্রম করিতেছি প্রথমে মহেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তারপর তিনি বাউলের দিকে ফিরিয়া কি বলিলেন। তখন বাউল উঠিয়া আমার দিকে আসিতে আসিতে গলা উচ্চ করিয়া বলিলেন: এই যে, এদিকে আসতে হবে যে একবার,—ও ভাই! আমায় তখন ফিরিতেই হইল।

আমি গিয়া দাঁড়াইতেই মহেশ্বরী ভৈরবী বলিলেন: এইমাত্র বাউলের কাছে তোমার কথা শুনিলাম, যদি বিশেষ কিছু কাজ না থাকে ত আমাদের সঙ্গে একটু বসলে ক্ষতি কি? এখানে খণ্ড ভৈরব এসেছেন, এঁকে দেখলেও পুণ্য আছে। বলিয়া সে নবাগত ভৈরবের দিকে দেখাইয়া দিলেন। পরিহাসের ভাবে যে কথাগুলি বলিলেন তা নয়, গম্ভীর ভাবেই বলিলেন। কিন্তু খণ্ড ভৈরব তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথাটা এই বলিয়া শেষ করিলেন যে, যদি দর্শনেই পুণ্য সঞ্চয় করতে চান, তাহোলে এই মহেশ্বরী মাকে দেখলেই তা হবে, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।

আমি এতটা অপ্রস্তত ছিলাম যে এ ক্ষেত্রে কি বলিব আর কি করিব কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ভৈরবীর দিকে জোড় হাতে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া এক ধারে বসিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরে, ভৈরবী আমায় তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন: পূর্ব্বাশ্রমের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলে দোষ হবে কি?

আমি বলিলাম : আমার পূর্ব্বাপর একই আশ্রম, আমি গৃহত্যাগও করিনি, সন্ন্যাসও গ্রহণ করিনি। আপনি যা খুসী জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

শুনিয়া তিনি যেন আশ্চর্য্য হইলেন,—পরে বলিলেন : তবে ? এরকম করে তোমার ফকিরের মত থাকবার উদ্দেশ্য কি ? আমি বলিলাম : সাধুসঙ্গ লাভ আর কি ?

তিনি সহজে ছাড়িলেন না, বলিলেন : লছমনঝোলা, হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগ, নাসিক এসব বড় বড় সাধুসঙ্গের জায়গা ছেড়ে এখানে, এ রাজ্যে কেন ?

তখন আমি তন্ত্রমতের সাধুসঙ্গের কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,— তাতে লাভ ? আমি বলিলাম : লোকসানের কথা আগেই খতিয়ে দেখে কি কেউ কারবার করে ? লাভের কথাটা যে আগেই লোকে ধরে নেয়,—না ? তারপর যা হয় তা শেষে বোঝা যায়। অন্তত আমি ত এতে কিছু লোকসান হোতে পারে আগে থেকে হিসেব করিনি !

তিনি বলিলেন : সেইটিই ত কাঁচা কাজ হয়েছে। পাকা বুদ্ধি যাদের তারা গোড়াতেই লাভ লোকসানটা ভাল রকম করেই খতিয়ে দেখে তবে কাজে নাবে।

আমি : আমি ত বলেছি যে এ কাজে কোন প্রকার লোকসানের সম্ভাবনা থাকতে পারে সে ধারণা আমার এখনও হয়নি।

তিনি : ঐটে না হওয়াতেই ত আমার বেশী ভয় হচ্চে, হয়ত লোকসানটা গুরুতর হোতে পারে। অঘোরীর কাছে গিয়েছিলে ত শুনলুম,—না ? আমি স্বীকার করিয়া মাথা নাড়িলাম।

ভৈরবী বলিলেন : তিনি তোমায় এবিষয়ে কিছু বলেন নি ? তাঁর সাড়া পাওনি বুঝি ?

আমি : একটুখানি পেয়েছিলাম, তবে তাঁকে ত ইচ্ছামত পাওয়া যায় না, তাঁর নাগাল পাওয়া মুস্কিল।

ভৈরবী বলিলেন : তা হোলেই হবে, তাঁর কাছে যাওয়াটা রেখো তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। ভয় পেয়ে যেন ছেড়ে দিও না,—ছেলেমানুষ কিনা তাই সাবধান করে দিচ্ছি।

আমি : ভয় মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু তবুও আমি যাই, কিন্তু গেলেই তাঁর কাছে বেশীক্ষণ থাকতে দেন না। ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন। শুনিয়া ভৈরবী বলিলেন : তাঁর ধমক খাওয়া আমাদের অদৃষ্টেও খুবই ঘটে,—আমরা খুব ভালই জানি,—বলিয়া বাউল এবং খণ্ড ভৈরবের মুখের দিকে যেন চাহিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে একটু হাসিলেন, তাঁহারাও হাসিয়া সায় দিলেন। ভৈরবী তারপর বলিলেন : উনি ইচ্ছা না করলে কেউ ওঁর কাছে বসতে পারবে না। উনি ইচ্ছাময় মহাশক্তিমান মানুষ। তবে ওঁর তাড়ানোর মধ্যেও একটি উদ্দেশ্য থাকে। ওঁর তাড়া খেলেও লাভ আছে।

আমি বুঝিলাম,—আজই তাড়া খাইয়া আমার মহৎ লাভ হইয়াছে। যাহা হউক শেষে তিনি বলিলেন : এই দেখ ওঁর জন্যেই এত কষ্ট করে আমাদের আসা।

খণ্ড ভৈরব বলিলেন : ওঁর টান কারো সামলাবার সাধ্য নাই, এই দেখুন না ওঁর টানেই আমরা কোথায় ছিলাম, এসে পড়েছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনারা কোথা থেকে

আসছেন? খণ্ড ভৈরব বলিলেন: আমরা পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরেই ছিলাম, সেখানে মায়ের একটি আশ্রম আছে;—সেইখান থেকেই আপাতত আসা হচ্ছে।



তারপর খণ্ড ভৈরবের কথা,—এই লোকটির সংসর্গে আসিয়া আমার একটি মহৎ লাভ হইয়াছিল, সেই জন্য তাহার কথা আরও একটু বলিব। ঐখানে বসিয়াই তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন যে এখানে কতদিন থাকিব। আমি বলিলাম: তার ঠিক নাই, মন উঠিলেই চলিয়া যাইব। তাহাতে তিনি বলিলেন: আমরা এখানে চার দিন থাকিব। অঘোরীর সঙ্গে দেখা হইলে স্থির হইবে—আরও আগে যাইব কিনা। এখান হইতে আমরা কামরূপের কামাখ্যা-পীঠে যাইব,—সেখানে মহেশ্বরী মার কন্যার অভিষেক হইবে। আমায়

আরও বলিলেন : বক্রেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গণে আজ রাত্রে আমাদের চক্র বসিবে। আপনি ত মন্দিরেই থাকেন ? যদি আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তাহা হইলে সন্ধ্যার পর একবার অঘোরীর কাছে যাইবেন, অনেক কিছুই দেখিতে পাইবেন। আপনার এ বিষয়ে কৌতূহল আছে জানিয়াই বলিতেছি।

মহেশ্বরী মাতা বলিলেন : ওঁর কি সে সব ভাল লাগবে ? হয়ত বিপরীত ধর্ম্ম, অনাচার এ সব মনে হোতে পারে।

আমি বলিলাম : আমি ঐ সকল সাধনের উদ্দেশ্য জান্তে ও দেখতেই ত এসেছি—যদি তন্ত্রোক্ত সাধনের প্রক্রিয়া আচার অনুষ্ঠান না দেখতে পাই তা হোলে আমার এখানে আসা বৃথা হয়েছে বোলেই মনে করবো জানবেন।

হাসিয়া খণ্ড ভৈরব বলিলেন : সে সব আপনি সহজে দেখতে পাবেন না, তবে অঘোরীর কাছে যা দেখবেন তার কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁর কোন গুহ্য নাই, তিনি সিদ্ধযোগী।

২১

আশার চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সঙ্গে একটু ভয়ও ছিল, আমার মনের মধ্যে। সন্ধ্যার পর হইতেই কেবলি নিজ স্থান হইতে বাহির হইতেছি—ইচ্ছা, এখনই চলিয়া যাই কিন্তু এতটা আগে যাইয়া কিছুই লাভ নাই ভাবিয়া আবার ভিতরে যাইয়া বসিতেছি। আসনে কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। আকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন ; বাতাসও মাঝে মাঝে জোর চলিতেছে। যেন ঝড় বহিতেছে। এইরূপ জোর বাতাসের জন্যই বোধ হয় বৃষ্টি নামিতে পারিতেছে না ; না হইলে পৃথিবী ভাসাইত এমনই মেঘাড়ম্বর। মাঝে মাঝে বিজলী চমকাইতেছে। এসব দেখিয়া মনে আমার উদ্বেগের সীমা নাই। বুঝি আজ বাদল নামিয়া আমার উপর বাদ সাধে !

রাত্র প্রথম প্রহর কোন রকমে শেষ হইবার পরেই আসন ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আর থাকা যায় না। এই আসনের রহস্য এখানে একটু বলিয়া রাখি।

যে কোন ভাবের সাধন অবস্থায় আসনের তুল্য সহায় এবং মহাবন্ধু আর নাই। যে আসনে তোমার চিত্ত স্থির হইয়া, কোনও তত্ত্বে গভীর অভিনিবেশে সহায়তা করে, তত্ত্বদর্শন যে অবস্থায় সহজ হয় সেই আসনের গুরুত্ব কতটা তাহা কাহাকেও বুঝাইতে কষ্ট হয় না। আসন একটি জীবন্ত সহায়, তোমার প্রাণের স্পর্শেই উহা জীবন্ত, যেন পৃথক ভাবেই উহার শক্তি জাগ্রত হয়। যে আসনে বসিয়া তুমি দীর্ঘকাল কোনও ব্যাপারে সংযম অভ্যাস, ধ্যান এবং ধারণা করিয়া থাক,—তোমার চৈতন্যের সঙ্গে তাহার ওতপ্রোত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া যায়। তাহার সংসর্গে আসিলেই তোমার চিত্তক্ষেত্র সহজেই স্থির ও সমাহিত হইয়া, লক্ষ্যে একাগ্র হইয়া ধ্যানের পথে প্রসারিত হয়। এমনই যে আসনের গুণ তাহার গৌরব এবং পবিত্রতার কথা আর বেশী কি

বলিব, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আসনই সাধকের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বস্তু। এই আসন হইতেই তাহার সিদ্ধি, ঋদ্ধি, কেবল আনন্দ লাভের অবস্থা হয়। মোট কথা সাধকের যাহা কিছু উচ্চ অবস্থা সবই এই আসনের গুণে হয়। যদি কোন বিশেষ স্থল, বাহ্যভাবের তরঙ্গে অন্তর ক্ষেত্র চঞ্চল থাকে তবে আসনে বসিলে উহা স্থির হয়, শান্ত হয়, আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এই জাগ্রত আসনের আর একটি বিশেষত্ব আছে। সেইটি বলিবার জন্যই এতটা কথা প্রথমে বলা,—সেটি এই যে, যদি কোনও উৎকট আকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে থাকে, যাহা, কর্ম্ম ব্যতীত কখনই শান্ত হইবার নয়, তবে, সেই অবস্থায় তোমারই আসন কিছুতেই তোমায় তাহার উপর স্থির হইতে দিবে না, অর্থাৎ তোমার আত্ম-চৈতন্য সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য মনকে নিরন্তর স্থানান্তরে, কর্ম্মান্তরে যাইতে প্রবুদ্ধ করিবে। যতক্ষণ না তাহার শেষ হয় ততক্ষণ কিছুতেই তুমি আর আসনে বসিয়া শান্ত হইতে পারিবে না। ঠিক এই কারণেই আজ আমি আসনে স্থির হইতে পারিতেছিলাম না, কেবলই শ্মশানক্ষেত্রে ভৈরবীচক্র দেখিতে প্রাণ ছুটিতেছে। আসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। যতবার মনকে বাহ্য বিষয় হইতে কুড়াইয়া নিজ ভাবে আনিবার চেষ্টা করিতেছি ততবারই তাহা নিষ্ফল, কাজেই এখন প্রবৃত্তির গতি ধরিয়া চলিতেই হইল, নিরুপায় হইয়াই বাহির হইলাম।

আন্দাজ রাত্র প্রথম প্রহর এখন সবে উত্তীর্ণ হইয়াছে বা হয় নাই, ভাবিলাম এখন শ্মশানে ত যাইব না, কালীবাড়িতে পুণ্ডরীকের কাছে গিয়া কতক্ষণ কাটাইয়া দিব, পরে গুটি-গুটি শ্মশানের দিকে যাওয়া যাইবে।

শ্মশানের দিকে চাহিতে-চাহিতে কালীবাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছি, দেখিলাম সেথায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই, চারিদিকেই ঘোর অন্ধকার। দূরে অঘোরীর কুটীরও অন্ধকারে মিশিয়া রহিয়াছে, কোথাও আলোর ফোঁটাটি মাত্র নাই। দেখিতে দেখিতে কালীবাড়িতে ঢুকিয়া পড়িলাম। পুণ্ডরীক একটি হ্যারিকেনের সম্মুখে খাতা-পত্র লইয়া বসিয়া আছে, হাতে নস্যাধার একটি সামুক। আমাকে দেখিয়া নস্যদানীটি আগাইয়া দিয়া বলিল: আজ এত রাত্রে এখানে কি মনে করে,—হঠাৎ এমন ভাবে আবির্ভাবের কারণটা কি, জানতে পারি?

আমি বলিলাম: এত রাত্রি কোথায়? এখনও যে প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়নি,—আচ্ছা আজ তোমাদের শ্মশানে কোন সাড়া শব্দ নাই কেন বল দেখি?

পুণ্ডরীক আপন কাজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল: আজ যে সেখানে খুব ধুম লেগেছে, —খানিক আগে সিদ্ধ করালী তাঁর ভৈরবী নিয়ে গেলেন,—বিকালে মহেশ্বরী মা এসেছেন, খণ্ড ভৈরব এসেছেন, আরও কে কে এসেছেন—সকলকে ত জানি না। আজ যে অঘোরী বাবার দরবারে চক্র বসছে।—মহা উৎসবের ব্যাপার!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: উৎসবে এত অন্ধকার কেন?

পুণ্ডরীক: জানেন ত, তান্ত্রিকদের ইষ্টগোষ্ঠী অন্ধকারেই হয়ে থাকে। ওদের সবই ত গুহ্য ব্যাপার।

আমি আরও একটু জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা তুমি কি কখনও কোন চক্রে উপস্থিত ছিলে ?

পুণ্ডরীক: না, বাইরে থেকেই যা কিছু শুনেছি ; চক্রের মধ্যে কখনও ঢুকি নি। আমার ভালই লাগে না ওসব। ওদের ভণ্ডামো, যথেচ্ছাচার আমার ভাল লাগে না। ওরা আবার কি করে যে ওই সব কর্ম্মগুলোকে ধর্ম্ম বলে তা বুঝতে পারি না। ওদের সবই বজ্জাতি। মেয়েমানুষ নিয়ে আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাধনা। ছি—

আমি: আচ্ছা, অঘোরীকে কি মনে হয় তোমার ?

পুণ্ডরীক: ঐ লোকটার কথা আলাদা।

আমি: অঘোরীর আবার তন্ত্রের মধ্যে যাওয়া কেন বল দেখি ? আমি ত বুঝতে পারি না কেন তিনি তান্ত্রিকদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা রাখেন।

পুণ্ডরীক: আমি শুনেছি যে উনি তন্ত্রের সাধনেই সিদ্ধ হয়েছেন। এখন উনি কোন একটি বিশেষ ভাবের সাধনে বদ্ধ নন। ওঁর অবস্থা এখন খুবই উচ্চ একথা ত সকলেই বলে। আমি মোটে এই ত এখানে মাস দুয়েক এসেছি, এক ভাবেই ওঁকে দেখছি। কিন্তু কখনও ওঁর কাছে গিয়ে সাহস করে বসতে পারলুম না।

আমি: কেন বল দেখি ?

পুণ্ডরীক: কেমন একটা ভয় আসে। একবার প্রথম-প্রথম একটু ভরসা করে এগিয়ে গিয়েছিলাম। একখানা কাঠ নিয়ে এমন তাড়া করলেন,—দে ছুট্। আর সেই থেকে কাছে যাবার চেষ্টা করি নি, দূর থেকেই নমস্কার করি। তবে আমাদের বোদে পাগলা (বৈদ্যনাথ) ওঁর খুব ভক্ত। তার কাছ থেকেই ওঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাই।

এখানেও আর কতক্ষণ থাকা যায় ?—আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। সুতরাং পুণ্ডরীকাক্ষ যখন বলিল,—আপনি এখন এইখানেই থাকবেন কি ? তখন ঘুমে তাহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতেছে। তখন আমি সুযোগ বুঝিয়া সেখান হইতে উঠিলাম। তখন পুণ্ডরীকাক্ষ মশারী খাটাইল।

বাহিরে আসিয়া আমি শ্মশানের পথ ধরিলাম। গাঢ় অন্ধকার কোলের মানুষও বুঝি দেখা যায় না। মাঝে-মাঝে চিকুর হানিতেছে,—একে রাত্রি তাহাতে আকাশ কালো, একটিও তারা নাই। পাপহরা পার হইয়া শ্মশানে যখন পা দিলাম তখন গা-টা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। ভিতরে একটু ভয় যে হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। চলিতে লাগিলাম,—অঘোরীর ঘর পানেই যাইতেছি,—দূরে যেন মৃদু-মৃদু মানুষের গলার আওয়াজ পাইলাম। অঘোরীর ঘর অবধিও যাইতে হইল না, মধ্যপথে দেখিলাম,—কতকটা জমি জুড়িয়া সারি-সারি কয়েকটি মূর্ত্তি বসিয়া আছে। ছয় সাত জন হইবে। কাহাকেও ত চিনিবার জো নাই, তবে তাঁহারা যে চক্রাকারে বসিয়া আছেন তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিলাম। মানুষ দেখিয়া অন্তরের সঙ্কোচ বা ভয় আর কিছুমাত্র রহিল না। তাহার পরিবর্ত্তে সাহস এবং হৃদয়ে বল আসিয়া

আমাকে শক্তিমান করিয়া দিল। এখন, আমি কি ভাবে এখানে স্থান করিয়া লইব তাহাই হইল চিন্তার বিষয়। আমি যে সেখানে একজন বাহিরের লোক গোপনে আসিয়াছি,—তাহা ত ভুলিবার নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে যাঁহারা বসিয়াছিলেন, আমার উপস্থিতির ব্যাপারটি তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিলেন কিনা তাহা বুঝিতে পারিলাম না বা তাঁহারাও লক্ষণে কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখাইলেন না। আমি তাহাতে প্রথমে একটু বিমনা হইলেও শেষে সাহস পাইলাম। কিন্তু কোথায় যে আমার স্থান করিয়া লইব সেটা ভাবিতেও কতকটা সময় গেল। আমি বুঝিলাম এই নির্ব্বাক সাধকের দলে আমি কোন বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করি নাই। তাঁহাদের চক্র হইতে সাত আট হাত দূরে একটু উচ্চ স্থান দেখিয়া ছোট-ছোট কতকগুলি গাছের ধারে নিজ স্থান ঠিক করিয়া লইলাম এবং নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। যখন আমি বসিলাম—দেখিলাম, অঘোরীর ঘরের দিক হইতে একটি ভারি জিনিস দুই হাতে ধরিয়া এক ব্যক্তি সেথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখানে আসিয়া স্থির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকাইল, তাহাতে সে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া নিকটে এক স্থানে তাহার হস্তধৃত ভারি সামগ্রীটি নামাইয়া রাখিল। সেই ক্ষণপ্রভার আলোতে দেখিলাম চক্রের স্থানটি পরিষ্কৃত, যেন পূর্ব্বেই উহা সযত্নে মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। একটা ধুনুচিতে ধুনা পুড়িতেছে। ধূপ ও ধুনার গন্ধ বাহির হইতেছে। চক্রের মধ্যে আঘোরী বাবা নাই। যিনি অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সে ব্যক্তি অপর কেহ নয় আমাদের ভুলো ডোম, মদের কলস অর্থাৎ কারণপাত্র আনিয়াছে। সে এই বিদ্যুতের আলোকে একটি স্থান ঠিক করিয়া উহা নামাইয়া রাখিল এবং কিছু দূরে গিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া পড়িল।

এই বিদ্যুৎ-জ্যোতির সুযোগে আমি যেমন উপস্থিত এখানকার সকলকে অস্পষ্টভাবে দেখিলাম, তাঁরাও আমার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেন কিনা তাহা কিন্তু বুঝা গেল না। সব চুপচাপ্। মাঝে-মাঝে দমকা বাতাস চালাইতেছে, তাহার গোঁ গোঁ শব্দ এই শ্মশানক্ষেত্রের সঙ্গে খুব সুন্দর খাপ খাইয়া স্থান-মাহাত্ম্য বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।

যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা যে অলসভাবেই বসিয়া আছেন তাহা ঠিক নয়,—আমার বোধ হইল তাঁহারা স্থির আসনে কোনও কর্ম্মে রত আছেন। সে কর্ম্মটি জপ। অনুমান করিলাম যে, আসনে কর্ম্ম আরম্ভ এই মাত্র হইয়াছে। অঘোরী বাবারই অভাব, তিনি কোথায়? এখানে সকলেই কর্ম্মী, কেবলমাত্র আমিই দ্রষ্টা।

অন্ধকারে ক্রমশ একটু একটু নজর হইতে লাগিল, অবশ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার ছাড়া মোটামুটি এক রকম দেখা যাইতেছে। দেখিতেছি—আমার সম্মুখে অবশ্য প্রায় দশ বারো হাত দূরে খণ্ড ভৈরব, বামে মহেশ্বরী মাতা ভৈরবী, তাঁর পাশে সহজিয়া বাবাজী কতকটা তফাতে বসিয়াছেন। প্রায় দুই তিন হাত পরে সিদ্ধ করালীর আসন, বামে তাঁর নবীনা ভৈরবী, তাঁর পাশে অনেক কিছু উপকরণ সম্ভার, তাহার মধ্যে ভুলোর আনীত কারণ-কলসটিও রাখা আছে। তার পর কতকটা স্থান ফাঁকা, আসন পাতা আছে বটে কিন্তু শূন্য। তারপর একজন

অপরিচিত ভৈরব ও তাঁহার ভৈরবী,—তারপর একটু তফাতে ভুলো বসিয়াছে। উবু হইয়া হাত দুটি করা। এই ভাবের চক্র বসিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে এক একটি কপাল-পাত্র এবং এক একটি তাম্রকুণ্ড রাখা আছে বোধ হইল।

আমি আসিবার পর প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছে। এই সময়টুকুতে স্থান-মাহাত্ম্যের অনুভূতি বেশ স্পষ্টতর হইতেছে। বিশেষত যখন বাতাসের বেগ একটু কম হইতেছে অথবা একেবারেই বন্ধ হইতেছে। পালে-পালে মশা আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে আক্রমণ করিতেছে, তখনই এটি বিশেষভাবেই জানাইয়া দিতেছে। কি জানি কেমন করিয়া ইঁহারা স্থির আছেন। যাহা হউক ক্রমে দেখিলাম একদিক হইতে একটি বিরাট মূর্ত্তি আসিয়া তখন ভুলোর কাছে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভুলোও দাঁড়াইল। আসনস্থ ভৈরব ভৈরবীগণ নিজ নিজ স্থান হইতে মস্তক নত করিলেন। ভুলো দণ্ডবৎ হইল। আমার বুকটি ধুক্ ধুক্ করিয়া উঠিল। অঘোরী বাবা আসিলেন,—আমার উপস্থিতি তাঁহার নিকট কি ভাবে গৃহীত হইবে! আমায় রাখিবেন কিম্বা তাড়াইবেন, সেই ভয়ে ও উদ্বেগে মরিতে লাগিলাম। কেমন করিয়া এখানে শেষ অবধি স্থান পাইব, বা সব কিছু দেখিতে পাইব। ভয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম,—এমনই সময়ে আবার বিজলী হানিল। আমার সম্মুখে প্রায় বুক অবধি একটি ছোট ঝোপ, বুঝিতে পারিলাম না ঠিক আমায় তিনি দেখিলেন কিনা! কিন্তু আমি তাঁহার যে মূর্ত্তি দেখিলাম তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। শরীরটি তাঁর মুক্ত, উলঙ্গ সম্পূর্ণই দিগম্বর। মুখমণ্ডল শান্ত, অপলক নেত্র। একখানা গুলবাঘের ছাল সেই শূন্য আসনে পাতা ছিল, বাউল বাবাজী উঠিয়া তাঁহার হাতটি ধরিয়া সেই দিকে ধীরে ধীরে লইয়া গেলেন এবং আসনে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তখন আর একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। পূর্ব্বে বিশেষ লক্ষ্য করি নাই, এখন দেখিলাম, সকলের গায়েই একখানি রক্তাম্বর জড়ানো, বোধ হয় মশার জন্যই,—না হইলে সকলেই উলঙ্গ।

অঘোরী যখন আসনে দাঁড়াইলেন তখন মহেশ্বরী মাতা গায়ের বস্ত্রখানি ত্যাগ করিয়া হাতে উপকরণপূর্ণ একটি পাত্র লইয়া অঘোরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে পাত্রটি নীচে রাখিয়া প্রথমে প্রণাম এবং তারপর পাত্র হইতে কিছু উপকরণ তুলিয়া পাদপূজা করিলেন। অনুমানেই এ সব বুঝিলাম, উপকরণ প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। বরণের মতই একটি অনুষ্ঠান হইল এটুকু মাত্র বুঝা গেল। যাঁহাকে বরণ করা হইল তিনি অচলের মতই স্থির নির্ব্বিকার। চারিদিক নিস্তব্ধ, অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য সেথায় বিরাজিত। যাহা হউক বরণের কাজটি হইয়া গেলে তখন অস্ফুট স্বরে ভৈরবী কি একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহার মধ্যে পিতৃ-সম্বোধনটি মাত্র শুনিলাম। তাহাতে অঘোরী আসনেই বসিলেন। তারপর, এইবার ভৈরবী অঘোরীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, স্থির পুত্তলিকার মতই অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি এখন অনেকটাই নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয় আছে যদি হঠাৎ অন্য কারণ উপস্থিত হয় যাহাতে

আমাকে তাড়িত হইতে হয়। যেহেতু আমি তাঁহার ঠিক পশ্চাতেই রহিয়াছি—মধ্যে কতটা ব্যবধান।

যাহা হউক আমি দেখিতে লাগিলাম,—অঘোরী পাত্র মধ্য হইতে উপকরণ লইয়া প্রথমে ভৈরবীর চরণপূজা করিলেন, তারপর মধ্যদেশে, তারপর বক্ষে, পরে কণ্ঠে, ললাটে স্পর্শ করিয়া পূজা চলিতে লাগিল। ভৈরবী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, অঘোরী তাঁহাকে পূজা করিলেন। তারপর, (এমন সময় আর একবার বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল) দেখিলাম, তিনি পার্শ্বস্থ আধার হইতে, খুব সম্ভব চন্দন হইবে,—হস্তে লইলেন এবং প্রথমে চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যদেশে, পরে হৃদয়ে, শেষে ললাট পর্য্যন্ত অনুলেপন করিলেন। তার পর তিনি স্থির হইয়া নিজ আসনে কতক্ষণ ধ্যানস্থ রহিলেন।

যতক্ষণ তিনি স্থির রহিলেন ততক্ষণ আর কাহারও কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখা গেল না, সকলেই এই ভাবেই স্থির হইয়া রহিলেন—এই ভাবে অনেকক্ষণ গেল। আশ্চর্য্য এইটুকু দেখিলাম, গায়ে চাদর থাকা সত্ত্বেও মশক-দংশনে মধ্যে মধ্যে আমাকে নিতান্তই অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, অঘোরী বা মহেশ্বরী ইঁহারা ত সম্পূর্ণই উলঙ্গ ছিলেন। কিন্তু শ্মশানের এই ভয়ঙ্কর মশক-দংশনের জ্বালা যে তাঁহারা সহ্য করিতেছিলেন বলিয়া আমার মনে হইল না। আমার গায়ে মশা, যেটুকু ফাঁক পাইতেছে তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে জ্বালাইয়া মারিতেছে। কিন্তু আমার সম্মুখেই দুটি মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহাদের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। দুটি প্রস্তর মূর্ত্তির মতই ইঁহারা স্থির হইয়া আছেন। অল্পক্ষণ নয় অনেকক্ষণই নিজ ভাবে সমাহিত। ইহা কি বাস্তবিকই অদ্ভুত ব্যাপার নয়? ইহা সত্য যে মুক্ত স্থানে সাধনের এই মহা বিঘ্ন, এই মশকের দৌরাত্ম্যে আমার ওখানে বসাই অসম্ভব হইত যদি-না পবনদেব মধ্যে মধ্যে প্রবল ভাবে তাহাদের তাড়না না করিতেন। প্রথম শত্রু মশা, তারপর শেষের দিকে পিপীলিকার উৎপাতও কম হয় নাই। তাহারা বাহির হইতে কাপড়ের উপর, আবার কেহ কেহ ভিতরে প্রবেশ করিয়া কামড়ের উপর কামড়ে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। আমায় অম্লানবদনে এ সবকিছুই সহ্য করিতে হইল যতক্ষণ না আমি সহ্য করিবার শক্তি লাভ না করিতে পারিলাম। যাহা হউক অনেকক্ষণ পর কিন্তু আমি ক্রমশ শরীরের অনুভূতি হারাইতে লাগিলাম। যদিও আমার কোনও আসন ছিল না তথাপি আমি অল্প-পরিসর, তৃণ-আচ্ছাদিত সমতল স্থান পাইয়াছিলাম।

এইবার বুঝিতে পারিলাম কেমন করিয়া সাধকেরা এই সব মশা-মাকড়ের অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সফল করেন। তোমার চৈতন্য যতক্ষণ দেহগত ততক্ষণই দেহের দুঃখ ও সুখের বোধ স্পষ্ট, জীবন্ত থাকিবে, যদি ঐ চৈতন্যকে কোনও একটি অন্তরা দেহাতিরিক্ত বিষয়ে সমাহিত করিতে পার তাহা হইলেই দেহের সকল আপদই চুকিবে; দেহের কোন প্রকার অস্বস্তি অনুভব হইবেই না।

ঐখানকার ব্যাপারে অঘোরীর তন্ময়তার উপর আমার ঐকান্তিক লক্ষ্য থাকায়, তাঁর

অনুগ্রহেই খুব সম্ভব আমার দেহবোধ আর রহিল না, অনেক কিছুই হজম করিবার শক্তি লাভ করিলাম।

যাহা হউক আমি এখন নির্ব্বিঘ্নে দেখিতে লাগিলাম। অঘোরী অনেকক্ষণ পর দু'বাহু প্রসারিত করিলেন এবং ভৈরবীকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কোলে বসাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। দৃশ্যটি হইল ঠিক হরপার্ব্বতীর ছবির মত। অপূর্ব্ব এই অন্ধকারের মধ্যে পবিত্র এবং মধুর ভাব-রসের এ চিত্রটি সকলের প্রাণে একটি নিষ্কাম, শুদ্ধ এবং স্থির সাত্ত্বিক ভাবের প্রভাব বিস্তার করিল। তারপর অঘোরী এবং ভৈরবী ব্যতীত সকলেই সমস্বরে কয়ছত্র মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। তারপর খণ্ড ভৈরব যেখানে ভুলো বসিয়াছিল তাহার দিকে ফিরিয়া তাহাকে কিছু বলিলেন। সে ব্যক্তি উঠিয়া সেই কারণের কলসটি আনিয়া অঘোরীর সম্মুখে রক্ষা করিল। কিন্তু তাঁহার বাহ্য চৈতন্যের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, কোলে ভৈরবীকে লইয়া অবধি আমি একলক্ষ্যে তাঁহার দিকেই চাহিয়া ছিলাম কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখিতে পাইলাম না, ভৈরবীরও সেই অবস্থা।

কিন্তু আর ত কাহারও সে অবস্থা নয়। কাজেই তাঁহারা অনেকক্ষণই অপেক্ষা করিলেন, তারপর খণ্ড ভৈরব আর-আর সকলের অনুমতি লইয়া যন্ত্রের মধ্যেই কারণ শোধন করিয়া ভৈরবী ও অঘোরীর প্রতি উৎসর্গ করিলেন। আশ্চর্য্য, এই চক্রের অন্যান্য সাধকবৃন্দ তখন কপাল-পাত্রস্থ কারণ অঘোরীর মুখের কাছে ধরিলেন। অল্প কিছুক্ষণ ধরিয়াও তাঁহার বাহ্য জ্ঞানের কোন চিহ্ন না দেখিয়া মৃদুস্বরে কানের কাছে কিছু বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেন আমি ইহা দূষ্য মনে করিলাম। আমার ধারণা এইরূপ হইল যে তিনি যে-আনন্দ উপভোগ করিতেছেন অন্তরক্ষেত্রে এই কারণ তাহার কাছে কিছুই নয়, সুতরাং এরূপ আনন্দময় অবস্থায় তাঁহাকে উপাসনার মাত্র বাহ্য নিয়ম রক্ষার জন্য বিরক্ত করা কি ন্যায়ানুগ কর্ম্ম?—কিন্তু চক্রমধ্যে আর কাহারও ত সে অবস্থা হয় নাই, তাঁহাদের মধ্যে মদের নেশার আকর্ষণটি কিছু বেশী, এমন কি অধৈর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। বাউল বাবাজী কেবল ইঁহাদের মধ্যে অচঞ্চল আছেন।

যাহা হউক ক্রমে অঘোরীর বাহ্য চৈতন্যের লক্ষণ দেখা গেল। তিনি নিজ হস্তে পাত্র লইলেন, ভৈরবীর মুখের নিকট ধরিলেন, তারপর নিজে পান করিলেন। এটি হইল নিয়ম-রক্ষা।

এইবার সিদ্ধ করালী ভৈরবের পালা। তাঁহার ভৈরবীও গায়ের আচ্ছাদন ত্যাগ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রথমে করালী ভৈরব তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজা, গন্ধানুলেপন শেষ হইলে সেইমত ধ্যান চলিল প্রায় আধ ঘণ্টা। কেন বলিতে পারিনা সম্ভবত মশার তাড়নায় হইবে—ভৈরবী মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইতে লাগিলেন। তারপর ধ্যানশেষে ভৈরব ভৈরবীকে কোলে লইয়া বসিলেন। কপাল-পাত্র পূর্ণ করিয়া ভৈরবীকে কতকটা পান করাইয়া নিজে পান-অবশিষ্টাংশ পান করিলেন। আমার পরিচিতের মধ্যে বাউল বাবাজী দেখিলাম কারণ-পাত্র হইতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ললাটে ধারণ করিলেন। পান

করিলেন না বা তাঁহার পৃথক পাত্রও ছিল না। তার পর অপরিচিত ভৈরব ভৈরবীর সেইমত পূজা, ধ্যান, গন্ধানুলেপন শেষে কারণ পান চলিল। শেষে ভুলো হাত বাড়াইয়া কারণ-প্রসাদ গ্রহণ করিল তাহাও দেখিলাম। তিন তিনবার কারণ-পাত্র সেই চক্র প্রদক্ষিণ করিল। শেষে কল্সটি অঘোরীর সম্মুখে ধরা হইল। তখন তিনি উহার কানা এক হস্তে ধারণ করিয়া গলায় ঢালিতে সুরু করিলেন, এবং সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইলে তখন রাখিয়া দিলেন।

তারপর অন্য পাত্র আসিল। খুব সম্ভব মৎস্য মাংসাদি আহার চলিল। ভোজনের পদ্ধতি অপূর্ব্ব। প্রত্যেক ভৈরব ভৈরবীর মুখে প্রথমে আহার তুলিয়া দিলেন, তারপর ভৈরবী আবার ভৈরবের মুখে তুলিয়া দিলেন সেইক্ষেত্রে খাওয়ার ব্যাপার যে আনন্দে চলিতে লাগিল তাহা আর বলিবার নয়। আনন্দের স্রোত চলিতে লাগিল।

২২

একটা মত্ততা আসিয়া সকলকেই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে দেখিতেছি। এই মত্ত অবস্থাতেই মুদ্রার প্রক্রিয়া চলিতেছে। আমি কেবল নড়াচড়াটুকুই দেখিতে পাইতেছি, বিশেষ কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। কেবল বাউল বাবাজী, অঘোরী ও মহেশ্বরী ভৈরবীর স্বতন্ত্র অবস্থা। কারণ—পূজার পর হইতেই সেই যে ভৈরবী অঘোরীর কোলে বসিয়া আছেন,—তারপর মৎস্য মাংসাদি গ্রহণ, ভোজন পূর্ণমাত্রায় চক্রের মধ্যে চলিয়াছে, স্ফূর্ত্তির মধ্যে ক্রমে চাঞ্চল্য, একটি উন্মাদনার ভাব অন্যান্য সকলের মধ্যে দেখা যাইতেছে, কিন্তু এ সকলের মধ্যে তাঁহারা উভয়েই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তাঁরা সুসংযত, নির্ব্বিকার, স্থির এবং আত্মস্থ। যেন একটি প্রস্তরনির্ম্মিত হর-পার্ব্বতি,—এই বিগ্রহের সম্মুখে, আসবপানে উন্মত্ত মানুষ কয়েকজন ভোগের বিষয় লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। কাহারও সেই অপূর্ব্ব সমাহিত মূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য নাই, নিজ নিজ বিষয় লইয়াই সকলে উন্মত্ত। এমন সময় হঠাৎ একবার চিক্কুরের চিকিমিকির আবির্ভাব হইল। সেই ক্ষণেকের জ্যোতিই, একীভূত ঐ দেবমূর্ত্তি দুটিকে যেন বিশেষরূপেই প্রকট করিয়া দিল, সকলের দৃষ্টির সম্মুখে উহা জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাহার ফলও হইল অপ্রত্যাশিত রূপে চমৎকার। উলঙ্গ ভৈরব ভৈরবীগণের পান ভোজনের উল্লাস, কে জানে উহার গতি কোন দিকে ছিল,—ঐ পবিত্র যুক্ত মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্যমাত্রেই সঙ্গে সঙ্গে সকলের চাঞ্চল্য কোথায় মিলাইয়া গেল এবং সকলের দৃষ্টি ঐ কেন্দ্রে নিবদ্ধ হইয়াই রহিল। ফলে তাঁহাদের দেহও যেন স্পন্দন রহিত, এরূপ বোধ হইল। আসবের স্ফূর্তি, উত্তেজনা ত সকলের অন্তর হইতে নিভিয়া গেলই পরন্তু সকলেই যেন প্রস্তর মূর্ত্তির অবস্থা পাইলেন। স্থির, শান্ত এবং সমাহিত।

কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল এই অল্প সময় টুকুর মধ্যে। তবে উহা বহুক্ষণ রহিল না। ক্রমে দেখিলাম অঘোরীর বাহ্য হইল, তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্তটি ভৈরবীর দেহ হইতে সরাইয়া

প্রথমে মাটিতে, পরে আবার নিজ জানুতে রাখিলেন, মহেশ্বরী তখনও স্থির। তারপর তিনি আবার কিছুক্ষণের জন্য স্থির রহিলেন। এদিকে চক্রের অন্যান্য সকলে এতক্ষণ তাঁহাদের দিকে বোধ হয় স্থির অপলক দৃষ্টিতেই চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার এই হাতটি নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই যেন বাহ্য হইল। তাঁহাদের মধ্যে যেন নড়া দেখিলাম।

বাউল বাবাজির কথা একটু বলিব। তিনি ত মদ্য স্পর্শমাত্র করিলেন,—কিন্তু মাংস মৎস্যাদি যে কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে যখন সকলকে চঞ্চল, মদ্য পানের ফলে মত্ত ও বিহ্বল দেখিয়াছি তখন তিনি স্থির শান্তই ছিলেন। তিনি ভিন্ন মার্গের সাধক কেন যে এদলে যোগ দিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। পরে একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে কথা পরেই বলিব।

এখানে তিনি আর ভুলো এই দুজন মাত্র ভৈরবী-বিহীন,—আর ত সকলের পাশেই ভৈরবী দেখিতেছি। প্রসাদ, সকল রকমই ভুলো পাইল, সকলের সঙ্গে সমান ভাবেই নিজ অংশ গ্রহণ করিল, এ হিসাবে তান্ত্রিকদের কস্‌মোপলিট্ বলা যাইত পারে। উদার ভাবেই তাঁরা সকলের সঙ্গে ব্যবহার করেন। শিবের সংস্পর্শে যত কিছু কর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে সকল গুলিই উদার, সর্ব্বপ্রকার জাতি ও সমাজগত সঙ্কীর্ণতা-শূন্য। এ ব্যাপারটি বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভবিষ্যতে আমরা স্থানান্তরে উহার আলোচনা করিব।

এখন এই বাবাজির কথা যাহা বলিতেছিলাম,—এদিকে যখন সকলে কারণ-প্রভাবে সুখোল্লাসে উন্মত্ত, তখন আমি বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিতেছিলাম, বাউল বাবাজী নিজ আসনে স্থির হইয়াই বসিয়াছিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে বামে ও দক্ষিণে একটু হেলিতে লাগিলেন, তারপর রীতিমত বড় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুই পার্শ্বে দুলিতে লাগিলেন। আর কোনও ভাব নাই কেবল তাহাই চলিতে লাগিল যতক্ষণ না উপরি উক্ত ব্যাপারটি সম্পন্ন হইল। যখন অঘোরী মহেশ্বরীকে কোলে লইয়া স্থিরসুখাসনে আসীন, অন্যান্য ভৈরব ভৈরবী মৎস্য মাংসাদি ভোজনের পর মুদ্রা-প্রক্রিয়ায় মত্ত তখনও সারাক্ষণ বাউল বাবাজী সুখাসনে ঐরূপ দুলিতে ছিলেন, তারপর বিদ্যুৎ চমকের ফলে সকলের অঘোরীকে লক্ষ্য এবং স্থির হইয়া কতক্ষণের জন্য তন্ময় ভাবে স্থিতি, তারপর বিচ্যুতি পর্য্যন্ত বাউল বাবাজীর দোল খাওয়া চলিতেছিল, শেষে এখন তিনি একেবারে স্থির হইয়া গেলেন, আর নড়াচড়া নাই। যেন সমাধিস্থ যোগী,—কোনরূপ বাহ্যজ্ঞান নাই। মেরুদণ্ড একেবারেই সোজা, নিস্পন্দ শরীর, তিনি এইভাবে অনেকক্ষণ ছিলেন।

আমার মনের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি যে তান্ত্রিকদের সাধন দেখিতে আসিয়াছি তাহা আর আমার মনে নাই। আমি কি দেখিতেছি বোধ হয় আমার সে জ্ঞানও এক একবার লোপ পাইতে লাগিল। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনার ফলেই কেমন স্মৃতি লোপ হইতে লাগিল। মনে কর ঘোর অন্ধকার, মেঘাবৃত আকাশে একটিও তাহার বিন্দু দেখা যাইতেছে না, কোন প্রকার আলোকের সংশ্রব নাই, তথাপিও আমি মানুষগুলির নড়া-চড়া

দেখিতে পাইতেছি। দুটি চক্ষুর কতটা শক্তি অতিরিক্ত অপচয় হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে যদিও কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম তাহারও ফল এমন কিছু হয় নাই। দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ অন্ধকার করিয়া আরও খানিকক্ষণ অন্ধ হইয়া থাকিতে হয়। তারপর আবার সেই অন্ধকারের প্রভা চক্ষুতে অভ্যস্ত হইতে আরও কতক্ষণ চলিয়া যায়। যাহা হউক এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। প্রথম হইতে আমি এ চক্রের মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা অবধি দেখিলাম। মুদ্রার মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে তাহা সম্পূর্ণরূপ অনুধাবন করিতে পারি নাই। কিন্তু বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির প্রেরণা দেখিয়া আমার ধারণা হইল, মুদ্রা প্রকরণ মৈথুনের পূর্ব্বাবস্থা। নানা ভঙ্গীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা। তাহার মধ্যে প্রথমে শিবপূজায় ব্যবহৃত কতকগুলি পরিচিত মুদ্রাও আছে। আমার তখনকার মনের অবস্থায়, সেগুলির খুটিনাটির দিকে লক্ষ্য করিতেও পারি নাই বা বিশেষ আকর্ষণ অনুভবও করি নাই। সে বিষয়ে আমার মনোযোগী না হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে, চক্রমধ্যে যখন মুদ্রা-প্রকরণ অনুষ্ঠিত হইতেছিল আমার মন তখন অধিকাংশ কালই অঘোরীর প্রতি নিবিষ্ট ছিল। তবে তাহার মধ্যেও যে টুকু দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

সুস্থ শরীর, সুস্থ মন, যেমন পূর্ণ যৌবনের স্বাভাবিক পরিণতি, এই মুদ্রা-প্রকরণও সেইরূপ যৌন-ক্রিয়ার সহজাত পূর্ব্ব সংস্কার। মদ্য, মাংস, মৎস্য ইত্যাদি পঞ্চ-মকার সাধনের পূর্ণ পরিণত অবস্থাই মুদ্রা সাধনের অবস্থা। স্ত্রী পুরুষের সান্নিধ্য বশত উভয়েরই শরীর মন স্ফূর্ত্তিতে যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠে তখনই মুদ্রার অবস্থা। এই মুদ্রার মধ্যে অশেষ সংযমের মধ্য দিয়া মৈথুনের সঙ্কেত বর্ত্তমান। মদ্য মাংসাদির প্রভাবে শরীরের স্ফূর্ত্তি পূর্ণ অনুভূত হইলেই যে তখনই মৈথুনের ইচ্ছায় কর্ম্মে নিবিষ্ট হইতে হইবে তাহা নয়। ঐ মুদ্রাপথেই সংযমের দৃঢ় অনুষ্ঠানের সঙ্গে—শেষে মৈথুনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নির্দ্দেশ।

যাহা হউক আমার অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনার ফলেই বোধ হয় এক্ষেত্রে আমার সংজ্ঞা লোপ হইতে লাগিল। আলস্যের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই বা ইহা নিদ্রার পূর্ব্বাভাষও নয়, তন্দ্রাও নয়। তখনকার দিনে রাত্র জাগরণ আমার পক্ষে সহজ ছিল। কাজেই আমার পক্ষে এই যে, ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন অবস্থা তার অন্য কারণ থাকিতে পারে, অন্তত ইহাই আমার তখন মনে হইতেছিল। কিছুতেই আমার চৈতন্যকে জাগ্রত রাখিতে পারিতেছি না। এ কি হইল আমার! আমার স্থানে ঠিক আমি বসিয়াই আছি, শরীর স্থির অবিচলিত রহিয়াছে। এমনই সময়ে ঠিক মনে আছে একবার একটা বড় জোর বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলোর সঙ্গে-সঙ্গেই আমার স্মৃতি, সংজ্ঞা লোপ পাইল।

অবশ্য সেই আলোকে আমি একটা কিছু দেখিতে পাইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে পারিব না। তবে কতকটা এইরূপ, যেন জ্যোতির্ম্ময় একটি ক্ষেত্রে, উজ্জ্বল শরীর কতকগুলি উলঙ্গ নিঃসঙ্কোচ দেবদেবীর মূর্ত্তি লীলাবেশে চঞ্চল, তাঁহাদের মধ্যে একটি

অপূর্ব্ব বিরাট হরগৌরীর মূর্ত্তি, হিমালয়ের মতই স্থির, ধীর এবং গম্ভীর, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সুখাসনে আসীন রহিয়াছেন।

কতকক্ষণ আমি যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলাম তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না, তবে ভোরের ক্ষীণ আলোকে পূর্ব্বদিগ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে দেখিতে দেখিতে চক্ষুরুন্মিলন করিলাম। পূর্ব্বস্মৃতি চিত্তক্ষেত্রে চমকিত হইতে না হইতেই আমি চারিদিকে একবার দেখিয়া আবার কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু মুদিলাম। মাথাটি ভার হইয়াছে, শরীরে যেন জ্বর-ভাব অনুভব করিতে করিতে আবার যখন জাগিলাম তখন পূর্ব্বাকাশ আরও কতটা ফরসা হইয়াছে, কতকগুলি কাক, আমার সম্মুখে সশব্দে পরস্পর কাড়াকাড়ি করিতেছে, অপর কেহ সেখানে নাই। গত রাত্রির সকল কথা স্মৃতিতে উদয় মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া চারিপাশ দেখিতে লাগিলাম। ভুক্তাবশিষ্ট কিছু কিছু উচ্ছিষ্ট খাদ্যাংশ ইতস্তত পড়িয়া আছে মাত্র আর কোন চিহ্নই নাই।

শরীরটি এত ভার হইয়াছে, প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরও গুরুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আনন্দ মোটেই ছিল না, একটা দুর্ব্বলতা-জড়িত অবসাদে শরীর মন যেন অবসন্ন। তখনও উঠি নাই, বসিয়া বসিয়া গত রাত্রির সকল দৃশ্য যাহা আমার চক্ষুর সম্মুখে ঘটিয়াছে দেখিয়াছি তাহাই ভাবিতেছিলাম।

দেখি, সম্মুখে কতকটা দূরে ভুলো ডোম আসিতেছে, মাথায় গামছা-বাঁধা, খালি-গা, কৌপিন-পরা নিম্নাঙ্গ। ক্রমে নিকটে আমার দিকেই আসিতেছে এরূপ বোধ হইল। আরো নিকটে আসিলে দেখিলাম তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুদুটি জবা ফুলের মতই লাল, কাঁচাপাকা গোঁফ জোড়াটি বিশৃঙ্খল। হাতে তাহার বাঁশের লাঠিটি ঠিক আছে। আমার সম্মুখে আসিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে অশেষ ভক্তিপূর্ণ প্রাণে প্রণামের অভিনয় করিয়া জড়িতকণ্ঠে সে বলিল: ঠাকুদ্দা,—বাবা বোলছেন যে—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কি বোলছেন, বাবা?

সে বলিল: বাবার কথা কি আমরা বুঝতে পারি!

বেটা মাতাল হইয়াছে, কিছু জ্ঞানগম্য নাই, বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে,—আমি বলিলাম: তিনি এখন কোথায় আছেন। সে বলিল: হোই ঘরকে আছেন বটে—বোলছেন দেখ্যা আয়গা যা হোথাকে আপুনি আছেন বটে।

আমি উঠিয়া পড়িলাম,—বলিলাম: চল যাই তাঁর কাছে।

সে বলিল: না না তা হবেক নাই, তিনি বাবা তা ত বলেন নাই।

আমি বলিলাম: তবে তিনি কি বোললেন! সে বলিল: ওই ত বোললাম না?

বৃথা তার সঙ্গে কথা কওয়া, এ অবস্থায় তাহার কাছে কিছু পাওয়া যাইবে না। ভাবিয়া আমি অঘোরীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ভুলো আমায় যাইতে দিবে না, সে আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল: এখন সেথাকে যাওয়া হবেক না, ওখানে মা আছেন যে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: মা! কে মা? সে বলিল: মইসারী ভৈরবী মা। বুঝিলাম, মহেশ্বরী, তিনি এখনও সেখানেই আছেন। বলিলাম: তা থাকলেই-বা, আমি যাব।

সে বলিল:—তা হবেক না বাবা,—এক্ষণ তাঁরা নাংগা রইচেন যে, তুমি যাবেক কেনে সেথা, তাঁরা পূজা করছেন, আর করছেন।

তখন আমি নিরস্ত হইলাম। এখন যাওয়া সঙ্গত নয়।



ভাবিলাম, এখন আর ওখানে না গিয়া নিজস্থানে যাওয়াই ভাল; পরে সময়মত একবার বৈকালে অঘোরীর কাছে যাইব, গিয়া জানিয়া লইব ব্যাপার কি! এই মনে করিয়া ফিরিয়া নিজ স্থানে চলিলাম। তখন আবার ভুলো পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। বলিল: তা হবেক নাই ঠাকুর মশায়,—আপনার এখান হতে যাওয়া হবেক নাই।

আমার হাসি আসিল,—ভাল আপদ দেখিতেছি, এ আমায় লইয়া করিবে কি? বেটা মদের নেশায় একেবারেই বেহেড হইয়া গিয়াছে। আমায় যাইতে দিবে না।

কি করিব তাই ভাবিতেছি। এমন বিপদে বাউল বাবাজী আসিয়া আমার সহায় হইলেন। তিনি অঘোরীর ঘরের দিক হইতেই আসিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন: ব্যাপার কি? আমি সকল কথা বলিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন: অঘোরী বাবা ওকে বলেছিলেন দেখে আসতে শ্মশানে কোন শব দাহ করতে এসেছে কি না। আজ তাঁর একটি শবের প্রয়োজন আছে।

তখন আমি বুঝিলাম,—বলিলাম: ভাগ্যে আপনি এলেন, না হোলে মুস্কিল হোতো। বৈরাগী বাবাজী বলিলেন: তিনিই ত আমায় পাঠালেন,—কারণ ভুলো ত এখন প্রকৃতিস্থ নাই, কাল রাত্রে তার প্রসাদটা গুরুতর রকমই পাওয়া হয়েছে, কাজেই কোন কাজে ত এখন ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না, তাই তিনি আবার আমায় দেখতে বোললেন, তিনি এমনই একটা কিছু আশঙ্কাই করেছিলেন। যাই এখন ফিরে গিয়ে তাঁকে সব বলিগে। চল ভুলো,—কাজ আছে। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: আচ্ছা দাদা, এখন ওখানে কাজ আছে, আবার দেখা হবে। বলিয়া চলিলেন।

ভুলো বেচারা অপ্রতিভের একশেষ,—স্বড়-স্বড় করিয়া বাবাজীর পিছন পিছন চলিল। কতকটা দূরে গেলে ভুলো কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিল, তার হাব ভাব দেখিয়াই অনুমান করিলাম।

আমি আর সেখানে কি করিব, আপন স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। মনে মনে বুঝিলাম, আজও হয়ত কিছু একটি বিশেষ ব্যাপার আছে। শবের প্রয়োজন যখন, তারপর মহেশ্বরী এখনও ওখানে রহিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু আছে। কিন্তু আমার ত ইহাতে অধিকার নাই।

কাল রাত্রে চক্র-সন্নিধানে আমার উপস্থিতি এবং সমস্ত দৃশ্য যাহা আমার চৈতন্য-লোপের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা একে একে মনে উঠিতে লাগিল। সেইদিন প্রাতে আমার আর নিজ কর্ম্ম কিছু হইল না। কেমন একটা নেশার মত হইয়া আছে, তাহার উপর মাথা ভার, গরম নিশ্বাস—যেন অবসন্ন ভাব।

অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা ছিল, যদি একবার অঘোরী বাবাকে নিরিবিলি পাইতাম। জানিনা কবে, কখন সুযোগ হইবে। তবে নিজের মধ্যে তখন একটা মীমাংসার প্রবাহ স্বতই চলিতে লাগিল তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি।

প্রথম কথা এই যে,—তন্ত্রের মধ্যে এই যে পঞ্চ-মকারে সাধনা তাহা সেই সময়ের জন্য, যে সময়ে সাধারণের মধ্যে মদ্য, মাংস প্রভূত পরিমাণে চলিত ছিল। মদ্য, মাংস ব্যতীত তখনকার লোকের আনন্দে জীবন-যাপনের ধারণাই ছিল না। তখন জনসাধারণের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতির এবং সংযত বুদ্ধির অভাব ছিল। তখনকার সমাজে মদ্য, মাংস নিন্দনীয় ছিল না।

দ্বিতীয় কথা,—মদ্য, মাংসের সঙ্গে স্ত্রী-সম্ভোগ একান্ত সুখের বিষয় বলিয়াই সাধারণের ধারণা ছিল। উহা ব্যতীত স্ত্রী-সম্ভোগ সম্পূর্ণ নহে এ ধারণাও তখনকার দিনে বদ্ধমূল ছিল।

তৃতীয় কথা,—সাধারণের মধ্যে অধ্যাত্ম ধর্ম্মের অথবা ঈশ্বর উপাসনার অভাব বোধ করিয়া যিনি প্রথম তন্ত্রোক্ত উপাসনা সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন তিনি জনসাধারণকে ধর্ম্মে লওয়াইবার জন্যই অর্থাৎ ধর্ম্মপথে প্রলোভিত করিবার জন্যই ইহাতে পঞ্চ-মকার সাধন যোগ করিয়াছিলেন। তাহাতে এক মহৎ উপকার এই হইয়াছিল যে অধ্যাত্ম ধর্ম্ম এবং উপাসনা আমাদের দৈনন্দিন জীবন হইতে স্বতন্ত্র একটা কিছু নয়, পরন্ত আমাদের প্রতিদিনের সহজ জীবন-যাপনের মতই প্রয়োজনীয় এই বোধেই তখনকার সমাজ ইহাতে আকৃষ্ট এবং অনুরক্ত হইয়াছিল।

চতুর্থ,—স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইয়ের তুল্যাধিকার তন্ত্রমতের বৈশিষ্ট। নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ এই বুদ্ধির প্রতিবাদেই তন্ত্রধর্ম্মের যত কিছু কর্ম্মের নির্দ্দেশ। নর অথবা নারী একা-একা কাহারও মুক্তি সম্ভব নহে। সাধন হইতে সিদ্ধির অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ যুক্ত হইয়া প্রত্যেকটি কর্ম্ম করিবে,—ইহাই ঈশ্বরের নির্দ্দেশ এবং ইহাই ধর্ম্ম। ইহাতেই কল্যাণ, শুভ এবং সিদ্ধি,—অন্যথায় ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম।

পঞ্চম,—স্ত্রী এবং পুরুষ ব্যতীত মানুষের মধ্যে অপর কোন জাতির অস্তিত্ব তন্ত্রধর্ম্মে নাই। সেই হিসাবে ইহা বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিবাদ। কর্ম্ম-সংস্কার হিসাবে অর্থাৎ গুণ এবং কর্ম্ম-হিসাবে জাতির কথা, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট, উচ্চ ও নীচের কথা তন্ত্রোক্তধর্ম্মে পৃথকভাবে বা অর্থে গৃহীত। সাধন-জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষ হিসাবেই তন্ত্রশাস্ত্রের ছোট বড় ভাব। তন্ত্রে মনুষ্য সাধারণই পশু, ধর্ম্মজীবনে উৎকর্ষ হইলে, শক্তিমান হইয়া বীর আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তারপর দিব্যভাবের উৎকর্ষে দেব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সাধক-জীবনের চরমোৎকর্ষই দেবভাব। এই অবস্থার জীবই ব্রাহ্মণ নচেৎ ব্রাহ্মণের পুত্র যে ব্রাহ্মণ হইবে এ ভাবের বংশগত প্রাধান্যের কথা তন্ত্রের অনুমোদিত নয়।

২৩

মূল তন্ত্র-ধর্ম্মের মধ্যে সুধুই যে নর-নারীর সমান অধিকার তাহা নয়, ইহার মূলে নারীর কর্তৃত্ব দৈবানুকূল বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। নারীকে শক্তির প্রতীক বলিয়াই বলা হয়, যাহার অভাবে লোক এবং সমাজের প্রগতি অচল। তারপর তন্ত্রের সাধন, নারী ব্যতীত হইবার নয়। এই যে নারী, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধই মানুষের সাধন জীবনে অগ্রগতির প্রথম ধাপ। তন্ত্র-মতে উভয়ের ইচ্ছার অভাব ব্যতীত বিবাহের অপর কোনও বাধা নাই। জাতি-বিজাতি, গোত্র, গাঁই-মেল, কুলিন, বংশজ, দান, পণ, অলঙ্কার ইত্যাদির মনুষ্যকৃত কৃত্রিম বাধা বালাই নাই। যেহেতু আসল

তন্ত্রমতে সদাশিবই একমাত্র পুরুষ এবং আদ্যাশক্তি ভগবতী পার্ব্বতী বা কালীই তাঁহার একমাত্র শক্তি ও আধার। সৃষ্টির মূলে সমষ্টিরূপে পূর্ণ একাই এই দুই দেবতা, উপাস্য, গুরু যাহা কিছু সব। উপাসক জীব, শিব ও শক্তির ব্যষ্টিরূপ। প্রথম অবস্থায় জীব যখন বিষয়মুখী তখন পশু, সেই জন্য শিব পশুপতি। উপাসনার আসল কথা জীবের পাশ মুক্তির অবস্থায় আত্মার মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় শিবরূপ সত্ত্বার উপলব্ধি। কারণ, তাহাই জীবের স্বরূপ। শরীর মধ্যে সূক্ষ্মরূপে জগৎ-সৃষ্টি বর্ত্তমান, তাই জীব সৃষ্টিবৃদ্ধি এবং সৃষ্টি রক্ষার সহায়তা করিতে পারে।

অঘোরী বলেন যে, এই যে জীব-রূপী সামাজিক পুরুষ, তাহার সঙ্গে যে নারীর প্রণয় হইবে তিনি হইবেন তাঁহার স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, উত্তর সাধিকা, ভৈরবী, যাহা কিছু সব। পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া উভয়ে উভয়কে গ্রহণের তাৎপর্য্য হইল উভয়ের জীবনগতি এক হইয়া যাওয়া, পুরুষের শক্তিমান হওয়া, নারীর শক্তিস্বরূপ হওয়া। উভয় জীবনেই সম্পূর্ণতার গতি-প্রাপ্তি চরম গতি-মার্গের উপযুক্ত হওয়া এবং কর্ম্ম জগতে উন্নত অবস্থা প্রাপ্তি ইত্যাদি। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার যে উদ্দেশ্য আছে, যে মহান্ ইচ্ছার নির্দ্দেশ আছে, যুক্ত ভাবে স্ত্রী-পুরুষ উপাসনা দ্বারা সেই ইচ্ছার গতিতে মিলিত হওয়া এবং মনুষ্য জীবনটি সার্থক করা। সেই জন্য বিবাহের পর গার্হস্থ্য জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার রীতি এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। তন্ত্রমতের ধর্ম্ম জীবন, দৈনন্দিন জীবনের সবটা লইয়াই। ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম কর্ম্ম পৃথক ব্যবহারের ব্যাপার নয়। ধর্ম্ম জীবনময়, ইহাই তন্ত্রমতের প্রকৃষ্ট অন্তর্নিহিত সত্য।

কুমার-কুমারী অবস্থায় মানুষ অপূর্ণ; সমাজে তাহাদের পূর্ণ কর্ম্মাধিকার নাই, বিবাহিত হইলে তবে তাহাদের পূর্ণতা, কর্ম্ম, ধর্ম্মাদির সাধন গণনীয় হয়।

বৈদিক আর্য্য ব্রাহ্মণ-সমাজে, তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি গ্রহণ করিবার পর ইহার স্বাভাবিক উপযোগিতা বুঝিয়াই বিবাহিত বা যুক্ত জীবনেই তান্ত্রিক দীক্ষার ব্যবস্থা এবং অবিবাহিত কুমার জীবনে বৈদিক দীক্ষার নিয়ম করিয়াছিলেন। বৈদিক দীক্ষার গুরুত্ব এবং দায়িত্ব অধিক এই ধারণাই তাঁহাদের ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তনে উদ্বুদ্ধ করিয়া ছিল ইহা স্পষ্ট, তন্ত্রমতে, প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলই উপাসনা, সুতরাং একটি যুক্ত জীবনের প্রাথমিক সাধন হইতে আরম্ভ করিয়া (অর্থাৎ শুচি-অশুচি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ, ভয়াদি পাশ) মুক্তি পর্য্যন্ত আগাগোড়া সমস্তটুকুই একটি পূর্ণ জীবন বুঝিতে হইবে।

অন্যান্য বিধি-নিষেধ ছাড়িয়া যদি সুধু নরনারীর মিলন বা বিবাহ-বিধি টুকু মাত্র লইয়া বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ইহার তুল্য উদার, স্বাভাবিক (অর্থাৎ প্রকৃতির উদ্দেশ্য অনুকূল) সঙ্কীর্ণতা শূন্য বিবাহ-পদ্ধতি জগতে আর কোথাও বিধিবদ্ধ হয় নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্ম, যাহার ফলে সভ্য জগতে বিবাহ-ব্যাপার লইয়া এতটা ভয়ানক আন্দোলন, তাহা সম্প্রতিই হইয়াছে। কিন্তু নরনারীর স্বাভাবিক অধিকার এবং কল্যাণময় তন্ত্রমতের বিবাহ-বিধি আজ কত শত যুগ পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিদ্বান শিক্ষিত সমাজের মানুষ, আধুনিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান তন্ত্র-সম্বন্ধে কেহই করেন নাই। দুই চারি জন য়ুরোপীয় পণ্ডিত

যাহা করিয়াছেন তাহার মূল্য অন্যদিক দিয়াই নিরূপণ করিতে হয়, ভারতবাসী কেহ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তন্ত্র-সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত কোনও অনুসন্ধান করেন নাই বলিয়াই জানি। এখনও যাহা হয় নাই কখনও যে তাহা হইবে না তাহাও ত বলা যায় না। তবে আশায় থাকা ভাল।

যাহা হউক এখন এই যে তখনকার দিনের (যখন তন্ত্রের প্রভাব পূর্ণরূপেই এদেশে বর্ত্তমান ছিল) তন্ত্র-সমাজে প্রচলিত বিধি, মনোভঙ্গে বিবাহ বা সম্বন্ধ ভঙ্গ,—এখনকার এই দাসত্ব ধর্ম্ম জর্জ্জরিত ক্লিষ্ট হিন্দু সমাজের বিবাহ বিধির সঙ্গে তুলনা করিলে অনুমান করা শক্ত নয় যে তখনকার রাষ্ট্র বা সমাজ কতটা স্বাধীন এবং শক্তিশালী ছিল। পূর্ণ স্বাধীন এবং শক্তিমান সমাজ না হইলে তন্ত্রের মত ধর্ম্মের জন্মলাভ সম্ভব নয়।

এখন যাহা বলিতেছিলাম,—যখন উভয়েই দেখিবেন পরস্পরের মধ্যে প্রীতি এবং আকর্ষণের অভাব, কেহ কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করেন না, পরস্পর সংসর্গে বীতরাগ তখনই বুঝিতে হইবে উভয়ের ব্যবহারিক সম্বন্ধচ্ছেদ হইয়াছে। তখন উভয়েই পুনরায় মনোমত পাত্র বা পাত্রী সন্ধান করিয়া লইবেন। এক ভৈরব বা সাধক, সাধন-জীবনে একাধিক বহু শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজ সাধন পূর্ণ করিয়াছেন, এরূপ অনেক শুনা গিয়াছে। নারী পক্ষেও তাই, ইহাই তন্ত্রের সত্যবিধি।

তন্ত্রের এই উদার বিবাহ-পদ্ধতি আর্য্য ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করেন নাই, ওটি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

স্বধু বিবাহপদ্ধতি নয়, তন্ত্রের জাতিহীনতা, অতিরিক্ত বাহ্য শৌচাচারের নিষ্প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি ছাঁটিয়া, কেবল নিজেদের বৈদিক সংস্কারগুলির সঙ্গে যেগুলি খাপ খায়, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া সেইগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তন্ত্রের পূর্ণ প্রভাব বা পূর্ণ রূপটি বৌদ্ধযুগের পর আর দেখিতে পাই না। যেগুলি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সঙ্গে মিলে নাই সেগুলি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে অতি সুন্দররূপে মিলিয়াছিল। তাই বৌদ্ধধর্ম্ম যতটা তন্ত্রকে আত্মসাৎ করিয়াছে অতটা কোথাও হয় নাই। আর্য্য হিন্দুগণ প্রথম হইতেই তন্ত্রের আংশিক অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের নিজ ধর্ম্মের মধ্যেও জাতির একটা পূর্ণরূপ দিতে পারেন নাই। বৌদ্ধযুগের পর তাঁহারা তন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুর ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের গৃহীত তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। সেই কারণেই একটি সম্পূর্ণ ধর্ম্মপ্রাণ শক্তিসম্পন্ন জাতির পরিবর্ত্তে এক অভিশপ্ত সজ্যশক্তি হীন ভগ্ন রাষ্ট্র পরিচালনায় দুর্ব্বল জাতিই গড়িয়া গিয়াছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ জাতির চতুর্ব্বর্ণ এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব আচার অনুষ্ঠান এবং সংস্কারের গভীর প্রভাব মূলে থাকায়, তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণকালে তাঁহারা সবটুকুই লইতে পারেন নাই, পাছে তাঁহাদের সমাজ ইহার উদার প্রভাবে ব্যভিচারদুষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব হারাইয়া ফেলে বা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অধঃপতিত হয়। কিন্তু হায় দুর্দ্দৈব,—তাঁহাদের প্রকৃতিগত সঙ্কোচ এবং ক্ষুদ্রতাই তখনকার সমাজে প্রতিফলিত হইয়া এখনকার সমাজকে কতদিকে না

উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচারদুষ্ট, জগতের চক্ষে হীন করিয়া ফেলিয়াছে, এখন ইহা চক্ষে পড়িলে কষ্টের কারণ হয় না কি ?

অঘোরীর মুখে শুনিয়াছি ; প্রাচীন বা মূল তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে তখনকার সমাজে নর-নারীর উদার ব্যবহারের যে সকল স্বাভাবিক সুন্দর রীতি-নীতির কথা বর্ণিত আছে, ব্রাহ্মণেরা সে সকলের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ ধর্ম্মের, জাতীয় সংস্কার যথা—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি ঢুকাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা শিবের মুখ দিয়া বলাইয়া যাহাতে ব্রাহ্মণের প্রভাব তন্ত্রের মধ্যে বরাবর থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা কস্মিন্‌কালেও তন্ত্রের মধ্যে ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের জাতিগত সংস্কারকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই সেই কারণেই তন্ত্রোক্ত আসল ধর্ম্ম আর এই বঙ্গে তথা ভারতে স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে পারে নাই। ফলে দুইটি ধর্ম্মই নষ্ট হইয়াছে, তন্ত্রও গিয়াছে বৈদিক আর্য্য হিন্দুধর্ম্মও গিয়াছে। এখন যেটা আমাদের দেশে আছে তাহাকে তন্ত্রও বলা যায় না, বৈদিক ধর্ম্মও বলা যায় না। তাই আমাদের এ সমাজের শক্তিও নাই, দৃঢ় ভিত্তিও নাই, নিজেদেব কাছেও গ্রহণ করিবার মত কিছুই নাই, অপরের কাছে পরিচয় দিবার মতও কিছুই নাই।

অঘোরী বলেন, সে তন্ত্রের ভাব, ভাষা এবং উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে, পূর্ণ প্রাণে পক্ষপাতশূন্য অনুসন্ধিৎসা দরকার। যিনি প্রথম হইতেই মনের মধ্যে ঘৃণা, সঙ্কোচ, উপেক্ষা রাখিয়া অথবা বিদ্বেষদুষ্ট মনে উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা না করিতে পারিবেন এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে তাঁহার প্রবেশ অসম্ভব হইবে। অঘোরী দেখিয়াছি অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোকের উপর ততটা নয়, যতটা দেশের বিদ্বান পণ্ডিতের উপরে নারাজ, কখনও আগে পরিচয় পাইলে, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন না, কাছে বসিতে দিতেন না। বলিতেন, তাহারাই দেশে ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়াছে। একদিন এই বীরভূমেরই এক পণ্ডিতকে কাঠ লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন। কেন যে তাঁর এতটা ক্রোধ সাধারণে কেহ বুঝিতে পারে নাই, পরে বলিয়াছিলেন—পণ্ডিত পরিচয় দিয়া তিনি আসিয়াছিলেন তন্ত্র-সম্বন্ধে তর্ক করিতে। যাহা হউক, অঘোরীর কথাগুলি একটু কিছু বাদ না দিয়া, তিলমাত্র বিকৃত না করিয়া বিশেষ সাবধানেই আমি যথাসাধ্য সাধারণের কাছে ধরিতেছি ইহা হইতে আসল তন্ত্রশাস্ত্রের কথা ধরিতে, বুঝিতে পারিবেন। যাহার সঙ্গে এখনকার প্রচলিত পুঁথি পুস্তকের বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। তিনি বলেন, তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে ছাপানো পুঁথি পুস্তকের মধ্যে মোটে আসল ব্যাপার স্থান পায় নাই, কাজেই তাহার ভিতর হইতে সাধারণের সত্য উদ্ধার করিবার সাধ্য নাই। মানুষের সহজ প্রবৃত্তি হইতে যে সকল কর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে সেই সকল কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই তন্ত্রের সাধন সুরু হইয়াছে, পরে প্রকৃতির নিয়মেই তাহা হইতে নিবৃত্তিমূলক সাধন, শেষে সিদ্ধি ; তাহাও সহজ নিয়মের মধ্য দিয়া। সংস্কারান্ধ মানুষের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে না, ভোঁতা বুদ্ধি থাকার জন্যই, তন্ত্রের প্রত্যেক ক্রিয়াটি যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বুঝিতে তাঁহাদের মাথা খারাপ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া তন্ত্রের সকল ব্যাপার গুহ্য বলিয়াই কোনও ছাপানো বইয়ে আসল কথা খুলিয়া লেখা হয়

নাই, সঙ্কেতও বিশেষ কিছু নাই ; হাজার পণ্ডিত বিদ্বান হোক বুঝিবে কি প্রকারে ? গুরু বা আচার্য্য কৌল না হইলে, আর অনুগত শিষ্য না হইলে, দীক্ষা না হইলে কিছুই পাইবার যো নাই। এ পর্য্যন্ত তান্ত্রিক বলিয়া কারণের যন্ত্র বা মদের বোতল হাতে যাহাদের দেখা যায় তাহারা মদের জন্যই তান্ত্রিক,—সাধক নয়, যথাশাস্ত্র তান্ত্রিক সাধন এক রকম লোপ পাইতে বসিয়াছে।

অঘোরী বলেন, তন্ত্রের জগতে বা অধিকারের মধ্যে ঘৃণার বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, মানুষের মধ্যেও কেহ অস্পৃশ্য নাই,—জাতির বেলা পুরুষ ও নারী এই দুই জাতি ছাড়া মানব-সমাজের মধ্যে আর কোন জাতি নাই। একথা এখনকার ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিকেরাও বুঝে কি না সন্দেহ। তারপর শবসাধন। পঞ্চমুণ্ডি আসন, মদ্য মৎস্য মাংসের ব্যবহার এ সব ত আর্য্য ব্রাহ্মণদের ধারণায় ভ্রষ্টাচার। বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে শুদ্ধাচারের বড়াই দেখিয়াও কি সহজে বোধ হয় না যে এ সকল পৃথক একটি ধর্ম্মের সাধন বা অনুষ্ঠান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। শুদ্ধাচারী আর্য্যেরা যতদিন বাঙ্গলায় আসেন নি, ততদিন তাঁদের, এ ভাবের যে একটি ধর্ম্ম-সাধন আছে, আর সেই ধর্ম্মের সাধন-প্রকরণ তাঁদেরই একদল গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আর একটি ধর্ম্ম গড়ে তুলবেন একথা কল্পনায়ও আনতে পারেন নি। বাঙ্গলাদেশ ত চিরকালই পশ্চিম দেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদের কাছে হেয়, ঘৃণ্য হয়ে ছিল, এখনও তার জের আছে। তারপর বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণেরা এসে বসবাস করে যখন স্থায়ী অধিবাসী হয়ে পড়লেন তখন থেকে ত তাঁরা পশ্চিমি জ্ঞাতি-ভাইদের কাছে একঘরে হয়েই ছিলেন। তারপর তন্ত্রের ধর্ম্ম গ্রহণ করে ক্রমে ক্রমে ত তাঁরা অনার্য্যই হয়ে পড়লেন,—তাঁদের বৈদিক ধর্ম্মের গুমোর আর কি রইলো। তাঁদের বাইরের সকল কর্ম্ম, দশবিধ সংস্কারগুলিতে বজায় রইলো বৈদিক ব্রাহ্মণত্ব, আর বিবাহের পর তান্ত্রিক কুলগুরুর কান-ফুঁকের মধ্যে রইলো তান্ত্রিকত্ব। এইত বাঙ্গলার বৈদিক ব্রাহ্মণদের বংশের তান্ত্রিক ধর্ম্ম, তার মধ্যে কেউ কেউ বংশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে তান্ত্রিক কৌল গুরুর শিষ্য হয়ে ভৈরবী নিয়ে সাধন-জীবন আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এখন আর সে সব বড় একটা ঘটে না, বৈদান্তিক ধর্ম্ম মাথা তুলেছে যে !

তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রবাদ এরূপ যে বেদের প্রাচীনতা তন্ত্রের হিসাবে অনেক কম। এঁরা বলেন—বেদের উৎপত্তির বহু সহস্রাব্দী পূর্ব্বে তন্ত্রের উৎপত্তি। আমরা যে দরের মানুষ তাহাতে এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার কল্পনাও বড় অখ্যাতির কথা, যদিও মনের মধ্যে একটা ছট্‌ফটানী থাকে ইহার সুমীমাংসার জন্য। অঘোরী বলেন, বেদ পুরানো কি তন্ত্র পুরানো একথায় সাধকের ত কোনই দরকার নাই। কিন্তু আমি তবুও এসম্বন্ধে তাঁহার কিছু নিজমত আছে কি না, বড়ই আগ্রহ দেখাইয়া শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, যে বেদ আগে কি তন্ত্র আগে তা আমি জানতে কখনও চাই নি—আমার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কও নাই তবে এটি ঠিক জানি যে বেদাচারী ব্রাহ্মণেরাই এদেশে এলে পর ক্রমে ক্রমে পরিচয় পেয়ে তন্ত্রধর্ম্ম গ্রহণ করে, তন্ত্রের বিস্তর ব্যভিচার করে আসল তন্ত্রের মাথা খেয়ে কেবল ছোবড়াটা ফেলে রেখেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : কি ভাবে ?

তিনি : এই ভাবে যে, যেটুকু তাঁরা হজম করতে পারেন মাত্র সেইটুকু নিয়ে তার উপর নিজেদের বৈদিক আচার, সংস্কার চাপিয়ে, কতক এভাবে কতক ওভাবে করে জগা-খিচুড়ি পাকিয়েছেন। এ ত আগেই বোলেছি।

আমি : আপনার মত কি বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর তবে ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

তিনি : তাইতো বলি, বলি কেন তাই যে ঘটেছিল তার অনেক প্রমাণই আধুনিক অনেক তন্ত্রের বইয়ের মধ্যেই আছে। প্রথমেই দেখ না, তন্ত্রশাস্ত্রে জাতি বলতে নরনারী, পশু, পক্ষী, জলচর, ভূচর, খেচর এই সব, গোঁড়া ভণ্ড জাতির গুমুরে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা ওর মধ্যে ঐ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাত ঢুকিয়ে নিজেদের বৈদিক ছাঁচে তন্ত্রকে গড়ে নিয়ে আসল বা মূল তন্ত্র-ধর্ম্মের উচ্ছেদ করে বসেছেন। এখন তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজতে গেলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুঁথি খুঁজতে হবে,—সংস্কৃত ভাষায় আগম, নিগম, তন্ত্রসার তারপর তিনশো পঁয়ষট্টিটা তন্ত্রের যে বই, সে সব ঐ বেদাচারের ছাঁচে গড়া ব্যভিচারী ব্রাহ্মণদের সুবিধামত শিষ্য যজাবার জন্যে তৈরী। ভাষা দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে কত হাল্কা বাংলার ছাঁচে, আসলে সাংখ্য, পাতঞ্জল, উপনিষদ, বেদান্তের ভাব সব হুবহু নকল ছাড়া আর কিছু নাই। শিব আর পার্ব্বতী বা ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বক্তা বা শ্রোতা, ঠিক যেন মহাভারত লেখার ছাঁচ নয় কি ? মহাভারতের পর আর বৈদিক ব্রাহ্মণদের গুমোর করবার মত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত একখানিও বই রচিত হয়েছে কি ? যা কিছু হয়েছে সব ঐ ছাঁচ বা নকল মাত্র।

ইনি বলেন যা, তা বড়ই অদ্ভুত লাগে, এখনকার তন্ত্রের সকল গ্রন্থই আসল তন্ত্রধর্ম্মের পরিপন্থী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রধর্ম্ম গ্রহণ করবার পূর্ব্বে তন্ত্রের ভাষা কিরূপ ছিল। কি ভাষায় তার প্রচার হোতো, আপনার কি ধারণা ?

তিনি : অনার্য্য বোলে আর্য্যেরা যাঁদের ঘৃণা করতেন, তাদের ভাষা দ্রবিড়, সেই ভাষায় তন্ত্রের যা কিছু ব্যবহার ছিল। পুঁথি পুস্তক ত ছিল না, বেদের মতই লোক পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচার ছিল। সাধকদের স্মৃতির ভিতরেই বদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির নাম গন্ধও ছিল না, কারণ তন্ত্রের কারবার যে সব মানুষকে নিয়ে তার মধ্যে জাত কোথায় ? সাধারণ মানুষের ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই ত তন্ত্রের সাধন।

তখন আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : মন্ত্র ছিল ত ? সে মন্ত্রের ভাষা কি ছিল ?

অঘোরী বলিলেন : কিছু মন্ত্র ছিল বোধ হয়, সে হয়ত তাদের চলিত ভাষাতেই ছিল। তারপর বৌদ্ধেরা সে সব মন্ত্রের অর্থ, শব্দ পালিতে করলেন, ব্রাহ্মণেরা আবার তাই থেকে কতক সংস্কৃত ভাষায় করে নিলেন।

আমি : আচ্ছা, তন্ত্র নামটাই সংস্কৃত নয় কি ?

তিনি : কত কত ভিন্ন ভাষার শব্দ সংস্কৃতের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা ঢুকিয়েছে তার ঠিক আছে কি ? ঐ রকমই একটি ব্যাপার এই নামের মধ্যেও ঘটে থাকবে।

আমি : মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ, এ সকলই ত সংস্কৃত শব্দ।

তিনি : হাঁ হাঁ, আসল শব্দগুলির সংস্কৃত ভাবানুবাদ।

আমি শেষে বলিলাম : যদি তন্ত্রের মধ্যে যত মন্ত্র আছে সব মূলত সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃত শব্দেরই হয় তা হোলে স্পষ্ট এটি বুঝা যাবে যে তন্ত্রধর্ম্ম ব্রাহ্মণদেরই সৃষ্টি ?

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন : আসলে তন্ত্র ত মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক। কাজেই নাম থেকেই বুঝা যাবে যে তন্ত্র যেটি সেটি মন্ত্র নয়, তাকে মন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করা হয়েছে অনেক পরে। আর্য্য ব্রাহ্মণদের খপ্পরে আসবার পরেই না তার মধ্যে চতুর্ব্বর্ণ আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইত্যাদির কথা ঢোকানো হয়েচে বলেছি। নানা প্রকার অধিকারী, শ্রেষ্ঠ, মধ্যম, নিকৃষ্ট প্রভৃতি অধিকারীর কথাও তার মধ্যে চালানো হয়েছে, আসলে ও ধর্ম্মের অধিকারী ভেদ নেই, ধর্ম্ম সকলকার জন্যেই।

আমি : এ বড় অদ্ভুত কথা আপনি বোলছেন, এ সব কথা পণ্ডিতেরা, বিশেষত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের শিষ্য যাঁরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, প্রমাণের মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষকেই মূল করে যাঁরা সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁরা আপনার এসব মতামত হেয় বা উপেক্ষণীয় মনে করবেন।

তিনি : তা আমি কি করবো—এ কতকালের কথা, এখন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায় পাবো,—আমরা গুরু-পরম্পরায় যা শুনে আসছি আর আমরা আলোচনা করে যা সত্য বলে ধরতে পেরেছি তাই ত বলেছি। ব্রাহ্মণেরা কত কত বাইরের জিনিস আত্মসাৎ করে নিজেদের সমাজে, আর ভাষার মধ্যে পুরে নিয়ে বড় হয়েছেন তার খবর কে রাখতে যাচ্চে। তন্ত্র, ভারতের ধর্ম্ম বটে কিন্তু ব্রাহ্মণদের নয়, এটা যেন মনে থাকে।

আমি আরও একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন : যাই-ই বলিস্ না কেন তোর তন্ত্রের কাল আর নেই। যদি কখনও আসল তন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তার যেটুকু ব্রাহ্মণেরা নিয়ে তন্ত্র বোলে চালাচ্চেন সেটুকু বাদে যে অংশটি ব্রাহ্মণেরা নেন নি,—তিব্বতে, চীনে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে মিশে আছে যদি উদ্ধার করা যায়, একটি দুটি জীবের জীবনব্যাপী সাধনা দরকার, তাহোলে জগতের লোকে এককালে বুঝতে পারবে তন্ত্রধর্ম্ম কি বিরাট ধর্ম্ম। শিব কি উদার, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ এক ধর্ম্ম থেকেই জগতের সকল জীবেরই যোগ, ভোগ শেষ করে মহা শক্তিশালী হয়ে আনন্দময় শিবই হয়ে যেতো।

আমি বলিলাম :—আচ্ছা, একই সময়ে সকল ব্রাহ্মণেই ত আর তন্ত্রধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, বাকি—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন : বাকী-টাকী নেই, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-সমাজ এক সময় কৌলদের

মুঠার মধ্যেই ছিল। যাঁরা বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বংশের মধ্যে বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁরাও তন্ত্রকে হাল্কা ডোজে নিজেদের মধ্যে মানিয়ে নিয়েছেন। সেটি হোলো নিরিমিষ্যি তন্ত্র। গোপনীয় ব্যাপার বোলতে নেই, আয় তোর কানে কানে বলি,—বড় গোঁসাইরাও তন্ত্রমতে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। অন্তঃশাক্তং বহিঃ শৈবং সভায়াং বৈষ্ণবং মতং—এই হোলো বাংলার ভণ্ড সমাজের ধর্ম্ম। এই থেকেই বুঝে দেখ্না কেন সংঘশক্তি এদের কোথা থেকে আসবে, দাসত্বই বা ঘুচে যাবে কি করে। যাঁরা পরের কাছে দাসত্ব করে তাঁদের মুক্তি কোনোকালে বা হবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু যারা নিজের মধ্যে ভণ্ডামীর দাস তাদের মুক্তি কোনোকালে হবার যো কোথায় ?

তন্ত্র বলিতেই শিবতন্ত্র বুঝিতে হইবে অর্থাৎ শিব যে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম সঙ্ঘের প্রবর্ত্তক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : এ শিব কে ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই মহেশ্বরই ত শিব ?

তিনি : শিবকে ত প্রথমে বৈদিক আর্য্য ব্রাহ্মণেরা পায়নি, স্বীকারই করেনি ভগবান বোলে, ইনি অনার্য্যদের নায়ক, দেবতা ছিলেন, আর্য্যদের হিসাবে শিবের দল ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত। বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গে তুলনায় শিব আচার-ভ্রষ্ট, অনার্য্য—যেখানে সেখানে থাকেন, যা-তা খান, কোনও নিয়ম নাই, শ্মশান তাঁর বড়ই প্রিয় স্থান, বস্ত্র পরেন না, একটা বাঘের ছাল জড়িয়ে আসেন যখন লোকালয়ে যান, তা নয়ত উলঙ্গ। এমনই উদার স্বভাব, যার-তার ঘরে বিনা আহ্বানেই উপস্থিত হয়ে দুঃস্থ বা পীড়িত যারা তাদের সেবা করা, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, নিজের ব্যক্তিগত যত্নে তাকে আরোগ্য দিয়ে তবে স্থান ত্যাগ করিতেন। তাঁর অদ্ভুত যোগসিদ্ধির কথা যখন আর্য্যেরা শুনলেন, কি শীত কি গ্রীষ্ম কোনও বস্ত্র বা আচ্ছাদন অঙ্গে ধারণ করেন না, যথা ইচ্ছা তথা যান, দুমাসের পথ অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করেন। মাদক সেবন করেন, নেশায় সব সময়েই চুরচুরে,—অনার্য্যেরা তাঁকে বলে ভগবান। সম্বৎসরের অর্দ্ধেক, যখন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ঋতু তিনি থাকতেন কৈলাসে, ও-দেশের লোকেরা তাঁকে ঐ সময়েই কাছে পেতো, হিমালয়ে তিনি থাকতেন না, কারণ হিমালয় ছিল আর্য্যদের স্বর্গ, তাদেরই অধিকার। তবে এই হিমালয়ের এক মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন, আর্য্যদলের এক প্রজাপতির মেয়ে, তাঁর গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁর গলায় মালা দেবার জন্য অনেক তপস্যা করেছিলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে যখন তিনি কৈলাসে থাকতেন তখনও উত্তর পশ্চিম ভারতের আবার পূর্ব্ব অর্থাৎ বাঙ্গলা বিহারেরও বহুতর ভক্ত হিমালয় পেরিয়ে তাঁর কাছে আসবার জন্যে তীর্থযাত্রা করে বেরুত। আর্য্যেরা এমন অদ্ভুত মানুষ পূর্ব্বে দেখেন নি। তাঁদের নিজেদের দলের দেবতা আর নিজেদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের গুমরেই মরেন,—এ একটা অনার্য্য মুখ্যু, অশিক্ষিত মানুষ আচার মানে না, বেদ মানে না, পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ তাঁর কোন অনুষ্ঠানই নেই এমন একটা লোককে আর্য্যদের মত চোসন্ পিপল্ অফ্ গড্—অর্থাৎ ঈশ্বর-নির্ব্বাচিত মনুষ্য, কি করে মানতে বা শ্রেষ্ঠ বোলে স্বীকার করতে পারেন ? তারপর উমার যখন বিবাহ হোলো শিবের সঙ্গে, আর্য্যদেবতারা ত চটে খুন।—কি ? এতবড় স্পর্দ্ধা শিবের, আর্য্য প্রজাপতির মেয়েকে বিবাহ করে। সমুচিত দণ্ড দেবার বা শক্তি পরীক্ষার এই ত সুযোগ !

তাতেই দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার ঘটলো, শিবের ঐশ্বরিক মহাশক্তির পরিচয় আর্য্যেরা যখন পেলেন তখন গরব আর রইলো না, শিবের কাছে মাথা হেঁট করতে হোলো, শিব তখন মহেশ্বর হোলেন। যজ্ঞের ভাগ তখন থেকেই শিবের জন্য নির্দ্দিষ্ট হোলো।

আমি বলিলাম : সে কত দিনের কথা ? তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন : পাঁজি-পুঁথি নিয়ে কি আমরা সে সময় বসেছিলুম রে শালা ? ফের ওসব বাজে কথা কইবি না, তা হোলে আর কিচ্ছু শুনতে পাবি না,—

আমি তখন,—না না, অপরাধ হয়েছে ক্ষমা করুন বলিয়া জোড়হাত করিলাম,—তাহাতে তিনি যেন আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন : ফের শালা তুই আমার কাছে বাহ্য শিষ্টাচারের ভান করছিস্ ?

আমি বলিলাম : আমাদের ওটা কেমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। আর ওসব কথা বলবো না। এখন আপনি তারপর বলুন।—ইহাতে তিনি আর কিছু বলিলেন না, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে তিনি বলিলেন : তারপর আর কি, তখন থেকেই আর্য্যদের সমাজে শিবের পূজা-অর্ঘ্য এ সকল বন্দোবস্ত হোলো। শিবকে তাঁদের দলে টেনে নিয়ে তাঁদের দল উন্নততর সভ্যতা পেলেন। শিবের কাছ থেকে তাঁরা আয়ুর্ব্বেদ পেলেন, ধনুর্ব্বেদ পেলেন, যোগ পেলেন। এসকল তাঁদের মধ্যে কস্মিন্‌কালেও ছিল না, হিমালয়ের মধ্যে থেকে শিব কত কত ভেষজ, পরীক্ষা করে করে তিনি মানুষকে দিয়ে গেছেন, দুঃসাধ্য কঠিন রোগ সমূহের ঔষধ তখন কে জানতো ?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : কেন দেবতাদের ত অশ্বিনীকুমার ছিলেন, তিনি ত অনেককেই কঠিন কঠিন রোগ মুক্ত করেছিলেন শুনা যায়।

তিনি : হুঁ, বহু পূর্ব্বে তাঁরা করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের সে সব দৈবশক্তির প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল, লোক-সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁরা কিছু প্রচার ত করেন নি, তাঁদের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের দৈবচিকিৎসাও লোপ পেয়েছিল। তাঁরা স্থায়িভাবে ত কিছু প্রবর্ত্তন করে যান নি। শিব মৃতসঞ্জীবনী আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি ঐ সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। তাঁর পূর্ব্বে রসায়ন যে কত বড় অদ্ভুত আবিষ্কার তা কারো ধারণা ছিল না। পারদ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুভস্ম এসব শিবের দান। তার পর ধনুর্ব্বেদের, সিদ্ধ অস্ত্রাদি, কতকগুলি অস্ত্র বা বাণ, সম্মোহন, উদ্‌মোহন প্রভৃতি যাতে করে যুদ্ধের সময়ে বিপক্ষের প্রাণহানি না করেও যুদ্ধে জয় হোতে পারে সে সকল শিবই আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর যুদ্ধের এমনই সাংঘাতিক মারাত্মক অস্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যার প্রভাব তখনকার দিনে কারো সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না। তার পর যোগশাস্ত্র সম্পূর্ণই শিবের নিজ আবিষ্কার। আর্য্যদের ধারণাও ছিল না যে সভ্য-সমাজের মানুষ না হয়েও জ্ঞান, বিদ্যা না থাকলেও সংস্কৃত দেবভাষায় বাহ্যভাবে স্তুতি, উপাসনা না কোরেও প্রাণ ক্রিয়ার সংযমের দ্বারা ইচ্ছা করলেই সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার উপায় আছে। শিবের এই যোগপন্থার

অপর নাম হোলো তন্ত্র। এর অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করেই আর্য্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দেবতা বলে ধারণা করেছিলেন। যথার্থ জ্ঞানপিপাসু গুণগ্রাহী আর্য্যের দলই শিবভক্ত হয়েছিল, তখন বহুকাল ধরে এই শিবের প্রভাবই আর্য্য অনার্য্য দুই দলের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। যতটা উপেক্ষা তিনি প্রথমে পেয়েছিলেন তার বহুগুণে ভক্তি সুদে-আসলে তখন থেকে এখনও পর্য্যন্ত আদায় করছেন। তার পর আরও আছে, এই যে সঙ্গীত শাস্ত্র রাগ-রাগিণী অধিকারে বিভিন্ন স্বরের বৈজ্ঞানিক সাধনা এরও আদি প্রবর্ত্তক শিব। মোট কথা একা শিবকে পেয়ে আর্য্যসভ্যতা গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। শিবের যা কিছু অবদান, অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির বলে তিনি তখনকার লোক-সমাজকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। আর্য্য ও অনার্য্যে তখনকার দিনে যে বিষময় শত্রু-সম্বন্ধ ছিল তা আমাদের ধারণাতেও আসে না। রামচন্দ্রের বহু পূর্ব্বেই এই শিবই উভয় শ্রেণীর মিলন-সেতু। আর্য্য ও অনার্য্য এই দুটি জাতিকে নিয়ে এক বিশাল সভ্য-জগত সৃষ্টির বীজ এই শিবই রোপণ করেছিলেন। তিনি সে যুগের এমনই একজন ছিলেন যাঁর গুণের, জ্ঞানের ও শক্তির পরিমাপ এখনও পর্য্যন্ত হয়নি! কাজেই শিব যে কত বড় দেবতা তার হিসাব করতে গিয়েই গন্ধর্ব্বরাজ মহিম্ন-স্তবের মধ্যে ঐ যে কথাটি বলেছিলেন তারপর আর কথা নাই:

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলম্ সিন্ধুপাত্রম্
সুরতরুবর-শাখালেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালম্
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥

২৪

একবার মহেশ্বরী মায়ীর সঙ্গে কথা কহিবার, একটু বিশেষ ভাবেই আলাপ করিবার সুযোগের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম, আজ তাহা উপস্থিত। খণ্ড ভৈরবের সঙ্গে তিনি বক্রেশ্বর মন্দিরের আঙ্গিনায় আসিয়া বসিয়াছেন, আর কেহই সেখানে নাই বটে তবে দূরে দুই তিনজন মন্দিরের পাণ্ডা তামাকের ধূমপান করিতে করিতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় মত্ত ছিল। তাহাদের কথা কহিবার বিশেষত্ব এইটুকু যে, দূর হইতে কেহ শুনিলে মনে করিবে যে একটা কলহ বা ঝগড়া চলিতেছে।

এই মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের বামে, ভূমির উপর একখানি মাদুর পাতা, তাহার উপরেই ভৈরবী উপবিষ্ট ছিলেন। যেদিকে মহেশ্বরী মুখ ফিরাইয়াছিলেন, সেদিকে কতকগুলি ছোট ছোট মন্দিরের মত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি খুব ছোট মন্দির, বোধ হয় হাত বাড়াইলে তাহার চূড়ায় ঠেকে। মন্দিরের আকৃতি বটে, কিন্তু মন্দির নয়। ভিতরে কোন মূর্ত্তি বা লিঙ্গ নাই। দুই হাত সমচতুষ্কোণ গৃহতলে একটি লোক আসন পাতিয়া বসিতে

পারে মাত্র, মাথার উপরে হাতখানেক শূন্য থাকে। প্রবেশ দ্বারও দুই হাতের অধিক নয়, শরীরকে যথেষ্ট সঙ্কোচ করিয়া ঢুকিতে হয়। ভিতর-বাহির শেওলায় চিত্রিত, সাঁতানি গন্ধ একটা বড় তীব্র, কাছে দাঁড়াইলেই পাওয়া যায়। ইহা একটি সাধন-গৃহ। যখন বক্রেশ্বর পুরীর অবস্থা ভাল ছিল তখন উহা সাধন অর্থে ব্যবহার চলিত, এখন কিন্তু তাহার মধ্যে থাকা বা অল্পক্ষণ বসাও ভয়ানক বিপদ্জনক। আমি এক সময় ঘুরিয়া-ফিরিয়া এসব দেখিয়াছিলাম, কিছুক্ষণ ইহার মধ্যে বসিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ভিতরে এমনই একটা বিষাক্ত ভ্যাপসা গন্ধ যে পাঁচমিনিটও বসা গেল না। এখন যাহা বলিতেছিলাম, ঐ মন্দির মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল বোধ হয়, কারণ মহেশ্বরী ঐদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কি বলিতেছিলেন তখন খণ্ড ভৈরব উঠিয়া সেই দিকে গেলেন। এই অবসরে আমি একটু বেশী আগাইলাম।

তিনি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে আমায় আহ্বান করিলেন, বলিলেন: কয় দিন হোতেই তোমার কথাই মনে করছিলাম, বলি হয়ত কাল চলে যাব, আর দেখা হবে কি না, তা দেখ ঠিক দেখা হয়ে গেল। আমি নমস্কার করিয়া বলিলাম: আপনার দয়া।

তিনি হাসিয়া বলিলেন: হাঁ তাই বটে, আমরা ত কেবলই মহৎ লোকের দয়াই চেয়ে আসছি। তা আর কতদিন এখানে থাকা হবে?

আমি: এখনও ত যাবার ইচ্ছা হয় নি। অঘোরী বাবার সঙ্গ ত তেমন পেলুম না,—

তিনি: আমরাও কখনো তার সঙ্গ বেশী দিন পাইনি, দুদিন কি বড় জোর তিনটি দিন এক সঙ্গে পেয়েছি কিনা সন্দেহ। কাছে ঘেঁসতেই দেন না কাকেও, খুসী হয়ে নিজে না ডাকলে কারো যাবার যো নাই।

আমি: সে হিসেবে মনে হয় তিনি আমায় যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন,—

তিনি: তাই ত আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হয়। খণ্ড ভৈরবও সেইকথা বলছিলেন যে, যে তাঁর সঙ্গ পায় বা পেয়েছে সেই লোককেই ঐ কথাটা বলতে শুনেছি।

আমি: আমার কিন্তু এখনও অনেক কিছু তাঁর কাছ থেকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আছে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন: আমারও কিছু কম নেই, কিন্তু আসল কথাটা কি জানো, তোমার যা যা জানতে ইচ্ছা হয়, তাই যে তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাবে তা যেন মনে ভেবো না, আমরা তা পাইনি। তোমার এখন ভিতরের ইচ্ছা যে তন্ত্র-সমুদ্রটি একেবারে পেটে পুরে উদ্গার তুলতে তুলতে ঘরে যাও, বাবা, সেটি হবে না জেনো। আমি বলিলাম: আসলে আমার আরও অনেক কিছু জানবার আছে। তাঁর কাছে না হোলে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এমনটি হবার সম্ভাবনা নেই।

তিনি: আচ্ছা, একটা আমায় বলত, কোন একটা যা হোক তন্ত্রসম্বন্ধে, দেখি আমি তোমার মনের মত বলতে পারি কি না!

যখন প্রথমে ইঁহাকে দেখি তখন ভাবিয়াছিলাম না জানি কি গম্ভীর প্রকৃতি, হয়ত আমার মত একজন কিছু জিজ্ঞাসা করতেই সাহসী হইবে না। হয়ত সামান্য কথায় উপেক্ষার ভাবে দুই

একটা কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন। কিন্তু আজ প্রথম আলাপেই একেবারে আমাকে এমনই আপনার করিয়া ফেলিলেন আমি সকল কাল্পনিক পার্থক্য ভুলিয়াই গেলাম। তাঁহার কথায় এখন আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম : আমার কিন্তু আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধে। অথচ আপনার সঙ্গে কথা কইতে প্রথম থেকেই আমার আকাঙ্ক্ষা। তারপর আপনার মহৎ সাধনার কথা—

তিনি : তাহোলে তোমার মনে কিছু যথার্থ জিজ্ঞাসা ওঠে নি। তাই কি না ?

আমি : তা বোধ হয় ঠিক নয়, কতকগুলি এমন বিষয় আছে যা আমি আপনার কাছে বোলতে সঙ্কোচ মনে করছি। সকল কথা সকলের সঙ্গে ত হবার নয় !

তিনি : আমাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তুমি কি এতদিনের শোনার মধ্যে অঘোরীর কাছে একথা পাওনি যে লজ্জা, মান, ভয়, এসব না ঘুচ্‌লে তন্ত্রশাস্ত্রের মূল তত্ত্বে কেউ ডুবতে পারবে না। নিঃসঙ্কোচ না হোলে কিছুই হবে না।

আমি : তা আমি শুনেছি, জানি সর্ব্ব বিষয়ে সকল ধর্ম্মেই ও কথা খাটে,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত,—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন : কোন নারীর কাছে বসে তন্ত্রধর্ম্মের কথা শোনবার সুযোগ ঘটেনি এই ত কথা ?

আমি বলিলাম : এই কথাই ঠিক। আমার প্রথম কথা এই যে আপনি গৃহী না সন্ন্যাসী জানতে ইচ্ছা হয় !

তিনি : তন্ত্রধর্ম্ম যিনি প্রবর্ত্তন করেছিলেন তিনি এর মধ্যে গৃহী সন্ন্যাসী বোলে কোন ভেদ রেখে করেন নি। যদিও এখন তা হয়েছে, বুদ্ধদেব এবং শঙ্করাচার্য্যের পর থেকে। কথাটি শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম : এখন তাহোলে যখন গৃহী ও সন্ন্যাসীর ভেদ হয়েছে তখন আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, আপনি কোন আশ্রমের ?

তিনি : আমি বোলে সুধু নয়, এখনও এমন একটি দল আছে যাঁরা মূল শিবতন্ত্রের মতে সাধন করেন, তাঁদের এখনও কোন দলের ভেদাভেদ নেই। আমি সেই দলের।

আমি : তাহোলে আপনাদের সম্প্রদায় ছোট,—বেশীর ভাগ ত এখন গৃহী দেখি,—

তিনি : তা আমি ঠিক বোলতে পারবো না আমাদের দল ছোট কি অন্য দল ছোট। তবে এইটুকু বোলতে পারি আমরা কৌল তান্ত্রিকের শিষ্য। তখন আমি কৌল কাদের বলে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধাবস্থা হোলেই কৌল। এইটুকু জানলেই হবে।

আমি : স্ত্রী ব্যতীত তন্ত্রমতে সাধন ত হোতে পারে না,—

তিনি : তা ত বটেই, স্ত্রী পুরুষের যুক্ত জীবনই সম্পূর্ণ জীবন, তন্ত্রের অধিকারে প্রথম প্রবর্ত্তকের একা একা সাধনা হয় না।

আমি : যদি কোন সাধকের স্ত্রীর সঙ্গে বেশী দিন ভালবাসা না থাকে,—দুজনের মিল না হয়,—তাহোলে ত স্ত্রী পরিত্যাগ করারও ব্যবস্থা আছে শুনেছি।

তিনি : তন্ত্রে স্ত্রী বা নারী জাতিই শক্তি। স্ত্রী গ্রহণ বলে না, বলে শক্তি গ্রহণ, যার সঙ্গে যোগাযোগ হোলো, কিছুকাল পরে যদি দেখা যায় দুজনে মিলছে না তাহোলে উভয়ে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ত ভাল,—শাস্ত্রের বিধানের জোরে টেনে রাখার সার্থকতা কি ?

আমি : তা ঠিক কিন্তু ঐ নারী বা শক্তিটির জীবনটি যে খারাপ হয়ে গেল ?

তিনি : খারাপ হবে কেন ? তার ত অপরের সঙ্গে পুনরায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার সুযোগ রয়েছে।

আমি : যদি সন্তান হয়, সে সন্তান কার কাছে থাকবে ?

তিনি : যদি দুগ্ধপোষ্য হয় তবে মা ছাড়া থাকবে কি করে, সন্তান মার কাছেই থাকবে, পিতা তাদের ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী থাকবেন—।

আমি বলিলাম : তারপর যদি অন্য লোকের সঙ্গে যান তাহোলে তাকে আর সতী বলা যাবে কি, একজন ছেড়ে আর একজনকে ধরা, আবার তার সঙ্গেও যে সারা জীবন মিল থাকবে তার নিশ্চয় কি ?

তিনি : যেখানে শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপার আর উদ্দেশ্য হোলো সিদ্ধি, সেখানে তোমাদের সমাজে যাকে সতীত্ব বলে এ সমাজে তার কোনও মূল্য নেই। তা ছাড়া সকল সমাজেই সকলেই সতী হয় না, কেউ অভাবে কেউ স্বভাবে অসতী হয়, তাতে বাধা দেবার কারো সাধ্য নেই। তারপর পুরুষের সতীত্ব বোলে যখন কোনও ব্যাপার নেই তখন মেয়েদের বেলা এতটা সতীত্বের কি দরকার ?

আমি : তাহোলে ত ভ্রষ্টাচার হোলো ? সমাজের মধ্যে ঘোর ব্যভিচার উৎপন্ন হোতে বাধ্য,—তাতেই ত সমাজ উৎসন্ন যাবে।

তিনি : এই সব কথা বুঝি তোমার জিজ্ঞাস্য ছিল, প্রথমে, মেয়েমানুষ বোলে আমার কাছে বোলতে চাওনি, এখন ত বেশ বোলছ দেখছি,—

আমি বলিলাম : আপনিই ত আমার সঙ্কোচটি কাটিয়ে দিলেন, তাইত বোলতে সাহস পেয়েছি।

তিনি হাসিয়া বলিলেন : বেশ ত, তুমি নিঃসঙ্কোচে সব কথাই বলনা কেন, কিছুই বাদ দিও না, বল।

এমন সময় খণ্ড ভৈরব সেই ক্ষুদ্র মন্দির হইতে একজনকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে নবাগত ব্যক্তিকে দেখাইয়া মহেশ্বরী বলিলেন : ঐ দেখ একজন, তিনটি ছেলে ও একটি কন্যার জন্ম দিয়ে, খাওয়াবার ভয়ে পালিয়ে এসে এখানে গাঢ় প্রবেশ করে সাধন করতে লেগেছেন।

যিনি আসিলেন, শ্যামবর্ণ রোগা, লম্বা ছিপছিপে,—কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফ,—চক্ষুদুটিতে কুটিলতা আছে কিন্তু জ্যোতি নাই,—পরিধানে রক্ত একাম্বর,—ভয়ানক ময়লা,—তিনি আসিয়া

মহেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পায়ে হাত দিতে গেলে, ভৈরবী পা টানিয়া লইয়া বলিলেন: খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে থাক্‌, থাক্‌,—এখন আর কত দিন এখানে থাকা হবে?

তিনি বলিলেন: এখানে মনটা বেশ বসে গেছে কি না তাই, আমার আর এখন কোথাও যেতে ইচ্ছা নাই।



মহেশ্বরী বলিলেন: যখন তারা এখানে ধাওয়া করবে তখন আর এখানে এতটা মন বসবে কি?

তিনি বলিলেন: এখানে তাদের আসবার দরকার কি? তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা ত হয়ে গেছে।

কোথা হোলো আবার,—কৈ কিছু শুনিনি ত!

কেন, কালীকিঙ্কর ঘোষালের সঙ্গেই ত ঠিক হয়ে গেছে।

সে আবার কে?—

আমার একজন শিষ্য। সে বোলে কয়ে নিয়েছে—তাদের খাওয়া-পরার ভার নেবে?

এইবার দেখিলাম ভৈরবী একটু ভ্রূকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন,—এবং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন তোমার লজ্জা না হয় নাই, কিন্তু যারা একজনের গলগ্রহ হয়ে থাকবে তাদের ত লজ্জা আছে,—যাও তুমি এখান থেকে,—তোমায় যা বলবার ছিল তা এই,—এখানে পুরুষার্থ প্রয়োগ না করলে অপরকে সুখী করা ত দূরের কথা তুমি নিজেও এক মুহূর্ত্তের জন্য সুখী হোতে পারবে না। কিছু দিন ফাঁকি দিয়ে তোমার সংসার আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে সুখটি ভাল করেই দেখ না কেন! সে দিকেও দরজা বন্ধ। তাঁর কাজ তুমি এড়িয়ে পার পাবে?

সে ব্যক্তি বোধ হয় আমার মত একজন অপরিচিত লোকের সম্মুখে এতটা আশা করে নাই,—ভৈরবীকে প্রণাম পূর্ব্বক সুড় সুড় করিয়া চলিতে চলিতে—আপনি রাগ করছেন, আমি তাঁর কাজ ফাঁকি দিই নি, মা জগদম্বা জানেন, আমি সাধন কোরবো বোলেই, ক্রিয়া-কর্ম্ম কোরবো বোলেই এসেছি। সঙ্কুচিত ভাবে এই কথা গুলি বলিয়া যে দিক দিয়া আসিয়াছিলেন সেই দিকেই প্রস্থান করিলেন। খণ্ড ভৈরবকেও হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। তখন ভৈরবী

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন : তোমারও কি ঘরে সংসার আছে নাকি, ছেলে পুলে ?—আমি বলিলাম : সংসার আছে বটে, ছেলে পুলে ত নাই।

মধ্যে এই যে একটা ব্যাপার হইয়া গেল ইহাতে আমাদের পূর্ব্ব আলোচিত কথার সূত্র ছিন্ন হইল বটে আবার তিনি এই ভাবেই আরম্ভ করিলেন।

এই দেখ তোমার স্বমুখে এই লোকটা, যে ভাবে নিজের শক্তিকে ভাসিয়ে দিচ্ছে তার পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর তা এখনও বুঝতে পারচে না। প্রকৃতির প্রতিশোধের নিয়মের কথা ত জানে না।

আমি : প্রকৃতি জননী, তিনি ত দয়াময়ী, সন্তানের উপর আবার তাঁর প্রতিশোধ কি ?

তিনি : বটে, তাঁর যদি তা না থাকবে তবে জগতে প্রতিহিংসা প্রতিশোধ বোলে এই ভাবটা এলো কি করে ? তিনি যত দয়ালু আবার ততই নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, দণ্ড দেবার সময় তাঁর মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। তবে সেই দণ্ডের ফলও কল্যাণময়, তাতে তার অকল্যাণ হয় না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কোন কথাই হইল না। আমিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলাম: আমাদের যে কথাটা হচ্ছিল,—স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা হোলে,—এত পর্য্যন্ত শুনিয়া তিনি ধমক দিয়া বলিলেন :

হাঁ, হাঁ,—তোমরা স্ত্রীলোককে খুব শাসনে রাখতে ভালোবাস, হিন্দুশাস্ত্রে মেয়েমানুষদের সতীত্ব রক্ষার জন্য শাস্ত্রে খুবই কঠিন নিয়ম করা আছে, কিন্তু গোড়ার কথা যেটা সে দিকে বাঁধন কৈ ?

আমি বলিলাম : পুরুষের পক্ষেও এক বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া আর কোন নারীকে ত মন্দ চক্ষে দেখতে নিষেধ আছে।

তিনি : নিষেধ ত আছে, কিন্তু নিয়মটির বাঁধাবাঁধি নারীর পক্ষে কি ভয়ানক জোর নয় ? এটা হোল কেন, বোলতে পার ?

আমি : এ ত সহজেই ধরা যায়,—নারী ভ্রষ্টা হোলে সমাজ যে একেবারে উৎসন্নে যায়, তারা একে কোমল হৃদয়,—বুদ্ধি কম, দুর্ব্বল জাতি বোলেই বোধ হয় তাদের পক্ষে নিয়মটা এত গুরুতর করা হয়েছে। নারীর দুর্ব্বলতা-সম্বন্ধে আমার প্রত্যেক কথায় তাঁর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

পরে তিনি স্থিরভাবে বলিলেন : এমন কোনও সমাজ দেখাতে পার যেখানে কঠিন নিয়ম করে নর-নারীর ভ্রষ্টাচার বন্ধ করতে পেরেছে। এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা সাধারণ নিয়মের বশ থাকতেই পারে না। ভ্রষ্ট নর-নারী নেই এমন সমাজ নেই। ভ্রষ্টাচার যদি না থাকে ত সদাচারেরই বা অস্তিত্ব থাকে কোথায়, একটা আর একটাকে অবলম্বন করে থাকে যে ! সমাজকে ভ্রষ্টাচার থেকে বাঁচাবার উপায় এই তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যেই আছে, হিন্দুদের অন্য কোন শাস্ত্রে নাই। আসলে যখনই সমাজে পুরুষের নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল, তখনই এই সব নিয়মের প্রবর্ত্তন। তার আগে যখন সমাজ শক্তিমান ছিল তখন ওসব নিয়মের কথাই ত

ছিল না—এখন একবার ঘরে ঘরে যেয়ে দেখ না ; দেখতে পাবে কতটা ব্যভিচার দুই পক্ষেই আছে আর তা চাপা দেবার উপায়ও কত রকমের হয়েছে। আগে ত মেয়ে-পুরুষে সমান ভাবে শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী ছিল, মেয়েদের পতি-নির্ব্বাচনের পর্য্যন্ত অধিকারও ছিল, স্বাভাবিক ভাবেই ছিল ত ? সে সব উচ্চ আদর্শ গেল কোথা ?

আমি বলিলাম : বোধ হয় যখন এই তন্ত্রধর্ম্মের প্রভাবে শেষের দিকে দেশে ব্যভিচার হয়েছিল, যথেচ্ছা ব্যবহার সমাজে চলেছিল, বিধি নিষেধের কোন আঁট ছিল না সেই সময়েই হিন্দু-সমাজপতিরা এইসব নিয়ম করে সমাজকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচিয়েছেন।

তিনি : বাঁচালেন কোথা,—কি এ-সমাজের মধ্যে কর্ম্ম-শক্তি, জাতিগত একতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, ইহলোকে জীবন-যাপনের উন্নত কোন পথ কি আবিষ্কৃত হয়েছিল? সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বাঁধুনি আরও জোর করেই বিধিবদ্ধ হোল, তাতে করে কি উন্নতি হয়েছিল বল না?

আমি : একটা উদ্দাম সর্ব্বনাশের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র, অবশ্য অন্য দিকে সমাজের আর কোন উন্নতি হয় নি। দেশ তখন ত পরাধীন হয়ে পড়েছিল। বিধর্ম্মী যবন রাজার আশ্রয়ে এ জাতির কোন উন্নতি সম্ভব ছিল কি ?

তিনি : নারীর স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব্ব করাই কি দেশ পরাধীন হওয়ার মূল কারণ নয়? আমি বলিলাম,—দেশ পরাধীন হবার অনেক পরেই ত নারীর অধিকার বা স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হয়েছিল।

তিনি : এইখানে তোমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে এটা দেখিয়ে দিতে হচ্চে যে কোন সময়ে কোন সমাজেই নারী কর্ত্তা ছিল না, প্রথম থেকে কর্ত্তৃত্বটাই নারী-ধর্ম্ম বিগর্হিত কথা। পুরুষ-সমাজ যে দিকে চলে নারী-সমাজও সেই পথে চলে পুরুষদের অবলম্বন করে, প্রেমের ভিতর দিয়ে শক্তির প্রেরণা যোগায়। সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই পুরুষের অধিকারই স্পষ্ট চক্ষে এখনও প্রবল আছে। পুরুষই পরিচালক, এ ত আমরা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখতে পাচ্চি। সমাজের যে-যে অবস্থায় পুরুষ নির্ভীক কর্ম্মশক্তিমান বীর,—নারীও ঠিক সেই ধারায় গুণবতী শক্তিমতী। তার পর এক একটা ভাব, কর্ম্ম-উদ্যম,—সমাজে এক এক সময় এসে সামাজিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে, সমাজের নর-নারী তাইতে অর্থাৎ সেই ভাবের আনন্দে অনুপ্রাণিত তাদের জীবনটি ভাসিয়ে দেয়। এই ভাবে একটা উন্নতমুখী ভাবধারা সমাজে কিছু দিন চলে। তারপর প্রত্যেক কর্ম্ম বা ভাবই ঐখানে প্রতিক্রিয়ামূলক। তার ফলেই সমাজে একটা অবসাদ আসতে বাধ্য। তখন সব ওলট-পালট হয়ে যায়। সেই সময়েই যাঁরা সমাজের চিন্তাশীল মানুষ, মহাপুরুষেরা এসে যথার্থ পথ নির্দ্দেশ করেন। কোন্ পথে গেলে সমাজ বা জাতি রক্ষা পাবে তার ইঙ্গিত করেন। কিন্তু পরলোক ও অধ্যাত্ম ধর্ম্ম এইটেই এ দেশের মাটিতে এমনি শিকড় গেঁড়ে গেছে যে ইহলোকের উপকারী এমন অনেক বীর মধ্যে মধ্যে এসেও দেশের মধ্যে সঙ্ঘ বা রাষ্ট্রশক্তি জাগিয়ে স্থায়িভাবে তুলতে পারেন নি। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে তন্ত্র-ধর্ম্ম মিশে অনেক

দিনই এ দেশের সমাজকে বেঁধে গেছে, এখনও তার জের চলেছে। তবে উপনিষদের তত্ত্ব বা শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার মধ্যে বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রভাব এখন সমাজের উপর খুব বেশী, জ্ঞানের যুগ চলেছে এটা, কাজেই বৌদ্ধ বা তন্ত্রধর্ম্ম এখন তলায় পড়ে গেছে। তখনও যেমন এখনও তেমন সমাজে নর বা পুরুষেরই প্রাধান্য—কিন্তু মূলে পুরুষের সঙ্গে নারীর যোগ, অন্তরের যোগাযোগ তাত অবাধ নেই, সেই যে বাধা তাইতে কি সমাজ-শক্তিকে পাছু করে ফেলে নি? তাইতেই কি এদেশের পুরুষেরা বহুল পরিমাণে কর্ম্মশক্তিহীন হয় নি? আর সেইটিই কি অধঃপতনের মূল কারণ নয়?

পূর্ব্বের কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: নারীপক্ষে স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়েছিল বোলেই কি সমাজে বা রাষ্ট্রের মধ্যে পুরুষেরা শক্তিহীন হয়েছে এই কথা বোলছেন?

সমাজে পুরুষ মানুষেই যখন সর্ব্বকালেই শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান, তখন সমাজকে সুশৃঙ্খলায় চালাবার কর্ত্তাও যে পুরুষ আর উচ্ছৃঙ্খল করবার বেলাও কি সেই পুরুষের কর্ত্তৃত্ব দায়ী নয়?

এতে ত পুরুষের দায়িত্ব বুঝা গেল, কিন্তু নারীর স্বাধীনতা খর্ব্বের জন্যই যে দেশ বা রাষ্ট্র শক্তিহীন হয়েছে তা ত বুঝা গেল না!

পুরুষের সকল কর্ম্মই ত একা তার নয়, সঙ্গে তার নারী আছে ত?

তা নিশ্চয়ই আছে, স্ত্রীপুরুষ যুক্ত হয়েই ত একটি সম্পূর্ণ জীবন, তা বুঝেছি।

তবে, যেখানে পুরুষে নারীকে তার অধিকার সীমাবদ্ধ করে দিয়ে নিজের ভাগে সর্ব্ব দিকেই অবাধ শক্তি রেখে দেয় তাতে তার কি এক অংশে দুর্ব্বলতা প্রশ্রয় পায় না? আর সে দুর্ব্বলতা কি সমাজের গায়ে লাগে না, তার ফলফল একটা নেই!

কথাটা এই যে উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে গেলে নারীপক্ষে যে ব্যভিচার হয়েছে, নারীপক্ষে স্বাধীনতা থাকার জন্য যে সব অশুভ ফলাফল ঘটেছে তা থেকে দেশ বা সমাজকে বাঁচাতে হোলে কি নারীপক্ষের অবাধ ব্যবহারকে সংযত করবার দরকার ছিল না?

সেটাও যেমন দরকার ছিল পুরুষপক্ষেও ত তাদের সেই অবাধ ব্যবহারকে সংযত করবার দরকার তেমনই ছিল। তা না করে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে নারীকে দায়ী করে শক্তিমান পুরুষ-মোড়লেরা নারীর অধিকারকে সর্ব্বদিকেই খর্ব্ব করে, বাল্য বা শিশুবিবাহের নিয়ম করে কি নিজ পক্ষের দুর্ব্বলতাকে বেশী প্রশ্রয় দেন নি? আর তাইতেই কি দেশ বা রাষ্ট্রশক্তি আরও হীন হয়ে পড়েনি?

আমার এটা বড়ই বিসদৃশ লাগে, চিরকালই পৃথিবীর সকল সমাজেই বিবাহের কাল যৌবনকে ধরেই নিয়মিত হয়ে চলেছে, এই ভারতে মধ্য যুগে হঠাৎ এর ব্যতিক্রম কেন যে হয়ে গেল তা ভেবে কূল পাওয়া দুষ্কর।

বেশী ভাবতে হবে কেন, কূল ত হাতের কাছেই রয়েছে। যে জাতের পুরুষেরা নারীকে আদ্যাশক্তির শক্তি বলে ধারণা করে, বিবাহিত জীবনকে পূর্ণ এবং শক্তিমান জীবন এই বোলে

বড় গলায় শাস্ত্রের মধ্যে প্রচার করে গেছেন, তারপর শক্তিমান জীবনে পূর্ণ শক্তির ফলভোগ করেছেন শেষে তারাই শক্তির ব্যভিচারে অবসন্ন হয়ে, শক্তিহীন হয়ে প্রতিক্রিয়ার বশে নারীজাতি গোজাতির সমান, ছাড়া পেলেই চরে খাবে, 'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু' এইসব ভাব তাদের মধ্যে যদি না আসে ত আর কাদের মধ্যে আসবে বল ? আসন্নকালেই না বুদ্ধি বিপরীত হয়ে থাকে, জানত একথা। কাজেই এই নারীকে সমাজ-জীবনে দাও পঙ্গু করে। সুধু পুরুষের ভোগের কাজে যেটুকু দরকার সেইটুকুই থাকে। একেবারে পঙ্গু করবার উৎকট উপায় হোলো শিশু-অবস্থা থেকেই বেঁধে ফেলা। ওদের স্বাধীনভাব বিকাশ হবার পূর্ব্ব থেকেই মেরে দাও যত কিছু ব্যভিচারের বীজ। বাঘ বা সিংহকে বাচ্চা বেলা থেকে আফিং খাইয়ে শেয়াল কুকুর করার গল্প জানো ? সেই রকম আর কি !

এর মধ্যে থেকেও কিন্তু অনেক অনেক নারী গরীয়সী, মহান জীবন পেয়েছেন দেখতে পাই !

আহা, তুমি তোমার বাড়ির ভিতরে কোন সময় যা খুসী যথেচ্ছাচার করতে পার কিন্তু সব সময়েই কি সকলকার উপর তোমার আধিপত্য খাটে না খাটবে। সব পুরুষেই ত শক্তিমান নয় ? প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচার—এক, দু-চার জন শক্তিশালী লোক কোন সময় কোন সমাজে হয়ত করতে পারে কিন্তু তার কি শেষ নেই, অবসান নেই ! শেষে তাঁর ইচ্ছাই ত পূর্ণ হবে ! আসলে দেশের পুরুষে নিজেরাই ত সমাজকে গড়ছেন ভাঙ্গছেন। স্ত্রী অথবা শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েই ত এক একটি পূর্ণ জীবন আর সেই জীবনের সমষ্টিই ত সমাজ বা দেশ। যখন সেখানে উভয়ের অবাধ স্বাধীনতার ফলে ব্যভিচার হয়ে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লো, পুরুষেরা ইন্দ্রিয়-সুখটাকেই বড় করে, নারী বলতে যে শক্তি সেটা ভুলে সমাজে যথেচ্ছা শক্তির অপব্যবহারে গা ভাসিয়ে দিলেন। আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন। তার ফল যা হয়, পুড়ে গেল তাদের বল বীর্য্য, সদ্‌বৃত্তি, উদার ভাব সব সেই আগুনে। তখন বাইরের কোনও শক্তিশালী জাতি এসে সেই বিকৃত সমাজকে পদানত করে,—সেটা কি বেশী আশ্চর্য্যের কথা ? তাইত হয়ে থাকে। বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা—জান ত একথা ? তোমার দেশের পুরুষ মানুষেরা ত আর বীর ছিল না, সবটুকু তাদের বীর্য্যই ইন্দ্রিয়-সুখের পথে যথেচ্ছা নারীশক্তির অপব্যবহারেই নিঃশেষ করে ফেলেছিল ; আর ধর্ম্মের নামে মহাপাতকের আবর্ত্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আসলে অন্নে পূর্ণ দেশে ত কখনও অন্ন-সমস্যা ওঠে নি, তা উঠলে হয়ত এতটা অধঃপতন হোতো না। যে দেশে অন্ন-সমস্যা আছে সেই দেশের মানুষে শক্তিশালী হয়। তারা নারীশক্তিকে যথাযথ ব্যবহার করে, এমন করে হেয় করে না। নারীর মধ্যে শক্তির আবিষ্কার এইখানেই হয়েছিল আর তার ব্যভিচারও এইখানেই চরম সীমায় উঠেছিল, এখনও তার জের পূরো দমে এইখানেই চলেছে।

আমি : এই দেশেই ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা এমনভাবে প্রচার হয়েছিল যা আর পৃথিবীতে কোথাও হয়নি।

তিনি : আহা তাই ত গো, ব্রহ্মচর্য্যের অপর দিকটাও ত আবার তাকেই না প্রচার করতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য থাকলে যা হয় তার দৃষ্টান্তও যেমন আছে, আবার তার ব্যভিচারেও যা হয় তার

দৃষ্টান্ত তেমনি রয়েছে,—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে! আসলে এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে একদল মানুষ তাদের জীবন দিয়ে কতকগুলি অপূর্ব্ব শক্তি আবিষ্কার করে গেল, তারপর যে দল এলো তারা আবার জীবন দিয়ে তাই পরীক্ষা (এক্সপেরিমেণ্ট্) করে গেল, তারপর যারা এলো তারা জীবন দিয়ে তার ব্যভিচার করে গেল,—ফুরিয়ে গেল তিন পুরুষের সেই শক্তির খেলা। এইভাবেই ত চলবে।

আমি বলিলাম : আপনার কাছে আজ যে কথা শুনলাম, একথা আগে কারো কাছে বোধ হয় এমন ভাবে শুনি নি,—আমাদের দেশে নারী, এত পরাধীনতার মধ্যে কোনঠাসা হয়েও এখনও মহিমাময়ী,—আমি কোন পুরুষ জ্ঞানীর কাছে একথা শুনলে ত এতটা আশ্চর্য্য হোতুম না।

তিনি : আচ্ছা উল্টে আমিও তোমার মুখে একটু মিষ্টি দিয়ে দি,—আমি বলি, তোমার মত ছেলেও আমি দেখি নি, এমন করে খোলাখুলি কেউ আমায় এসব কথা জিজ্ঞাসাও করে নি, বেশীর ভাগই সব কুনো-শোরের দল। কাছে এসে কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না, একেবারেই কাহিল, যেন তাদের কিছু জানবার নেই, জানবার শক্তিও নেই, ইচ্ছাও নেই। গোঁফ-দাড়িওলা পুরুষ মানুষ অনেক রকমই দেখি; একদল আছে, তাদের যদি কারো একটু রক্তমাংসের তেজ থাকে, হৃষ্টপুষ্ট শরীর, অমনি দেখি তার চোখের দিকে, কুৎসিত ইন্দ্রিয়-সুখের লালসে রাঙ্গা, যেন মেয়েমানুষের কাছে আর কিছু পাবার নেই, যেন আর কোন সম্বন্ধও নেই। তাদের মুখে আগুন লাগিয়ে দাড়ি গোঁফগুলো পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে। আবার আর একদল আছেন একটু কাহিল শরীর, কাছে এসে বসলেন ত একেবারেই ক্রীতদাস, যা বলবো তাই একেবারেই সিদ্ধান্ত। তাদের দিয়ে যা খুসী করিয়ে নাও আপত্তি নেই। ঘেন্না ধরে গেছে এদেশের পুরুষ দেখে দেখে, পোড়াকপাল!

আমি : মাটি করে দিলেন আপনি, বেশ বলছিলেন, কোথা থেকে এসব পুরুষদের কথা এসে,—

তিনি : হাজার হোক, মেয়েমানুষ আমরা, কথা পড়লে—না বোলে যে থাকতে পারি না,—জান ত মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না। আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল, তুমি হয়ত বিজ্ঞের মত, আমার কতটা পড়াশুনা আছে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসবে!

আমি : ছি-ছি—আপনার পড়াশুনার কথা আমার মনে হয় নি, তবে আমি ভেবেছিলাম যে আপনি আমাদের দেশে সাধারণ লেখাপড়া জানা বা পাশ-করা মেয়েরা যেমন হয় তা নন। আপনার মধ্যে এক টা ঐশ্বরিক শক্তি আছে।

তিনি : একজন হাইকোর্টের জজ,—নামটি কি যেন—সারদা মিত্তির। তাঁর সঙ্গে গত বছর ভুবনেশ্বরে দেখা, ১৯১৭।১৮ সালের কথা। তিনি চেঞ্জে গিয়েছেন,—বড় দরের মানুষ তিনি, দেখেই বোধ হোলো। তারপর কথায়-বার্ত্তায় পরিচয় পেলাম, সাধন-ভজন প্রাণ খুলে করতে পারেন না সেজন্য প্রচ্ছন্ন একটা বেদনা তাঁর মধ্যে আছে। আমি তাঁকে বোলেছিলাম ঐ যে আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা তাইতেই আপনার সাধনের কাজ হয়ে গেছে আর কোন

সাধনেরই দরকার হবে না। হাঁ, এখন সেই ছোকরাটির কথা বলচি, তাঁর কাছে একটি ছোকরা দেখেছিলাম। এম-এ পাশ, রোগা ক্ষীণ শরীর, যেন শরীরে তার কিছু সত্ব নেই। একদিন সেই ছেলেটি আমার কাছে এসে উপস্থিত, কি ব্যাপার ? না আপনার পড়াশুনা কতদূর বোলতে হবে। খুব পড়াশুনা না থাকলে আপনি কখনই এত বড় বড় কথা বলতে পারতেন না।

আমি তাকে বললুম : কৈ সারদা বাবু ত একথা আমায় কখনও জিজ্ঞাসা করেন নি ? সে বলে,—তিনি না করতে পারেন কিন্তু আমি যতক্ষণ সেটা আপনার মুখে না শুনছি ততক্ষণ কিছুতেই স্থির হোতে পাচ্চি না।

মহেশ্বরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন : এসব দেশের ছেলেগুলা যদি চাষ-আবাদের কাজ শিখতো কিম্বা ভাল করে শুভঙ্করী শিখে আড়তদারী কাজ শিখতো তো ভাল হোতো। তাদের বাপ মা পয়সার লোভে পড়তে দিয়ে তাদের মাথা খেয়ে দিয়েছে একেবারে। দেখে বড় কষ্ট হোলো।

ভৈরবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন,—তার পর বলিলেন : এত কথা ত শুনলে, বল ত দেখি প্রতিক্রিয়ার কথাটা কি-রকম বুঝলে ?

আমি বলিলাম : এই একটু বুঝলাম আমাদের যত কিছু কর্ম্ম, সাংসারিক, সামাজিক বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সকল ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে, যার কখনও ব্যতিক্রম হয় না। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম।

এটুক ঠিক হোলো,—তার পর নর-নারীর ব্যবহার সম্পর্কে ?

আমি বলিলাম : নর-নারী যুক্ত হয়ে সংসার সমাজ বা ধর্ম্মমার্গে কাজ করতেই আমাদের পরম প্রকৃতি বা ভগবানের নির্দ্দেশ। যেখানে নারীকে তার পূর্ণ-অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পুরুষ সেই অধিকার নিজে গ্রহণ করতে যায় সে-সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। সে-সমাজ জগতের কাছে, নিজের কাছেও হীন হয়ে থাকে যেমন আমাদের এখন হয়েছে।

তিনি : নারীর পূর্ণ অধিকার বোলতে কি বুঝেছ এখন আমায় বল ত বাবাজী ?

আমি : চির কালটা, জন্ম থেকে আমাদের সমাজে নারীর পূর্ণ অনধিকারই দেখে-শুনে আসছি, তাদের এক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার যে কি একথা ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলি যে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন : তোমার এই অকপট ভাবটি আমার বড়ই ভাল লাগে, সত্য বলছি। তোমার তন্ত্রশাস্ত্র মতে সাধন দেখবার আকাঙ্ক্ষার কথা থেকেই যখন এত কথা উঠছে, তখন একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—তন্ত্রের বই ত অনেক আছে, তা পড়বার ইচ্ছা না হোয়ে সাধন দেখতে ইচ্ছা হোলো কেন ?

আমি বলিলাম : তন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের সমাজে বড়ই একটা কুৎসিত ধারণা আছে, আমার মনে হয়েছিল সত্যই কি এটা এত কুৎসিত ! তাই দেখবার জন্য, বুঝবার জন্যেই আমি বেড়িয়ে পড়েছিলাম। তার পর বই পড়ার কথা বোলছেন, তাও কিছু কিছু পড়েছি। আগমসার,

নিগমসার, তন্ত্রসার, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পড়েছি। যোগিনী তন্ত্র বোলেও একটি গ্রন্থ আছে দেখেছি। কিন্তু এসব দেখেও আসল ধর্ম্মের কিছু নির্দ্দেশ পাই নি। বই পড়লে হয় না।

তিনি : তুমি কি সংস্কৃত পড়ে ভাল বুঝতে পার ?

আমি বলিলাম : না, সামান্য রকমই পারি, তবে অনুবাদ আছে তারি সাহায্যে এক রকমে বুঝে নিই, বিশেষ কিছু বাধে না। কিন্তু বই পড়লে আসল কাজ হয় না, প্রাণের তৃপ্তিও হয় না। তাই সাধন দেখতে চেয়ে ছিলাম। এখন আপনি নারীর পূর্ণ অধিকার কি তাই বলুন—

তিনি : পূর্ণ অধিকার ঠিক করবার আগে পূর্ণ মিলনটাই হোক, তবেই ত তার অধিকারের প্রশ্ন ? আগে যদি তার সঙ্গে তোমার মিলনই না হোলো তবে ত অধিকারের প্রশ্নই নেই।

আমি বলিলাম : ধরুন না কেন পূর্ণ মিলন ঠিক হয়ে গেছে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন : তাহোলে পূর্ণ অধিকারও ঠিক হয়ে গেছে।

আমি : তবে কি বুঝতে হবে যে পূর্ণ রকম মনের মিল হোলেই পূর্ণ অধিকার আপনিই সাব্যস্ত হয়ে যাবে ?

তিনি : সে কথা তোমার বুঝতে এতটা দেরী হবে আমি আশা করি নি।

মনে কর মোটামুটি একটা কথা, যারা দুজনে, দুজনের কাছে পূর্ণ রকমে উলঙ্গ হোতে পারে তাদের মধ্যে কার কতটা অধিকার এ প্রশ্ন উঠতে পারে কি ?

আমি : তাহোলে আমার ধারণা পূর্ণ রকমের মিলন একটি এমনই বস্তু যা মানুষের সমাজে দুর্ঘট।

তিনি : হাঁগা, পূর্ণ যখন বলছ তখনই কি একটা দুর্ঘট জিনিসের কল্পনা কর নি ? এখন পূর্ণ ছেড়ে খণ্ডের মধ্যে এস এখানে কিছুই দুর্ঘট নেই—

তিনি বলিতে লাগিলেন : এই মিলনের কথা, তারপর অধিকারের কথা। তন্ত্রমতেই আমি বলছি,—তবে পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রানী, হস্তিনী বা শশক মৃগ বা বৃষজাতীয় পুরুষ স্ত্রী এ সব কথা বোলবো না। তন্ত্রের মধ্যে নর-নারী বিচার এমনই সুন্দর করে ধরা হয়েছে যার কোন প্রতিবাদ সম্ভব নয়। আচ্ছা আমরা এটা ত বেশ দেখতে পাই যে সকলের সঙ্গে সকলের মিল হয় না।

এ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই।

বেশ, এ ত বুঝতে পার ! যখন যৌবনের প্রভাব আসে তখন খোলা চোখে অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাতে মনে হয় সকলের সঙ্গেই সকলের একটা মিল যেন আছে। মনে কর দুটি অবিবাহিত কুমার-কুমারী কোন ক্ষেত্রে এক জায়গায় দেখা হোল। সেই প্রথম দেখাতেই তাদের মধ্যে যদি রূপের বিশেষ তারতম্য না থাকে তাহোলে একটা ভাব এই দুজনের মধ্যে হয় কিনা ? প্রথমেই তাদের মধ্যে মনে হয় যেন উভয়ের মিলন সম্ভব, যদিও স্পষ্টভাবে তখন দুজনের সঙ্গে দুজনার কোন পরিচয়ই নেই।

আমি : তা হোতে পারে।

তিনি বলিলেন : তা কিন্তু ঘটে না। কেন জানো ? মানো বা না মানো জেনে রেখো যে, প্রকৃতির হাতটি পূর্ণ ভাবেই এই নর-নারীর মিলনের মধ্যে থাকে বোলে। সেই জন্যই বাঙ্গলায় কথা আছে, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—এ তিন বিধাতা নিয়ে। এমন কোন মিলন তিনি ঘটাতে দেবেন না যাতে তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ হবে না। অর্থাৎ এমনই মিলনের যোগাযোগ তিনি ঘটাবেন যাতে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। একথা সকলের আগে ভারতের তন্ত্রের ঋষিরাই আবিষ্কার করেছিলেন।

বড়ই আশ্চর্য্য,—আগে, ছেলেবেলা থেকেই এ কথাটা মেয়েদের মুখেই শুনে এসেছি, কিন্তু এমন করে সত্য ভাবে এটা ধারণাই করতে পারি নি।

আরও আশ্চর্য্য কথা এর পর আছে, শোন,—মানুষ তাঁরই সৃষ্টি, তাঁর রাজ্যে বাস করে তাঁর অন্ন খায়, তাঁরই সৃষ্ট সকল সুখ-সুবিধাই ভোগ করে বটে কিন্তু আদুরে ছেলেকে বাপ বা মা যেমন অনেকটা বেশী অধিকার দেন তেমনি ভগবানের শেষ এবং চমৎকার সৃষ্টি এই মানুষকে আদুরে ছেলের মতই অনেক বেশী অধিকার তিনি দিয়ে ফেলেছেন,—বুদ্ধি, মন, জাগ্রত আশা দিয়েছেন, অনন্ত সম্ভাবনা দিয়েছেন। কেবল সেটা কালের মধ্যে দিয়ে ফোটবার নিয়ম করেছেন বলেই রক্ষা, না হোলে তাঁর এ সৃষ্টি থাকতো না। মানুষ অনুকূল অবস্থা পেলেই তাঁর নিয়মের বিরুদ্ধে যায়। এখন ধর, এমনই অবস্থায় যদি কোন মানুষ প্রকৃতির নিয়মের বাধা না মেনে ইচ্ছামত যে কোনও একটা নারীকে চায়, ভোগ দখল করতে চায়, তার জন্য উৎকট পুরুষার্থ প্রয়োগ করে, তখন তিনি কি করে তার ব্যবস্থা করেন জানো ? সেখানে সেই মিলনটুকু, মাত্র ইন্দ্রিয় সুখেই শেষ হয়ে যায়,—সে মিলনের ফলে তা থেকে কোন জীব উৎপন্ন হয় না। বংশ উৎপন্ন হয় না। ঐখানে আরম্ভ আর ঐখানেই তার শেষ করে সে মিলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

আমি : তাই বোধ হয় আমরা দেখতে পাই যে অনেকের বংশ থাকে না, বন্ধ্যা হয়ে তারা জীবন কাটায়।

তিনি : একই কারণ থেকে যদিও তা হয় না তার অন্য অনেক কারণ আছে। এখন সে কথা থাক, যা বোলচি পুরুষের মধ্যে কারো কারো এমন দেখা যায় না কি যে একটা মেয়েতে তার কামের তৃপ্তি হয় না।

এ ত আমরা খুব দেখতে পাই যদিও সংখ্যায় খুব বেশী নয় তারা।

এর মধ্যে সভ্য-অসভ্য, বিদ্বান, মূর্খ, এসবের কিছু নেই, এ তাদের অন্তর-প্রকৃতি নিয়েই কথা। ঐ সব পুরুষ কখনও একটি বিবাহিত স্ত্রী নিয়ে সুখী হোতে পারে না বা একটি নারীর সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে পারে না।

তারাই নিকৃষ্ট জীব মনে হয়।

তোমার মনে হোতে পারে কিন্তু পরমা প্রকৃতি বা ভগবানের তা মনে হয় না, তাদের

ভোগের অনুকূল শক্তি বা নারী তিনিই ত যুগিয়ে দেন। তার মধ্যে তাঁর একটা উদ্দেশ্য থাকে যে! তাকে দিয়ে তিনি অনেকগুলি জীব সৃষ্টি ও পালন করিয়ে নেন। আমরা বাইরে থেকে মনে বিচার করে আমাদের সংস্কার-অনুযায়ী যে রকম বুঝি তার সঙ্গে আমারই ব্যবহারের সম্বন্ধ থাকে, তাঁর উদ্দেশ্যের ধার দিয়েও আমরা যেতে পারি না।

তা হোলে যারা অত্যন্ত কামুক, বহু স্ত্রী-পরায়ণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই এমন যারা তারাই তাঁর প্রিয় বলুন ?

এই সৃষ্টির মধ্যে দুটো দিক্ কি আমরা দেখতে পাই না ?

আমি : পাই। তিনি অমনি প্রশ্ন করিলেন : কি পাও বল দেখি ?

আমি বলিলাম : স্থূল, সূক্ষ্ম, অথবা বাহ্য ও অন্তর এই দুই দিকের কথাই ত বলছেন ?

তিনি : হাঁ, একটি হচ্ছে সৃষ্টিবৃদ্ধির প্রবাহ, আর একটি সঙ্কোচ অথবা অন্তরমুখী প্রবাহ যেটি সৃষ্টি বা সমাজকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। একটি হোলো ক্রিয়া আর একটি তার প্রতিক্রিয়া, এক দিকে তাঁর বাহ্য সৃষ্টিতে যে সব শক্তিমান জীবের মধ্যে দিয়ে অনেক অনেক বংশ সৃষ্টি করিয়ে নেন,—তারাই শাস্ত্রে বৃষজাতীয় পুরুষ। ষাঁড় আর কি! মানব-সমাজের তারা হোলো ষাঁড়। উদ্দাম তাদের প্রবৃত্তি, সুস্থ বলবান শরীর, ধ্যান তাদের দুটি জিনিসের উপর থাকে, নানাবিধ ভোগ, আর মৈথুনের ফলে বংশবৃদ্ধি। যে কোন রকমের মেয়েমানুষ, এদের কাছে একেবারে কেঁচো হয়ে পড়ে। এমনি এদের প্রভাব।

আমি : তা হোলে তারা নিম্নস্তরের জীব বলুন,—

তিনি : না, না, তা ঠিক নয়,—ছ-টা পাস করা বিদ্বানের বুদ্ধি দিয়ে এ সব হিসেব চলবে না, এর অন্য দিক আছে। আসলে গরু-সমাজে ষাঁড়ের যে খাতির, যে পদ, মানব-সমাজের মধ্যেও তারা তাই। তারাই মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান বোলে প্রকৃতি তাদের ইচ্ছানুরূপ সকল সম্পদই যুগিয়ে দেন। তাঁর কাছে এরা আদরের ছেলে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি বুঝে নিও। এই যে বাঙ্গলায় এক সময় বহু বিবাহ-প্রথা সমাজে চলেছিল সেটা তাঁরই একটি বংশবৃদ্ধির খেলা। ঐ সময়েই এ দেশে ঐ রকম বহুতর ষাঁড়জাতীয় মানুষ জন্মে বহু ভাবে এই ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বংশের বৃদ্ধি করেছে। ভবিষ্যতে একটা জাত গড়বার জন্যে তিনি প্রথমে ঐ রকমই করে থাকেন। এখন সেটা যেন দোষের মনে হচ্ছে, তখন ছিল গৌরবের জিনিস। তারপর এটা হোলো সৃষ্টির বাইরের দিকের বৃষ, আবার সূক্ষ্মের কথা আছে। এই বৃষ জাতীয় পুরুষই অন্তর ক্ষেত্রে তত বড়। তখন তাদের আর বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যটা থাকে না, সে লক্ষ্য সমাজকে সংঘবদ্ধ করবার দিকে গিয়ে পড়ে। সমাজ উন্নত করবার দিকে যায়। বড় বড় শক্তিশালী দল গড়ে। মৈথুনের ফলে যেটা বংশবৃদ্ধির সহায়তা করতো, সূক্ষ্মভাবে সেটা প্রেমের টানে বহু লোককে তার কর্ম্ম বা ধর্ম্মের প্রভাবে এক করাই হয় তখনকার বৃষ-জাতীয় মানুষের প্রবৃত্তি। এই ভাবে দেখ না কেন জগতে দুই দিকেই বৃষজাতীয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় আছে। এই হোলো তন্ত্রের মতে এক শ্রেণীর মানুষের প্রকৃতি।

আমি : আচ্ছা, এইবার বলুন,—

তিনি : তাইত বলছি,—এখন বুঝে দেখ, নারী প্রকৃতিও ত নানা রকম আছে। এক রকম মেয়েমানুষ আছে যাদের লজ্জা সরম খুবই কম, পুরুষ ঘেঁসা, নিঃসঙ্কোচ ভাব, দৃঢ় শরীর, নারী-সুলভ দুর্ব্বলতা মোটেই নেই। কোন ভাবে তারা চট্ করে গলে না, শাসন মানে না। খুব হুড়ে, যেন মদ্দা ভাব।

আমি : হাঁ হাঁ নির্লজ্জ বেহায়া আমরা যাদের বলি,—

তিনি : হাঁ, তারাই প্রকৃতির প্রিয় সন্তান। তোমাদের চোখ যে অন্ধ, প্রকৃতি জননী বা ভগবানের উদ্দেশ্য তোমরা যে বুঝনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণই হোলো এই যে, যাঁকে তিনি কোন বিশেষ উদ্দেশে সৃষ্টি করেন, যেটি তাঁর বিশেষ যত্নের জিনিস, তাদেরই তোমরা বল খারাপ। তোমরা যেমন নিজেরা পঙ্গু হয়ে পড়েছ—তোমরা চাও ঐ রকম পঙ্গু। আসলে যে শক্তি পরবর্ত্তী জীবনে মহাকর্ম্মে প্রসারিত হয়ে সমাজে অনেক কিছুই করবে, সে শক্তি প্রথম বয়সে কি করে জড়ভরতের মত নিস্তেজ শান্ত হোতে পারে, এটা কি মনে আসে না তোমাদের!

আমি : আমরা চাই নারীকে নারীর মতই শান্ত দেখতে—

তিনি : পোড়াকপাল তোমাদের চাওয়ার, তোমরা চাইচ কোন অধিকারে? চাওয়া মানেটা কি বোঝ? শক্তিহীন না হোলে চাইবার কি আছে কার? তোমরা চাইলেই বা দিচ্চে কে? শক্তিমান যারা হয় তারা চায় না, গড়ে; মনোমত গড়ে নিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সার্থক করে। ফের ওরকম পাগলামো কোরো না আমার সুমুখে—

আমি : আমাদের ধারণা এই যে পুরুষের ভোগের জন্যেই নারী সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং নারীকে পুরুষের মনোমত হওয়া চাই না কি?

তিনি : বাঘ-সিঙ্গিরাও চায় যে মানুষ আমাদের ভোগের বস্তু, তারা সুড়-সুড় করে চুপচাপ চলে আসুক আমাদের কাছে,—আমরা নির্ব্বিবাদে আমাদের ভোগ মিটিয়ে নি। বাজে কথা উঠিয়ো না, এখন আমায় উঠতে হবে সন্ধ্যা হয়ে এলো যে।

আমি বলিলাম : মনে যেটা উঠছে বোলে ফেলাই ভাল, মনে করেই বোলেছিলাম,—

তিনি : মনে যা ওঠে তাই কি বলে ফেলতে হয়? আহাম্মক বনে যাবে যে সমাজে। মনকে এখনও বোঝনি বাছা। মনের পেছনে ছুটে চলেছ এখনও,—

আমি লজ্জিত হইলাম, দেখিয়া তিনি বলিলেন : আসলে যে ভিন্ন নারী-প্রকৃতি আছে দেখেছ ত, তাদের প্রত্যেকেরই এমন বিশেষ বিশেষ গুণ আছে যে, সে ক্ষেত্রে যে জীব জন্মাবে তাদের মধ্যে ঐ সব বিশেষ গুণেরই বিকাশ হবে। তাতে স্রষ্টার উদ্দেশ্যই সফল হবে, তুমি আমি যা হিসেব করবো তা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে সে কথা না কওয়াই ভাল।—বুঝেছ?

আমি : আচ্ছা ধরুন, আমাদের যে ভাবে বাপ মা কন্যা বা পাত্র নির্ব্বাচন করে বিবাহ দেয় তাতে যেমন অনেক সময় মিলনটা ঠিক হয় না দেখতে পাওয়া যায়। আপনাদেরও

তন্ত্রমতে ত স্বাধীন ভাবেই মিলন হয় কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ত ঐ রকমের অমিলও হয়—তাহোলে ঐ স্বাধীন আর পরাধীন হয়ে বিবাহ-মিলনের প্রভেদ রইলো কি ?

যে নরনারীর প্রথম মিলন স্থায়ী নয় সেখানে বুঝতে হবে তাদের দুজনেরই জীবনে অপর নরনারীর সম্বন্ধ ঘটবে যাতে তাদের জীবনে উদ্দেশ্য সফল হবে। তবে এই যে স্বাধীন আর অধীন সমাজের বিবাহ কথা বলচ, আসলে দুই সমাজের যে মিলন তাতেও তাঁর হাত আছে। যেখানে নরনারীর মিলন সেইখানেই তাঁর হাত।

গুপ্ত মিলন বলে একটা মিলন ত দুই সমাজেই আছে—তার ব্যাখ্যা কি ?

সেটার কথা ত বলেছি, পুরুষার্থের জোরে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যে মিলন তার ফল ভাল নয়।

তাতেও ত জীব সৃষ্টি হোতে পারে।

যখনই কিছু সৃষ্টি হয় আর যদি তাতে জন্ম-মৃত্যু থাকে সেখানে তাঁরই হাত আছে বুঝতে হবে। তবে স্বাধীন বা অধীন সমাজ-হিসাবে ব্যবহারে তার ফল আলাদা।

২৫

আমাদের শৈব বিবাহের কথাই চলিতেছিল। আমি বলিলাম: এতটা উদার এই শৈব বিবাহ এ সমাজে ত চললো না। সুধু তা নয় এখনকার দিনে এদেশের খুব কম লোকেই এই বিবাহের কথা জানেন। আমাদের মত বেশীর ভাগ লোকেই জানে না যে শৈব বিবাহ বোলে একটি পদ্ধতি এদেশে আছে। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-কথা আলোচনার পর থেকে এর কথা আমরা জানতে পেরেছি; তার আগে ত শুনিনি জানিনি।

ভৈরবী বলিলেন: জানবে কি করে, বৈদিক আর্য্য হিন্দুর দল যে এ পদ্ধতি নিলে না, তাতে তাদের ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হবে যে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি কেউ এড়াতে পারে, না পেরেছে,—সেই ত হিন্দু বামনদের গড়া সমাজ বর্ণসঙ্করময় হয়ে উঠেছে, প্রকাশ্যে, প্রচ্ছন্নে, কত রকমেই না কত কত সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে, হচ্ছে—কে তার হিসাব রাখছে।

আমি: এটা কি কম আপশোষের কথা, বিবাহের এত নিয়মের বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও এতটা ব্যভিচার! এক একবার মনে হয় যেন এ সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকলে ত আরো এসব বেশী বেশী হবে।

ভৈরবী: এখনও তুমি মেয়েদের কৃতদাসী করে রাখবার মোহ কাটাতে পারোনি দেখছি। এটা বুঝতে পাচ্চ না যে সর্ব্বনাশ কোন পথে এসে তোমাদের পৌরুষকে ধ্বংস করেছে, এত কথার পরও জাতির গোঁড়ামো, আর পুরানো বিবাহ-প্রথা, ভট্টাচার্য্যদের আধিপত্য আঁকড়ে ধরে আছ!

আমি : তা ঠিক নয়, যেটা বেশীর ভাগ পুরানো-তন্ত্রের লোকেরা মনে করেন তাঁদের যুক্তির দিক থেকেই কথাটা বোলে ফেলেছি। আর আমাদের মত লোকের ভিতরে ত কিছু কিছু পূর্ব্ব সংস্কারের বীজ ত রয়েইচে, এক একবার উঁকি মারে বৈকি! দেখেছি যাঁরা সমাজ-সংস্কার চান তাঁরাও স্ত্রী-স্বাধীনতা একেবারে চান না, একটু আধটু চান, স্ত্রীকে বেশী রাশ আলগা দিতে চান না, কারণ—

তিনি মুখের কথাটা কাড়িয়া বলিলেন : পাছে ভ্রষ্টা হয়ে অপরের সঙ্গে যায়,—এইত? ওসব ভণ্ড সংস্কারকামীদের কথা ছেড়ে দাও। অবিশ্বাসের চক্ষে যারা মেয়েদের দেখে জেনে রেখো, তাদের স্ত্রীরাই বেশী অবিশ্বাসিনী হয়। আমি ত নারী, আমার চেয়ে ত তুমি মেয়েদের মনের খবর বেশী রাখো না। মেয়েদের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা বেশীর ভাগই কাল্পনিক, পুরুষের হাতে পড়লেই, বয়সে যতই ছোট হোক আর বিদ্যা বুদ্ধিতে তোমাদের চেয়ে যতই কম হোক, মেয়েরা ঠিক বুঝে নিতে পারে যে কি রকম মানুষের সঙ্গে তাকে ঘর করতে হবে। প্রকৃতি মেয়েদের মধ্যে এই বুদ্ধিটি খুব বেশী করে দিয়েছেন। কাজেই এটা ঠিক জেনে রেখো যে, যে সকল অভাব তার স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ হয় না বা হবার নয় তা সে কোন না কোনও স্থযোগে অন্যের কাছ থেকে মিটিয়ে নিয়ে তার জীবনকে পূর্ণ করবে। প্রকৃতিই তাকে সে সব স্থযোগ এনে দেবেন। আসলে চরিত্র, যেটি অন্তর প্রকৃতি থেকে গড়ে উঠে, তাকে শাস্ত্রবাক্যে বা হিতোপদেশে ঠেকিয়ে রাখবার উপায় নেই।

আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলাম,—তিনি দেখিলেন এবং বুঝিলেন,—পরে বলিলেন : স্ত্রীপরায়ণ কামুক এদিকে হয়ত-দিগ্‌গজ পণ্ডিত যাঁরা, নরনারী সম্বন্ধে ব্যবহারমূলক শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন, নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সব ব্যাখ্যা করেছেন তাঁহাদের সমস্ত বিচারই কল্পনার বশে চলেছে, আসলে অধিকাংশই তার মিথ্যা। নারী-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় ঘটেনি, একজন দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ তার দিক থেকে যেমন দেখায় নারীকে সেই ভাবেই দেখে। নারী-মনের গুহ্য তত্ত্ব তাদের জানবার সম্ভাবনা নেই। একটা দৃষ্টান্ত দি,—এক দল পণ্ডিতের মত যে নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী কাম-রিপুর বশবর্ত্তী। মাপ করে আবার তাঁরা দেখিয়েছেন, কেউ বলেন চারগুণ, কেউ ছয় গুণ, কেউ আট গুণ, কেউ দশ গুণ, এই রকমে গুণের মহিমা দিয়ে নারীর ইন্দ্রিয়-স্থখস্পৃহার পরিমাপ করে দেখিয়েছেন। প্রকৃতি, নারীকে যে ভাবে গড়েছেন সে সত্যের ধার দিয়েও যান নি। আসলে তিনি যদি নিজে অতটা সন্দিগ্ধচিত্ত ও কামান্ধ না হোতেন তাহোলে বুঝতে পারতেন যে পুরুষের ছোঁয়াচ না লাগলে, সুধু সামান্য-ভাবে লাগা নয়, খুব বেশী রকমে না লাগলে নারীর উত্তেজনা ত দূরের কথা উদ্দীপনও হয় না, হোতে পারে না। অপরের ইন্দ্রিয়জ মোহের ব্যাপার দেখলে পুরুষের যেভাবে নিজের শরীরও মনে লিপ্সা জ্বলে উঠে নারীর তা অনেক পরিমাণেই কম হয়। নারী-মন একজনকে গভীরভাবে ভাল না বাসলে সংসর্গ-স্পৃহা তার মনে স্থান পায় না। তারপর যেখানে নারী প্রকৃতিভেদে নানা প্রকার স্বভাবের হয়ে থাকে সেখানে একেবারে নারীজাতি মাত্রেই ঐ প্রকার স্বভাবের

বোলে প্রচার করাটা কত বড় মূর্খতা আর সেটা যে আমাদের ঐ সব পণ্ডিতদের মধ্যে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আমরা তা খুব স্পষ্টই বুঝতে পারি। যাকে নারী অবলম্বন করে তার সুখের জন্যই সে তার দেহ দেয়। এই ভাবটাই নারীর মধ্যে প্রবল, একজনের সুখের জন্য, ভোগের জন্য নারী তার সব দিয়েই সুখী। এই ভাবটা তাদের প্রকৃতিগত থাকে সেই-জন্যই পুরুষেরা তাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করবার সুযোগ পায়, যা অনেক সময় নারীর বিরক্তির কারণ হোলেও ভালবাসার খাতিরে অবাধে ঐ সকল সে সহ্য করে। পীড়ন বা অত্যাচার করবার প্রবৃত্তিই পুরুষেয় বেশী, আর তা সহ্য করবার ক্ষমতা নারীর অনেক বেশী, পুরুষের মধ্যে সেটা বিরল। এ সকল নারী জাতির প্রকৃতিগত গুণ, কটা পণ্ডিত শাস্ত্রকার এর খবর রাখতেন বা রাখেন! অবশ্য তারতম্য আছে এর মধ্যে—কিন্তু সমষ্টিতে যেটা প্রকৃতগত গুণ সেইটাই ত ধরতে হবে। আসলে সংযমই যে নারীর বিশিষ্টতা। তবে সুযোগ পেলে পুরুষেরাও যতটা বিপরীত পথগামী হয় নারীর মধ্যেও তা হওয়া সম্ভব। সে সব ত অসাধারণ ব্যাপারের মধ্যে তার কথা ছেড়ে দিতে হবে।

আচ্ছা, এ যে নারীর প্রকৃতিগত গুণের কথা বোললেন, এ সব কি আমাদের সমাজে নারী-পক্ষে কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে হয় নি?

যখন এ দেশে নারী-পক্ষে কঠিন নিয়ম ছিল না অথবা নারী-পক্ষে যেদেশে কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ নেই, মিলিয়ে দেখবে এই সকল নারীজাতির প্রকৃতিগত গুণ কিনা! যেখানে নারীদের স্বাধীনতা, সেখানে বাইরের কাপড়-চোপড় বদলাবার মত বাহ্য প্রকৃতির কিছু কিছু অদল বদল হোতে পারে কিন্তু যে গুণের জন্য নারী—নারী, সেগুলি ঠিকই থাকে, তিনি যে ঐ রকম করে এই জাতিকে গড়েছেন।

আচ্ছা, এবার বলুন আমাদের সমাজে যে বিবাহের চলন, তন্ত্রমতে সাধন করেতে গেলে এ বিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে সাধন কি হোতে পারবে না!

এখন যদি বিবাহিত কোন ব্যক্তি তান্ত্রিক সাধন হঠাৎ গ্রহণ করে তাকে দেখতে হবে সেই স্ত্রীর উপর তার পূর্ণ ভালবাসা আছে কি না, তার উপর আস্থা রাখা যায় কি না। সে স্ত্রীকে যদি গড়ে নেওয়া যায় তবে সেই স্ত্রী নিয়ে সাধন করবার বাধা কি? আসলে গোড়া থেকেই যাঁরা তান্ত্রিক তাঁরা তন্ত্রমতে স্ত্রী গ্রহণ করবে। পূর্ণ যৌবনা, মনোমত শক্তি, যার সঙ্গে তার ভালবাসা হয়েছে তাকে নিয়ে সাধন চলবে। মোট কথা তন্ত্রে নর-নারীর স্বাভাবিক মিলনের নিয়মই ধরা হয়েছে। হিন্দুদের যে ভাবে বিবাহ হয় সেটা ত স্বাভাবিক নয়। যৌবনের পূর্ব্বে যে বিবাহ, তার অনেক দোষ, কেবল একটা অমানুষিক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে হিন্দুরা তাদের সমাজের মধ্যে এই প্রকার বিবাহের প্রশ্রয় দিয়েছেন। ও বিবাহ সিদ্ধ নয়, অন্তত আমরা মনে করি না। প্রকৃতিও তা করেন না, এখন দেখ না কেন কেমন ভেঙ্গে যাচ্চে। ঠেকাবার শক্তি নেই কারো। এই বিবাহ ব্যাপারে তোমাদের হিন্দু-সমাজের হীনতা মনুষ্যত্বের সীমা বহুকাল থেকেই ছাড়িয়ে উঠেছে। জগতের চক্ষে কতটা হীন ছন্নমতিগ্রস্ত জীব তারা। যে সমাজে বিবাহের পবিত্র

মিলনের ব্যাপারের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ—সে কি একটা সভ্য সমাজ! যে দুরাচারেরা এর প্রশ্রয় দিচ্চে তারা চোর ডাকাতের চেয়ে বেশী দণ্ডনীয় নয় কি?—সত্য বল দেখি? আমাদের বাঙ্গলা দেশে নারীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের নারীর তুলনা কর দেখতে পাবে—কাপড় চোপড়, আচার ব্যবহার এই সব বাইরের যে প্রভেদ তাছাড়া স্বাস্থ্যবান শরীর এ দেশে কত কম। এই যে এদেশে পথে ঘাটে মেয়ে দেখা যায়, তাদের রূপের কথা ছেড়ে দিচ্ছি স্বধু শরীরের স্বাস্থ্যের দিক থেকে কতটা দুর্ব্বল এটা কি এদেশের মরদদের চক্ষে পড়ে না। বড় জাতের দেখাদেখি ছোট জাতেরাও এখানে শিশু ও বালিকা বিবাহ করে নিজেদের জাতের সমাজের সর্ব্বনাশ করচে। মনে কর দেখি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের চাষার একটা সাত আট বছরের বৌ। এ জাতের ছন্নমতির কথা ভাবতে পারো,—ত্রিজগতের কোথাও এমন ধারা আছে? ছি ছি—বল, তোমায় বোলতে হবে তোমাদের হিন্দু সমাজের গৌরব করবার কি আছে!—বল!

দেখিলাম মাতা একটু উত্তেজিত হইয়াছেন,—বলিলাম: মা জগদম্বা কি সন্তানের এতটা দুর্গতি দেখবেন? এর কি কিছুই উপায় করবেন না!

সন্তান হোলে করতেন বোধ হয়,—কিন্তু এরা সব যে সয়তান! সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করবার শক্তি পেয়ে সয়তান হয়ে বসেছে, তাঁকে বা তাঁর সহজ নিয়মগুলি মানছে কোথায়? এরা যে সেই পাপ দানব অহঙ্কারকে নিজের মধ্যে প্রাণ শক্তি দিয়ে তাকে জীবন্ত সংহারের মূর্ত্তি করে তুলেচে, আর প্রত্যেক ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারে বসে যাত্রীদের শাসন করচে। প্রকৃতির নিয়মকে কি ভাবে ভাঙ্গচে দেখতে পাচ্ছ না, অকল্যাণকে কি ভাবে ডেকে এনেছে। তিনি প্রতি হাতেই কতই সামলে নিচ্চেন তা এই মোহগ্রস্ত সমাজের মানুষের চক্ষে পড়চে না। তাঁর নিয়মের পূর্ণ ব্যতিক্রম কোনও সমাজে ঘটতে পারে না।

এই ত আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে তা ঘটে গিয়েছে দেখতে পাই। এ সমাজে ত শিশু বালিকা, কিশোরী বিবাহ ত বহু কাল থেকেই চলচে, কঠিন অবরোধ প্রথা ত আজকালের নয়, এ সব ত অনেক দিনই চলচে এদেশে, হিন্দুরাজ্যের পতনের পর থেকেই ধরতে হবে।

যখন থেকে এ সব হয়েছে তখন থেকে এই তন্ত্র-ধর্ম্ম ও সমাজ তার পাশে-পাশে চলেছিল, সমাজের সর্ব্ব স্তরের মানুষকে পঙ্গু করে নি—এক দিকের রাস্তা খোলা ছিল,—হিন্দুর গোঁড়া-সমাজে কঠোরতার মধ্যে থাকতে পারতো না যারা, শিবের তন্ত্র-ধর্ম্মের আশ্রয়ে তারা মুক্তভাবে জীবন কাটাতে পারতো।

কিন্তু চৈতন্যের সময়ে যে, তান্ত্রিকদের পাষণ্ড বলা হোতো—

ধর্ম্মরাজ্যে তখন যে তিনি নূতন আলো এনেছিলেন। তন্ত্র-ধর্ম্ম প্রথম অবস্থায় যেমন উদার ছিল বামনদের হাতে পড়ে শেষে ত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তাই তখন ব্যভিচার ঢুকেছিল শিব-তন্ত্রের সাধকদের মধ্যে, এ ধর্ম্ম অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে এসেচে তখন। তা ছাড়া ইংরাজেরাও আমাদের অর্দ্ধসভ্য, বর্ব্বর ইত্যাদি বলে থাকে। এক ধর্ম্মের গোঁড়ারা অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে পাষণ্ড

বা বিধর্ম্মী বলেই থাকে, মুষলেরাও হিন্দুদের অবিশ্বাসী পৌত্তলিক কত কি বলে, যেন ভগবৎ-বিশ্বাস মুষলদেরই একচেটে সম্পত্তি।

কিন্তু ইংরাজের আমলে তো তন্ত্রধর্ম্মে ভাটা পড়ে গেছে অর্থাৎ সমাজ-শরীরের ভিতর হজম হয়ে গেছে বোললেই হয়, এখন এই হিন্দুধর্ম্মের পাশাপাশি মুক্ত সমাজ ত কিছু দেখা যায় নি,—

কেন যাবে না, প্রকৃতির সহজ মুক্ত নিয়মের ধারা এ দেশে বা সমাজে একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে বোলতে চাও? প্রথমে কৃশ্চান-সমাজ এলো, তার পর সেই কৃশ্চান-সমাজ যেই বদ্ধ হিন্দু-সমাজের পাশে এসে গায়ে গা দিয়ে দাঁড়ালো অমনি ব্রাহ্ম-সমাজের আবির্ভাব। না হোলে উদার প্রাণ মানুষেরা এদেশে বাঁচবে কি করে! সেই ঘেও পুতিগন্ধময় গলিত সমাজের আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যকামী মানুষেরা, যাদের শক্তি আছে তারা কখনও থাকতে পারে? রামমোহনের সময় পর্য্যন্ত তন্ত্রের প্রভাব দেশের সভ্য সমাজে ছিল। এখনও সে একেবারে নেই তা ত নয়। সুবুদ্ধি হোলে, এর সংস্কার করে নিয়ে সমাজ-জীবনকে বলশালী করা যেতে পারে ত?

করলে ত হয় কিন্তু হিন্দুদের এখনও ব্রাহ্মদের উপর বিদ্বেষ রয়েছে যদিও এখন অনেক হিন্দুরা স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্পে অনেক কিছু উদার ভাব আত্মসাৎ করেছেন। যাহোক আমরা আসল তন্ত্রের কথা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। এখন বলুন, বিবাহের কথা ছেড়ে দিয়ে, তন্ত্রে কিরূপ স্ত্রী নিয়ে সাধন চলতে পারে?

তিনি বলিলেন: আমার যে উঠবার সময় হোল, ঐ যে খণ্ড ভৈরবও এসেছেন।

আমি বলিলাম: তা হোক, আপনি ত কাল চলে যাচ্চেন আজ আমায় আরও কিছু বলে যান।

খণ্ডভৈরব আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: ও আবার তোমায় কি বোলছিল?

তিনি বলিলেন: ও বলে, উনি অনর্থক আমার উপর রাগ করছেন, আমার আসল উদ্দেশ্যই হোলো সাধন, অন্য মতলবে ত আমি এখানে আসিনি,—

বিরক্ত হইয়া মহেশ্বরী বলিলেন: ওর মুণ্ডু সাধন, ছাই-পাঁশ সাধনের উদ্দেশ্য। স্ত্রী ছাড়া সাধন হবে কি করে, তাকে পরাশ্রয়ে ফেলে দিয়ে এসে—

ও বলে যে এখানে আর একটা ভৈরবী যোগাড় করে নিয়ে সাধন করবে—

ক্রোধে আরক্তচক্ষু ভৈরবী বলিলেন: ও ছাগলটাকে বলে এস ও যেন নিজেকে ভৈরব বলে আর কারো কাছে পরিচয় না দেয়। ওর যা মতলব তার নাম ধর্ম্ম নয়, তাকে এর ফলে মহা দুর্গতি ভোগ করতে হবে, সাধনের নামে সে মহাপাতক সঞ্চয় করছে—অনন্ত নরক তার জন্যে তোলা আছে। যাও ওকে এ সব কথা বোলে তার পর তুমি ওখানে চলে গিয়ে উদ্যোগ করে রাখগে, আমি দু' এক দণ্ড পরে যাচ্চি।

তিনি চলিয়া গেলেন।

আমার দিকে চাহিয়া ভৈরবী বলিলেন : দেখ, এই সব জানোয়ার, মানুষ হয়ে এসেও ঠিক সেই জানোয়ারের মতই চল্‌ছে। ওর ধারণা হয়ে গেছে যে যখন তখন যথেচ্ছা শক্তিকে ত্যাগ করা যায়। এরাই ত ব্যভিচারী—এদের জন্যেই ত তন্ত্রের এমন মহৎ ভাব সাধারণের কাছে এতটা ঘৃণ্য হয়ে পড়েছে।

আমি বলিলাম : এই লোকটি যে সব ছেড়ে পালিয়ে এসেছে এর মূল কারণ কি? অবশ্য ছেলেপুলে হোলে তাদের মানুষ করবার ক্ষমতা নেই দেখে কারো ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সরে পড়াটা সব সমাজেই একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে আছে—আমরা তা দেখতে পাই,—কিন্তু এ লোকটি যে অন্যরকম বোলছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।

তিনি বলিলেন : একরকমের মানুষ আছে দেখ নি, যারা সংসারের কোন দায় বা বোঝা ঘাড়ে নিতে পারে না অথচ নানাফুলের মধু পান করে বেড়াবার প্রবৃত্তি তাদের প্রবল,—এরা সেই লোক। এদের মাথায় এটা আসে না যে শক্তি থাকতে কর্ত্তব্য পালন না করলে সেটার প্রত্যবায় আছে, একটা দণ্ড আছে যা এড়ান যাবে না। মেয়েমানুষ নিয়ে ভোগ করতে পারবো কিন্তু সন্তান হোলে লালন-পালন করতে পারব না। ধর্ম্ম বোলতে, তাতে যেটুকু সুখ-সুবিধা আছে তারা সেটুকু নেবে, অসুবিধা হোলেই সে ধর্ম্মের সঙ্গে তার বনলো না।

আচ্ছা তান্ত্রিক হোলে কি অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা আছে?

টাকা উপার্জ্জন এখনকার দিনে না করলে সন্তান প্রতিপালন, সংসারে সকলের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে কি করে?

আমি বলছি তন্ত্রমতের সাধন করতে গেলে কি অর্থোপার্জ্জন সম্ভব, তা যদি হয় তার বৃত্তি হবে কি?

সব ধর্ম্মের মধ্যেই দুটি শ্রেণী দেখা যায়, প্রথম যারা ধর্ম্মকে মুখ্য বলে ধরেচে,—ঐকান্তিকতা যদি থাকে আর যৌবনের স্বাভাবিক ভোগলিপ্সার প্রবল আকর্ষণ না থাকে তাহোলে অর্থ উপার্জ্জনের প্রশ্ন উঠে না, তারা নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে টুকু, তা সহজেই পায়,—আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বা সাধক যারা তাদের ধর্ম্ম মুখ্য নয় তাদের ধর্ম্মও চাই, অর্থও চাই। তারা শক্তি নিয়ে সংসারী হয়ে পড়ে। ছেলেপুলে হয়, তাদের ভরণপোষণের জন্য কোনও একটি সৎবৃত্তিকে অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে নেয়। অর্থটা ভাগ্যের ফল, সম্পূর্ণ পুরুষার্থের ফল নয়,—আমি ত অনেক তান্ত্রিক দেখেছি যারা ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করছে, মহাধনবান, বিস্তর লোককে খেতে পরতে দিচ্চে, আবার সাধনও তার বেশ ভালই চলচে। সব ধর্ম্মের মধ্যেই এটা আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : এই যে লোকটির কথা হচ্চে যার প্রতি আপনি এতটা বিরক্ত হয়েছেন তার কি করা উচিত ছিল, কি করলে—

হাঁ, হাঁ, বুঝেছি তোমার কথা,—ও যদি যথার্থ ধর্ম্মকে রাখতে চায় তা হোলে নিজ শক্তিকে নিয়ে দুরবস্থার মধ্যে থেকেই ওর সাধন করা উচিত, তাতে ও যেটা এড়াতে চাচ্ছে, ঝঞ্ঝাট বোলে ছাড়তে চাচ্ছে সে সব গোলযোগও থাকতো না, সব কেটে যেতে পারতো, কারণ তা হোলে ওর

শক্তি ওর সহায় থাকতো, দুজনের মনোবলে দুরবস্থা কাটতে বেশী সময় লাগতো না। এখন তাদের ছেড়ে ও করলে কি, নিজের শক্তি, যে সহায় হোলে তার ইষ্টলাভ সহজ হোতো তাকে ও শত্রু করলে,—তাতে ও নিজেই সর্ব্বনাশের পথে এগিয়ে গেল, বিপদ ডেকে আনলে। এটা ও বুঝলে না!

আমি বলিলাম: স্ত্রী বা শক্তির সঙ্গে মনোভঙ্গ হোলে ত আপনাদের ধর্ম্মে শক্তিত্যাগের বিধি আছে—

মনোভঙ্গ একজনের হোলেই ত হয় না, দুজনেরই হওয়া চাই তবেই না তাতে ভাল হবে? না হোলে একজন স্বার্থপরতন্ত্র হোয়ে একজনকে ত্যাগ করবে, যাকে ত্যাগ করতে চাইচে সে তাকে এখনও অবলম্বন করে আছে, ভালবাসা দিয়ে বেশ জোরেই টেনে ধরে আছে, তুমি ছাড়লেই কি সে ছাড়া সাব্যস্ত হবে? জগদম্বার হিসেবে ত ও রকম গোঁজা-মিলন নেই, তাঁর সহজ, সরল, সোজা হিসেব যে! ও বেটা আসলে ভণ্ড বদমাস, আমি ওকেও জানি ওর শক্তিকেও জানি। সে বড় ভাল মেয়ে, সে ওকে ভালবাসে, ছেলে-পুলে নিয়ে ওর সঙ্গে কত কষ্ট পেয়ে ঘরও করে এসেছে এতদিন। পেট ভরে খেতে সে পায় নি, পরতে ভাল কাপড়ও কখন পায় নি, ওর কিন্তু রোজ মদ চাই, মাংস চাই আরও সব কত কি চাই। এক জমিদারের গোমস্তার কাজ করতো, একজন মহাজনের দোকানে হিসেব-পত্তর করে দিতো, তাতেও দশ টাকা পেতো। ঐ রোগ ওর কেবল, আত্মসুখসর্ব্বস্ব। আর কারো দিকে দেখবে না। এদের ধর্ম্মলাভ কি করে হোতে পারে, একবার বুঝে দেখ।

এইতেই সন্দেহ হয়, প্রকৃতি মা, মেয়ে পুরুষের মধ্যে মিলনের যোগাযোগ সব সময় ঠিক মত ঘটান না। এরকম মিলনের বৈষম্য আমি বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি। বেশী কথায় কাজ কি—আমার পিতামাতার মধ্যেই দেখেছি। মা আমার শান্ত ধীর প্রকৃতি, মুখে কথাটি নেই আর বাবা একেবারে চণ্ড ভৈরব, দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি।

আমাদের চক্ষে বিষম লাগতে পারে তাঁর ব্যবস্থা ঠিকই আছে। এর তত্ত্ব সব খুঁটিয়ে বোলতে গেলে একখানা মহাভারত হয়ে পড়বে—তবে মোটামুটি সংক্ষেপে এটুকু বুঝে রাখো, এই রকম বিষম মিলনের মধ্যে থেকেই অনেক সময় প্রকৃতি তাঁর মনোমত জীব সৃষ্টি করেন। এরকম সব জাতের মধ্যেই আছে। জাতসর্ব্বস্ব হিন্দুদের মধ্যেও যেমন আছে আর একজাত মুষলদের মধ্যেও আছে, আবার খৃষ্টানদের মধ্যেও আছে, যেখানে যেখানে মানব-সমাজ, সেখানেই এরকম মিলন বৈষম্য দেখতে পাবে তবে খুব বেশী নয়।

আচ্ছা স্ত্রী-পুরুষের সকল মিলনের মধ্যেই যদি তাঁর হাত থাকে তা হোলে আমাদের হিন্দুদের বদ্ধ সমাজই বা কি আর আপনাদের তন্ত্রমতের মুক্ত সমাজই বা কি—ফল ত দুয়ের একই রকম হচ্চে!

তা কি করে হচ্চে,—তন্ত্রমতের বা অন্য কোনও মুক্ত সমাজের মানুষ যারা তাদের মধ্যে আত্মার প্রাধান্য আর পচা হিন্দুসমাজে মানুষের মধ্যে জাতের প্রাধান্য। একটিতে আত্মার

নির্দ্দেশই হোলো অবলম্বন, মধ্যে আর কিছু নেই অপরটিতে জাতটাই হোলো বড় বা সেই সমাজে মানুষের প্রধান অবলম্বন, দুটি এক হোলো কিসে? অন্যান্য স্বাধীন সমাজে মানুষেরা আত্মধর্ম্মী হয়ে থাকে আর তোমার হিন্দু-সমাজের মানুষেরা পচা সংস্কারে পূর্ণ জাতিধর্ম্ম আঁকড়ে আজও হাবুডুবু খাচ্চে আর বলচে আমাদের পরকালে স্বর্গ হবে। যাদের ইহকালে স্বর্গ নেই, পরকালে তাদের স্বর্গ কোথায়?—জাত বড় না আত্মা বড়? বল না কোনটায় বিবেক-চৈতন্য সাড়া দেয়?—

তাই ভাবি কি করে আমাদের এতটা অধঃপতন হোলো? পূর্ব্বে যাঁরা জাতিগত পবিত্রতা রাখবার জন্য এ ভাবে সমাজকে বেঁধে গিয়েছিলেন, তাঁরা কি এর পরিণামটা ভাবেন নি?

এর মূলে তখন স্রষ্টার একটা অভিপ্রায় ছিল। জাতিগত পবিত্রতার ধারা, বংশানুক্রমে বজায় রাখবার লক্ষ্য যাঁদের ছিল তাঁরা সভ্যতার উচ্চস্তরেই উঠেছিলেন। সহজেই বুঝা যায় শেষে তাঁদের মনে একটা সন্দেহ স্থান পেয়েছিল যে আমাদের বংশধরের মধ্যে কালে এতটা পবিত্রতা হয় ত থাকবে না। তাইতেই উচ্চ জাতের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের বা বিধি নিষেধের এতটা কড়া বাঁধন। তখনকার আদর্শ ধরে পবিত্রভাবে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে শ্রেষ্ঠভাবে জীবন-যাপন করবেন যাঁদের এই অভিমান ছিল, তাঁরা সেই মতই জীবন কাটিয়ে গেছেন। জীবের এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান পরমেশ্বরের ইচ্ছায় শক্তিমান হয় যতক্ষণ তার মধ্যে পবিত্রতা থাকে, এই অভিমান, সমষ্টির মধ্যে প্রসারিত হয়েই না তখনকার ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিকে মানব-সমাজে জ্ঞানে গুণে এতটা বড় করেছিল! যখন পূর্ণ শক্তির বিকাশ তাঁদের মধ্যে হয়েছিল, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে দীপ্ত জাতির কোথায় যে একটা ফাঁক আছে যার মধ্যে দিয়ে অধঃপতন এসে জাতিগত গৌরবকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে তা তখন ত ধরা পড়েনি।

এ একটি অপূর্ব্ব রহস্যের মত, একটি জাতি যেখানে উচ্চ আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠছে তাতেও তাঁর ইচ্ছা বা শক্তি কাজ করচে আবার তার ধ্বংসের বীজও সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজ করচে, যাতে সে জাতি কালক্রমে বিপরীত ভাবে পরিণত হয়ে গেল,—এর মধ্যেও তাঁর ইচ্ছাশক্তি কাজ করলে, অসম্ভবকে সম্ভব করে দিলে। চমৎকার ব্যাপার তাঁর এই ইচ্ছাশক্তির খেলা।

তাইতো চমৎকারই লাগে, প্রথমে বড় ধাঁধায় পড়তে হয়। কিন্তু এর মধ্যে কত কি ব্যাপার ঘটে যায় সে দিকে ত লক্ষ্য থাকে না! যে জাতটি গড়লো, উন্নত হোলো, তার সভ্যতার মহিমা, পরিণতি দিক্‌ময় ছড়িয়ে পড়লো, বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তাঁদের কাজ ত এ জগতের মাঝে রয়ে গেল। তাঁদের জ্ঞান, কর্ম্ম, মনের বিকাশ কোন্ কোন্ দিকে প্রসারিত হয়েছিল, সভ্যতা-অভিমানী জাতটির উন্নতির ছাপ, কত দিকে রেখে গেছে, এ সব যখন দেখি তখন বুঝতে পারি, সে জাতির স্বার্থকতা কোনখানে অথবা এই সকল কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের জাতীয় জীবনকে সার্থক করে গেছেন। তাতেও ত তাঁর অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়েছে!

তা হোলে জাতি ত আছে, আর তাঁরই ইচ্ছায় গড়ছে; তা হোলে আমাদের হিন্দুদের এখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতের মধ্যে এমন দোষ কি হোলো ?

একধর্ম্মী মানুষ সমষ্টিগত হোলে এবং এক সমাজগত হোলে জাতি হয়। তার মধ্যে উচ্চ জ্ঞান, শিক্ষা বা উৎকর্ষ প্রাপ্ত মস্তিষ্কবান মানুষের বংশ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ভাবের নানা স্তরের মানুষের বংশ থাকে। আবার সাধারণ মানুষের চেয়ে যারা ছোট অর্থাৎ বৃত্তিতে ছোট ছোট কাজ করে, বিদ্যা বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষও থাকে। সকল স্তরের মানুষই একটি জাতির মধ্যে থাকে ত! স্থধু থাকা নয় সে জাতির মধ্যে এই যে মহান্, সর্ব্ব উচ্চস্তরের মানুষ, তারপর মধ্যস্তরের সাধারণ মানুষ, তারপর নিম্নস্তরের মানুষ, সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে একটি সংযোগ সূত্র আছে বা থাকে, তাতে জাতির শরীরে সকল স্থানেই শক্তিপ্রবাহ অপ্রতিহত চলে আর জাতিটি সর্ব্বস্থানেই সেই শক্তি অনুভব করে যেন একটি বিরাট শরীর। জীবিত স্বাধীন সকল জাতের মধ্যে এটা অনুভব করে। একটা জাতির সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে সকল স্তরের মানুষের আদান-প্রদান যোগাযোগ আছে—এ পোড়া হিন্দু-সমাজে তা নেই, ছোট বড়র যোগ নেই। এই দেখ না, যারা আগে সেপাই ছিল, সৈন্য হয়ে দেশরক্ষা করতো, সেনা পরিচালনা করতো এই চাঁড়াল ডোম নমঃশূদ্র বাগ্দী তেওর এদের সঙ্গে বামন কায়েত বড় জাতের মোটে যোগ নেই, কি একটা তুচ্ছ সূত্র বা ছুতো ধরে তাদের 'পঞ্চম' বলে দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে। অঘোরী বাবা বলেন কি জান ?

আমি বলিলাম: কি বলুন না,—

অঘোরী বলেন, এরপর দিগ্‌গজ পণ্ডিত আচারী বামন কায়েতেরা, চণ্ডাল, বাগ্দীদের পায়ের ধুলা নেবে।

শুনিয়া আমার মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল,—তা হোলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আর একবার আসতে হবে, তাহোলে ওটা সম্ভব বটে।

ভৈরবী বলিলেন: নাঃ তাঁর দরকার হবে না, তা ছাড়া চৈতন্য ত রাষ্ট্রশক্তির প্রাণসঞ্চার করতে আসেন নি, তন্ত্রধর্ম্মের ব্যভিচারের প্রতিক্রিয়ার ফলে আসল ধর্ম্মমার্গে প্রাণসঞ্চার করতে এসেছিলেন, প্রেমভক্তির মহিমায় মানুষ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে এক হোতে পারে তাই দেখাতে এসেছিলেন। তা ছাড়া মহাপুরুষেরা দুবার কেউ আসে না। প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিলোম নিয়মের কথা জান ত,—যার জন্য একস্তরের মানুষকে ছোট বা হীন বলে আর একস্তরের মানুষে মনে করেছে,—এ অভিনয়ের পালা ওল্টাবে নাকি ? যখন তা হবে তখন আবার বামনে শূদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবে। অঘোরী সেই কথাই বোলছিলেন, ওঁরা অনেকটা দেখতে পান যে।

পুনরায় বলিলেন: আমরা যাকে ছোট জাত বলি তাদের মধ্যেও কত মানুষ বিদ্যা বুদ্ধি আচারে বেশ শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠচে, সমাজে বাইরে তাদের সঙ্গে মেলা মেশায় দোষ হয় না,—ধোপার ছেলে অফিসের বড়বাবু হোলে, ছেলের চাকুরীর জন্যে বামন জোড়হাত করে তার কাছে দায় জানাতে পারবেন কিন্তু সকালে উঠে ধোপার মুখ দেখলে তাঁর সর্ব্বনাশ হবে,

এতে কি এটা বুঝা যাচ্ছে না যে আচার এবং বিদ্যাই এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, এই আচার ও বিদ্যার অভাবই তাদের ছোট করে রেখেছে বড় জাতের কাছে ? তাদের মধ্যে বিদ্যার প্রসার হোলেই তারা বড় হবে। কিন্তু এদেশে বড় জাতের মধ্যে এ বোধ জাগে নি। তারা এতটা জড় বুদ্ধি, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নজীর বার করছে যে, ডোম হাড়ি মুচি ধোপা এদের ভগবান ছোট করে সৃষ্টি করেছেন তাই এরা ছোট, আমরা কেন তাদের সঙ্গে মিশবো তাতে আমরা ছোটই হয়ে যাব। এই যে বুদ্ধি এ বুদ্ধির মূলে একটা ধর্ম্মহীন, নীচ মনোভাব, আর ভগবানের সম্বন্ধে কতবড় মিথ্যা ধারণা রয়েছে এইটিই বুঝা যায় না কি ?

এখন দেখুন আমাদের দেশে অনেকেই অসবর্ণ বিবাহ করছে, হিন্দু সমাজ তা মেনে নিতেও পারছে না ত্যাগও করতে পারছে না। সমাজকে সংস্কার করে, তার প্রসারতা বাড়াবার দিকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টাও চলচে না, ফলে একটা মহা অশান্তি এসে পড়েছে চারিদিকেই।

প্রকৃতি থেকে যেটা ভাঙ্‌চে, মূঢ় বুদ্ধি মানুষে সেই প্রাণশক্তিহীন পুরানো রীতিই জোর করে আঁকড়ে ধরে নিজেদের অবস্থা আরও হাস্যাস্পদ করে তুলছে পাঁচজনের কাছে। এ সব দেখে শুনে তবুও যদি না বুঝে তবে ত ঘা খেতেই হবে, উপায় কি ? স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যদি সত্যকার ভালবাসা হয়, প্রকৃতি সেখানে জাতধর্ম্ম এসব দেখবেন না। তিনি শুভটাই দেখবেন। শুভ বা কল্যাণ যদি তার মধ্যে থাকে ত তিনি দম্পতিকে সে মিলনে সাহায্য করবেন। ভালবাসাটি সত্য হওয়া চাই। আরও এক রহস্য এর মধ্যে আমরা দেখেছি,—প্রেমে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে ঘর সংসার কর, সৃষ্টি বৃদ্ধি কর তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই কিন্তু জাত ভাঁড়িয়ে যদি সমাজকে প্রবঞ্চনা করতে যাও তবে তাকে ধরে সমাজের কাছে মুখ পুড়িয়ে দেবেন। প্রকৃতি জননী সন্তানের সব অত্যাচার সহ্য করতে পারেন কেবল ঐ ভাণ্ডামোটা ছাড়া। ভাণ্ডামো অর্থে সত্যের অপলাপ। ফাঁকা জাতের অভিমান যেটা, সেটা ত আসলেই মিথ্যা। অভিমান সেইখানেই সত্য যেখানে জীবনে পবিত্রতা থাকে। আমি সৎ হব, শ্রেষ্ঠ হব এ অভিমান প্রকৃতি সুধু সহ্য করা নয় তা পূর্ণ করতে তিনি দুহাতে সহায়তা করবেন, কিন্তু যেখানে অন্তরে গলদ পুরে রেখে বাইরে শ্রেষ্ঠত্বের ঢং দেখিয়ে লোক ঠকাবার মতলব থাকে সেখানে তাঁর প্রতিহিংসাই কাজ করবে, সমাজের চক্ষে তাকে এমন হীন, হেয় করে দেবেন যা কোন কালেই সে কল্পনাও করে নি। এর দৃষ্টান্ত চারিদিকেই দেখতে পাবে ; সুধু রূপের খাতিরে ভোগলালসা চরিতার্থ করবার জন্য বিবাহ ব্যাপারে নয়, গৃহ বা সমাজের সর্ব্ববিধ ব্যাপারের মধ্যেই তাঁর এই বিচার দেখতে পাবে। ব্যষ্টিভাবে, সমষ্টিভাবে সকল দিকেই ভণ্ডামো বা আত্মপ্রবঞ্চনার উপর তাঁর তীব্র দৃষ্টি আছে।

আমি : এখনও আমরা বুঝতে পারি নি যে শিব কি বস্তু আমাদের দিয়ে গেছেন !

আসল তন্ত্রধর্ম্মে বামনদের গড়া এখনকার তন্ত্রশাস্ত্রে নয়, শিবের রাজত্বে এ রকম কেলেঙ্কারীর পথই মেরে দিয়েছে, শিবের সাঙ্গোপাঙ্গ কারো বামন কায়েতের বালাই নেই ; প্রেমের

রাজত্ব একটি, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে আসলে তফাৎ নেই। জাত হারালে যেমন বৈষ্ণব হয়, জাত হারালে সেই রকম তান্ত্রিক বা যথার্থ শৈব হয়।

আমি বলিলাম : সেই রকম জাত হারালে তবে ব্রহ্মজ্ঞ বা যথার্থ ব্রাহ্মণও হয়।

ভৈরবী বলিলেন : এখনকার এই হিন্দুজাতের বামনের সঙ্গে ভদ্র চাঁড়ালের বা পঞ্চমের পার্থক্য কি? ধর্ম্ম কোথায়? কার কাছে? ব্রহ্মকে জানলে যে ব্রাহ্মণ হয় সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে হিন্দুজাতের বামনের এখন তুলনা করলেও পাপ হয় যে!

আমার প্রশ্ন ছিল—কি রকম স্ত্রী হোলে তাকে নিয়ে তন্ত্রের সাধন চলতে পারে? এর উত্তর আমি এখনও পাই নি। কিন্তু এখন আমি এসব তন্ত্রের কথা শুনবো না। আর একটা কথা আমাকে বলবেন?

তিনি বলিলেন : এখন উঠবার সময় হয়ে এসেছে, কি বলবে চট্ করে বল, গুরুতর কথা হয় ত থাক।

আমি বলিলাম : গুরুতর আমার পক্ষে ত বটেই তবে আপনাদের পক্ষে না হোতে পারে। আমার কথা এই যে, আমাদের এই হিন্দুসমাজ কি এইভাবে ধ্বংসের পথেই যাবে, এ সমাজ কি আর কখনও শক্তিমান ও উন্নতিশীল হবে না? আপনারা কি মনে করেন, আপনাদের দূরদৃষ্টি ত আছে!

তিনি : আত্ম প্রবঞ্চনা আর শঠতাই যে এখন সর্ব্বস্তরে প্রবল হয়ে উঠেছে, টাকাকে আত্মার চেয়ে, ধর্ম্মের চেয়ে বড় করে ধরেচে প্রত্যেকে, আর ভূয়ো জাতের গোঁড়ামী আঁকড়ে ধরে আছে, সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকেরা। এখনও ছোট জাত বোলে অবজ্ঞা করে চাষা-ভূষোদের রক্ত শোষণ করে নিজেরা পুষ্ট হচ্চে,—সর্ব্বনাশের সকল লক্ষণই ত বর্ত্তমান, আর ধ্বংসের বাকী কি!

আমি : সকলেই ত আর ওরকম নয়,—অনেকেই ত এখন দেশের এ অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

তিনি : কটা? সেই গোঁড়া সনাতনী ভট্টচাজ্জির দল আর তাদের যজমান যত কেরাণীকুল, আর দেশের ভোগী বিলাসী গরীবের অর্থশোষক জমীদারকুল, দাসত্ব ছাড়া যারা অন্য উপায়ে উন্নতির কল্পনাও করতে পারে না তারা থাকতে কিছুই হবে না। যেখানে গুরু-পুরুত এসে আশীর্ব্বাদ করে—তোমর একটি চাকরী হোক,—তারা থাকতে কি করে সমাজ শক্তিশালী হবে বল দেখি?

কথাগুলি বলিয়া তিনি একটু অন্যমনস্ক হইলেন বোধ হইল, তারপর আবার বলিলেন : দেখ, এই সেদিন এখানে আসবার আগের দিন কলিকাতায় একদিন ত ছিলাম, কি দেখলাম জান? পটলডাঙ্গায় কলেজের দিকটায় গোলদিঘির মধ্যে যত সব জোয়ান ছেলেরা বেড়াচ্চে। লম্বা কোঁচা ঝুলচে, কেউ আবার সেটাকে বাঁ হাতে মুঠো করে ধরেছে, কারো-বা পকেটের মধ্যে পোরা আছে, ডান হাতে সিগারেট, ঝোলা পাতলা জামা, সকলেরি প্রায় গলা সরু, রোগা,

কণ্ঠার হাড়, বুকের পাঁজর কতকটা দেখা যাচ্চে,—মাথার চুল বড় বড় পিছন দিকে ফেরানো, কারো বা তোলা, গোছাসুদ্ধ একেবারেই তোলা, গোঁপ-কামানো, ক্ষীণ শরীর, হাতে ও কপালের শির বেরুনো, মাঝে মাঝে মাথা দোলাচ্চে আর চুলগুলো ছপ ছপ করে যেমন পাট করা ছিল ঠিক তেমনি পড়ে যাচ্ছে, কেবল সিঁথিতে সিঁদুরটা নেই—না হোলে ঠিক মেয়েমানুষের মত চেহারা। তারা সব হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্চে যেন ক্ষয়রোগের আসামী। তারাই ত ঐ সব ছেলে,—পরস্পর কি সব অসভ্য সম্ভাষণ হাস্য পরিহাস করছে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কানে শোনা যায় না, এরা,—

আমি বলিলাম :—এখন যেন একটু ফিরেছে, তবে ভবিষ্যতে,—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন : আহা হা,—বাছা এটা বুঝছো না এরাই ত ভবিষ্যৎ বংশের জন্ম দিচ্চে বা দেবে ? এই দুর্ব্বল, জড়, তরল বুদ্ধি, বিকৃত শরীর বাপ মার ছেলেরা কি এদের চেয়ে ভাল হবে ?—কি করে তা হবে বল দেখি ?—

কিন্তু দেখা যায় না কি, এর মধ্যে কেউ কেউ তাদের অবস্থার কথা বুঝেছে, আর উন্নতির চেষ্টায় লেগে গেছে,—শোচনীয় দুরবস্থার জন্য দুঃখ বোধ এসেছে, তারা ত উন্নত জীবনই চায়,—

হাঁ, যারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছে তাদের বংশধরের দ্বারাই কল্যাণ হবে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা কতটুকু,—সাত কোটীর মধ্যে হিসাব কর দেখি বাছা, এতই কম যে চোখেই পড়ে না, গণনাতেও আসে না। মনে কর সৎ প্রবৃত্তি, শক্তিমান শরীর মন, উন্নতপথে প্রবল গতিবিশিষ্ট ছেলের দল কতটা পরিমাণে বাড়লে তবে সমাজ জাগ্রতভাবে ক্রিয়াশীল হবে,—কে জানে কত দিনে হবে! যখন ঐ সব ক্ষয়াক্রান্ত শরীর ছেলেদের দেখি, তারা যতই পাশ-টাশ করুক বাপু আমার ভয় হয় যে ভবিষ্যতে তারা দাঁড়াতে পারবে কি করে ? তাদের বিবর্ণ মুখ-চোখের চেহারা দেখে মনে হয় অপরিমিত শক্তি ক্ষয় হচ্চে। না হোলে এতটা বিবর্ণ হবে কেন, এতটা অল্প বয়সে বাড় কমে যাচ্ছে কেন ? তাদের বাপ মা বা শিক্ষকেরাও এসব কি দেখেন না,—পোড়া-কপাল! দেশের ছেলেরা হোলো দেশের প্রাণ, তাদের যদি শরীর মন প্রকৃতি ভাল রকমে না গড়ে তা হোলে কি করে কাজ হবে। ভগবানের অভিপ্রায় যে কি ঐ মেঘে-ঢাকা আকাশের মতই!

২৬

মহেশ্বরী মাতা আজ চলিয়া গেলেন। এই যে কয়দিন তিনি এখানে ছিলেন, প্রত্যহ আমার সঙ্গে দেখা না হোক তাঁহার অবস্থানের সময়টি আমি একটি বিশেষ আনন্দ এবং উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছিলাম। আজ মনটা খারাপ ছিল না বটে কিন্তু তাঁহার অভাবটাই বিশেষ মনে হইতেছিল। ঘর ছাড়িলেও মায়া মমতা ছাড়ানো যায় না। স্থানের উপর মায়া, ব্যক্তি বিশেষের উপর মায়া বা মমতা এগুলি মানব-প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধা। খণ্ড ভৈরব আজ যাইবার সময় বলিলেন : আপনার কথা আমাদের মনে থাকবে।

অঘোরী বাবার কাছেই আজ যাইব ঠিক করিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহরে একবার ঘুরিয়া আসিলাম, তাঁহাকে শ্মশানের দিকে দেখিতে পাইলাম না, ঘরের দিকে গেলাম, সেখানেও নাই। গেলেন কোথা? এদিক ওদিক দেখিলাম—শেষে ফিরিয়া আসিতেছি। ডোমেদের মেয়ের দল জঙ্গলে ঘুরিতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের গানের রেশ বহুদূরাবধি ভাসিয়া যাইতেছে। কালো রং বটে কিন্তু তাহার মধ্যে রূপ আছে, আকর্ষণও আছে। তাহাদের মাথায় কাপড় নাই, নিঃসঙ্কোচ ধীর এবং স্বচ্ছন্দ গতি, তাহাদের দেখিতে ভাল লাগে। এদিক ওদিক চাহিতেছে, অভীষ্ট বস্তু অন্বেষণে চঞ্চল নয়ন, তাহাতে তাহাদের গানের ছন্দ ভঙ্গ হইতেছে না। প্রকৃতির কোলে ইহারা মানুষ তাই ইহাদের আনন্দের অভাব নাই,—সভ্য জগতের অভাব, উচ্চাভিলাসের কোন ধার তাহারা ধারে না, তাই বোধ হয় তাহাদের বদনে অবসন্ন ভাবের ছায়া নাই। দুই একটি দিগম্বর শিশুও তাহাদের দলে আছে। আরো আছে কৌপীনধারী দুই তিনটি যুবক, আগে আগে খুব লম্বা ছিপের মত হাতে, বোধ হয় পাখি ধরিবার আটা-কাঠি। বৃক্ষ-পত্র-শাখা সমাচ্ছাদিত পক্ষিনীড় অন্বেষণে ব্যস্ত নয়ন তাহাদের, উপর দিকেই ঘুরিতেছে। মেয়েরা কাঠ কুড়াইতে এবং গোময় সংগ্রহ করিতেই আসিয়াছে—দুই তিন জনের হাতে টুকরীও রহিয়াছে দেখিতেছি। তাহারা গান করিতে করিতে বনান্তরালে লুকাইলে আমি কতক্ষণ পর নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

মন আমার আজ যেন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে, কাহারও সঙ্গ কামনা করিতেছে, কিন্তু এমন কেহ এখানে নাই যাহার কাছে যাইয়া দুদণ্ড আলাপ করি। যারা আছে অনুকূলানন্দ প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে ও বসিতে প্রাণ চায় না কারণ তাঁহাদের চিন্তা, উদ্দেশ্য এবং সাধন-মার্গ পৃথক। একবার মনে হইল খণ্ড ভৈরব কাল যে ব্যক্তিকে ঐ ছোট সাধন-মন্দিরে দিয়া আসিলেন তাহার কাছে যাই। কিন্তু তাহার যে সব গুণের পরিচয়-কথা শুনিয়াছি, তাহাতে তাহার সঙ্গ করিয়া যে কিছু শান্তি পাইব তাহা মনে হইল না। কি করি, কোথায়ই বা যাই, একটু ওদিকে শালবনের মধ্যে ঘুরিয়া আসি।—চলিলাম সেদিকে। প্রায় এক দেড় পোয়া পথ চলিয়া বনের ধারে পৌঁছিলাম। দেখি আমাদের ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য্য এক খোন্তা হাতে বনের ধারে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৌরবর্ণ বেশ সবল যুবক, কালীমাতার নূতন পূজারী,—কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সামান্য রকম আলাপ হইয়াছিল। এখন খোন্তা হাতে এখানে কি মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন: কিছু তালমূলী সংগ্রহ করিবার জন্যই আসিয়াছি,—আপনি এখানে যে।

আমি বলিলাম: কোনও উদ্দেশ্য নাই, এমনিই। আপনাদের এখানে এত দিন এসেছি, নিকটেই এমন সুন্দর একটি শালের অরণ্য, কখনও দেখিবার সৌভাগ্য হয় নি, আজ তাই ভাবলাম দেখে আসি। তিনি প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন: বেশ, বেশ, চলুন দুজনেই আজ বন ভ্রমণে যাওয়া যাক। আপনি গাছ-গাছড়া চেনেন কি? আমি বলিলাম: যে দেশের লোকে ধান গাছে কড়িকাঠ বিশ্বাস করে আমি সেই দেশের লোক—

জানেন ত। তিনি হাসিয়া বলিলেনঃ চলুন আমি যেগুলি জানি আপনাকে দেখিয়ে দি।—



—কি আনন্দ এই শাল বনের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। শালগাছগুলি খুব বড় হইতে পায় না, বিশ পঁচিশ ত্রিশ ফুট হইলেই কাটিয়া চালান দেয়। এখানে দেখিলাম পাঁচ ছয় ফুট হইতে প্রায় ত্রিশ ফুট গাছ। এমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন জঙ্গল ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। ঘন গাছের সার পর পর চলিয়া গিয়াছে বহুদূর—অন্ধকারের মধ্যে যেন তার শেষ। এই সকল সরল ঋজু বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট বনৌষধি সকল। তার মধ্যে তালমূলী, শতমূলী, দশবাহু চণ্ডী, অনন্ত মূল প্রভৃতি অনেক প্রকার গাছ ভট্টাচার্য্য আমায় দেখাইলেন। শতমূলীর উপরের দিকটা সামান্য একটু লতার মত, যেন মাটির উপরে ছোট একটি লতানে গাছ রহিয়াছে। খোন্তা দিয়া ভট্টাচার্য্য খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটির তলায় বহুতর লম্বা লম্বা মূলগুচ্ছ দেখা যাইতে লাগিল। অনন্তমূলও অনেকটা ঐরকম, মাটির উপরে সামান্য লতাপাতা বাহির হইয়া আছে মাটির অন্তরে তাহার মূল অনন্ত ভাবেই প্রসারিত।



তারপর ভট্টাচার্য্য তালমুলী দেখাইলেন। পরিষ্কার জমির উপর সোজা বিঘৎ খানেক লম্বা সুচালো তাল পাতার অঙ্কুরের মত এখানে সেখানে জাগিয়া আছে দেখা গেল। তলা অনেকটা খুঁড়িতে খুঁড়িতেই তাহার মূল বাহির হইল। একটি শ্বেতবর্ণ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মত সরু খানিকটা তাহার মূল। তিনি বলিলেনঃ খাইয়া দেখুন কেমন সুন্দর মিষ্ট। উহা মিষ্ট বটে অল্প তিক্তাভাসও পাইলাম। এইরূপে শালবনের মধ্যে অনেকগুলি লতা-গুল্ম দেখিলাম যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ছোট ছোট পাতা, শক্ত কাঠির মত ডাল, এক প্রকার লতানে গাছ দেখাইয়া তিনি বলিলেনঃ এই দেখুন বিশল্যকরণী। আমি বলিলামঃ সেত গন্ধমাদন

পর্ব্বতে হয়। তিনি বলিলেন: সেটা ত্রেতা যুগের কথা, এ যুগে ত এসব জঙ্গলেও পাওয়া যায় দেখি।

শালবনের মধ্যে এই বর্ষাকালেও নানা আগাছা কুগাছার জঙ্গল নাই। বিশেষত দেখিলাম ইহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গাছগুলির তলা যেন সযত্নে কেহ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। যতদূর যাও ঝুপী জঙ্গলের বালাই নাই, পথ রুদ্ধ করিয়া কেহ দাঁড়াইয়া নাই। আমরা অনেক দূর বনেই গিয়াছিলাম। বনের শোভা দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিলাম, এক সময় একলা আসিয়া মনের সাধে ইহার মধ্যে বেড়াইব, সম্পূর্ণ একটা দিন উদয়াস্ত ঘুরিয়া কাটাইব। এখন ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রয়োজন মত তালমূলী আরও কত কি সব লইলেন। শেষে আমরা ফিরিলাম। এখানকার বনপথগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া বহুধা বিভক্ত হইয়া নানা দিকে চলিয়া গিয়াছে। সকল দিক হইতেই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। ওদিকে বনের ধারে সাঁওতালদের বস্তী, কয়েকজন কাঠ কুড়াইয়া মাথায় বোঝা চলিয়াছে।

এই বক্রেশ্বরের চারিদিকে বিশাল মালভূমি। দূরে, বহু দূরে একটা পাহাড়ের নীল রেখা



দেখা যায়। বিশাল প্রান্তরের শোভা অপূর্ব্ব, দেখিতে দেখিতে আমরা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দূরে দেখি অঘোরী বাবার মত কে একজন, তিনিও মাঠ ছাড়িয়া রাস্তায় উঠিলেন। ভট্টাচার্য্য পাশ কাটাইতেছেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আবার ওপথে কেন? তিনি আড়চোখে একবার অঘোরীর দিকে দেখাইয়া বলিলেন: দেখছেন না অযাত্রা। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম: কি রকম? ভট্টাচার্য্য বলিলেন: বেটার জাত কুলের ঠিক নাই, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, থাকবার জায়গা শ্মশান, শাস্ত্রজ্ঞান নাই,—বেটা আকাট মুখ্যু, মান অপমান জ্ঞান নাই—যাকে তাকে যা তা বলে বসে, মশাই,—কি বোলবো, ওকে দেখলেই আমার কেমন একটা ভয় হয়। আমি বলিলাম: ওর যে গুণগুলির কথা এইমাত্র বোললেন সেটা সংস্কৃত ভাষায় বোললে শিবের স্তোত্র হয় যে—

ভট্টাচার্য্য বলিলেন: হ্যাঃ,—শিব না আরো কিছু, শিবের সঙ্গে ওর তুলনা, বেটা হাড়ি মুচি, মুদ্দফরাসেরও অধম, জাতের ঠিক নেই,—ঐ যে বেটা এদিকেই আসে যে মশাই, আমি আসি—তাহোলে,—দ্রুত পাদবিক্ষেপে ভট্টাচার্য্য তার বনৌষধির পুঁটলিটি লইয়া গ্রামের পথে ঢুকিয়া পড়িলেন। একবার পশ্চাতে ফিরিয়াও চাহিলেন না। আমি ফিরিয়া দেখিলাম অঘোরী আমার পশ্চাতে।

ওবেলা খুঁজিয়া পাই নাই, এখন পশ্চাতে তাঁহাকে দেখিয়া প্রফুল্ল মনে যোড়হাতে প্রণাম

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন, কখনও ত আপনাকে এদিকে আসতে দেখি নি। তিনি কোন কথাই কহিলেন না, যেন কেহ কিছুই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম বড়ই গম্ভীর, এমন কোন লক্ষণ নাই যাহাতে আবার কিছু সাহস করিয়া বলিতে পারি। মনে করিলাম রাস্তায় হয়ত কথা বলিবেন না। আমি তাঁহার পশ্চাতেই চলিতে লাগিলাম। পথে তিনি কোন কথাই কহিলেন না। ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে শেষে যখন শ্মশানের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এখানে তিনি আসিয়া কোনও দিকে না দেখিয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িলেন। একটু তফাতে আমিও বসিলাম। তিনি দেখিলেন কিন্তু কিছুই বলিলেন না। অনেকক্ষণ চুপচাপ, কোন কথা নাই। আমি স্থির হইয়াই আছি, কথা কহিতে প্রবৃত্তিও হইতেছে না। ক্রমে একবারেই স্থির এবং নিশ্চল হইয়া পড়িলাম। কতকক্ষণ পর তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কি দেখছিস্? আমি বলিলামঃ একটি পুরুষমূর্ত্তি। তিনি বলিলেনঃ শালা কেবল আমাকেই ভাবছিস, এখন বল দেখি সেটা তোর ভিতরে না বাইরে?

এই যে, ভিতরে না বাহিরে,—ইহার মধ্যে একটি ব্যাপার আছে যাহার একটু বিবরণ জানা ভাল। আমরা যাহা কিছু দেখি তাহা বাহিরেই দেখি অর্থাৎ আমি একটি সত্তা অপর একটি সত্তা দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি। তাহা হইলে দুইটি পৃথক অস্তিত্ব হইল—একটি দ্রষ্টা অপরটি দৃশ্য। এখন বুঝিতে হইবে, আমি বলিতে আমার অন্তঃকরণের সহিত (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহং লইয়া অন্তঃকরণ) ইহা লইয়াই আমার যাহা কিছু বোধ,—ইহার বাহিরেই যাহা কিছু দেখা তাহাকেই ইনি, বাহিরে, বলিতেছেন। আর ভিতরে বলিতে অন্তঃকরণ অথবা সূক্ষ্মভাবে 'আমি' বলিয়া আমার যে সত্তার বোধ তাহার মধ্যেই অর্থাৎ দ্রষ্টার সঙ্গে দৃশ্যের একীভূত হওয়া,—ইহাকেই ইনি বলিতেছেন, ভিতরে। আমি বলিলামঃ বাইরে। শুনিয়া তিনি বলিলেনঃ ও কিছু না, তুই ঢুকে যা। ঢুকে যা তার ভিতরে। তারপর তিনি বলিলেনঃ তোর 'আমি'টা কোথা? আমি বলিলামঃ ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। তিনি যেন বলিলেনঃ থাক তুই ঐ রকম।

প্রথম আমি যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তন্ময়তার গুণে উহা চিত্তের মধ্যেই দেখিতেছি এইরূপ মনে করিতেছিলাম। তারপর যখন বলিলেনঃ ডুবে যা ওর ভিতর, তখন, আমি দেখিতেছি, এই বোধটি ক্রমে ক্রমে সেই মূর্ত্তির মধ্যে অনুভূত হইতে লাগিল, তারপর যখন বলিলেনঃ 'আমি'টি কোথা? তখন ধীরে ধীরে, 'আমি' বোধ বা অনুভবটি, সেই বিরাট মূর্ত্তিময় হইয়া গিয়াছে—আমি আর তন্ত্রাভিলাসী নয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেন এক হইয়া গিয়াছে। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা শুনিতেছি, তাহাই স্পর্শ করিয়া আছি—তাহা রসময় এবং দিব্য গন্ধময়। প্রথমে গন্ধ গেল, তাপর রসবোধও গেল, তারপর ক্রমে রূপও গেল, কিন্তু অন্ধকার বোধ হইল না, বহু বিস্তৃত স্পর্শ-বোধের সঙ্গে 'আমি' আছি, আর অপূর্ব্ব একধারায় ধ্বনিত শব্দের রেশও তার সঙ্গে লাগিয়া

আছে। কতক্ষণ পর শব্দও গেল—শুধু স্পর্শময় 'আমি'—তাহাও গেল, এখন শুধু 'আমি' এই বোধটুকু,—তারপর আর কিছুই জ্ঞান রহিল না।

কতক্ষণ পর যখন সেই শ্মশানক্ষেত্র আঁধারময় হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে আমি চক্ষু চাহিলাম। দেখিলাম তিনি নাই, কেহই নাই একা আমিই আছি। কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। এইবার উঠিয়া পড়ি ভাবিতেছি দেখিলাম তিনি আসিতেছেন। আর উঠিলাম না।

নিকটে আসিয়া অঘোরী জিজ্ঞাসা করিলেন: কিরে শালা, এতক্ষণ কি করলি। তোর 'আমি'কে দেখলি ?

আমি বলিলাম: হাঁ, যেন কতকটা দেখলাম।

তিনি: কি দেখলি ? আমি বলিলাম: স্বধু 'আমি' আছি, এই বোধটুকুই ত ছিল। আর কিছুই ত—বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: দেহ, নাম, রূপ এসব মনে ছিল ? আমি: না! শেষে এ সব কিছুই বোধ ছিল না। তিনি তখন বলিলেন: ঐ টুকুই তোর 'আমি', এখন বুঝে নে এই জগত-প্রপঞ্চের সঙ্গে তোর আসল সম্বন্ধটা কি!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: দেহত্যাগের পর মাত্র ঐ টুকুই কি থাকে ? তিনি বলিলেন: সকলকারই কি থাকে, যার সাধন আছে, 'আমি' সত্ত্বার তীব্র অনুভূতি আছে, তারই থাকে, না হোলে সাধারণের তাও থাকে না। এখন তুই বুঝতে পেরেছিস ত রূপ-টুপ দেখা ও সব বাইরের দেখা,—একটা কিছু রূপ দেখলেই চারটে হাত বেরোয় না!

আমার মধ্যে একটা নেশার মত তখনও ছিল, বেশী কথা কহিতে ইচ্ছা হইতে ছিল না। আনন্দময় একটি অবস্থা হইতে ফিরিয়া কি যেন গোলমালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

তিনি বলিলেন: তুই ভাবছিস কি, অনেক গোলমাল স্বষ্টিও করবি, আবার কাটিয়ে যেতেও হবে। সংসারে অনেক কিছু দেনা-পাওনা আছে তোর, হিসেব-নিকেশ না হোলে তুই যাবি কোথা ?

আমি বলিলাম: কারো সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখলেই ত চুকে যায়, আমি আমার অনুভূতি নিয়ে একলাই থাকি না কেন ?

তিনি: তোর তা সাধ্য আছে কি ? এখন বোলছিস বটে, এর পর তুই প্রবৃত্তির খপ্পরে পড়ে নিজেই কত সম্বন্ধ পাতাবি। ঐ অবস্থা থেকে নেমে এলেই চেপে ধরবে সব তখন।

আমার তখন মনে হইল, 'আমি' আছি এই জ্ঞানটুকু সম্বল করেই না মানুষে কত কাণ্ড, কত বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে,—

তিনি বলিলেন: হাঁ, এর মধ্যে তাহোলে আর একটা হাত দেখা যাচ্ছে না কি,—যার উদ্দেশ্য সফল করতেই আমাদের এই সব কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্চে ?

আমি বলিলাম: তা এখন বুঝতে পারছি বটে, কিন্তু কর্ম্ম করবার সময় আর কাকেও দেখা যায় না ত! তিনি বলিলেন: এই ত রহস্য,—এই গুলো বুঝে নিয়ে যদি সব কাজে চালাক হয়ে যেতে পারিস, তবে ত বুঝি। সাধনা দুরকম আছে; এক রকম, শিবই যে শক্তির

মধ্যে দিয়ে জগতের সকল কর্ম্মের মূলে আছেন, মুখের কথায় নয়—এই বুদ্ধিটি যাতে পাকা হয় তারি জন্যেই সাধনা, এতে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে সুখে সংসার-জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। অন্য সাধন হোলো নিজের মুক্তি, কর্ম্ম বা সংসার থেকে তফাৎ, নিজেকে একেবারে আলাদা করে ফেলা। সে হয় না, লক্ষ কোটির মধ্যে একটা হয় কি না হয়। কারণ মূলে তার ভুল থেকে যায়।

আমি ঃ এখানে ত দেখতে পাই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখেও কত মানুষে কত কি নিয়ে এ কর্ম্মজগতে সাধনা করছে—তাতেই কল্যাণ হচ্চে।

তিনি ঃ কথায় কথায় যারা ভগবানের দোহাই দিয়ে কথা বলে, যেন ভগবানের সঙ্গে তার কত জানা-শোনা পরিচয় আছে, তাদের মাথা খারাপ বোলে ধরে নিতে হবে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই ভালো। ভণ্ড ত তাদেরই বলে। এখানে কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি ও বুদ্ধি নিয়ে কারবার, যার তা আছে সে মনে ভগবানকে স্মরণ করুক না করুক তাতে কিছুই এসে যায় না। বরং নিজের শক্তি ও জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সৎ উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্ম করে যায় যারা, ভগবানের কথা মনেও আনে না তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ তাঁর হিসাবে,—অন্তরে তারা আনন্দ ভোগ করে, তারাই তাঁর প্রিয় সন্তান। শক্তিমান মানুষ যে তাঁর স্পর্শ পেয়েই রয়েছে, আর শক্তিহীন যারা ভগবান ভগবান করছে তারা বাহ্য জগৎ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে ফেলেছে। তার ফলে তারা যে অপদার্থ সেইটাই প্রমাণ করচে। সহজ কথাটি বুঝে নিতে পারিস ত? এখানে সব কিছুই দেওয়া আছে বুদ্ধি আর শক্তির সাহায্যে যা তোমার চাই তা উপার্জ্জন করে নিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সফল কর না কেন। আসলে শক্তির অভাব যাদের, দুর্ব্বল মানুষ যারা, তারা শক্তিলাভ করবার জন্যেই ভগবানের শরণাপন্ন হয়। আমাদের দেশে বহুকাল থেকেই সাধারণের মধ্যে এই সংস্কার দৃঢ় হয়ে আছে—যে ভগবানকে ডাকলেই শক্তি পাওয়া যায়, দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কি ভাবে সেই ডাকাটা কার্য্যকরী হবে তাদের সে বুদ্ধি নেই। হিংসা বিদ্বেষের বশে একজনকে শাপ-মন্নি দিতেও ভগবানকে ডাকচে, নিজের শুভ চাই তার জন্যেও ডাকচে,—এই যে সব কারবারেই ভগবানের নাম নেওয়া আমাদের দেশে, স্থূলভাবে সূক্ষ্মভাবে সকল ভাবেই, বস্তুর সঙ্গে পরিচয় নেই কেবল নিজস্বার্থে ঐ নামের ব্যবহার এটা যে কতটা শক্তিহীনতার পরিচয়, কতটা অধর্ম্ম, অন্যায় একথা যদি তারা টের পেতো ত লজ্জায় মরে যেতো। স্বচ্ছন্দে সমাজে তারা চলে যাচ্ছে কারণ সমাজের অধিকাংশই তাই। এর ফল কি জানিস? এর পরিণাম?—

আমি ঃ আমার পক্ষে কি তা জানা সম্ভব?

তিনি ঃ এর পরিণাম এ দেশ থেকে ভগবানের নাম উঠে যাবে।

আজ কয়দিন হইতে অবিশ্রান্ত বর্ষার প্রকোপে ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীরটি আমার বড়ই খারাপ যাইতেছিল। পেটের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিতেছিলাম, মাঝে মাঝে যন্ত্রণাও হয় বেশী। আমাশা হইয়াছে মনে করিয়া কাঁচা বেল পুড়াইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া, গুড় দিয়া খালি-পেটে খাইতে বলিয়াছিল পুণ্ডরীক,—তাহাই কয়েক দিন হইতে করিতেছিলাম। এখানে বেল গাছের অভাব নাই, চারি দিকেই গাছ, কাঁচা বেলও অনেক। বৈকালে একটি শ্রীফল পাড়িয়া নিকটেই কোন একটি কুণ্ড মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতাম, সেই অত্যুষ্ণ জলে সারা রাত্রে উহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকিত, প্রাতে সকল কাজ শেষ করিয়া বেলটি লইয়া কালীবাড়ি হইতে কিছু গুড় সংগ্রহ করিয়া উপযোগ করিতাম।

বর্ষার সময় সারা গ্রামে মাটি ভিজিয়া উঠিয়াছে, সব সময়েই একটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে হাওয়া, আর গন্ধ এই পীঠস্থানের চারিদিকেই সর্ব্বক্ষণ রহিয়াছে। রাত্রে যেখানে শয়ন করি তাহার চারি-দিকেই ছাদ দিয়া জল পড়ে, বৃষ্টির সময় স্থানটি ভাসিয়া যায়, কম্বলখানি আমার শরীরের তলায় ভিজিয়া উঠে। এই সব কারণেই আরও শরীরটা সারিতেছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সরিয়া পড়ি, কিন্তু এখান হইতে সরিলে অঘোরীকে পাইব কোথায়? তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে প্রাণ চায় না। কাল ভুলো ডোমের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, সে বলিল: বাবা ত আর এখানে রইবেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম: কোথায় যাবেন, জানো? সে বলিল: একদিক দিয়ে চলে যাবেন গা, ওঁয়াদের আবার যাবার ভাবনা! কুথাও এক শ্মশানকে যেঁয়ে উঠবেন গা।

আজ সকালে আমার সিদ্ধ বেলটি হাতে লইয়া কালীবাড়ি গেলাম, ভোজন সারিয়াই শ্মশানে অঘোরী বাবার কাছে যাইব। দেখিলাম, মন্দিরের মধ্যে আমাদের সেই ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য্য, পূজার যোগাড় করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন: দেখা হোলো, ভালো হোলো, আপনার কাছেই আমি যাচ্ছিলাম।—পশ্চিম থেকে এক সাধু এসেছেন, বাঙ্গালী সাধু, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো, তাঁকে বোলেছি, একটু পরে তিনি এইখানেই আসবেন। আমি বলিলাম: মহাভাগ্য আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে,—তবে আমি একটু ঘুরে কতক পরে আসবো, একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে অনুরোধ করিয়া তিনি স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন,—আমিও বেল আর গুড়ের কাজ শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

শ্মশানে গিয়া দেখি আমাদের অঘোরী বাবা একটি গাছের তলায় বেশ প্রফুল্ল মনে বসিয়া এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। লোকটিকে আরও দুই একবার এখানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। ইনি বাবার একজন মদের ইয়ার। যখনই তাঁহাকে এরূপ লোক-সঙ্গে দেখা যায় তখনই বুঝিতে হইবে মদের ব্যাপার ইহার মধ্যে আছে। না হইলে সাধারণ কোন সাধুর মত একস্থানে ভক্ত বা শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া কোন প্রকার সৎ-প্রসঙ্গ আলাপনে

কালাতিপাত করিতে ইঁহাকে ত কখনও দেখিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ইনি কাহাকেও শিষ্য করেন না; মন্ত্র তন্ত্রের কথা দূরে থাকুক,—কাকেও আমোল দেন না, কেহ আসিলে তাহাকে দূর না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের আমল দেন, মদ বা কারণ সম্পর্কে, উহার কাজ শেষ হইলেই দূর করেন; তখন একলা; আর রহস্য এই যে মদের সম্পর্কে যাঁহারা অঘোরীর কাছে আসেন তাঁহার ইচ্ছা হইলে তবেই আসেন, তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে কেহ কারণ লইয়াও তাঁহার নিকটে আসিতে পারেন না। কারণ উপহার লইয়া যাঁহারা আসেন বা সঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে ধারণ ব্যতীত তাঁহাদের বাবার নিকট আর কিছু প্রার্থনার বালাই নাই। আমার মনে হয় ঐ শ্রেণীর লোক, মদ লইয়াই যাঁহারা বাবাকে কৃতার্থ করিতে আসেন তাহাদের কারণানন্দ লাভ ব্যতীত আর কোনও প্রশ্ন নাই! তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য যাহা-কিছু সমস্তই আত্মবিস্মৃতির ফলে অতলে ডুবিয়া কারণানন্দই জীবনের একমাত্র কাম্য ও ইষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন আমি যাইয়া সেখানে দাঁড়াইতেই সে ব্যক্তি উঠিয়া গেল। তখন অঘোরী বলিলেন: এখন আবার কি মনে করে আমার হাড় জ্বালাতে এলি তুই?

আমি একটু সাহস পাইয়া বলিলাম: আমার কথা ছেড়ে দিন, আপনার সঙ্গে এদের মদ-যোগানো ছাড়া আর কি অন্য সম্বন্ধ কিছু নেই?

তিনি যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন, আমার মুখে এরকম একটা প্রশ্ন বাহির হইতে পারে তিনি আশাই করেন নাই। মন-মেজাজ এখন ভালই ছিল, তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন: এ সব আবার কি কথা বল্‌ছিস তুই! আচ্ছা তুই বলত, তুই কি করতে এখানে আসিস? আগে আমায় তাই বল দিকি?

আমি বলিলাম: আমি যা করতে আসি তা তো আপনার অজানা নেই। অনেক কিছু জানবার আছে আমার তাই আসি। যা অপরের কাছে পাই না তাই জানতে আসি।

তিনি বলিলেন: তোর একটা মৎলব আছে, স্বার্থ আছে যার জন্যে তুই আসিস্‌। এদের কিন্তু কোন স্বার্থ নেই, একটু মদ খাইয়ে আমাকে সুখী করতে আসে। কোন স্বার্থ নিয়ে এরা আসে না তোর মত। তাই তোর চেয়ে এদের আমি বেশী ভালবাসি।

আমি বলিলাম: এদের তাতে কি কল্যাণ হয়,—আপনাকে মদ খাইয়ে এদের কি লাভ? ওদের না আছে সাধন, না আছে জীবনে একটা বড় উদ্দেশ্য!

তিনি: কার জীবনের কি উদ্দেশ্য তা তুই কি করে বুঝবি, তোর বুদ্ধি ত স্বধু তোর মৎলবের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা, তার বাইরে যা কিছু তার ভাল-মন্দ তুই বুঝবি কি করে? তোর ধারণা কেবল তোরাই উন্নতির পথে যাচ্ছিস্‌ আর ওরা সব অধঃপাতে যাচ্ছে, এইত?

আমি: ওরা নিজে মদ খেয়ে বা আপনাকে কতকটা খাইয়ে কি উন্নতি করচে তা তো আমি বুঝতে পারলাম না। আপনি কি বলেন, এতে ওদের উন্নতি হচ্চে?

তিনি একটু যেন বিরক্তির ভাবে বলিলেন: তোদের কেবল উন্নতি আর উন্নতি; উন্নতি কি সকলের এক ভাবেই হয়? এর মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা এখানে কোন উন্নতি অবনতির উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি, কেবল কর্ম্মক্ষয় করতে এসেছে। আত্মার ক্ষুধা যার যে রকম তার সেই ভাবের কর্ম্ম আর ভোগ এখানে চলবে ত? এমন কতকগুলি জীব এ সংসারে আছে যারা তাদের কর্ম্ম মোটেই বাড়াতে আসে নি, কমাতেই এসেছে, সেই জন্যেই তারা এমন সব ভাবের কর্ম্ম নিয়ে জীবনের দিন কাটাচ্চে যাতে তা থেকে আর নূতন কর্ম্ম-সৃষ্টি হোতেই পাচ্চে না। লোকচক্ষে, অন্তত তোদের মত লেখাপড়া-জানা বাবু-লোকদের চক্ষে হয়ত তা খারাপ ঠেকবে,—কিন্তু তাদের হিসেবে তারা ঠিক আছে। এ জীবন শেষ হোলে তখন নিজের ধারা, তার আত্মার নির্দ্দিষ্ট গতি পেয়ে যাবে, কোন অসুবিধা হবে না,—সব মানুষের কর্ম্মের ব্যাপার তুই জানিস?

বুদ্ধি আমার কতটুকু ক্ষুদ্র, অহং আমার অভিমানে নিজেকে অপরের তুলনায় কতটা বড় দেখে, ধরা পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়া যায়। হায় আমার জ্ঞানের অহমিকা! আমার মধ্যে গ্লানি আসিয়াছে তিনি বুঝিলেন,—অপার কৃপা তাঁহার আমার উপর,—এজন্য আমায় নিরুৎসাহ হইতে দিলেন না। প্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে বলিলেন: একটা কথা মনে রাখবি কখনও ভুলিস নি,—কারো উন্নতি বা অধঃপতন নিয়ে বিচার করতে যাস নি আর প্রচারও করিস নি কখনও,—তাতে তোর ক্ষতি হবে, নিজের কিছুই সুবিধা হবে না। এখানে তুই যা দেখবি যা শুনবি, তা থেকে একটা কিছু মনগড়া সহজ সিদ্ধান্ত করে নিয়ে কারো কাছে কিছু বলিস নি; ঠকে যাবি। যত জীব দেখছিস, যারা জীবনের ধারা পেয়ে গেছে, তাদের সকলের মধ্যেই একটা করে পৃথিবী আছে। জ্ঞানী, মহৎ বোলে তুই যাদের কর্ম্মের প্রকাশ কতকটা দেখেছিস্ তাদেরও যে রকম; আর অজ্ঞান হীনবুদ্ধি মূর্খ, কুক্রিয়াসক্ত বোলে যাদের দেখছিস তাদেরও সেই রকম, সকলকারই একটা একটা আলাদা পথ আছে যার মধ্যে দিয়ে সে খেলা করছে, আপনাকে প্রকাশ করছে। আর জগদম্বা, আদ্যা প্রকৃতি, তিনি এমন করে এই সৃষ্টির মধ্যে সকলকেই ছেড়ে দিয়েছেন যাতে কারো সঙ্গে কারো ঠোকাঠুকি হচ্চে না। তোর সঙ্গে কারো যখন মিলন ঘটছে বুঝতে হবে সেটা উভয়েরই কর্ম্মের একত্ব থেকেই হয়েছে, সেই টুকু মাত্র দুজনে দুজনকে বুঝচে, তাই নিয়েই বিচার, ঐটুকুই তোদের মধ্যে আলোচনার বিষয়,—কিন্তু তা ছাড়া উভয়েরই কতটা বিস্তৃত জীবনের ব্যাপার রয়েচে সেটা দুজনের কাছেই গুপ্ত, অব্যক্ত। এ সব তুই বুঝিস? যখন তুই তোর নিজের পথ সবটাই দেখতে পাস নি তখন অপরের সবটা বুঝবি কি করে? মানুষের উন্নতি-অবনতি বুঝা কি এতই সহজ মনে করিস?

আমি নির্ব্বাক। অন্তরে অন্তরে আমার কতটা অবসাদ তাহা আর কি বলিব! ভবিষ্যতে কেমন করিয়া ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইব এ সকল ভাবনায় এক একবার ভিতরটা তোলপাড় করিতেছে। আমায় কেমন করিয়া প্রতারণা করে, কিছু না বুঝিয়াও সব বুঝিয়াছি এইভাবে

হীন, অসমর্থ ও শক্তিহীন করিয়া দেয়—এক একবার এই কথাই ভাবিতেছি। আবার পরক্ষণে এইমাত্র ইনি যে অদ্ভুত জীবনচক্রের কথা বলিলেন, কি অপূর্ব্ব রহস্যের মধ্যে জগজ্জননীর সৃষ্টির প্রবাহ চলিতেছে। হায়, অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমরা জীবনগুলি বলি দিতেছি কিসের লোভে? কমপিটিশনের হাওয়ায় আমরা কোথায় চলিতেছি। পুস্তকলব্ধজ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থ উপার্জ্জনের প্রতিযোগিতায় ক্লিষ্ট জীবন ইহাতেই যদি নিঃশেষিত হইল তাহাতে—

আজ আমার কি হইয়াছে জানি না, এখানে আসিয়া অবধি এমন সব কথা কহিতেছি যাহার ফলে একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি করিতেছি, শেষে অনুশোচনায় পুড়িয়া মরিতে হইতেছে। এতটা শুনিয়াও কতক্ষণ পর আবার এক প্রশ্ন করিয়া বসিলাম। প্রথমে অন্তরের সঙ্কোচটা কাটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম: একটা কথা বলবেন? তিনি বলিলেন: তার জন্যে আবার এত ভনিতা কেন? বল না—

মেজাজটা তাঁর আজ নেহাত ভাল, তাই সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলাম,—আপনি মদ খান কেন? কথাটা বলিয়াই আমি অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলাম। এতটা কথার পর আবার এ কি একটা বিশ্রী কাণ্ড করিলাম। ছি ছি, সঙ্কোচে আমি এতটুকু হইয়া গেলাম।

যে মেজাজটি ভাল দেখিয়া আজ এতটা সাহস করিয়া একথা বলিয়া ফেলিয়াছি,—সে প্রফুল্ল ভাবটি তাঁহার এই একটিমাত্র কথায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ক্রোধের ভাব মুখে প্রকট হইল,— যথার্থই আমি এইবার ভয় পাইলাম। অপরাধীর মত একবার অপরাধ স্বীকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কণ্ঠে কোনও শব্দ আসিল না। তিনি বলিলেন: তোর কি রে শালা,—তোর তাতে কি? আমি মদ খেয়ে কারো কিছু অনিষ্ট করেছি তুই দেখেছিস, শুনেছিস কোথাও, আমার খুসী আমি খাবো,—বল শালা, তুই কেন একথা বললি আমাকে। এই যে তোকে বুঝিয়ে দিলুম এসব নিয়ে বিচার করিস নি।

অনেকটা জোর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম: আপনার মহান চরিত্রের মধ্যে ঐ টুকুই আমার বড় অসঙ্গত ঠেকে—তাই বোলে ফেলেছি।

মিথ্যাবাদী, শালা চোর, ঐটুকু মাত্র অসঙ্গত তাই বলছিস? মনে ভেবে দেখ আরও কত কত অসঙ্গতির কথা তুই জানিস, কত লোকে তোর মত আমায় ভূতসিদ্ধ পিশাচ বলে, কত কি বলে,—আমি জানি নি। পরে চীৎকার করিয়া বলিলেন: কুকুর তুই শালা, কুকুরের জাত তুই, নাই পেলে মাথায় উঠিস্। ছুঁচো কোথাকার এতটা তোর স্পর্দ্ধা,—তুই কি আমার বিচারকর্ত্তা! বেরো তুই এখান থেকে,—তোর সঙ্গে আমার কোন কথা নেই, বেরো এখান থেকে তুই—আর কখনও আসবি না, বেরো বেরো—বলছি—এখান থেকে,—বলিয়া হাত দিয়া বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দিলেন।

আমি প্রথমটা ভয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু শেষে কি জানি আমার ভয় ত ছিলই না কেমন এক রকম অনাসক্ত হইয়া গেলাম। তাঁহার শেষের কথাগুলির কোন ক্রিয়াই আমার মধ্যে হইল না। আমি উঠিলাম না, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলাম। মনের মধ্যে একটা

শূন্যতা,—আমার যেন সমস্ত বোধ বা অনুভবশক্তি অসাড় হইয়া গিয়াছে। ক্রমে যখন আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম কতক্ষণ পর সাহস করিয়া একবার মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম আর কোনপ্রকার চাঞ্চল্যের লেশমাত্র তাঁহার বদনে নাই, প্রশান্ত মুখখানি তাঁহার সহজ গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। বুঝিলাম ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছেন। তিনি যে একটু আগে এতটা চাঞ্চল্য দেখাইলেন উহা সত্য কিনা ইহাই তখনকার বিচারের বিষয় হইল আমার মধ্যে। এমন সময় সেই ব্যক্তি মদ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দুটি বড় বোতল ও একটি পাত্র সম্মুখে রাখিয়া সে প্রণাম করিয়া বসিল। যখন দেখিলাম এখন ত এঁদের মদ চলিবে তখন আমি প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলাম এবং চলিয়া আসিবার জন্য পা বাড়াইয়াছি,—তখন অঘোরী আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন : এই শালা কোথা যাস্,—বোস এখানে। তাঁহার অঙ্গুলী-সঙ্কেতের সঙ্গে, বোস, এই কথাটির সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরটি যেন আপনিই বসিয়া পড়িল।

তারপর দেখিলাম সেই লোকটি একটা বোতলের ছিপি খুলিয়া হাতে দিলেন,—অঘোরী বাবা উহা মুখে উঠাইয়া যেমন করিয়া ডিস্‌পেপ্‌টিক্‌রা সোডা খায়, সেই বড় বোতলটির সবটুকুই আপনার গলগহ্বরে ঢালিয়া দিলেন। একটু মুখ বিকৃতি নাই, কিছু নাই। তারপর দ্বিতীয় বোতলটির ছিপি খুলিয়া সে ব্যক্তি যখন হাতে দিলেন তখন তিনি তাহাকে তাহার পাত্রটি আনিতে ইঙ্গিত করিলেন, পাত্র আসিল, বাবা তাহাতে বোতলের একচতুর্থাংশ আন্দাজ মাল ঢালিয়া বাকিটুকু মুখের মধ্যে দিয়া নিজ উদরে গ্রহণ করিলেন। সে ব্যক্তি তারপর পাত্রটি তাঁহার পায়ের কাছে মাটিতে ঠেকাইয়া ভক্তিভাবে পান করিল। তারপর কতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবের রাজত্ব চলিল। সে ব্যক্তি কতকটা বসিয়া বোতল দুইটি ও পাত্রটি লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। এখন আমরা দুজনে মাত্র এখানে রহিলাম।

২৮

অনেকক্ষণ পরে তিনি কথা কহিলেন। আমার দিকে না চাহিয়া যেন আপন মনে কথাটা বলিলেন : মদ খেলে কি হয়? আমি কিছুই বলিলাম না,—কোন কথা মুখেই আসিল না। তারপর আপন মনেই বলিতে লাগিলেন : অপরিমিত খেয়ে যদি লোকে মাতাল হয়, অন্যায় কিছু করে, সে কি মদের দোষ? সুধাও মাত্রা ছাড়ালে বিষের কাজ করে, সে কি সুধার দোষ? শরীরে স্ফুর্ত্তি, মনে আনন্দ যাতে হয়, সে কি খারাপ জিনিস? আমি খাব, আমার খুসী, যার খুসী হবে সে খাবে তাতে তোর কি? যে মানুষ এমন জিনিসের গুণ বোঝে না, কেবল দোষই দেখে, সে কি রকম মানুষ? সংসারে আসে কেন মানুষ, কাজ করতে আসে, ভোগ করতে আসে। যারা মদ খেয়ে আনন্দ পায়, কর্ম্মশক্তি পায়, তারা কেন খাবে না? পাপ কিসে হয়?

নিজের সুখ সুবিধের জন্যে যারা অপরের অনিষ্ট করে, যার মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষার বিষ রয়েচে, সে মদ খেলেও যা করবে, না খেলেও তাই করবে। তাতে মদের দোষ কি? মদের উপরে ঘৃণা রাখবার কি অধিকার আছে তোর? কোনটা কার পক্ষে ভাল, কোনটা মন্দ, তা কি তুই জানিস্? তুই সভ্য আর যারা মদ খায় তারা অসভ্য, এ বুদ্ধি কোথা থেকে এলো তোর! এত অহংকার তোর লেখা-পড়ার! যার প্রকৃতি যা, মদের প্রভাব কি তার উপর যেতে পারে?

কতক্ষণ পর আবার ধীরে ধীরে বলিলেন: তোদের শিক্ষিত সভ্য সমাজে যে সব পাতকের কাজ নিত্য নিত্য হচ্ছে, সে সব কি মদ খেয়ে ঘটচে না মদ না খেয়ে ঘটচে? পাতকের কাজ তোদের লেখা-পড়া-জানা লোকে বেশী করে, না নিরক্ষর লোকে যারা নেশা-ভাং করে তারাই বেশী করে দেখতে পাস না? তোদের সমাজে ধনবানের অত্যাচার কত বড়, ধনমদে কত লোক নির্ধনের উপর অত্যাচার করচে, বলবান দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করচে সেখানে মদের বোতল কোথায়? বিষয়ের লোভে তোদের শিক্ষিত সমাজে কত লোক বিষ খাইয়ে মানুষকে হত্যা করচে, শিশু হত্যা, বালক হত্যা, স্ত্রীহত্যা কত প্রকারের মহাপাতক সমাজের মধ্যে হচ্ছে, সেখানে মদ কোথায়? যারা মদ খায় তারা বেশী, না যারা খায় না তারা বেশী পাতকে লিপ্ত, হিসাব করে দেখেছিস তুই? সাধু চরিত্র যারা মদ মাংস স্পর্শ করে না অথচ ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে নিজ স্ত্রী, পরস্ত্রী, কুমারী, বিধবা তাদের কাছে কিছু ভেদ নেই, সব সমান; স্ত্রীলোক ঘটিত এমন কোন মহৎ পাপ নেই যা করে না, সেখানে মদ কোথায়? জ্ঞান বুদ্ধির অহংকারে এমন উপকারী জিনিসের উপর এমন অবিচার করে যারা তারা কি ভাল লোক? কি অধিকার আছে তোর মদকে খারাপ বোলে প্রচার করবার? সাধু চরিত্রের মানুষ যারা তারা মদ খায় না, এ কথা তোকে কে বল্‌লে? মদ খেলে অসাধু হয় এই বা কেমন কথা? সাধু অসাধু ঠিক করবার মাপকাটি হোলো কি না মদ? এ সব কি বুদ্ধি! সমাজে মানুষের স্বভাব প্রকৃতিটাই যে আসল। কিসে মানুষের চরিত্র উন্নত হবে, শক্তিমান হবে, সরল অকপট হবে সেদিকে বুদ্ধি গেল না, বুদ্ধি গেল কি'না মদের দোষ দেখতে। সমাজে যেন মদই মানুষের প্রকৃতি স্বভাব গড়ছে, মদেরই যত দোষ?—এ্যাঃ।

এই পর্য্যন্ত এমন শান্ত, সরলভাবে কথাগুলি বলিলেন, আমি প্রত্যেক কথাটি স্থির মনোযোগের সঙ্গেই শুনিতেছিলাম। ইহার পর একবার তিনি হঠাৎ মুখ তুলিয়া, বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে চাহিলেন। বোধ হয় আমি মনোযোগ সহকারে তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছি কিনা তাহাই বুঝিবার জন্য দেখিলেন। আমি এই সুযোগে তাঁহার চক্ষে এক অপরূপ বস্তু দেখিতে পাইলাম যাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। কি বিশালায়ত চক্ষু তাঁহার! এতদিন সঙ্গ করিয়াছি, তাঁহার নয়নের এরূপ বিশাল মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। জবা ফুলের মত, সত্য সত্য অতটাই ঘোর লাল, মধ্যে বড় বড় দুইটি ক্ষীণ স্বচ্ছ নীলাভ তারকা,—তাহার মধ্যে এক ফোঁটা গাঢ় নীলবর্ণের মণি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,—তাহার মধ্যেও যেন স্বচ্ছ তারকা ভেদ করিয়া লালের

আভা প্রবেশ করিয়াছে। তারপর, সেই মণির ঠিক উপরেই অতীব উজ্জ্বল দিবাকর জ্যোতির সূক্ষ্ম একটি বিন্দু দেখা যাইতেছে। তাহাতে সেই চক্ষুর মধ্যে এক অমানুষিক তেজ উৎপন্ন করিয়াছে। উহা স্বচ্ছ, উহার উপর দৃষ্টি রাখা যায় না। সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার চক্ষুও স্থির হইয়া আসিল, আমায় যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। ভয়ে নয়,—কারণ তাহাতে ক্রোধ হিংসাদি কোনপ্রকার উগ্রভাবের ছায়াও ছিল না, ছিল কেবল তাঁহার শক্তির অসীম আকর্ষণ, দৃষ্টিপাতে একজনকে একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া লইবার ধ্রুব শক্তি। অপূর্ব্ব ভাবোদ্দীপক, পূর্ণ শক্তির আলোকে উদ্ভাসিত সেই দিব্য চক্ষু দুইটি। তাহার রূপ আমার এখনও স্মৃতির মধ্যে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। আমার চক্ষের উপর তাহার সেই জীবন্ত বাঙ্‌ময় কটাক্ষ পড়িবামাত্রই অন্তরে একটি আঘাত অনুভব করিলাম। উহা আকস্মিক, বোধ হইল আমার অনুভব-রাজ্যের সবটুকুই যেন তোলপাড় করিয়া দিল, যাহার ফলে আমার সংজ্ঞালোপের মতই একটা অবস্থা হইল। কিন্তু তাহা ঘটিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমায় সজাগ করিয়া দিল। এই কথাগুলি আমার কানে গেল,—শুনছিস তুই, একটা তেজী ঘোড়া,—

চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন: ওদিকে নয়, ওদিকে নয়—আমার দিকে শোন,—একটা তেজস্বী ঘোড়া মানুষের কত উপকার করে,—তাকে বাগিয়ে নিয়ে কত কাজ করা যায়, কেমন? আমি তখন বুঝিলাম, বলিলাম: ব্যবহার জানলে, সাহস থাকলে করা যায় বই কি! যারা জানে তারা ত তা কোরেও থাকে,—

তিনি বলিলেন: তাই বল। এখন, সেই ঘোড়ায় উঠলে তোকে ফেলে দেবে, কত রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যাতে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে এই ভয়ে তুই আর ঘোড়ায় উঠবি না, এ কিরকম ভাব! ঘোড়া দেখলে শত হাত দূরে পালাবে, এ কিরকম শাস্তোর? তোদের এ দেশ ছাড়া কোন্ সভ্যদেশে এ রকম শাস্তোর আছে দেখতে পাস্? এ কি শক্তিমান দেশের শাস্তোর? পরিমিত মদের ব্যবহারে যে অশেষ উপকার হয় এটা কোন্ সভ্যদেশের মানুষে জানে না, মানে না? এই অলস অকর্ম্মণ্য কাপুরুষের দেশে, যেখানে মানুষ একদিনের খাবার জোগাড় থাকলে সেদিন আর হাত পা নাড়বে না, সেদিন কেবল খাবে আর ঘুমিয়ে কাটাবে, দিনে ঘুম যে দেশের প্রত্যেক মানুষের ধাতস্থ, মজুরী করতে হোলে কেবল গতর ফাঁকি কি ভাবে কতটুকু দেওয়া যায় তাই যাদের লক্ষ্য,—মড়ক, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি যে দেশে সমানে লেগে আছে, সেখানে এই মদ যে একটা মহাশক্তি, মহা ওষুধের কাজ করে, বুঝতে পারিস্ নি? আফিং, গাঁজা, চরস খেয়ে জড়ভরত হয়ে থাকবে, মরবে সেও ভাল, কিন্তু মদ ছুঁলে পাপ, শাস্তোরে লিখেছে,—মদের উপর অভিশাপ আছে, কেমন?

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা কহিলাম, বলিলাম: শাস্ত্র এখন মানছে কে? এ সব যে শাস্ত্রের কথা তা কোন দিন মানা হোয়েছে বোলে ত আমার মনে হয় না, এখনকার কথা ত ছেড়েই দিতে হবে। ব্রাহ্মণদের মদ অস্পৃশ্য, অবশ্য ঔষধার্থে ছাড়া। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কথা জানি না, দেখি নি। আমাদের সময়ে এমন কোন ব্রাহ্মণ-সংসার দেখিছি বোলে মনে হয় না

যেখানে কেউ না কেউ মদে আসক্ত নয়। ছেলেবেলা থেকেই দেখছি ব্রাহ্মণেরাই ত শাস্ত্রবিধি বর্জ্জন করবার কাজে অগ্রণী, কিন্তু মুখে স্বীকার করবার কাজে নয়। ভাবটা এই যে, আমরা যা খুসী হবে করবো কারো কিছু বলবার আবশ্যক নেই। বোললেই লাঠালাঠি ব্যাপার। বাল্যকাল থেকে মদ বোলে এই শব্দটির উপর প্রকাশ্যে ঘৃণা করতে আমরা শিখেছি। মদ নরকের পথ পরিষ্কার করে, মদ্য পানের তুল্য পাতক নাই,—ও বস্তুটি অতীব ঘৃণ্য। কিন্তু আর আর নেশা, ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিম, চরস এ সকল হিন্দুদের ভগবানের দরবারে পাস করা নেশার জিনিস, এসবে পাতক নেই। এসব কথা ত এখন সকলকারই জানা। আমার মনে হয়, এই যে আমাদের দেশে গৃহস্থ ইতর ভদ্রের মধ্যে মদের চলন তার মূলে তন্ত্রধর্ম্মের প্রভাব আছে। পূর্ব্বে যেখানে পঞ্চ-মকারের সঙ্গে মদ সাধনের অঙ্গ ছিল একালে সাধনের অঙ্গটা বাদ দিয়ে এখন আর সবটাই রয়ে গেছে, কেবল মুদ্রার অর্থটা বদলে গেছে। এখন বোধ হয় দুর্ভিক্ষের বাজারে মাংস জোটে না বোলে মুড়ি কড়াই ভাজাটাই মুদ্রার নামে চলেছে। এই যা তফাৎ।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তুই কখনও মদ খেয়েছিস্, বল দিকি!

আমি: প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি দুই একবার খেয়েছিলাম।

তিনি: কিরকম বুঝলি তুই খেয়ে? আমি বলিলাম: কি রকম ভাব আমার মধ্যে হয় সেইটে দেখবার জন্য, বুঝবার জন্যই খেয়েছিলাম। দেখলাম আমি যা তাই-ই থাকি, কেবল শরীরের মধ্যে একটা স্ফূর্ত্তি আসে এই মাত্র। যাতে মন দেওয়া যায়, খুব আনন্দে সেই কাজ করা যায়। আমার মদ খেলে কোন অন্যায় বা অসঙ্গত কাজে মন যায় নি এটা দেখেছি, কিন্তু অন্যের বেলা অন্য রকম দেখেছি। আমার একজন আত্মীয় মদে আসক্ত ছিলেন। তাঁকে দেখেছি মদ খেলেই মাতলামো; আর লোকের উপর অত্যাচার করবার, লোককে অপমানিত করবার প্রবৃত্তি যেন ভয়ানক রকম জেগে উঠতো। সহজ অবস্থায় বেশ লোক কিন্তু মদ পেটে পড়লেই যেন আর একটা মানুষ, যেন একটা দানব হয়ে উঠতেন। আবার আর এক রকমও দেখেছি, স্বভাবত ভয়ানক রাগী উগ্র প্রকৃতির লোক,—বদমেজাজ, তার জ্বালায় বাড়িতে কারো শান্তি নেই, কিন্তু মদ খেলে একেবারেই বিপরীত; এমন শান্ত, ধীর, ভদ্র ব্যবহার তাঁর দেখে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। কি ব্যাপার বুঝা শক্ত।

তিনি বলিলেন: এইমাত্র তোকে বল্লুম যে, মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি যা তার উপর মদ যেতে পারে না। মানুষকে সরল অকপট করাই মদের ধর্ম্ম। মানুষের প্রকৃতি যেটা তাকে বাইরে প্রকাশ করে দেয়। ঐ যে তোর আত্মীয়ের কথা বললি, সহজ অবস্থায় ভাল লোক, আর মদ খেলেই হয় দানব, সে লোকটার প্রকৃতিই তাই। সহজ অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যে তার দানব মূর্ত্তি ফুটতে পায় না, মদ খেলে যখন প্রাণ সরল অকপট হয়, নিঃসঙ্কোচ হয়, তখনই তার প্রকৃত পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। আমি বলিলাম: কথাটা সত্য, আমরা জানি তিনি অন্তরে বড়ই ভয়ঙ্কর দাম্ভিক মানুষ। আচ্ছা তা হোলে দ্বিতীয় লোকটির ব্যাপার—

তিনি : যার বাইরের ভাব উগ্র প্রকৃতির, মদ খেলে শান্ত ভাব দেখেছিস, তার অন্তর প্রকৃতি ভাল, সৎ ভাবই তার আশ্রয়, কেবল অভাব এবং অশান্তির জন্য, আর এমন হোতে পারে লোকের ব্যবহারে হয় সে দাগা পেয়েছে,—তার প্রিয়জনের দুর্ব্ব্যবহারেই তার মেজাজ শান্ত থাকে না, শান্তি পায় না। মদের গুণে তাকে যখন স্থির করে দেয় তখনই তার আসল প্রকৃতির বিকাশ হয়।

আমি : আপনি সাধারণ ভাবে ত মদের সম্বন্ধে অনেক কথাই বোললেন, এখন তন্ত্রে এই মদের ব্যবহার সম্বন্ধে যুক্তিটা কি, মদটা কেন তন্ত্রের সাধনের মধ্যে স্থান পেলে—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন : স্থান পেলে কিরে,—প্রধান স্থান বল!

তন্ত্রধর্ম্ম কেবল কোন বিশেষ উচ্চশিক্ষিত সভ্য সম্প্রদায়ের জন্য নয় ত, এযে গরীব দুঃখী, উচ্চ নীচ সাধারণ অ-সাধারণ সকলের নিত্য ব্যবহারিক ধর্ম্ম, যা কর্ম্মজীবন থেকে মোটেই আলাদা নয় এটা তুই ত জেনেছিস! এখন দেশের সর্ব্ব সাধারণের দিকে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবি সবাই চাইচে আনন্দ, স্ফূর্ত্তি। ধর্ম্ম বল্, কর্ম্ম বল্ যা কিছু প্রেরণা দেশের মানুষ অনুভব করচে সুখকে লক্ষ্য করেই ত করছে? শরীরের সুস্থতা আর তার জন্য যে একটা সহজ স্ফূর্ত্তি এইটিই ত চাই প্রথম, এ না হোলে কিছুই হবে না। কিন্তু এমনই সামাজিক মানুষের স্বভাব যে প্রকৃতির সহজ নিয়মের ব্যতিক্রম করবেই করবে,—অতিরিক্ত সুখের আশায় উন্মাদ হয়ে বাল্যাবস্থা থেকেই শরীরকে বিগড়ে ফেলতেই অভ্যস্ত। শরীর-যন্ত্রের কি পরিণাম হবে এ ভেবে কেউ কাজ করতে নামে না। চারিদিকেই দেখতে পাবি বালক-অবস্থা থেকেই শরীরকে সংযত প্রণালীতে চালাবার, আর যৌবন-অবস্থার কর্ম্মও ভোগাদি ব্যাপারে সংযমের শিক্ষা, যেটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম লক্ষ্য তা অনেক কাল দেশ থেকে অন্তত সাধারণের মধ্যে থেকে উবে গেছে; আর তার ফলে জনসাধারণের শরীরও ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে, হিন্দু সমাজ-শরীরও ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই যদি শরীর ভাল না গড়তে পায়, উদ্দাম যৌবনে, ভোগ ও কর্ম্মের বেলা সেই শরীর ও মনের কি রকম গতিক হয় তাত বুঝতেই পাচ্ছিস্। এই তন্ত্রধর্ম্মে প্রথমেই মদকে নিয়েছে এই কারণে যে এতে নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয়, পরিমিত ব্যবহারে শরীরকে সুস্থ, সবল, শ্রমী এবং কঠিন কর্ম্মক্ষম করে, প্রকৃতিকে অকপট করে মনকে নির্ভীক ও সাহসী করে তোলে। বিশেষত চাল বা ভাত থেকে বা গাছের রস থেকে যে মদ তৈরী হয় তার গুণ অসাধারণ। ভেতো বাঙ্গালীর শরীরে তার উপকারিতা অনেক। তা হোলেই ত বুঝতে পাচ্ছিস্ কেন মদকে প্রথমেই ধরা হয়েছে! সাধনার প্রধান অঙ্গ বোলে নেওয়া হয়েছে!

আমি বলিলাম : তাইতেই ত এত জড়বুদ্ধি মাতালের সৃষ্টি—ধর্ম্মের নামে।

তিনি বলিলেন : তন্ত্রধর্ম্মের মধ্যে যে মদ নিয়ে সাধন, তার ওরকম বিশৃঙ্খল ব্যবহারের নিয়ম নেই। নিয়ম হচ্ছে ছোট্ট একটি পাত্র, অধিকারী ভেদে মাপ করে তার তিন পাত্র, পাঁচ বা সাত পাত্র হোলো পূর্ণ মাত্রা;—সে কতটুকু? তাতে অনাচার বা দূষণীয় কিছুই নেই। তাতে করে কাকেও মাতাল বা অজ্ঞান করে না। তবে কেউ যদি লোভে

পড়ে নিয়মের ব্যতিক্রম করে, স্ফূর্তি পাবার জন্য বেশী বা অপরিমিত ব্যবহার করে, সেটি কি বস্তুর দোষ?

আমি বলিলাম : সেটি যদি এমনই লোভের বস্তু হয়,—

তিনি বলিলেন : এই যে ভাত পেট ঠেসে বেশী মাত্রায় খেয়ে খেয়ে কত অনিষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে, বোধহয় জনসাধারণের এতটা অনিষ্ট আর কিছুতে হয় নি—তুই তার কি করছিস। দেখতে পাচ্চিস না এই যে অপরিমিত অন্ন আহার তার ফলে ভোজনের পর শরীর কি রকম অবসন্ন হয়ে আসে যে তাকে শুতে হয়, তাই থেকেই ত দেশজুড়ে দিবানিদ্রার উৎপত্তি হয়েছে। দেশে দশ সেরী, পনর সেরী, আধ মুণি, এক মুণি খাইয়ের উৎপত্তি—সে কি দেশের সৌভাগ্যের লক্ষণ? হাঘোরে মন্বন্তরা যে দেশে লেগে থাকে সেই দেশেই এ রকম অদ্ভুত অকর্ম্মণ্য মানুষের উৎপত্তি হয়। তাদের দ্বারা কি কোন কাজ হয় না কল্যাণ হয়। এ দেশে কেবল খাবার জন্যেই বেশ বড় একদল লোক বেঁচে থাকতে চায়, জানিস ত? (পেটকে বাড়ালে যে কতটা শক্তির অপচয় হয় যাতে শেষে শক্তিহীন হোতে হয় সে কি ভুজুনীরা জানে?) খাওয়া আর শোয়া ছাড়া আর কোন্ পরিশ্রমের কাজে তারা লাগে! (ধর্ম্ম-সাধনা তাদের জন্য ত নয়,) এ ত বুঝতে পারিস!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : এই তন্ত্র-মতের সাধনের ব্যাপারে মদ কি শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহার করতেই হবে?

তিনি : তা কেন,—যার শরীর সুস্থ সবল, পশ্বাচার আর বীরাচারের পর ত আর তার মদের প্রয়োজন বোধ থাকবে না। দিব্যাচারের মধ্যে গিয়ে পড়লে তখন তাদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে যায়।

আমি : স্বভাবতই যাদের মনে স্ফূর্ত্তি আছে, শরীর সবল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে তাদের বীরাচারের বেলায়ই বা মদের প্রয়োজন কেন?

তিনি : তোকে ত বোললুম যে মদের যে সব গুণ আছে তার মধ্যে বিশেষ গুণ হচ্ছে মানুষকে নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ করে। বীরাচারের সাধনায় এমন অনেক কাজ আছে যাতে অমানুষিক সাহসের প্রয়োজন। মনে কর, ঘোর অমাবস্যার রাতে শব-সাধনার সময়,—যখন হয়ত উত্তর সাধকও কাছে থাকবে না তখন ঐ মদই প্রধান সহায় হয়। তখনকার দিনে মহাশক্তি লাভের জন্য সাধকেরা যে সব ক্রিয়া-কর্ম্ম করতো তা শুনলে তোরা চমকে উঠবি। এখন অবশ্য দেশের মধ্যে আর সে সকল ভাব নেই, মতি-গতি বদল হয়ে গেছে। বেশীরভাগ লোকের জীবনধারার পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

শুনিয়া আমি ভাবিতে ছিলাম,—কতক্ষণ পর তিনি বলিলেন : আচ্ছা তোর শরীর কেন এরকম দেখছি, জ্যোতিঃ নেই, যেন অসুস্থ বোলে বোধ হচ্চে—

আমি তাঁহাকে তখন ঠাণ্ডা লাগার ফলে শরীর অসুস্থ হওয়ার কথা বলিলাম।

শুনিয়া তিনি বলিলেন : এই দেখ, তোর পক্ষে এখন এই মদ উপকারী। যদি তুই এখন দুই চার দিন একটু করে খাস তা হোলে অনেক উপকার হবে; কিন্তু তুই ভিন্ন মার্গের লোক তুই

ত তা করবি নি—তাই বলি এখন তুই এখান থেকে চলে যা, এতদিন ত রইলি, যাহোক কিছু ত দেখা শোনা হোলো, এখন এখান থেকে চলে যা।

আমি বলিলাম: আপনার জন্যই এখানে থাকা,—তা ছাড়া এখনও আমি ত যা চাইছিলাম তা পাই নি,—

তিনি বলিলেন: সেটি নিজে সাধনা না করলে পাবেও না। এবার আমিও যাবো যে, অনেক দিন হয়ে গেল।

আমাদের এই সব কথা যখন হইতেছিল তখন বোদে পাগলা (বৈদ্যনাথ) আসিয়া উপস্থিত, —বাবাকে প্রণাম করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিল: ননী (অনাদি) ভট্চায আপনাকে ডাকছেন,—কে একজন সাধু বাবা আইচেন, দেখেন যেঁয়ে।



আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না, অঘোরী উঠাইয়া দিলেন কাজেই চলিয়া আসিলাম। মনে মনে তাঁর ঐ কথাগুলি ভাবিতেছিলাম যে পেট ঠেসে ভাত খেয়ে দেশের লোকের কি ভয়ানক অনিষ্টই হচ্চে। কেমন করিয়া দেশের লোককে এ কথা বুঝানো যায়,—কেই বা বুঝিবে?

নবাগত সন্ন্যাসী বাঙ্গালী, আধা বয়সী, খর্ব্বাকৃতি, মাথাটি তাঁর প্রকাণ্ড এবং মুণ্ডিত, রোগা শরীর। চেহারায় ব্যক্তিত্বের আভাষ নাই। আমি যখন আসিতেছি পিছনে বৈদ্যনাথ,—শুনিলাম তিনি অনুকূলানন্দজী এবং আরও দুই একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, —এই কি সাধু-সন্ন্যাসীর লক্ষণ! এত চীৎকার-মাৎ, এত গোলমাল কিসের? শান্তি নষ্ট করে কি সুখ হয় বল ত? তোমরা সাধু-সন্ন্যাসী বোলে পরিচয় দাও আর কাজের বেলায় এমন কেন। সাধুকে চেহারা দেখলেই চেনা যায়। এখানে তোমাদের কি দিন রাত এই রকম হট্টগোল চলে নাকি? সাধন-ভজন হয় কখন? ইত্যাদি।

সদ্দারী-ভাবটি তাঁর যেন স্বভাবগত। তাঁর কথা শুনে অনুকূলানন্দ চুপ-চাপ অবস্থায় সরে

পড়লেন, বাকী যাঁরা রহিলেন তাঁরাও মৌনাবলম্বন করিলেন, এখন সব চুপ-চাপ। আর সে হট্টগোল নাই।

আমাকে দেখিয়াই নবাগত সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন: এই দেখ একটি মূর্ত্তি, দেখলেই আর পরিচয়ের দরকার হয় না, স্থির সৌম্যভাব, মুখে প্রসন্নতা, গাম্ভীর্য্য এক সঙ্গে,—চাল-চলনে একটা,—

আমি নমস্কার করিলে ননী ঠাকুর বলিলেন: এঁর কথাই আপনাকে বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে কথা কইবার মত একজন মানুষ এখানে ইনিই আছেন।

আমরা অগ্রসর হইয়া সেই বিশাল বৃক্ষতলে বৃত্তাকার বেদীতে যাইয়া উপবেশন করিলাম। তিনি বাক্যকুশল মানুষ, প্রথমেই আরম্ভ করিলেন:

আমি এখন সিমলা (শৈল) হোতে আসছি। সেখানে প্রায় দুই মাসকাল ছিলাম। সেখানে যত বড় বড় অফিসার আছেন সকলের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। গত মাসে বেরিয়েছি, ঘুরতে ঘুরতে প্রয়াগ, কাশী, পাটনা, ভাগলপুর হয়ে আসছি। একবার বক্রেশ্বর আসবার ইচ্ছা অনেকদিনই ছিল, এবারে ভাবলাম দেখে যাই,—পূর্ব্বে এ অঞ্চলে আসি নি কখনও,—কেবল এই অঞ্চলটাই ঘোরা হয় নি, না হোলে আর কোন প্রসিদ্ধ স্থান ঘুরতে বাকী নেই। আপনি কতদিন এখানে আছেন?

আমি বলিলাম: এই দেড়মাস কাল প্রায় এখানে আছি। শুনিয়া তিনি আমার নিবাস কোথায়, কতদিন বাহির হইয়াছি, কি প্রকার উদ্দেশ্য এই সব কথা প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমায় আকুল করিয়া তুলিলেন। শেষে বলিলেন: দেখি আপনার হাতখানা! আমি হাতখানি বাড়াইয়া দিলাম, না হইলে উপায় ছিল না। বলিলাম: আপনার আবার এ বিদ্যাও আছে নাকি?

তিনি বলিলেন: আছে বৈকি, কিছু কিছু সবই রাখতে হয়।

অনেকক্ষণ দেখিয়া, নানাপ্রকার ভঙ্গীতে হাতটি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বলিলেন,—আপনাকে পুনর্মূষিক হোতে হবে যে,—এই বৎসর খানেক পরেই।

আমি বলিলাম: আমি ত সংসার ত্যাগ করে একেবারেই সন্ন্যাস নিই নি,—

তিনি: তা না হোক, এসময়টা আপনার বৈরাগ্য-যোগ দেখছি, অন্তরে ত সংসারভাব নেই। আপনার দুই বিবাহ কি না? প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সকল সম্পূর্ণ হইলে তখন আমি বলিলাম: আপনি হিমালয়ে ত অনেক ঘুরেছেন?

তিনি: হাঁ, প্রায় হাজার চার মাইল বেড়িয়েছি, এই পায়ে হেঁটে, নিঃসঙ্গ হয়ে—একলাই ঘুরেচি।

আমি: ওদিকে কোনও সিদ্ধ যোগীর সঙ্গ পেয়েছিলেন কি?

তিনি বলিলেন: হরিদ্বার থেকে আরম্ভ করে যতদূর যাবেন, সেই যোশী মঠ অবধি পেটভুখা সাধুই দেখতে পাবেন,—রোটি আর কম্বল চাই,—আর বেশী একটু প্রতিষ্ঠাপন্ন হোলে,

বেশী লোক পটাতে পাল্লে তখন তাদের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই বলবৎ দেখতে পাবেন। শাঁসালো ভক্তদেরই খাতির, সাধারণ বা গরীব গেরস্ত যারা তাদের হরিতকী প্রসাদের ব্যবস্থা। এ আপনি হরিদ্বারের ভোলাগিরী থেকে আরম্ভ করে ও অঞ্চলের শেষ সেই হনুমান চটির উত্তরে নীরানন্দ বাবা পর্য্যন্ত একই রকম দেখতে পাবেন। মুখে গীতার শ্লোক, দুই চারটি বাঁধা গতের আওড়ানি ছাড়া পেটে বোঙা মারলে আর বেশী কিছু পাবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: সিদ্ধযোগী দরশন ভাগ্যের কথা ত? আপনার দেখছি সে ভাগ্য হয় নি।

তিনি বলিলেন: সিদ্ধ যোগী-ফোগী কিছু না, সবই ভবঘুরের দল। যোগ-সিদ্ধিই যদি হবে ত হা-অন্ন, হা-অন্ন করে বেড়াতে যাবে কেন? আশ্রম-প্রতিষ্ঠাই বা করতে যাবে কেন?

আমি: মনে করুন সাধনের জন্য অনুকূল স্থানও ত চাই, রৌদ্র বৃষ্টি থেকে শরীরকে বাঁচাবার জন্য—

তিনি: হাঁ হাঁ—সে আমি বুঝি, সেই যদি বললেন, সে সব কাজের জন্য উপর হিমালয়ের মধ্যে কত শত গুহা আছে যার মধ্যে যতকাল ইচ্ছা কাটানো যেতে পারে। আসলে তা তো তাদের উদ্দেশ্য নয়। তারা চায় গৃহীদের কাছাকাছি থাকতে, এমন যায়গায় থাকতে যাতে গৃহী-মক্কেলদের সঙ্গে দহরম-মহরম বরাবর ঠিকমত চলে। এই আর কি!

আমি তখন লছমন ঝোলার বেশী ও দিকে যাই নাই সুতরাং জানাও ছিল না। কিন্তু এমনই একটা কল্পনা বা অনুমান ছিল যে ওদিকে বদরী নারায়ণের বা কেদারের পথে অথবা গঙ্গোত্তরী বা যমুনোত্তরীর দিকে নিশ্চয়ই সিদ্ধ মহাপুরুষের স্থান আছে, ভাগ্যের যোগাযোগ হইলে দর্শন ঘটে। যাহা হউক আমাদের এই স্বামী, ইনি প্রায় সর্ব্বজ্ঞ ভাবের মানুষ, সাধু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে,—কেউ কিছু নয়, এই ভাব।

তারপর প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন হইল, সাধু-সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ হইতে তিনি নামজাদা সরকারী কর্ম্মচারীদের উপাখ্যানে নামিয়া আসিলেন। তিনি এখন বড়লাট, ছোটলাট, হাইকোর্ট-জজ, বড় বড় সেক্রেটারিয়েট অফিসারদের পরিচয় এবং তাঁহাদের সঙ্গে কোন্‌স্থানে তাঁহার কিরূপভাবে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল,—তাঁহাদের মধ্যে কাহার কিরূপ বিশেষত্ব সেই সকল বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বড় বড় কলেজের অধ্যাপকদিগের পর্য্যায় চলিতে লাগিল, শেষে তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার এবং জ্যোতিষচর্চ্চার অধিকারের কথা প্রকাশ করিলেন। প্রথম হইতে এখানে তিনিই বক্তা এবং প্রধান; আমরা সব শ্রোতা। কেহ কেহ দুই হাঁটু শিথিল বাহু বেষ্টনে হাঁ করিয়া তাঁহার এই সকল প্রতিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার গল্প শুনিতে ছিলেন। উঠিবার ইচ্ছা থাকিলেও উঠিতে সাহস ছিল না। আমাদের বৈদ্যনাথও ইহার মধ্যে ছিল। শেষে সেই মানুষটি একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আলস্য ত্যাগ করিল, পরে বলিল: এ সব শুনে কি হবে, না কালী না রাম,

সাধুদের এ সব কথা কেনে? যান যান ছান করেন যেঁয়ে। এখনি কালীবাড়ির ঘণ্টা বাজবে গা। তৈয়ারী হয়ে লন সব।

দুইটি কারণে মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। প্রথমটি এই যে বহুবচন বাঙ্গালী সাধুটি আসিয়া সংবাদ-পত্রের মত রাজ্যের খবর এখানে আমার কানের কাছে ছড়াইয়া দিল এবং আমায় আবার সংসারী হইয়া সেই সাধারণ গৃহস্থের মত অদূর ভবিষ্যতে ঘরকন্না করিতে হইবে, মুক্তভাবে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারিব না, বদ্ধ ভাবে সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে কাল কাটাইতে হইবে এই ভাবিয়াই মনটা বেশী খারাপ হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এবার এখান হইতে যাইতে হইবে—এখানে যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, বুঝিলাম তাহাতে মনের সবটা পূর্ণ হইল না, অনেকটাই ফাঁক রহিয়া গেল। যাইবার সময় যেন একটা অশান্তি লইয়া যাইতেছি।

বাঙ্গালী সাধুটি এখানে একটি দিন ও একটি রাত্র ছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার আসল কর্ম্ম হইল এই মন্দির-সম্বন্ধে যা কিছু সকল ব্যাপারের খোঁজ করা। বাৎসরিক কত আয়, কত ব্যয়, কে এ সকল ব্যবস্থা করে,—যাত্রীদের তরফ হইতে কত আয় হয় এই সব খবর সংগ্রহ করিয়া লইলেন। কেবল বৈষয়িক কথা ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গ তাঁহার মুখে শুনি নাই।

হয়ত আরও দুই চার দিন থাকিয়া যাইতাম,—কিন্তু এই ব্যক্তির সংসর্গ আমার মনকে বিরক্ত করিয়া তুলিল, আমি আজই বৈকালে চলিয়া যাইবার সংকল্প করিলাম। শরীর এখানে খুবই খারাপ হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথা ভার হইয়া থাকে; এরূপ ব্যাপার আজ ছয় সাত দিন হইতেই চলিতেছে। এখান হইতে আমি লাভপুরে ফুল্লরা পীঠ এবং পরে অট্টহাস হইয়া তারাপুর যাইব সঙ্কল্প করিলাম। এই সাধুটি ঠিক যেন আমাকে এখান হইতে তাড়াইতেই আসিয়াছিলেন।

যাইবার সময় কম্বলখানি পিঠে বাঁধিয়া লইলাম, হাতে জলপাত্র বা কমণ্ডলু,—একবার শ্মশানে লক্ষ্য করিলাম অঘোরীকে দেখিতে পাইলাম না। উদ্দেশে প্রণাম করিয়াই বাহির হইলাম। সোজা পথে দুবরাজপুর ষ্টেশনের দিকে চলিলাম।

স্তিমিত সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত চারিদিকে বিস্তৃত বহু দূর অসমতল দিকচক্রবাল দেখা যাইতেছে। পথটি বড়ই সুন্দর। মুক্তির বাতাস ও আলোকের মধ্যে ষ্টেশনে পৌছিলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে ট্রেনে উঠিয়া সাঁইথিয়ায় উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি তান্ত্রিক সাধকের সমাধি আছে। ষ্টেশনের নিকটেই।

সমাধিটি প্রাচীন, চারিধারে শেওলা ও ঝুপি জঙ্গলে পূর্ণ। একটি প্রকাণ্ড বট গাছ আছে, তাহার অনেকটা বিস্তার। দেখিলাম, দুই তিন জন কৃষ্টকায় ব্যক্তি সমাধির ধারে বৃক্ষতলে বসিয়া একটি অশীতিপর বৃদ্ধার সঙ্গে কথা কহিতেছে। আমি যাইয়া সেখানে পিঠের বোঝাটি নামাইয়া বসিলাম।

একজন জিজ্ঞাসা করিল: কোথা হোতে আসা হচ্ছে? উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: এখানে আজ রাত্রের মত থাক্‌তে একটু স্থান পাওয়া যাবে কি?

সে কথার উত্তর না দিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল : কোথায় যাওয়া হচ্ছে। আমি বলিলাম : কাল প্রাতে লাভপুর যাইব।

পার্শ্বেই বৃদ্ধার কুটীর, তাহার দাওয়ায় আমার থাকিবার স্থান হইল। বৃদ্ধা একটি ভৈরবী, তিনি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিলেন। সংসারে কে কে আছে, কেন এমন করিয়া বেড়াইতেছি জিজ্ঞাসা করিলেন।



প্রাতে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখান হইতে আমাদপুর লাইনে লাভপুর যাইতে হয়। প্রায় আটটা নাগাত লাভপুর পৌছিলাম। ফুল্লরা পীঠ ষ্টেশনের নিকটেই। দেবীর ছোট পুরানো মন্দির তাহার সম্মুখেই থামওয়ালা প্রকাণ্ড নাটমন্দির, তাহার সম্মুখেই উপরে পাকা ছাদ আচ্ছাদিত চাঁদনী, তারপর সোপানমণ্ডিত একটি সরোবর। তাহার উপরে, তিন দিকেই শ্মশান-ভূমি। দক্ষিণ পার্শ্বে কতকটা জঙ্গল। শ্মশানের সর্ব্বত্রই নর-কপাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কঙ্কাল এবং বিভিন্ন অংশের অস্থি চারিদিকেই লক্ষ্য হয়। দিনমানে স্থানটি বড়ই মনোরম। শ্মশানের পরেই রেল লাইন।

আমি একবার চারিদিক দেখিয়া মন্দিরের পশ্চাতে যে কয়খানি চালাঘর আছে সেখানে যাইয়া বোঝা নামাইলাম। সেখানে পূজারী এবং তাঁহার সঙ্গে তিন জন ভদ্র লোক বসিয়া কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন। এই স্থানে পূজারী বাস করেন এবং তাহার একাংশে ভোগ রান্না হয়। তাহার পশ্চাতে নীচু পাঁচিল-ঘেরা কতকটা স্থান—সেখানে শিবা ভোগ দেওয়া হয়। পোষা শৃগাল দুই তিনটি মাঝে মাঝে দেখা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বোধ হয় ভোগের কতটা বিলম্ব তাহাই অনুসন্ধান করিতেছিল।

পীঠস্থ দেবী মূর্ত্তির সবটাই রক্ত বস্ত্রে ঢাকা, কেবল মুকুটাবৃত মস্তক এবং মুখটুকু খোলা। প্রথম দৃষ্টিতে ইহাই যেন বোধ হয় কিন্তু নিকটে যাইলে কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। সিঁদূরের প্রলেপ প্রস্তরাংশের সবটাই জুড়িয়া আছে। কতক্ষণ মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া পূজার আয়োজন দেখিতেছিলাম। সেখানে গ্রামের মেয়ে দুই চার জন তাহার মধ্যে বর্ষীয়সী বিধবাও ছিলেন। বোধ হইল প্রত্যহই ইঁহারা এখানে আসিয়া থাকেন।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর ভোগ হয়, দেবীর ভোগ হইয়া গেলে প্রথমেই শিবা ভোগ হয়। নিত্য ভোগ আমিষ ও নিরামিষ দুইই হয়। পর্ব্ব-উপলক্ষে এবং অমাবস্যায় ছাগ বলি হয়। প্রসাদ পায় অভ্যাগত যাঁরা থাকেন তাঁরা এবং পূজারী মহাশয়ের নির্ব্বাচিত গ্রামস্থ প্রতিবেশিগণ। সকলেই তান্ত্রিক অর্থাৎ তন্ত্রমতের লোক। পঞ্চ-মকারের অনুষ্ঠান এখানে অতি সাধারণ। প্রত্যহ যে পূজা এবং ভোগের ব্যবস্থা আছে তাহা হইতে প্রায় বিশ বাইশ জন ব্যক্তি প্রসাদ পায়। প্রতি অমাবস্যা এবং অন্যান্য বিশেষ পর্ব্ব যোগে বিশেষ পূজার ব্যবস্থাও আছে। তাহা ছাড়া—বাহিরের মানত বা মানসিক দিয়া পূজা প্রায়ই আছে। ভিন্ন গ্রাম হইতে মধ্যে মধ্যে পূজার উপকরণাদিসহ যাত্রিগণ উপস্থিত হয়, সঙ্গে বলির জন্য ছাগও থাকে। সেদিন মহাপ্রসাদের আকর্ষণে গ্রামস্থ দুই চার জন ভক্তের বেশী আমদানী হয় এবং কারণানন্দের সঙ্গে প্রসাদ প্রাপ্তি ঘটে।

নাটমন্দিরটি—যেমন বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ স্থানে আছে—স্তম্ভশ্রেণীর উপর পাকা ছাদ যাহা গ্রীক স্থাপত্যের অন্তর্গত ডোরিক্ শ্রেণীর। লোক জন এখন বড় একটা কাহাকেও ইহার মধ্যে দেখিলাম না, ভিতরটা অত্যন্ত অপরিষ্কার, পায়রা ও বাদুড়ের ঘন অধিষ্ঠানে যাহা হইয়া থাকে। অথচ কতকাংশ জাল দেওয়া, তাহার পরই ঘাটের চাঁদনী। দুই দিকে দুইটি করিয়া চারিটি থামের উপর পাকা ছাদ। নীচে দুই দিকে প্রশস্ত মার্ব্বেল পাথরের বেশ দীর্ঘ বসিবার আসন, যেখানে একত্র পাঁচ ছয় জন বসিতে পারে। তাহার পরেই সোপান-শ্রেণী। জল হইতে মোটে তিনটি ধাপ জাগিয়া আছে, জল নির্ম্মল ও স্বচ্ছ, কাকচক্ষুর ন্যায়।

এখানে আসিয়া অনেকটা শারীরিক সচ্ছন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু স্থানের কোথাও একটু লক্ষ্মীশ্রী দেখিলাম না, কোথাও জীবনের চিহ্ন নাই। সরোবর-সংলগ্ন স্থানটুকু ছাড়া সবটাই যেন শ্রীহীন, নির্জ্জীব।

এই ফুল্লরা মহাপীঠ অতি প্রাচীন একটি তান্ত্রিক অভিচারের ক্ষেত্র, এক সময় এখানে বহুতর সিদ্ধ তান্ত্রিক আসন করিয়াছিলেন। তন্ত্রমতের অনেক অনেক সাধন এখানে হইয়া গিয়াছে। এখনে কিন্তু এই সরোবর-তীরের শ্মশান ব্যতীত তাহার আর কোন সাক্ষ্য নাই। বক্রেশ্বরের তুলনায় ইহার বিস্তৃতি কম এবং সঙ্কীর্ণ। বক্রেশ্বরে যেমন সাধু সন্ন্যাসীর ঘন আনাগোনা আছে, এখানে সেরূপ নাই অথচ এস্থানটি রেলের ধারেই, আসা-যাওয়ার খুব সুবিধা। এখানে গৃহী লোকের আনাগোনাই বেশী। বক্রেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে যেমন অনেকটা স্থান আছে, যেখানে

অল্প-বিস্তর বাহিরের লোক থাকিতে পারে এবং থাকে এখানে সেরূপ স্থানই নাই। শ্মশান-ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ।

এখন, আমি যখন এখানে ছিলাম কোন সাধু সন্ন্যাসী দেখি নাই, কোন সাধককেও দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

প্রায় আড়াই প্রহরের পর পূজা ও ভোগ হইয়া গেলে শিবা ভোগ হইল এবং আমাদের প্রসাদ পাইবার স্থান হইল। প্রায় বার তের জনের পাতা হইয়াছিল। বালক, ষোয়ান, বৃদ্ধ—প্রায় সকলেই এখানকার লোক, বাহিরের লোকের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আর কোথাকার নায়েব এবং গোমস্তা দুই এক জন ছিলেন।

প্রসাদ পাইবার পর এদিক-ওদিক ঘুরিয়া দিনমান কাটাইলাম। অট্টহাসে যাইবার পথের খবর করিলাম। এখান হইতে দুই তিনটি ষ্টেশন পরে পচণ্ডী ষ্টেশনে নামিয়া ক্রোশ দুই আন্দাজ চলিয়া যাইতে হয়। আজ রাত্রে এখানে কাটাইয়া প্রাতে অট্টহাসে যাত্রা করিব সঙ্কল্প করিলাম। স্থানটি দেখিয়া এখানে বেশী দিন থাকিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। আমার মনে হইল, এখানে আর এমন কিছুই নাই যাহাতে কিছু দিন থাকিয়া যাইতে লোভ হয়।

একদল বালক দেখিলাম,—আসপাশের গৃহস্থ ঘরের ছেলে, যাত্রী দেখিলেই পয়সা চায় এবং পাইলে তাহা পান-বিড়ি খাইয়া উড়াইয়া দেয়। পড়াশুনা করে না। কেহ কেহ স্কুল বা পাঠশালায় যায় বলিল বটে কিন্তু দুপুরবেলাটা হো হো করিয়া কাটাইতেই দেখিলাম।

সন্ধ্যার পরে আরতি হইয়া গেল, আমার আহারাদির কোনও চেষ্টা ছিল না,—ঘাটের চাঁদনীতে কম্বলখানি বিছাইয়া শয়নের যোগাড় করিলাম। মশা এত যে গায়ে ঢাকা দিয়াও নিষ্কৃতি নাই। ভিতরে জানিনা কেমন করিয়া কয়েকটা ঢুকিয়া জ্বালাইতে লাগিল। বহুক্ষণ ছট্ ফট্ করিয়া একটু ঘুম আসিল, জানিনা কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম। হঠাৎ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একজন মানুষের উচ্চ আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্থির হইয়া কিছুক্ষণ শুনিতে লাগিলাম, ব্যাপারটি কি! কতক্ষণ পর বুঝিলাম, একজনের কনফেশনের অর্থাৎ পাপ-স্বীকারের ব্যাপার। উঠিয়া বসিলাম।

লক্ষ্য করিলাম, নাটমন্দিরের বাইরে সোজাসুজি মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া একটি দৃঢ় স্থূলকায় ব্যক্তি-বিশেষ দাঁড়াইয়া। বেশ বুঝা যায় নাতিদীর্ঘখর্ব্ব শরীর একটি, কোমর অবধি কাপড়। বেশ স্পষ্ট শব্দে এবং সহজ কথার ভাষায় আত্ম-দোষ স্খলনার্থে যাহা মায়ের চরণে নিবেদন করিতেছে তাহা এইরূপ,—

মা জগদম্বা! তুমি ত অন্তর্য্যামী মা। সবই জান আমি হিংসার বশে একাজ করি নি, প্রাণে মারাও আমার ইচ্ছা ছিল না, অন্ধকার রাত্রে অস্থানে লেগেই তার প্রাণ গেল। যে টাকার জন্যে একাজ করেছিলাম সে টাকাও সব ত পেলাম না, তাতে আমার জাতও গেল, পেটও ভরল না। মেয়েটাও হাতছাড়া হয়ে গেল, কেমন করে পাঁচজনের ভিতর থেকে সে সরে পড়লো তাও বুঝতে পারলুম না। মা কালিকে! তুমি জান, মেয়েটার উপর আমার লোভ হয়েছিল। সে

স্বীকারও পেয়েছিল এ দায় থেকে উদ্ধার করে দিলে সে আমার কাছে থাকবে,—কিন্তু মা! তুমিই ঠিক জানো সে কেমন করে সরে পড়লো। আজ আমি উপবাস করে আছি। অন্নজল মুখে দিইনি, কেবল একটু তালের রস খেয়ে দিনটি কাটিয়েছি, রাতও কাটাবো!

তারপর ঐ গিরীশের বোয়ের হাত থেকে গয়না খুলে নেওয়ার কাজে আমি একলা ছিলুম না, বরেন্দ্রও ছিল। সে ত কিছু করে নি, আমি একলাই ত সব করেছিলাম, কেন তাকে ভাগ দেবো মা! তাকে আমি ভাগ দিইনি, সেই জন্যে সে ভয় দেখিয়েছিল একথা প্রচার করে দেবে। তাই আমি তাকে খুন করবো ভয় দেখিয়েছিলুম বোলে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মা! তুমি আমায় বরাবরই রক্ষা করে এসেছ, এবারেও রক্ষে কোরো মা! আমি তোমার দাস, তোমার পূজা না করে কোন দিনই কাটাই নি, জলগ্রহণ করি নি। আমি তোমার সেই সন্তান, মা! যাকে তুমি ছোট বেলা থেকে রক্ষে করে এসেছ। দ্বারিকের মকদ্দমায় সাক্ষী দিয়ে তার উপকার করতে গেলাম, পঁচিশটি টাকার লোভে তুমি জান মা! সে টাকা আমায় দিলে না, মকদ্দমায় হার হোলো তার। সে জন্য কি আমি দায়ী, আমারও জেল হোতো, এমনই বিপদে সে আমায় ফেলেছিল, সেই জন্যেই ত আমি তার মাল সরিয়েছি। সে বুঝতে পারলেও তোমার দয়ায় আমার কিছু করতে পারে নি, এখন আমায় অন্য উপায়ে জব্দ করবার ফিকিরে আছে,—তা তুমি সবই জান, তুমিই আমায় রক্ষে করবে, আমার ভরসা আছে। দেবি চণ্ডিকে! তোমার কাছে আমি কোন কাজ গোপন রাখি নি—কখনও রাখবো না। তোমার কাছে নিবেদন করলে আমার প্রাণটা হালকা হয়, বড় শান্তি পাই মা! আমি এবার লক্ষ জপ করবো মা, মানস করেছি, এ অমাবস্যা থেকেই সুরু কোরবো, মনে মনে সঙ্কল্প করে রেখেছি। এখন তোমার দয়া। তুমি ছাড়া আর ত আমি কাকেও জানি না। ইত্যাদি—



এই ভাবে অনেকক্ষণ চলিল। আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম এরূপ অপরাধ-স্বীকার জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখনও এদেশে শুনি নাই। আমার ধারণা ছিল না এরূপ ভাবে একজন পীঠস্থানে দাঁড়াইয়া নিজ অকর্ম্মের অপরাধ অকপটে স্বীকার করিতে পারে। আমার ঘুম উড়িয়া গেল, লোকটা ডাকাত নাকি? বসিয়া বসিয়া এই সকল যাহা স্বকর্ণে এইমাত্র শুনিলাম তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে এক ফালী চাঁদ উঠিয়াছে, অল্প অল্প আলোক হইয়া কতকটা দেখা যাইতেছিল। এই ষণ্ডামার্ক লোকটি, ইহাকে আমি আজ এখানে স্নান করিতে

দেখিয়াছিলাম মনে হইল। লোকটির মোচার মত গোঁফ আছে, ভরাট মুখ, বড় বড় রক্তবর্ণ চক্ষু তাহাতে জ্বালা আছে, মাধুর্য্য নাই,—দাড়ি কামানো, চুলগুলি খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মধ্যে সঙ্কীর্ণ শিখা একটি। চওড়া কালো পাড়ের সাড়ি একখানি পরা, নাভির নীচে কাপড়ের কষি-আঁটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধে গামছা একখান। এমূর্ত্তি আজ স্নানের বেলা দেখিয়াছিলাম স্পষ্ট মনে পড়িল। আমাকেও সে লক্ষ্য করিয়াছিল।

মূর্ত্তিটি তান্ত্রিক ভৈরবের মতই কিন্তু লাল কাপড় নয়, সাধারণ গৃহীদের মতই বিশিষ্টতাশূন্য; নির্ভয় এবং নিঃসঙ্কোচ মূর্ত্তি, এমন মানুষ প্রায় নজরে পড়ে না।

লোকটি এতক্ষণ আত্মনিবেদন করিয়া যেন কতকটা ক্লান্ত হইয়াই বসিবার জন্য চাঁদনীর দিকে আসিতে লাগিল। আমার একটু ভয় হইল। যদি টের পায় যে আমি শুনিয়াছি তাহা হইলে সে ব্যক্তি আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে। এখন একটু চাঁদ-উঠিয়াছে, কতকটা আলোও হইয়াছে আমায় ত দেখিতে পাইবেই। নিঃশব্দে আমি শুইয়া পড়িলাম। সে ব্যক্তি আসিয়া দেখিল একজন ঘুমাইয়াছে তখন অপর দিকে বিস্তৃত মার্ব্বেল পাথরের আসনে উপবেশন করিল। তারপর একটা বিড়ি ধরাইয়া সজোরে টান লাগাইল।

আমি অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া শেষে উঠিয়া বসিলাম। বলিলামঃ উঃ ভয়ানক মশা। তখন অম্লানবদনে সে ব্যক্তি হাত বাড়াইয়া বলিলঃ বাবাজি একটা বিড়ি ইচ্ছা করবেন নাকি? আমি না, বলিয়াই উঠিয়া চাদরটি ঝাড়িয়া লইলাম,—বড়ই মশার উপদ্রব। স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতার ভাব দেখাইয়া—যেন কিছুই হয় নাই। সহজ মানুষের মত সে ব্যক্তি তখন—বাবাজীর কোথা থেকে আসা হচ্চে? কোথা যাওয়া হবে? বাবাজীর কি সম্প্রদায়—ইত্যাদি প্রশ্নের পর প্রশ্নে আপ্যায়িত করিয়া শেষে বলিলঃ এখানে এসে আপনাদের কিছুই সুখ হবে না,—সব অনাচার আর অনাচার। আর এখন মানুষের মা জগদম্বার উপর সে ভক্তি নেই,—এখন সকলে স্ব স্ব প্রধান, স্বার্থপর বুঝলেন কিনা? তা আপনি তারা-পীঠে গিয়ে খুসী হবেন, সেথা জায়গাও ভাল পাবেন। সেখানে চক্কোত্তি মশায় আছেন,—শ্মশানে আজ পাঁচ ছয় বছর আছেন, বারো বছর হোলে সিদ্ধ হয়ে তবে বেরোবেন।

আমি আর বেশী কথা বাড়াইতে চাই না দেখিয়া তিনি তখন বলিলেনঃ আপনি তা হোলে শুয়ে পড়ুন। তখন চাদরখানি আবার ঝাড়িয়া শুইয়া পড়িলাম। সে তখন উঠিয়া পূর্ব্বস্থানে গিয়া দাঁড়াইল এবং হাতজোড় করিয়া স্তবপাঠ করিতে লাগিল। দেবি প্রাপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগদখিলস্য ইত্যাদি। সম্পূর্ণ পাঠ হইলে তখন আবার নিজ ভাষায় আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। হে আদ্যাশক্তি, ভগবতি, মা, জগদম্বে! আমার অশেষ পাপ তুমি ক্ষমা করেছ,— এ জগতে কোন্ বেটার পাপ নেই, কেউ বুকে হাত দিয়ে বোলতে পারে কি যে তার পাপ নেই? তারা কি তোমার কাছে এমন করে মনের পাপ স্বীকার করতে পারে? যদি তা করে তা হোলে কতটা ভাল হয়। মা জননি, জগৎ-প্রসবিনি, কালিকে! তুমি ত ভক্তবৎসল, তোমায়

যে প্রাণ দিয়ে ডাকে, তোমার কাছে নিজ দোষ স্বীকার করে, তাকে তুমি অভয় দাও মা!

২৯

পরদিন প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলাম, অট্টহাসে যাইব। মন্দির তখনও খোলা হয় নাই, পুরোহিত মহাশয় দ্বার খুলিতেই আসিতেছিলেন, দ্বার খোলা হইলে তখন আর একবার মূর্ত্তিটি দেখিলাম। রক্তবস্ত্র আচ্ছাদিত এবং স্তূপাকৃতি যাহা সম্মুখে দেখিলাম সেটি কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি নয়, তাহার অধিকাংশ ভাগ পুষ্প-বিল্বপত্রাদিতে আচ্ছন্ন, যদিও তাহাতে একটি মূর্ত্তির ভাব আছে এবং কৌশলে অলঙ্কার পুষ্পমালাদিতে বিভূষিতও বটে। পুরোহিতকে তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: ইহা কিরূপ মূর্ত্তি? তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—বস্ত্রে-ঢাকা যে মূর্ত্তি আছে, উহা বহুকাল হইতেই বাহিরে দেখাইবার নিয়ম নাই। স্নান ও বেশের সময় দ্বার বন্ধ করিয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে উহা বাহির করিয়া পূজা-অর্চ্চনার পর পুনরায় ঢাকা দিতে হয়। সে মূর্ত্তি পুরোহিত ব্যতীত আর কেহ দেখিতে পায় না।

সে মূর্ত্তিটি কিরূপ? জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি স্পষ্ট কিছুই বলিতে পারিলেন না। খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে উহা একখানি খোদিত প্রস্তর, তাহার মধ্যে অস্পষ্ট মায়ের মূর্ত্তি আছে, সিন্দূরে সম্পূর্ণই রঞ্জিত। এমূর্ত্তি যে কিরূপ তাহা পুরোহিতেরও স্পষ্ট ধারণা নাই। পূজার্চ্চনা পূর্ব্বাপর যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে তিনি সেই ভাবেই করিয়া যান। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, প্রথমে ইহার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না, এখন যেন লোকের মনে একটা প্রচ্ছন্ন রহস্যের ভাব সৃষ্টি করাই এ সকলের উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে। এখানে যাহা, অট্টহাসেও তাই, আবার তারাপীঠেও তাই দেখিয়াছিলাম। অবিকল একই ব্যাপার চলিতেছে, তাহার কথা সময়ে বলিব। এখন এটুকু বুঝিলাম এখানে লাল কাপড়-ঢাকা উপরের মূর্ত্তির নীচে যেটি আছেন যাহার স্নান-পূজাদি গোপনে করা হয়,—সেটি বহু প্রাচীন ভাস্কর্য্য কলার নষ্ট সৌন্দর্য্য, ক্ষয়প্রাপ্ত নিদর্শন, বহুকাল হইতেই আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিহ্নাদি বিলুপ্ত একখানি সিন্দূর-রঞ্জিত প্রস্তরমূর্ত্তি। ইহা কোন্ কালে কাহার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কোনও বিবরণ কাহারও জানা নাই, সুতরাং তাহার অনুসন্ধান বিড়ম্বনা মাত্র। পুরোহিতের ধারণা যে সতী-দেহের যে অংশ এখানে পড়িয়াছিল উহাই পাথর হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পবিত্রতা রক্ষার জন্যই সিন্দূর-লিপ্ত করিয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে রাখা হইয়াছে। লোকে দেখিলে অমঙ্গল ঘটিবে। আমাদের কলিকাতার দক্ষিণে কালিঘাটে যে কালী-মূর্ত্তি আছে সেখানেও এই ব্যাপার। লোলজিহ্বা ধাতুময় যে বিশাল মুণ্ড সকলে দর্শন করিয়া ধন্য হন, সেটি আসল মূর্ত্তিই নয় আসল মূর্ত্তি পাঁচটি আঙ্গুলের প্রস্তরময় আকৃতি, উহা একটি আধারে, উপরিস্থিত বিশাল ধাতুময় শরীরের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। প্রায় সকল মহাপীঠেই একই রূপ ব্যবস্থা। বাহিরের খোলসটিকেই সকলে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে।

আসলে সতী-দেহের নানা অংশ নানা স্থানে পড়িয়াই যে বাহান্ন পীঠের উৎপত্তি হইয়াছে, আমার ইহাকে মাইথলজী বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রবৃত্তি হয় না বরং ইহা সত্য এবং স্বাভাবিক বলিয়াই ধারণা। দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার যে ঐতিহাসিক তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ, যদিও ইহা প্রমাণ করিতে হিমালয়-পাণ্ডিত্য আমার নাই। তবে যে সকল সহজ অনুমান লইয়া সতী-দেহ হইতে বাহান্ন পীঠের উৎপত্তি এই ধারণা আমার বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে তাহার কতকটা প্রকাশ করিতে দোষ নাই।

পরবর্ত্তী কালে, অর্থাৎ বীরভূমের পীঠস্থানগুলিতে ঘুরিয়া প্রায় এক দেড় বৎসর পর যখন আমি তীব্বতে কৈলাস ও মানস-সরোবরাদি তীর্থ-পর্য্যটনের সুযোগ পাইয়াছিলাম তখনই এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেখানকার কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যবহার এবং লোকাচার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বিশেষরূপেই ধারণা হইয়াছিল। যে আমাদের ভারতের বিশেষত বাঙ্গলার সঙ্গে যখন এ সকল ব্যবহারের এতটা মিল এবং এতটা বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতেছি তখন সেখান হইতেই এ সকল এখানে আসিয়াছে। অবশ্য তখন ঠিক ধারণা করিতে পারি নাই এদেশ হইতে সে সকল ও দেশে গিয়াছে কিম্বা তাহার বিপরীত। তারপর তন্ত্রধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে কয়েকজন পণ্ডিতের মতের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় ঘটিল, তখনই স্পষ্ট-রূপে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে তীব্বত হইতেই যত কিছু মূল তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ভারতে তথা বাঙ্গলায় আসিয়াছে।*

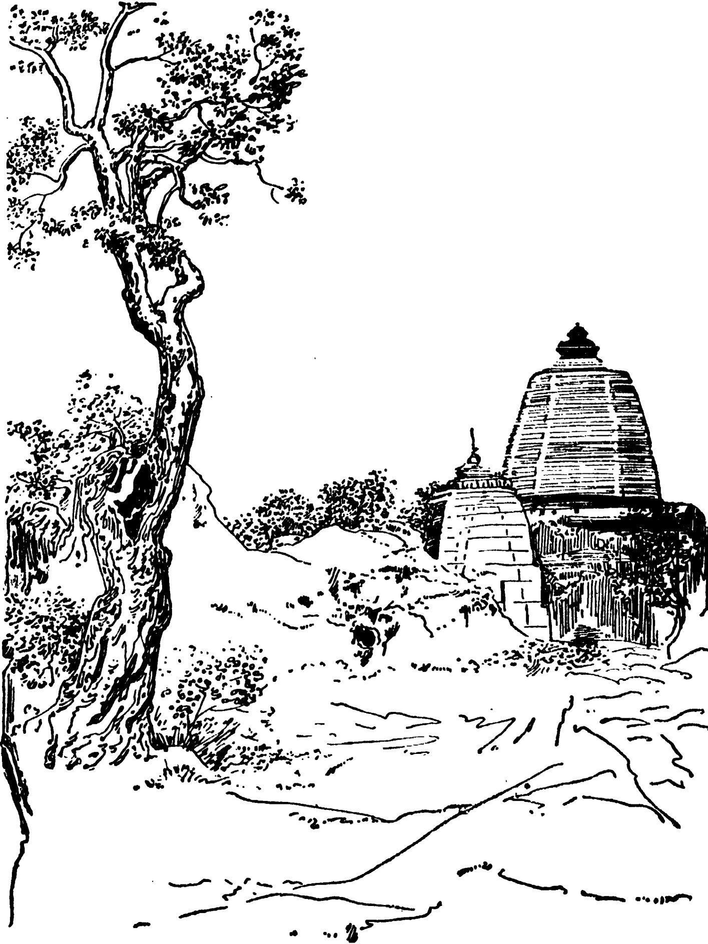
এখন, সতীর দেহাংশ হইতে যে ভারতে বাহান্ন পীঠের উৎপত্তি এবং যে কারণে ইহা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস তাহাই বলিতেছি।

তীব্বতে কোন অসাধারণ মানুষের দেহত্যাগ ঘটিলে সেই দেহের সংকার নানা প্রকারেই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটি এই যে, মৃতদেহের পূর্ণ অংশ অথবা অংশ-বিশেষ লইয়া তাহার উপর সমাধি অথবা স্তূপ নির্ম্মাণ করা। কেশ, অস্থি, নখ, দন্ত প্রভৃতি মহান ব্যক্তির মৃতদেহের কোন অংশই সেখানে ফেলা যায় না। এমন কি হাড়গুলি পর্য্যন্ত মালা করিয়া ধারণ করা হয়।

ভারতে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার নখ, চুল, দাঁত লইয়া কত কত স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। অবশ্য সে সকল তাঁহার জীবিত অবস্থায়ই সংগৃহীত কিন্তু তীব্বতে দেহত্যাগের পরও এ সকল সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই প্রকার ব্যবহার যে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর ভারতে আচরিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট। তাহার পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ভারতে ছিল না। এ প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারত-সংলগ্ন কোনো স্থানে প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে ভারতে আসিয়াছে বলিয়াই মনে করি। বুদ্ধ অপেক্ষা শিব অনেক প্রাচীন কালের মানুষ, আর কৈলাস হইল তাহার অতি প্রিয়স্থান যাহা তীব্বতের মধ্যে বলিয়াই আমরা জানি, সুতরাং এ

* যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে চান তাঁহারা Modern Review, Aug. 34. সংখ্যায় অধ্যাপক নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর Home of Tantricism প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিবেন।

প্রথা তীব্বত হইতে ভারতে আসিয়াছে ধরিলে ভুল হয় না। কাজেই সে কালে সতীর দেহ-ত্যাগের পর সেই শরীর বহুধা খণ্ডিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ছড়ানো হইয়াছে, আমার মনে হয় যে ইহা মোটেই কাল্পনিক নয় এবং প্রথমে শিব-প্রচারিত তন্ত্রধর্ম্মের প্রত্যেক কেন্দ্রেই উহা ক্ষুদ্র স্তূপাকারে রক্ষিত হইয়াছে। ক্রমে তাহার উপর মন্দির গড়িয়াছে, তাহার মধ্যে পরবর্ত্তী কালে মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই ভারতের মহাপীঠের আদি ইতিহাস।



পুরাণের কথা এই যে দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে শিব সেই দেবী-দেহ স্কন্ধে লইয়া বাহির হইলেন। তারপর একমতে, শিব সতীদেহের কেশ ধারণ করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন এবং বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের দ্বারা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। ফলে যে যে স্থানে ঐ শরীরের যে-যে অংশ পড়িয়াছে সেই-সেই স্থানে মহাপীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় মত এই যে, সতী-প্রেমে উন্মাদ শিব, সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া পর্য্যটন করিতে লাগিলেন আর নারদ, শিবের

অগোচরে চক্রের দ্বারা কৌশলে ঐ দেহ কাটিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে যে-যে স্থানে মহাশক্তিরূপিণী সতীর দেহাংশ পড়িল সেই সেই স্থান মহাপীঠ হইয়া গেল। শেষে শিব যখন দেখিলেন যে সতীদেহ স্কন্ধে নাই তখন তিনি পুনরায় যোগে বসিলেন।

আসলে সতীদেহের অংশ বিশেষ হইতেই, যে একান্ন বা বাহান্নটি মহাপীঠের উদ্ভব তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই অন্তত তন্ত্রমতের যাঁহারা, তাঁহারা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

এখন পুরাণের সম্বন্ধে যেরূপ গভীর গবেষণা এবং আলোচনা চলিতেছে মনে হয় দক্ষযজ্ঞের সত্য ইতিহাস, তাহার কাল এবং স্থানাদি যথার্থরূপে নির্ণীত হইবে। তবে ইহাও সত্য যে একশ্রেণীর পণ্ডিত মানুষ, তাঁরা এ সকল পৌরাণিক ব্যাপার রূপক ব্যতীত আর কিছুই নয় এ ধারণা হইতে বিচলিত হইবেন না।

আমি প্রাতেই অট্টহাস যাত্রা করিলাম। ঠিক মনে হইতেছে না, নিরোল অথবা পচণ্ডি ষ্টেশনে নামিয়াছিলাম। ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটিতে হইয়াছিল। মাঠের উপর দিয়াই পথ, মধ্যে মধ্যে ঘন বৃক্ষলতাপূর্ণ জনবহুল গ্রামও আছে। ঐরূপ দুইখানি গ্রাম এবং একটি ছোট খাল বা নদী নৌকায় পার হইয়া দশটা নাগাত অট্টহাস মহাপীঠের মনোরম বৃক্ষতলায় পরিবেষ্টিত জনবিরল স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইলাম।

এখানে একজন বৃদ্ধ ভৈরব ও ভৈরবী আছেন। তখন ভৈরব পূজায় ছিলেন। ছোট একটি পুরাতন মন্দির সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। পাশেই জঙ্গল। ফলের মধ্যে আমগাছ দুই তিনটি, লেবু ও কলাগাছ কয়েকটি দেখিয়াছিলাম। পীঠস্থানের পাশেই ছাদ-আচ্ছাদিত একটি স্থান, নাটমন্দিরের ধরণ, অতিথি অভ্যাগতদের আশ্রয়,—মন্দিরের পাশেই ভোগ-রান্নার ঘর। প্রাঙ্গণে একটি বিশাল বটবৃক্ষ আছে, অনেকগুলি তাহার ঝুরি নামিয়াছে, উচ্চ শাখায় সারি সারি বাদুড় ঝুলিতেছে। সেই বৃক্ষের পার্শ্বেই ভৈরবের বাসস্থান, সম্মুখেই দাওয়া, তারপর চালাঘর। ভৈরব অধিকাংশ সময় দাওয়ায় বসিয়া থাকেন, তামাক খান এবং দু পাঁচজন যাঁরা আসেন তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করেন। সচরাচর নেশার মধ্যে চরস ও গাঁজাই এখানে বেশীর ভাগ চলে।

ভৈরব মহাশয় সরল, অকপট মানুষটি, কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ক্রিয়াকর্ম্ম যদি করিতে পারি তবেই কারণ (অর্থাৎ মদ্য ব্যবহার) করি, না হইলে বৃথা কারণ স্পর্শ করি না। বয়স তাঁর অনুমান আটষট্টি, খর্ব্বাকৃতি, দৃঢ় শরীর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথার সম্মুখে কেশশূন্য, পশ্চাতে শিখা, দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে বড় বড় পাকা চুল, পাকা দাড়ি, পাকা গোঁফ, তাহার মধ্যভাগ অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে পীতাভ। পরনে রক্তাম্বর, ধীর শান্ত প্রকৃতি, মৃদুস্বরে কথা কওয়াই তাঁহার অভ্যাস। গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। হাতেও রুদ্রাক্ষের তাগা, তাহার মধ্যে মাদুলী।

তাম্রশ্যামা ভৈরবী ঠাকুরাণীর বয়স ভৈরব অপেক্ষা ছয় আট বৎসর কম হইবে। মোটা-সোটা শরীর, গিন্নিবান্নিগোছের ভাবটি। নীচের হাতে সোনার বালা, শাঁখা, নোয়া। উপর হাতে তাগা, আবার তাহার উপর ডোর দিয়া মাদুলী তিনটি। মুখে হাসি, সম্মুখের দুইটি দাঁত নাই।

লাল কাপড়, তার পাড়ও ঘোর লাল, পূর্ব্ববঙ্গের ধরণে ফেরতা দিয়া পরা। অভ্যাগত অতিথির প্রতি স্নেহ আছে, তাঁহার মধ্যে সেবা-যত্নের প্রবৃত্তি স্পষ্ট। দেখা মাত্রই বলিলেন: এসেছ ত বাবা দুদিন থাক, আমরা এই জঙ্গলে একলা থাকি, তোমাদের পেলে বড় আহ্লাদ হয়, মনে হয় আজ কি ভাগ্য!



ভাদ্র মাস, তাল পাকিয়াছে, দেখিলাম তালের আঁটি হইতে শাঁস বাহির করিতেছেন, তাহার গন্ধ চারিদিকে। কি জানি কেন বাল্যকাল হইতে পাকা তালের গন্ধ সহ্য করিতে পারি না। নাকে কাপড় দিয়াছিলাম দেখিয়া বলিলেন: ওমা তুমি কেমন ছেলে গো, তাল ভালবাস না! তাহোলে কি হবে, তুমি তালের বড়া খাবে না বাবা?

আমি বলিলাম : বড়া হোলে ভাল হবে, কাঁচা গন্ধটা বড় খারাপ লাগে আমার।

তিনি বলিলেন : এখন তালের সময়, পরমান্নর সঙ্গে তালের বড়া করে ভোগ দিতে হয়।

আমি এদিক ওদিক ঘুরিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইলাম, তারপর ভৈরবের কাছে গিয়া যখন বসিলাম তখন তিনি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন, তামাক খাইবেন তাহার যোগাড় করিতেছেন। গিয়া বসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার সংসারে কে কে আছেন ?

বলিলাম : বাপ মা, ভাই বোন, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সবাই আছেন।

তিনি বলিলেন : হুঁ,—তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন : নিবাস কোথা, জন্মস্থান ? আমি বলিলাম : কলিকাতায়।

তিনি : গিরীশবাবুকে জানো, থিয়েটারের গিরীশ ঘোষ ?

আমি : হাঁ, তাঁর সঙ্গে যদিও পরিচয় নাই, তবুও তাঁকে জানে অনেকেই, তিনি বিখ্যাত লোক।

তিনি : তিনি ভক্ত লোক, প্রতি বৎসর এখানে অনেক সাহায্য করেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : তিনি তন্ত্রমতের সাধনা কিছু করেছেন ?

তিনি : তিনি নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক, গৃহিলোকের মধ্যে তাঁর মত সাধক খুব কমই হয়। তিনি অনেক সাধনা করেছেন।

আমি বলিলাম : আমরা জানি তিনি পরমহংসদেবের ভক্ত ; সাধন-ক্রিয়াদি তিনি যে কিছু করেছেন তা আমরা জানি না।

তিনি : তোমরা তাঁর সাধন-ভজনের কথা জানবে কি করে, তন্ত্রমতে, সাধন ত গুহ্য ব্যাপার। গুপ্তভাবে তাঁর অনেক সাধন আছে।

আমি : আজ আপনার মুখে তাঁর সাধনের কথা শুনে আশ্চর্য্য হোলাম, আমরা স্বধু তাঁকে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার বলেই জানতাম, তবে স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারি নি।

তিনি : তিনি ভণ্ড লোক নয়, তাঁর দান বা সাধন-ভজন সবই গুহ্য। তিনি মার সাক্ষাৎ-কৃপা পেয়েছেন।

তাঁর এই কৃপা শব্দটি আমার মধ্যে প্রশ্ন জাগাইল ; কারণ এই কৃপা শব্দটি উচ্চারণে তাঁর একটু বিশেষত্ব ছিল ; তাই আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম : আমার একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে লোভ হচ্ছে, বোলবো কি ?

তিনি বলিলেন : যেই আমি বোলেছি মায়ের কৃপা পেয়েছেন, অমনি তোমার বুঝি মায়ের কৃপার কথা মনে হোলো, যে তাঁর ঐ কৃপাটি কেমন ?

আমি বলিলাম : সত্য, ঠিকই আমার তাই-ই মনে হয়েছে।

তিনি : কৃপা বোলতে যা বুঝায় তা কি তুমি জান না ?

আমি : সাধারণত কৃপা বোলতে আমরা দয়াই বুঝি। কামনার পূর্ত্তি, কোন অসুবিধায়

পড়লে সেই অসুবিধা-দূর, অর্থের অভাবে অর্থপ্রাপ্তি, রোগে আরোগ্য, বিপদে ভয়ে উদ্ধার, এই সবই ত কৃপা বোলে জানি।

তিনি এইবার তামাকটি যুতমত ধরাইয়া লম্বা একটি টান লাগাইলেন, তারপর কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ছাড়িয়া স্থানটি ঝাঁপসা করিয়া দিলেন, ধীরে ধীরে তারপর বলিলেন : তবে ত সব জানো দেখছি, আবার কি চাই ?

আমি বলিলাম : ও সব ছেড়ে দিন, দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত যাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্ম-সুখসর্ব্বস্ব বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই জাগে নি, অভাবে পড়লে নিজ শক্তিতে অভাব মোচনে উদ্যমহীন যারা, তাদের বুদ্ধিতে ভগবৎকৃপা ত ঐ রকমই, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি।

এখন আসলে কৃপা বস্তুটির স্বরূপ কি, গিরীশবাবুর কথায় আপনি কৃপা শব্দটি কিভাবে ব্যবহার করেছেন তাই ত জানতে চাই।

তিনি বলিলেন : কৃপা যিনি পান, আর, যাঁর কৃপা হয় তাঁরাই ঠিক বোঝেন অন্যের পক্ষে বোঝা মুস্কিল আছে,—তাই বলছিলাম,—

আমি বলিলাম : আপনি সরল ভাবেই বলুন না কেন! শুনিয়া তিনি বলিলেন : এই দেখ, তুমি জিজ্ঞাসু হয়েছ তোমায় সন্তুষ্ট করতেই হবে, না হোলে অন্যায় হয়, অথচ ব্যাপারটি বুঝানো মোটেই সহজ নয়,—এখন আমি কি করি। আচ্ছা, স্বার্থপ্রণোদিত স্থূল বিষয়ের কামনাগুলি যে স্থূলবুদ্ধি মানুষের মনের মধ্যেই ওঠে, এটা ত বুঝতে পেরেছ,—

আমি বলিলাম : ভগবৎ সম্পর্কেও দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার যে বেশীর ভাগ হিন্দু-সমাজের মানুষের মধ্যে চলছে এ কথায় আর কাজ নেই, ওত হয়ে গেছে—এখন বলুন।

তিনি : তাই এইবার বলি শোনো,—আচ্ছা, দেওয়া আছে, নেওয়া বা চাওয়া নেই, এমন একটা ব্যাপার বুঝতে পার ?

আমি : অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে উপাসনা আছে অথচ তার পরিবর্ত্তে কোনও কামনা নেই, এই কথা বোলছেন ত ?

তিনি : হাঁ, তাই বলছি। ঐ রকম অনুরাগের ভাবটি যার এসেছে, তার ইষ্টের দিকে নিঃস্বার্থভাবেই লক্ষ্য থাকে,—তার সকল কাজে, সকল চিন্তায়, সকল ব্যবহারেই জগদম্বার দিকে সহজ ভাবের টান থাকে। অভাব-অভিযোগের ব্যাপার তার নিজ মনে বা সংসারে থাকলেও ইষ্টের কাছ থেকে অভাব-মোচনের কামনা তার মনেও আসে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : অভাব আছে, আবার অভাব-মোচনে শক্তিমান একজন নিকটেও আছে, অথচ তার কাছে অভাব দূর করতে যাচিঞা করতে ইচ্ছা হয় না, এটা কি স্বাভাবিক বোলে বোধ হয় ? তোমার এই স্বাভাবিক কথাটির ভাব কি আপেক্ষিক নয় ? সকলকার পক্ষে কি বিশেষ একটি ব্যাপার বা মনোভাব স্বাভাবিক হোতে পারে ? ক্ষেত্র-হিসাবে ভাবের অনেক তারতম্য হয় না কি ? যেমন আমার পক্ষে তামাক খাওয়া, গাঁজা খাওয়া সেটা স্বাভাবিক, তোমার পক্ষেও কি তাই ? তেমনি একজনের পক্ষে ইষ্ট-পূজা বা উপাসনার সঙ্গে প্রার্থনা,

অভাব-মোচনের কামনা যেমন স্বাভাবিক আর একজনের কাজে সেটি অস্বাভাবিক,—কেন এটা কি বুঝতে এতই কঠিন ?

আমি বলিলাম : বুঝতে কঠিন নয় কিন্তু প্রায়ই এমনটি দেখা যায় না,—যাঁর এ ভাব হয় তিনি মহা ভাগ্যবান বোলতে হবে।

তিনি : হাঁ, তাতে আর সন্দেহ কি ? এ ত সকলের কথা নয়, এ যে এক জন বিশিষ্ট সাধকের কথা। এখন ঐ যে অনুরাগে, স্বভাবের টানে ইষ্টের উপর লক্ষ্য সাধকের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ তাঁর অস্তিত্বের অনুভব চলতে থাকে,—ওদিকেও, তার ফলে তাঁর ইষ্টেরও লক্ষ্য সর্ব্বক্ষণ তাঁর প্রতি রয়েছে, ক্রমে এটি সাধক উপলব্ধি করে থাকেন,—এটি বুঝতে পার ?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আচ্ছা ! এর মধ্যে রূপের ব্যাপার আছে কি ?

তিনি বলিলেন : এ শক্তি-উপাসনার ব্যাপার যখন, তখন রূপ ত নিশ্চয়ই আছে। রূপ ছাড়া শক্তি প্রত্যক্ষ হয় কি করে ? সে রূপের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ অনুভবের ব্যাপার যে।

আমি : সে রূপ কি বরাবরই থেকে যায় ?

তিনি : তা কি থাকে ? তোমার এই যে রূপ, এ কি বরাবরই থাকবে ? এখানে কোন বাহ্য দৃশ্য বস্তু চিরস্থায়ী ভাবে রূপ পায় না। তখনও রূপ সেই সাধকের মধ্যে বাহ্য ব্যাপার কি না ? পরে সেই রূপ আত্মশক্তির মধ্যে চলে যায়, মিশে যায়, যদি সাধকের সে অবস্থায় কোনও বিকৃতি না আসে। আনন্দের চাপে ও অবস্থায় তখন অনেকেই পাগল হবার যোগাড় হয়। বেশ শক্তিমান আধার না হোলে, শক্তির সাধনায় যে সকল ভাব হয় সে সব কি হজম করতে পারে, না ভোগ করতে পারে !

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : তা হোলে কৃপা কোন্ ব্যাপার,—বলুন ?

তিনি : ভক্ত বা সাধকের লক্ষ্য ইষ্টরূপিণী জগদম্বার উপর স্থির হোলে, ঐ যে মায়ের লক্ষ্যও তার উপর পড়ে, সেই লক্ষ্য সাধকের প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও শক্তির ধারা বহায়,—সাধক তখন প্রত্যক্ষ অনুভব করেন তাঁর মহিমা, এই হোলো কৃপা, এই ভাবটিকে লক্ষ্য করেই মর্ম্মীরা বলে থাকেন, অমুকের উপর ভগবৎ-কৃপা হয়েছে বা মায়ের কৃপা হয়েছে।

আমি : তাহোলে আসলে সাধকের ইষ্টের প্রতি লক্ষ্যের ফলে ইষ্টেরও যে সাধকের উপর প্রতিলক্ষ্য তাকেই ত আপনি কৃপা বোলছেন ?

তিনি : হাঁ, তাই ত, তবে তুমি বাবা ঐ যে সব ছেঁটেকেটে স্বধু লক্ষ্য আর প্রতিলক্ষ্য বোললে ওটা ঠিক লক্ষ্য আর প্রতিলক্ষ্য মাত্র নয়। সেই জন্যই আমি বোলেছিলাম যে কৃপা বুঝানো সহজ নয়, যে পায় আর যার কাছ থেকে পায় এরা যেমন এটি বুঝে, এমনটি আর কেউ বুঝতে পারে না, অন্য পক্ষে,—

আমি বলিলাম : আমাকে বুঝে নিতে হবে ত ?

তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন : ঐ হয়েছে তোমাদের অল্প-বিদ্যার দোষ, কেবল বুঝবো আর বুঝবো। পরে একেবারেই উচ্চ আওয়াজে বলিলেন : তোর সাধ্য কি যে তুই

আধ্যাত্মিক ব্যাপার সব বুঝবি,—তোর সে শক্তি কোথা? তুই যেটা বুঝবি সে ত তোর মন-গড়া একটা কিছু করে নেওয়া, তাতে তোর জ্ঞান হবে কি করে? করে দেখনারে বাপু, করে দেখলে তখন যে বুঝবি তাতে হবে তৃপ্তি। তা নয়, কর্ম্ম নেই, ক্রিয়া কিছু না করে কর্ম্মেই, সব বুঝবো—

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইলাম। সঙ্কুচিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—আমাদের জাতীয় জীবনের শিক্ষার ধারা বদলের ফলে পূর্ব্বে আমাদের অতি সহজে যেগুলি মনে বিশ্বাস হইত এখন সেগুলি মনে বুঝিতে অনেক তর্ক-বিতর্ক আসে। এক দিকে এটা যতটা ভাল অপরদিকে আবার ততটাই অশান্তির কারণ হইয়াছে। প্রকাশ্যে বলিলাম: আপনার বিরক্তিতে আমি দুঃখ পেলাম;—আপনি কিছু মনে করবেন না; আপনাকে বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

তিনি তখন একেবারেই শান্ত হইয়া গেলেন; বলিলেন: আরে বাবা তোমরা এখন নূতন ধরণের মানুষ। ইংরাজী লেখা-পড়া শিখে আর এক রকম হয়ে পড়েছ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধন-ভজনের ব্যাপারগুলি তোমাদের কাছে অপদার্থ পুরানো হয়ে গেছে;—এখন তোমাদের নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ছাড়া আর সব কিছু নয় এই ভাবটা যেন দেখচি।

আমি বলিলাম: তাই কি ঠিক—; যদি অপদার্থই বোধ হবে তবে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করচি কেন? এখন আপনি যদি বিরূপ হন তাহোলে ত আর কিছু জিজ্ঞাসা করা চলে না। আপনারা প্রাচীন মানুষ, যা কিছু আছে তাহা আপনাদের কাছেই। যদি আপনাদের না সুধাব ত কাদের কাছে যাব!

তিনি খুসী হইলেন বোধ হইল; বলিলেন: তা কর না, করনা কেন? আমি বোলচি ত বাবা—

আমি: আচ্ছা, আপনি বোললেন যে, রূপ ধরেই তাঁকে লক্ষ্য করতে হয়। আর গভীর লক্ষ্য হোলে সাধকের প্রতিও তাঁর লক্ষ্য পড়ে। আবার সেই রূপ অর্থাৎ ভগবৎ-রূপ যা ভক্ত প্রত্যক্ষ করেন তাহা তখন বাহ্য। সাধকের অন্তরে সেই রূপের প্রকাশ হয় ত! তাহোলে তা বাহ্যরূপ হোলো কি ভাবে?

তিনি: সাধকের অহং বা আমি যে রূপটি দেখে সে রূপ বাহ্য নয় ত কি। আমি দেখছি যেটি সেটি ত আমা থেকে পৃথক? তা যদি হোলো তা হোলে বাহ্য বা বাইরের বস্তু হোলো নাকি? যতক্ষণ ঐ ভাবের দেখা ততক্ষণ ভগবৎ-স্পর্শ বা তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ দূরের ব্যাপারই থাকে। তারপর সাধন গভীর হোলে তখন আত্মা বা আমি-সত্ত্বার মধ্যে তাঁর প্রকাশ হয়ে আমি-সত্ত্বাকে প্রসারিত করে দেয়, তখন আর বাহ্যরূপ বোধ থাকে না। তখন দিব্যাচারের পূর্ণতায় সাধকের সিদ্ধি, (অষ্ট সিদ্ধির কোন সিদ্ধি নয়) জীব হয় তখন শিব। জীবসত্ত্বাকে শিব-সত্ত্বা স্পর্শ করলে তখনই সর্ব্বার্থসিদ্ধি। তান্ত্রিক সাধনের সেইখানেই সিদ্ধি—এই সিদ্ধিই কাম্য বা লক্ষ্য।' না হোলে শক্তিলাভের জন্য অষ্টসিদ্ধি অণিমা, লঘিমা এ সকল সাধকের কাম্য নয়।

আমি তখন বলিলাম : রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় এ সকল পেয়েছি! কিন্তু আমরা জানি তন্ত্রের সাধন মানে শক্তিলাভের জন্য অষ্টসিদ্ধির অনুষ্ঠান।

ভৈরব বলিলেন: তা আছে বটে কিন্তু আমরা ঠেকে শিখেছি অষ্টসিদ্ধিতে কিংবা আভিচারিক ক্রিয়া-কর্ম্মে কিছু লাভ নেই। পরমহংসদেব যা বলেছেন তা ত ঠিক, তিনি যে মহা তান্ত্রিক ছিলেন, একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

এমন সময় ভৈরবী আসিয়া খবর দিলেন, সব প্রস্তুত হইয়াছে। শুনিয়া ভৈরব মন্দিরের দিকে উঠিয়া গেলেন। যখন তিনি চক্ষের অন্তরালে তখন ভৈরবী বলিলেন: বাবা, ওঁর সঙ্গে তুমি কথাবার্ত্তায় বেশী ঘনিষ্ঠতা কোরো না,—উনি কারো বেশী কথা ভাল বাসেন না, একেবারেই জ্বলে উঠেন, আবার তক্ষুনি ঠাণ্ডা হয়ে যান। বয়স হয়েছে কিনা?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: উনি এখানে কতদিন আছেন?

তিনি: আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর ত আমিই ওর সঙ্গে আছি, তার কত আগে থেকে উনি আছেন। এই বেল-টেল ত সেদিন হয়েছে। তখন এখানে ভয়ঙ্কর জঙ্গল ছিল, উঁনি এসে সব পরিষ্কার করিয়ে সব ঠিক করে নিয়ে নিজের আসন পাতলেন। কতলোক ওঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

আমি: ওঁর কি কোন শিষ্য সেবক আছে?

তিনি: না, উঁনি কোন চ্যালা করেন নি,—আগে দু-চার জনকে মন্ত্র দিয়েছেন জানি। এখন আর কাকেও দেন না, বলেন, ওতে কিছুই হয় না, দিনকতক মন্ত্র নিয়ে বেশ নিয়মেই চলে, তারপর কেবল মদ খাওয়া আর ফুর্ত্তি,—সাধনের কিছুই থাকে না। ধর্ম্ম বোলে অধর্ম্মের ব্যবহারই চলতে থাকে, তাই উঁনি আর কাকেও আমল দেন না। তন্ত্র-ধর্ম্ম এই ভাবেই লোপ পেয়ে গেল। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন,—ভোগের সময় হইয়াছে। এখানেও শিবা-ভোগ হয়।

দেখিলাম, এঁরা পুরানো তন্ত্রের লোক—এঁদের ধারণা জগত এখন উৎসন্নের পথেই যাইতেছে, তাহার উপর কলিকালের মাহাত্ম্য আছে। বৈষ্ণবেরা কিন্তু বলেন,—কলিযুগ ধন্য! কারণ এ যুগে সহজেই ভগবৎ কৃপা লাভ করা যায়,—সুধু নাম করিলেই কঠিন সাধনের ফললাভ হয়। তন্ত্রধর্ম্ম এখন যে শক্তিহীন হইয়াছে তাহা ত বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ফলে, অথবা উদার তন্ত্রধর্ম্মের ব্যাভিচারের ফলে, যখন শাক্তধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য—তখনই বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবন্ত হইয়াছে, শ্রেষ্ঠ জনসমাজে প্রবল এবং গৌরবের ধর্ম্ম হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পর তন্ত্রধর্ম্ম আর এদেশে জীবন্ত ছিল না। হীন, নিষ্প্রভ হইয়াই রহিল এখন আমরা তার কঙ্কালটি দেখিতেছি; আর এই যে এখানকার ভৈরব,—এইরূপ দুই একজন প্রাচীন তন্ত্রমতের মানুষ নিষ্ঠাপূর্ব্বক ধারাটি বজায় রাখিয়াছেন।

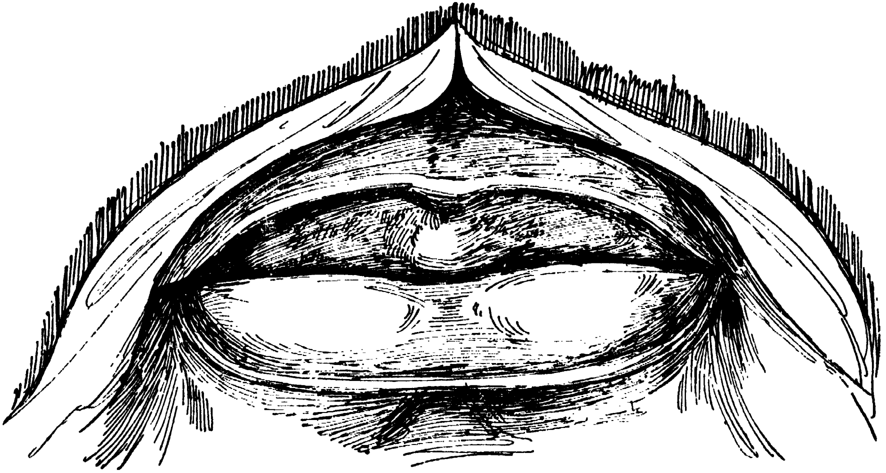
দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিশ্রাম,—আমি দেখিলাম তপোবন একেবারে নিস্তব্ধ, নিঝুম, জনমানবের চিহ্ন নাই,—এদিক ওদিক বেড়াইলাম, দেখিলাম স্থানটির প্রায় চারিদিকেই জল,—যেন একটি দ্বীপ। খেয়া নৌকা একখানি সর্ব্বদাই ঘাটে লাগানো আছে। বর্ষায় খালটি

জল পূর্ণ, কোনও দিকেই স্থলপথে এখানে আসিবার যো নাই। সেই কারণে এখানে খুব কম লোকেই আসে। রেলের ধারে যেগুলি, সে সব তীর্থে স্বভাবতই যাত্রীদের ভীড় হয়,—কিন্তু এসকল পীঠস্থানে খুব বেশী লোকের সমাগম নাই। কালীপূজায়, শিবরাত্রিতে, দুর্গাষ্টমীতে লোকের যাতয়াত হয়।

বৈকালে যখন ভৈরব নিদ্রা হইতে উঠিয়া তামাক লইয়া বসিলেন, তখন ধীরে ধীরে গিয়া সম্মুখে বসিলাম,—তিনি বলিলেন: বিশ্রামের সুবিধা হোলো না বুঝি? আমি বলিলাম: এমন সুন্দর জায়গায় যদি বিশ্রামের সুবিধা না হয় ত কোথায় হবে,—স্থানটি যেন মূর্ত্তিমান বিশ্রাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন: তোমার বুঝি দিনমানে শোয়া অভ্যাস নেই?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, তারপর বলিলাম: এখানে এই মহাপীঠের যে মূর্ত্তি তার ভিতরে আসল মূর্ত্তিটি কিরূপ তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।

তিনি বলিলেন: দেবীর অধরোষ্ঠ এখানে পড়েছিল, সেই অধরোষ্ঠ পাষাণ হয়ে আছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: সেটি কত বড়? তিনি হাত দিয়া দেখাইলেন,—এত বড়! প্রায় দুই ফুট লম্বা ও দেড় ফুট চওড়া, এক ফুট উচ্চ একটি পাষাণ মূর্ত্তি অনুমান করিলাম।



আমি বলিলাম: ফুল্লরা পীঠে কাল আমি ছিলাম,—সেখানেও দেখলাম বাইরে একটি মূর্ত্তি, ভিতরে অপর একটি মূর্ত্তি। ওখানকার পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি ভিতরের মূর্ত্তির কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ বলতে পারলেন না; তিনিও ঠিক জানেন না যে সে মূর্ত্তি কাহার। এতটা চেষ্টা করলাম কোন ফল হোল না।

তিনি বলিলেন: কি জানো, কত যুগ হয়ে গেছে, কে তার খবর রাখছে। কেউ কেউ বলে ওখানে মায়ের চোয়াল পড়েছিল,—এখন ত সে সব পাষাণ হয়ে আছে।

আমি বৈকালে তাঁহার সঙ্গে কাটাইলাম,—যে সকল কথা হইল তাহার মধ্যে প্রয়োজনীয় কথা এইটুকু ; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : কেন এখন তন্ত্রধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যাইতেছে ?

তিনি বলিলেন : দেশময়, আপামর সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মশক্তি জাগাবার জন্যই তন্ত্রধর্ম্মের উৎপত্তি। এই উদার-ধর্ম্মের মধ্যে উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন ভেদ নেই, কাজেই একধর্ম্মী হোলে সকলকার মধ্যে যে একতা আসবে, সকলে সমান হয়ে এক ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, একই মহা জাতিতে পরিণত হও মহাশক্তিশালী হয়ে জগতের আদর্শ ধর্ম্ম হয়ে থাকবে, এই ছিল তন্ত্রধর্ম্মের উদ্দেশ্য, কিন্তু দেশের ব্রাহ্মণেরা সকলের মধ্যে ধর্ম্মের একতা, ধর্ম্মের নামে সমান অধিকার এসব চান না। তাঁদের উদ্দেশ্য, তাঁদের একাধিপত্য কোন রকমে না বাধা পায়। তাঁদের নিজেদের মধ্যেই জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্মাঙ্গ সাধন, ক্রিয়া-কর্ম্ম যা কিছুর বিধান এসব বাঁধা থাকবে, তাঁরাই থাকবেন উচ্চ, শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য জাতির বিধাতা হয়ে,—কাজেই এখানে তন্ত্রধর্ম্ম টেঁকতে পারবে কেন চিরকাল!

আমি বলিলাম : তন্ত্রধর্ম্মের পর এই যে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয় আমাদের বাঙ্গলায় হয়েছিল, তার মধ্যেও ত মহা উদারভাব রয়েছে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সকলেই এক, উচ্চ নীচ ভেদ লোপ করবার ব্যবস্থা রয়েছে,—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন : সে সব থাকলেও আভিজাত্যের বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র কম আছে কি ব্রাহ্মণদের ? বৈষ্ণব হোলেও সভায় ত ব্রাহ্মণদের খাতির আগে, জগতের সকল রকম মানুষের সঙ্গে চৈতন্য বা নিত্যানন্দের প্রেমের সম্বন্ধ সত্ত্বেও এখন ঐ শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশের আর খড়দহের সেই নিত্যানন্দের বংশের দুলালদের, প্রভুপাদ, গোস্বামী ইত্যাদি উপাধি আর শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই কি কিছুমাত্র কম আছে ? তারপর আবার তাদের ফ্যাঁকড়া-ফেঁকড়ি কত কত সব, ব্রাহ্মণ গুরু-বংশের সম্বন্ধ নিয়ে এখনও যে বৈষ্ণব-সমাজ ব্রাহ্মণদের তাঁবেদারীই করচে দেখতে পাচ্ছ না ? তাঁরাই ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট সমাজের শাসনকর্ত্তা বোলে এখনও যে তরে যাচ্ছেন। প্রেমধর্ম্মও থাকবে আবার জাতের শ্রেষ্টত্বও থাকবে এ কি রকম ধর্ম্ম হোলো ? এ মাটির গুণ বাবা, এ মাটির গুণ, এখানে খাঁটি মাল বেশীদিন চলে না, এটা হচ্ছে ভণ্ড স্থান, স্থানমাহাত্ম্যে মহাপুরুষের আবির্ভাবকালটুকুই যা কিছু চরম উৎকর্ষের কাল, তারপর যত দিন তাঁর প্রভাব থাকে—বড় জোর দু-পুরুষ, তারপর আবার যা তাই।

আমি বলিলাম : এখন দেখুন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই ইংরাজ-আমলে সকল ধর্ম্ম যে আবার মাথা তোলবার চেষ্টা করচে। এখন ত হামেশাই দেখা যায়—পণ্ডিতেরা, সকল ধর্ম্মের নিষ্ঠাবান ভক্তেরা যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজ-নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করছেন। যিনি যে ধর্ম্মের মধ্যে আছেন তিনি সেই ধর্ম্মের গভীরতা আর সারবত্তার কথা প্রচার করছেন। আমার মনে হয় এটি একটি অতীব শুভ লক্ষণ।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তন্ত্রধর্ম্মের কথা কেউ প্রচার করেছেন নাকি ?

আমি বলিলাম : হাঁ নিশ্চয়ই। মুর্শিদাবাদের পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের শক্তি-

সম্বন্ধে ধারাবাহিক অনেকগুলি বক্তৃতা শুনেছি। তার ছাত্র রেবতীমোহনের ব্যাখ্যাও শুনেছি। তর্কচূড়ামণি মশাই ত সিদ্ধ তান্ত্রিক বোলে বিখ্যাত।

তিনি বলিলেন: বাঙ্গলায় তন্ত্রশাস্ত্রে একাধারে সাধক আর পণ্ডিত তাঁর মত আর এখন কেহ নাই!

৩০

ভৈরব বলিলেন: আগেও তোমাদের কলিকাতায় অনেকগুলি বড় বড় তান্ত্রিক প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম শুনেছ? কালীবর পণ্ডিত, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, তারপর মহেশ ন্যায়রত্ন এঁরা মহাতান্ত্রিক ছিলেন।

আমি বলিলাম: বাঙ্গলার বড় বড় পণ্ডিতেরা তখনকার দিনে প্রায় অধিকাংশই তন্ত্রোপাসক ছিলেন শুনেছি, কেবল বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা,—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: না না, তাঁরাও প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক,—গোঁসাই বংশ যত আছে জান্‌বে সবাই গুপ্তভাবে শক্তি-উপাসক। জানো না, অন্তঃ শাক্তং বহিঃশৈবং সভায়াং বৈষ্ণবং মতং। অদ্বৈত বংশ, নিত্যানন্দের বংশ এদের সবাই প্রচ্ছন্ন শক্তি-উপাসক, এঁরা কেউ তন্ত্র-ধর্ম্মকে ত্যাগ করে বৈষ্ণব হন নি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: তাহোলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—

তিনি: তিনিও ত মহাতান্ত্রিক ছিলেন। পুরীতে গম্ভীরায় তিনি কি করতেন জানো? সেও স্পষ্ট করে চৈতন্যচরিতামৃতে লেখাই আছে। দিনমানে ভক্তদের সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন করতেন, আর রাত্রে অন্তরঙ্গসঙ্গে রস আস্বাদন করতেন। এ রস কী রস জানো? এ সেই কারণ-রস সে কি আবার বোলে দিতে হবে? তিনি যে মহা কৌল ছিলেন।

আমি: কি সর্ব্বনাশ! এ ভাবের চৈতন্যচরিত্র ত কখনও শুনি নাই।

তিনি: কি করে শুনবে! এ সব যে গুহ্য ব্যাপার। বাইরের লোক এসব জানবে কি করে। বোষ্টোমেরা ত তাঁকে নেড়া সাজিয়ে রেখেছে, আসলে কি তিনি নেড়া ছিলেন? তাঁর বড় বড় জটা ছিল, নাচবার সময় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠতো, এসব ত পুঁথির মধ্যে নেই, কেউ জানে না।

আমি: আমরা জানি পুরীতে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই তাঁর মনে ছিল না। রাত্রে রায় রামানন্দ আর স্বরূপ দামোদরকে নিয়ে পদাবলী কীর্ত্তনের আনন্দে বিভোর থাকতেন।

তিনি: আর মাধবী দাসী কোথা থাকতেন? ঐ মাধবীকেই ত তিনি শক্তি করে নিয়েছিলেন, রাত্রে সঙ্গে নিয়ে চক্রে বোসতেন। ওসব চাপা দিয়েছে ওরা,—গুহ্য ব্যাপার কি প্রকাশ করতে আছে। এ ধর্ম্ম ত প্রচারের ধর্ম্ম নয়, গুহ্য ভাবে সাধনের ধর্ম্ম। সে সব দিন এখন আর নেই।

একটু থামিয়া ভৈরব বলিলেন: এখন কৌল নেই। এখনকার দিনে, গৃহস্থ আশ্রমে থেকে তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়ে বিবাহিত জীবনে সস্ত্রীক যে সাধনা তাতেই যা তন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। না হোলে ঘর-সংসার থেকে বেরিয়ে এসে ভৈরবী নিয়ে যে সাধন সে কাল আর নেই রে বাবা! আর তাতে সিদ্ধিও নেই, ব্যভিচার বেড়ে যায়। তাই আমরা আর ওভাবে সাধনের উপদেশ দিই না। এখন উটকো, ঘরছাড়া কেউ এলে বলি,—মা কালীর মূর্ত্তিকে ধ্যান করো গে যাও, তাইতেই সব হবে।

অনেকক্ষণ আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। শ্রীচৈতন্যের নিষ্কলঙ্ক দিব্য ভাবময় চরিত্রের উপর এই সকল বৃদ্ধ তান্ত্রিকেরা, কিরূপ বিপরীত ভাব আরোপ করিয়া দেখিতেছে তাহাই ভাবিতেছিলাম। সত্যই তিনি তান্ত্রিক ছিলেন কি? তান্ত্রিকদের শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে এই যে ধারণা আমার মনে হয় ইহার মূলে একটি রহস্য আছে। মহামানবকে কোন সম্প্রদায়ই ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মের অন্তর্গত বিশিষ্ট ভাবের আরোপ করিয়া তাঁহাকে আপন করিয়া লন। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস-হীন নাস্তিক বুদ্ধকেও হিন্দুরা অবতার গণ্য করিয়াছেন। আবার এদিকে বৈষ্ণবেরাও শিবকে ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা বলেন, শিবের যত নাম একমাত্র রুদ্র নামটি ব্যতীত আর সবই বিষ্ণুর নাম;—বিষ্ণু ও শিব একই। ইহাতে ভেদজ্ঞান থাকিলে সাধন পণ্ড হয়। আবার তন্ত্রমতের প্রসারতাও কম নয়, তাঁহারা রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের আধার-শক্তি বলিয়া সমুদয় রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারকে তন্ত্রের মধ্যে পুরিয়াছেন। রাধাতন্ত্র একখানি বিশিষ্ট তন্ত্রের পুঁথি। তন্ত্রের গ্রন্থসমূহের মধ্যে রাধাতন্ত্রের স্থান নগণ্য নয়। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে রাধা ও কৃষ্ণের জীবন, কর্ম্ম সর্ব্বাংশেই তন্ত্রময়। তন্ত্রোক্ত শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের সামঞ্জস্যের ফল স্বরূপ বাঙ্গলায় আউল বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি কত উপধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। এ কথা এখন অনেকেরই জানা আছে। একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যেখানে যেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কথা আছে সেখানে সেখানেই একটি তন্ত্রমতের ব্যাখ্যা তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে।

রূপ, সনাতন এবং জীব গোস্বামীর গ্রন্থমালা, চৈতন্য-চরিতামৃত, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কৃষ্ণ কর্ণামৃত, ভক্তমাল গ্রন্থাদি, তারপর এখনকার দিনে শিশিরকুমারের অমিয়নিমাইচরিত গ্রন্থের প্রচার এবং ইহাদের প্রভাব যদি আমাদের মধ্যে না থাকিত তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে তন্ত্রধর্ম্মের প্রভাব বিশ্বাস করিতে বোধ হয় বাধা ছিল না।

যাহা সত্য এখন তাহার উদ্ধার অনিশ্চিৎ কোন গহনে জানি না কিন্তু যথার্থ বলিতে কি মহাপ্রভুর মধ্যে তান্ত্রিকতা এখনকার দিনে কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রাণ চায় না। তবে যদি কখনও এমন দিন আসে, শ্রীচৈতন্যের মধ্যে তন্ত্রধর্ম্মের প্রভাব নিশ্চিৎ প্রমাণ হয় তাহা হইলে কি হইবে, বৈষ্ণব ভক্তেরা কি তাহা বিশ্বাস এবং গ্রহণ করিতে পারিবেন? এখন ইহাই ভাবিতেছিলাম।

এখন তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের উপর স্বধু অনাস্থা নয়, আভিচারিক ক্রিয়াদি এবং নীতিবিরুদ্ধ আচার

তন্ত্রধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ বলিয়া সাধারণের বিশেষত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিজাতীয় ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে ইহাকে আর লোকের কল্যাণকর ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করিবার উপায় নাই। মনে হয় যেন তন্ত্রধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে চিরবিরোধ, এই দুই ধর্ম্মের গতি আদি মধ্য ও অন্ত সবটাই বিভিন্ন।

যাহা হউক, এখনও যখন তন্ত্রধর্ম্ম এ দেশে বর্ত্তমান আছে, নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই তখন মনে হয় কখনও কোন কালে ইহার স্বরূপ আবার মূর্ত্তিমান হইয়া সাধারণের গোচরীভূত হইতে পারে। তখন সেই সত্যের আলোকে এ সকল বিরুদ্ধ সংস্কার দূর হইবে,—ইহা আমার অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

এখন আমি ভৈরব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি যে কালীমূর্ত্তি ধ্যানের কথা বললেন, এই কালী, তারা, মহাবিদ্যার মূর্ত্তি সকল এ দেশে কতদিনে প্রচার আর কার দ্বারা এখানে প্রচারিত হয়েছে; যদি বিরক্ত না হন—

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন: অত খোঁজে কাজ কি তোমার, তোমার সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কি। তোমার যে সবই বেয়াড়া ধরণের কথা দেখতে পাই,—এঁ্যা।

আমি বলিলাম: দেখুন, আপনারা প্রাচীন লোক, আপনাদের কাছে আমরা যদি এসব না শুনবো তবে কার কাছে যাব বলুন! জানেনই বা কে এ সকল কথা। আমরা—

আর বলিতে হইল না, তিনি একেবারে তরল হইয়া গেলেন, বলিলেন: কি জানো বাবা, এত লোক আসে এসব কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে না, সেই জন্যেই কেমন কেমন ঠেকে। আর আমরা জানিই বা কি, মা জগদম্বার দয়ায় যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে, হবে—কেবল এইটুকু জানলেই হোলো।

আমি বলিলাম: সেটা আপনার পক্ষে সত্য, আমাদের এখনও অনেক দেখতে হবে, শুনতে হবে, করতে হবে, না হোলে আমাদের গতি কি হবে বলুন। যাক্, এখন যে কথা হচ্ছিল,—কেউ কেউ বলেন যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে তন্ত্রধর্ম্ম আর মহাবিদ্যার মূর্ত্তি পূজা বাংলায় এসেছে, তার আগে এসব ছিল না।

তিনি বলিলেন: অতশত জানি না বাপু, আমরা মা কালীকে নিয়েই যা কিছু সাধন-ভজন করে আসচি, তিনিই আমাদের সব। তবে শুনেছি আগমবাগীশই এদেশে প্রথম কালীমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনিই খুব সম্ভব দশ মহাবিদ্যার পূজা, উপাসনাও প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

আমি ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম: তা হোলে আগমবাগীশের পূর্ব্বে কি এদেশে তন্ত্রের মতে দশমহাবিদ্যার প্রচার ছিল না? আর তন্ত্রের প্রচারও কি ছিল না?

তিনি: তন্ত্রধর্ম্ম মহা প্রাচীন, বেদের পূর্ব্বেও তন্ত্র ছিল। যেমন শিবের উৎপত্তির কথা কেউ জানে না, তেমনি তন্ত্রের উৎপত্তি কোথায় তা কেউ জানে না, কেউ বোলতে পারে না। চীনদেশেও তন্ত্র আছে, কালী, তারাদি পূজার বিধিব্যবস্থা আছে। বশিষ্ঠ দেব যখন এখানে তন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি শান্তি পান নি। তখন তাঁর ইষ্টের আদেশ হোলো মহাচীনে গিয়ে

চীনাচার সাধন করতে। তিনি মহাচীনে গিয়ে চীনাচার সাধন করেছিলেন, তারপর কঠোর সাধনের পর সিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তখন শান্তি পেলেন। তন্ত্রের চীনাচারই হোলো সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। তাতে সিদ্ধি হোলে আর কিছুই করবার থাকে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম : এখানে কি চীনাচার সাধন হয় না ?

তিনি : এখানে সে সাধন করবে কে, তার উপদেশ, নির্দ্দেশই বা দেবে কে ? উত্তর সাধক কোথা ? যার চীনাচার সাধন করতে হবে, তাকে নিঃসঙ্গ হয়ে মহাচীনে যেতে হবে। সেইখানেই উপদেষ্টা আছে, সেখানে সব যোগাযোগ ঘটিয়ে নিতে পারলে তবে হবে সিদ্ধি। এক বশিষ্ঠ দেবের কথাই আমরা জানি যিনি এতে সিদ্ধ হয়ে ছিলেন, না হোলে কৈ আর কারো কথা ত শুনি নি। তবে এদেশে তন্ত্রের যা কিছু প্রচার তা আগমবাগীশের দ্বারাই হয়েছিল। তন্ত্রোক্ত যে দেবীর মূর্ত্তি তাও তিনি এখানে পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। কালীপূজা ত সহজ,—কিন্তু তারার পূজা বড় ভয়ঙ্কর এখানে তাঁর পূজা হয় না। মহাবীর্য্যবান উচ্চস্তরের সিদ্ধ যোগী না হোলে তারার পূজা আর কারো দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। গৃহস্থ সাধকের ঘরে তারার পূজা হোতেই পারে না, একেবারেই নিষিদ্ধ।

আমি বলিলাম : স্বধু তারা কেন, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, ভেবে দেখুন কি ভয়ঙ্কর ভাবের মূর্ত্তি,—কি ভয়াবহ কল্পনা !

তিনি : কল্পনা কেন, মহাদেবকে মা যে ঐ সব মূর্ত্তি দেখিয়েছিলেন ! তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন 'সাধনায় ঐ সব মূর্ত্তির ধ্যান ও পূজার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া জ্যোতিষের গ্রহাচার্য্যেরা দুষ্ট গ্রহ বা গ্রহদোষ কাটাবার জন্য ও দুর্ভাগ্য প্রশমনের জন্য ঐ সকল দেবীর পূজা করে থাকেন।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে তন্ত্রের সঙ্গে জ্যোতিষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গ্রহাচার্য্যগণ এদেশে সকলেই তান্ত্রিক। তন্ত্রের অধিকার আমাদের বাঙ্গলায় বহুদূর প্রসারিত।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : বক্রেশ্বরের অঘোরীকে আপনি জানেন ?

শুনিবামাত্র তিনি একবার আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, তারপর বলিলেন : তুমি তাকে জানো না কি ? তার কাছে গিয়েছিলে নাকি ?

বলিলাম : কিছুদিন বক্রেশ্বরে ছিলাম, তখন মাঝে মাঝে সঙ্গ পেয়েছি।

তিনি : সঙ্গ পেয়েছ ! মারধোর খাও নি ?

আমি : আমার উপর অতটা হয়নি, তবে গালি-গালাজ, ধমকানিটা হয়েছে।

তিনি : তুমি ত দেখছি একটা ভবঘুরে, মহাডানপিটে ছোকরা, তার মত একটা দুশমন, একটা ম্লেচ্ছ, ব্যভিচারীর সঙ্গলাভের খেয়াল হোলো কেন তোমার ? সে যে একটা পিশাচ, রাক্ষস, তার ভিতর কি আছে বল ত ?

বুঝিলাম অঘোরীর স্বরূপ ইঁহারও জানা নাই। সেখানকার সাধারণে যেমন তাঁহাকে বুঝিয়াছে—এই ভৈরব বাবাজীর অভিজ্ঞতা তাহাদেরই অনুরূপ। অপরাধ ইঁহার কিছু নাই, ওখানকার লোকে তাঁহাকে অত নিকটে পাইয়াও যখন পিশাচ বা রাক্ষস ছাড়া অন্য কিছু

ভাবিতে পারে নাই,—উপরন্তু সেখানকার সাধারণ লোকের ধারণা এইরূপ ছিল যে অঘোরীর ঐ স্থানে অবস্থান সে গ্রামের অধিবাসিগণের অমঙ্গলের কারণ। ভাগ্যে তিনি শ্মশানবাসী, না হইলে লোকালয়ে তাঁর স্থান নাই।

যাহা হউক, বলিলাম: অঘোরী বলেন, তন্ত্রধর্ম্ম অতি প্রাচীন, ব্রাহ্মণেরা এদেশে আসবার পূর্ব্বেও ছিল। ব্রাহ্মণেরা এসে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাঁদের মনোমত গড়ে নিয়েছেন, আর সংস্কৃত ভাষায় পুঁথি-পত্র লিখে নিজ সম্প্রদায় মধ্যে প্রবর্ত্তিত করেছেন।

তিনি বলিলেন: তুমি অবাক করলে যে হে,—সে বেটা অজামুখ্যু, ক অক্ষর গো মাংস। দুর্দ্দান্ত মাতাল, ডাকাতি কোরতো কিনা তারই বা ঠিক কি! জানোয়ার বেটার ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা কইবার ক্ষমতা নেই, বাপ বোলতে শালা, ব্রাহ্মণ মানে না, জ্ঞানী মানে না, মুখে যার পচা কথা ছাড়া কথা নেই, সে বেটা আবার তন্ত্র-মন্ত্রের কথা কি জানবে!

তিনি বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন,—আমি অবাক হইয়া তাঁহার ভাব দেখিতেছিলাম। ধীরে ধীরে তিনি বুঝিতে পারিলেন তিনি নিজ মর্য্যাদার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন,—কতক্ষণ তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কোনও কথা হইল না। অনেকক্ষণ পর যখন তিনি কথা কহিলেন তখন যেন আলাদা মানুষ।

তিনি বলিলেন: অঘোরীর আবার এ সব জানা আছে নাকি? তুমি কি বোলচ? হোতে পারে, কার ভিতর কি আছে তা জানবো কি কোরে! জগদম্বার খেলা; আমরা শুনেছি সে নরমাংস খায়, পচা মড়া খায়, অতি বড় পিশাচ,—তাই তাকে কেউ ঘাঁটায় না।

বলিলাম: আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম, যদিও তাঁর ভোজনের ব্যাপারে কোন বিচার নাই সেটি আমিও দেখেছি। এখন আমাদের যে কথা হচ্ছিল—হয়ত আগমবাগীশই প্রথম তন্ত্রধর্ম্ম এদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবর্ত্তন করেন। তার আগেও তা হোলে এ দেশে অব্রাহ্মণদের মধ্যে তন্ত্রধর্ম্মের চলন ছিল!

তখন ভাবিয়াছিলাম হয়ত ভারত হইতে তীব্বত, সেখান হইতে চীনে তন্ত্রধর্ম্মের গতি হইয়াছে। কিন্তু এখন ভাবিতেছি অন্যরূপ। মহাচীন হইতে তীব্বত, তীব্বত হইতে বাঙ্গলায় তন্ত্রধর্ম্মের আগমন খুবই সম্ভব। অথবা তখনকার দিনে তীব্বত হইতে চীন রাজ্যের সমস্তটাই কি ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট মহাচীন নামে পরিচিত ছিল?

তন্ত্রের সাধন দেখিতে কোথায় আসিয়া পড়িতেছি! যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ কিছু জ্ঞান নাই, বেশী ভাবিতে গেলে কল্পনা আসিয়া পড়ে। তন্ত্রের উৎপত্তিসূত্র যে আমাদের কোথায় লইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই।

ভৈরব মহাশয় চিন্তামগ্ন দেখিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন: কি ভাবছ বাবা? তারপর একটু স্থির করিয়া বলিলেন: ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়। অত ভাবনা কেন বাবা, মা বোলে দুবার ডাকো দিকি অনেকটা সুখ পাবে। তন্ত্রধর্ম্ম কোথা থেকে এলো, কি বৃত্তান্ত, সাত সমুদ্র তেরো নদী এ সব ভাবনায় কাজ কি?

সেই রাত্রে আর বেশী কিছু কথা হইল না। রাত্রে সামান্য কিছু জলযোগের পর দাওয়ায় শয়ন করিলাম। ভাবিতেছিলাম অনভিজ্ঞ গৃহী যারা, ভোগাসক্ত মন তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, তাহারা ক্ষমার পাত্র, কিন্তু সাধু যাঁরা একই ধর্ম্ম সম্প্রদায়গত সাধকের সঙ্গে সাধকের পরিচয় নাই, এত নিকটে থাকিতেও একজনের উপর অপরে এতটা বৃথা বিদ্বেষ পোষণ করেন, কেন এমনটি হয়। এই সকল পাঁচ কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিল, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

রাত্রে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলাম। যেন, আমি একটি মূর্ত্তি গড়িয়াছি, গড়া অর্থে আঁকা। বিশাল মূর্ত্তি হইয়াছে, ধর্ম্মের দেবতা। দেখিতে অনেকটা শিবের মূর্ত্তি কিন্তু ঠিক শিব নয়। কল্যাণময় মূর্ত্তি, অলঙ্কারশূন্য—কোথাও কোনও অঙ্গে অলঙ্কারের চিহ্ন মাত্র নাই। সম্পূর্ণ সুগঠিত অঙ্গ তাঁহার, প্রশান্ত সস্মিত বদন, নিম্ন দৃষ্টি, মাথায় জটা বাঁধা, প্রশস্ত ললাট, ত্রিনয়ন। উজ্জ্বল নীলাভ শুক্লবর্ণ জ্যোতির্ম্ময়, সম্পূর্ণই নগ্ন শরীর। একটু দূরে দাঁড়াইয়া যেন বিশেষ-রূপেই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলাম। কোন একখানি মূর্ত্তি সম্পূর্ণ চিত্রিত হইলে একটু দূরে দাঁড়াইয়া দর্শকের ভাবে অনন্যমনে নিরীক্ষণ করিতে শিল্পীর যে সুখ, ভাষায় তাহা বুঝাইবার নয়। বড় আনন্দেই দেখিতেছিলাম। মনে মনে একটি ঘন আত্মপ্রসাদও অনুভব করিতেছিলাম। এই অপরূপ মূর্ত্তিটি ত পুরুষের নয়, স্ত্রীরও নয় অথবা পুরুষও হইতে পারে, স্ত্রীও হইতে পারে। তার পর—ও কি? হঠাৎ দেখিলাম, অলঙ্কারশূন্য জ্যোতির্ম্ময় শরীরে সর্ব্বাঙ্গেই যেন কাটা কাটা দাগ। একি হইল, আমি ত এরূপ করি নাই,—না কখনই নয়। তখন যেন আতঙ্কিত হইয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, এখানে কেহ আছে কি না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্ব্ব শরীর রেখা দ্বারা বিভক্ত। একি অভাবনীয় ব্যাপার, দেখিয়া আমার অন্তর বিষণ্ণভাবে পূর্ণ করিয়া দিল।

হঠাৎ খল খল হাসির শব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখি এখানকার ভৈরবী। এক কোণে দাঁড়াইয়া আমার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এখন তাঁহার মূর্ত্তিটি বড় উজ্জ্বল, বয়সও যেন কম, যৌবন-শ্রী মণ্ডিত। দাঁত পড়া নয়, মুক্তার মত দন্তপঙ্‌ক্তি মনোহর হাসির মধ্যে প্রকাশিত রহিয়াছে। পরণে ঘোর রক্তবর্ণ বারাণসী সাড়ি, তাহাতে চরণ দুইটি, সুন্দর সুগঠিত বাহু যুগল এবং মুখ মণ্ডল আরও যেন স্নিগ্ধ ও উজ্জল দেখাইতেছে। দৃষ্টিমাত্রেই আমার ধারণা হইয়া গেল, ইনি নিশ্চয়ই কোনও দেবী মানবীরূপে আমায় দেখা দিতে আসিয়াছেন। আমি যেন প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি, এখানে?

তিনি আবার খল খল হাসি আরম্ভ করিলেন। এমন হাসির শব্দ আর কখনও শুনি নাই,—যাহাতে আমার অন্তরে একটি আতঙ্কের ভাব আনিয়া দিল। ভাবিতেছিলাম,—কিছু অমঙ্গলের পূর্ব্ব সূচনা না কি? তিনি প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন: আমি তোমার কাজ দেখতেই এলাম।

তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম: আমি ত মূর্ত্তির গায়ে ওরূপ দাগ দিই নি, এখন এ রকম হোলো কি করে বুঝতে পারছি না।

তিনি : ধর্ম্মের মূর্ত্তি করেছ অথচ তার সর্ব্বাঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো রেখা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করো নি কেন ? তা না করলে ধর্ম্মের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হবে কেন ?

উত্তরে যেন বলিলাম : একটি মূর্ত্তি গড়ে যে, সেই সুন্দর সৃষ্টির উপর সে কি ঘন ঘন দাগ কেটে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে পারে ?

তিনি বলিলেন : সে না পারলে দাগগুলি আপনিই হয়ে যাবে।

আমি : কেন তা হবে ? তিনি বলিলেন : তুমি ধর্ম্মের একটি অখণ্ড মূর্ত্তি আঁক্‌তে চেয়েছিলে ত ? কিন্তু পশুর রাজ্যে কোথায় দেখেছ ধর্ম্মের অখণ্ড মূর্ত্তি। কোনও দেশে, কোনও কালে ধর্ম্মের অখণ্ড মূর্ত্তি ত নেই ; এমন কি একই দেশে একই মানব-সমাজে, একই ধর্ম্মের মধ্যে কত ভাগ হয়ে আছে দেখতে পাও না ?

আমি বলিলাম : যেভাবে ধর্ম্ম এখন আছে সে ত আমার আদর্শ নয়, যেটি আমি দেখতে চাই সেইটিই ত আমার আদর্শ।

আবার কতক্ষণ তার সেই খল খল হাসি, তারপর তিনি বলিলেন : বাছা, ধর্ম্ম ত বাইরের জিনিস ; জাতি বল, সমাজ বল, মনোরাজ্য বল, জ্ঞানরাজ্য বল, সে সবই ত বাইরের, তার সঙ্গে তোমার আত্মার সম্বন্ধ কি ? বাইরের একটা ভাবকে আঁকড়ে ধরে কল্পনায় তাকে পূর্ণ রূপ দিতে যাওয়া, খণ্ড খণ্ড ভাবকে একটা অখণ্ড ভাবের মধ্যে ধরে দেখাতে যাওয়া কি বিড়ম্বনা নয় ? একজন যদি তা করে সে কি করলেও সাব্যস্ত হয় ? আবার সেই খল খল হাসি। হাসির শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

৩১

প্রভাতের শীতল হাওয়ায় বৃষ্টি-ধারা উড়াইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে—সেই ঠাণ্ডায় বুকের মধ্যে একটা ধড়ফড়ানি লইয়া জাগিয়া উঠিলাম। আজই তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইব ঠিক করিলাম। তখনও শয্যা ছাড়িয়া উঠি নাই, আলস্য সম্পূর্ণরূপে শরীর হইতে ছুটে নাই, দেখি ভৈরবী আসিতেছেন। তিনি খুব ভোরেই উঠিয়াছেন অনুমান করিলাম।

আমাকে জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন : মুখ ধোয়া হোলে চা খাবে ত, চা খাওয়া অভ্যাস আছে ত ? আমি চা'য়ে অভ্যস্ত নই শুনিয়া তিনি বলিলেন : সে কি ! সকালে চা খাও না, কলকাতার মানুষ এ কিরকম ? আমরা দেখ জঙ্গলে থাকি রোজ সকালে চা না হোলে চলে না। চা না খাও গরম দুধ একটু খাবে ? আমি বলিলাম : এখনই যাব ভাবচি। শুনিয়া তিনি প্রবল আপত্তি জানাইয়া বলিলেন : আজ ত নয়ই, যেতে হয় কাল কি পরশু যেও, লক্ষ্মী বাবা, আজ থাক।

মহা মুস্কিল হইল দেখিতেছি,—এ একপ্রকার জোর বাঁধন, এমন হইবে এখানে তাহা কে জানিত ! অনেক সাধ্য-সাধনা মিনতি করিয়া বৈকালে যাইবার ব্যবস্থা করিলাম। সকালে

যখন ভৈরবের কাছে তাঁহার কর্ম্ম-অবসরে গিয়া বসিলাম, তিনি বলিলেন : তোমরা এত চঞ্চল কেন ? যদি এত পরিশ্রম ক'রে এক জায়গায় দেখতে শুনতে এসেছ তা ভাল করে স্থানের সঙ্গে পরিচয় হোতে না হোতেই ছট্‌ফট্‌ করচ কেন যাবার জন্যে ? অ্যাঁ—

বলিলাম : আমি বড় চঞ্চল একথা ঠিক,—তবে আসল কথা এই যে কোনও জায়গায় গেলে প্রথম দিনেই তার আবহাওয়া যদি ভাল লাগলো ত থাকতেই ইচ্ছা হয়,—না হোলে থাকতে মন যায় না। এ রোগের ঔষধ কি ?

তিনি : কি জানো তোমাদের সুখটাই হোলো আসল, সুখের পায়রা তোমরা সব, যদি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা থাকতো এখানে, তা হোলে চট্‌ করে চলে যেতে চাইতে না নিশ্চয় ?

আমি : কথাটি কতকটা সত্য বটে, কিন্তু এখানে কেমন একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব, আর আমার শরীরও ভাল নয়, সেই জন্যই আর এখানে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তবে এ সবও উপেক্ষা করা যায় যদি মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল হয়, আনন্দ পাওয়া যায়।

তিনি : তুমি ত ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্চ, তপস্যার যে অবস্থায় এসেছ, এখন তোমার পক্ষে শান্তি পাওয়া মুস্কিল। এ সব ছেড়ে যখন ঘরে গিয়ে বোসবে, স্থির হয়ে সংসার-ধর্ম্মে মন দেবে, তখনই তোমার আসল কাজ আরম্ভ হবে।

আমি : আপনিও কি মনে করেন আমায় গৃহস্থভাবে সংসার নিয়ে জীবন কাটাতে হবে ? বক্রেশ্বরেও একজন একথা বোলেছিলেন, তখন সে কথা আমার ভাল লাগে নি।

তিনি বলিলেন : বাবা, তুমি এখন পুঁজির যোগাড়ে বেরিয়েচ, কিছুদিন এই কর্ম্ম কর, যখন বুঝবে, তখন ঠিক নিজ স্থানে গিয়ে বোসবে। এখন এসব ত তোমার পুঁজি কুড়ানো হোচ্চে কি না ?—কেমন ?

আমি : আমার মনে হয় তপস্যার বাড়াবাড়ি করলেও ভোগের স্পৃহা ঠিক যায় না। সেই জন্যে বোধ হয় সংসারকে তখন বেশী জোরে আঁকড়ে ধরিয়ে দেয়।

তিনি : কে দেয় ধরিয়ে ?—সে ত তুমিই নিজে। তুমি যে সংসারে, যে অবস্থার মধ্যে জন্মেছ সেইখানেই তোমার পথ ঠিক করা আছে। সে দিকে তোমার লক্ষ্য আছে কি ?

আমি : তার মধ্যে নিজের পথ-নির্ব্বাচন করতে গিয়ে মহা বাধা দেখছি যে চারিদিকেই,—সেক্ষেত্রে না বেরিয়ে এলে উপায় নেই—

তিনি : সেই বাধাতেই যে তোমার আসল পথ নির্দ্দেশ করে দিচ্চে, সেটা ত বুঝতে পার ? যেখানেই বাধা বোলে ঠেকচে সেইখানেই ত ঠিক পথের নির্দ্দেশ। তখন সেই পথে গেলেই হোলো—

আমি : তাই ত ঠিক ঘটচে, পর পর অবস্থার মধ্যে দিয়ে দেখে আসচি।

তিনি : যখন কাজে মন বসে না তখন বাইরের যত কিছু গোলমাল বড় করে দেখায়। কাজে মন নেই, উঃ বড় গরম, ভারি তাত পড়েছে ; অসহ্য—এজায়গা ভাল নয়, ওজায়গা

ভাল নয়, এখানে মাছি ওখানে মশা, এই সবই তখন লক্ষ্য হয়। কাজের সঙ্গে মনের যোগ হোলে তখন এ সকল চক্ষে লাগে না।

আমি ভাবিতেছিলাম দেখিয়া তিনি বলিলেন: তোমার ত স্ত্রী আছেন? তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ কি রকম রেখেছ?

বলিলাম: এখন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি, দেখতেই ত পাচ্ছেন এ অবস্থায় আর কি ভাবের সম্বন্ধ রাখা যায়?

তিনি বলিলেন: তোমরা নিজের দিকে এতটা চোক ফেলে রেখেচ তাতে অন্য দিকটায় একেবারেই অন্ধ হয়ে আছ সেটা দেখতে পাচ্ছ না মোটেই; সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়ার মতন।

আমি বলিলাম: নিজের দিকেই যখন সামাল দিতে পাচ্চি না তখন অন্য দিকে সামলাবো কি করে?

তিনি: কেন, তিনি কি তোমার বিরুদ্ধ পথের মানুষ, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পার না? স্ত্রী হয়েছে যখন, তাই বোলছি। আসলে বুঝি তুমি অর্থ উপার্জ্জনের দিকে অলস?

আমি বলিলাম: দেখুন টাকা টাকা করে বেড়ালে সৎসঙ্গ পাবো কোথা, পাঁচটা বিষয় ত জানতে ইচ্ছা হয়—

তিনি: হাঁ, হাঁ, বুঝেছি, জ্ঞান-উপার্জ্জনে যার স্পৃহা আছে স্ত্রী কি তার বাধা হোতে পারে? বাইরের বাধাটা কি যথার্থ বাধা? তোমার এই বুদ্ধি হোলো শেষে?

আমি বলিলাম: অবস্থা যখন যেমন ভাবে মানুষকে নিয়ে যায় তখন তাকে সেই ভাবেই ত চলতে হয়? এখন স্ত্রীকে নিয়ে আমার কিছু করবার অবস্থা নয়। সংসারের বর্ত্তমান অবস্থায় এখন স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি অবশ্যম্ভাবী।

তিনি: কত দিন তোমাদের বিবাহ হয়েচে? বলিলাম: প্রায় বারো তেরো বৎসর হবে।

তিনি বলিলেন: এই বারো বৎসর তুমি তার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার রেখেছিলে?

বলিলাম: প্রথম চার পাঁচ বৎসর সে বালিকাই ছিল, বেশীর ভাগ বাপের বাড়িতেই থাকতো। তারপর যখন সে আমাদের বাড়ি আসে, তখন থেকেই আমার মধ্যে ঘর ছাড়বার ইচ্ছা, নানাদেশ পর্য্যটন আর সাধুসঙ্গের ইচ্ছা বলবৎ হয়ে উঠলো। তা ছাড়া ইন্দ্রিয় সম্পর্ক না রেখে পবিত্র ভাবেই জীবন-পথে যাওয়া যায় কিনা এটিও আমার পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্য, সেই জন্যে সেটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

তিনি: এখন তা হোলে এই ভাবেই চলুক, কেমন? তার পর সংসারে গাঢ় প্রবেশ করবে, কি বল? পুঁজি বাড়িয়ে চল যতটা পার, তখন কাজ দেবে।

আমি বলিলাম: সেটা ভবিষ্যতের কথা, তবে যদি পাঁচজনের মতই সংসার করতে হয় তখন এড়াবো কি করে? তবে আমায় শেষে যদি সংসারেই ফেঁসে যেতে হয়, স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততি নিয়ে টাকার যোগাড়ে ব্যতিব্যস্ত হোতে হয় ত বুঝবো আমার অধঃপতন চরমে নেমেচে।

মনের মধ্যে জমাট আনন্দের ভাব থাকিলে প্রবীণ ব্যক্তি যেমন ভাবে চাপিয়া চাপিয়া হাসিয়া থাকেন তিনি সেইভাবে হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন: জীবনের একটা পরিবর্ত্তন এলে সেটিকে এমন হেয় ভাববে কেন! কোন্‌টা যথার্থ হেয়, কোন্‌টি শ্রেয়: সে কি তুমি প্রথমেই ধরতে পারবে? আমি যদি দেখি যে তুমি সংসারী হয়েছ, ছেলেপুলে হয়েছে তা হোলে আমি বুঝবো তুমি এইবার ঠিক নিজের পথেই চলেছ, যথার্থ কল্যাণময় পথ পেয়েছ। মা জগদম্বার নির্দ্দিষ্ট, অতি প্রিয় সরল, পরম আনন্দময় সনাতন পথ।

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, বলিলাম: ঐ গতানুগতিক পুরাতন, জরাজীর্ণ সংস্কারাভাবে ধ্বংসোন্মুখ পচা আমাদের এই শ্রীহীন সংসার-জীবনকে আপনি জগদম্বার অতি প্রিয়, পরমানন্দময় সরল পথ বোলছেন? বলিয়া তাঁর চক্ষুর দিকে চাহিয়া দেখি যেন অন্ধকারে ব্যাঘ্রের পূর্ণ বিস্ফারিত চক্ষুর মত জ্বলিতেছে,—তাহার মধ্যে কি শক্তির স্ফুরণ! আমি যেন এতটুকু হইয়া গেলাম। এই গত কাল হইতে দেখিতেছি, তাঁহার চক্ষে এরূপ জ্যোতি দেখি নাই। সেই জ্যোতির মধ্যে যেন একটি অমানুষী সত্বা উঁকি মারিতেছে, এ কি মূর্ত্তি? যেন অন্য একটি মহা সত্বা, বিরাট ভৈরব মূর্ত্তি। আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন,—বোধহয় আমার বিস্ময় মিশ্রিত ভয়াকুল ভাব দেখিয়া বলিলেন: যাঁর সৃষ্টি, তিনি যে সহজ নিয়মের মধ্যে দিয়ে সরল রাজপথ করে রেখেছেন তোমরা সে পথ এতটা হেয় ধারণা করো কোন সাহসে? কৈ এ পর্য্যন্ত কি কেউ অন্য পথ আবিষ্কার করতে পেরেছে? যে প্রতিক্রিয়ার বশে দুদিন তোমার পরিবারবর্গের আড়ালে থাকবে, আবার দ্বিগুণ আকর্ষণে সেই সকলের মধ্যে গিয়ে কড়া-ক্রান্তিতে সব ঋণ শোধ করতে হবে। হ্যাঁ, যদি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, কারো প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি না রেখে কিছু করতে পার তবে বলি বীর। তা নয় কাপুরুষের মত এটা আকর্ষণ, ওটা মায়া, সেটা অনিষ্টকারী বাধা, ওটা শত্রু, বিঘ্ন—এই সব ভেবে, নিজেকে পৃথক করে ধর্ম্মপথের ধ্বজা উড়াতে যাবে, তার পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ?

আমি বলিলাম: অবশ্য চিরজীবনের জন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার সংকল্প নিয়ে বাড়ি ছাড়ি নি। আমার কথা ধরি না—কিন্তু যাঁরা অবতারকল্প মহাপুরুষ, সুধু তাঁরা কেন—এমন কত কত মহৎপ্রাণ সংসারত্যাগী—

তিনি: হাঁ গো, তাঁরা সংসারকে ভাল করে দেখে শুনে, ভোগ করে, ভগবৎ শক্তির প্রেরণায় একটি বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র গড়বার জন্য ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু তাঁদের কি কোনও প্রত্যবায় ছিল? তাঁরা এমন কোন কাজ করেন নি যাতে প্রত্যবায়ভাগী হোতে হয়। তাঁদের কথা আলাদা,—

তারপর বলিলেন: হাঁ, হয় বটে কারো কারো এ রকম, সংসার হোতে একটু পৃথক্ থেকে পুঁজি বাড়িয়ে নিয়ে তারপর এসে বেশ পাকা হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ঢোকা, এ খুব ভাল,—কিন্তু সংসার ত্যাগ—! সংসার ত্যাগ! বোলে এই যে একটা জুয়াড়ীর কাণ্ড, বাপ মা মাগ ছেলে ঘর

সংসার ছেড়ে এসে আবার এক সংসার পেতে টাকা কড়ি বিষয় আশয় কামড়ে থাকা এযে মহা বিশ্রী ব্যাপার একটা। আমরা ওটাই খুব খারাপ দেখি।

আমি বলিলাম: এখনও—আমাদের দেশে সাধারণের মনে সংসার-ত্যাগীর উপর একটি প্রবল শ্রদ্ধা আছে। আমি জানি অনেক সংসার-ত্যাগী এমন গুরু আছেন, যাঁরা এক প্রকাণ্ড সংসার পেতে নানা প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করেছেন,—শিষ্য, শিষ্যা সেবকাদি নিয়ে অনেক সংসারীদের পথ দেখাচ্ছেন,—দলাদলি, মামলা মোকদ্দমা, এ সব বৈষয়িক ব্যাপারও খুব বিস্তৃত-ভাবে আছে তাঁদের মধ্যে অথচ সংসার ত্যাগী বোলে গৌরবও আছে।

তিনি বলিলেন: এখানকার সবই কারবার বাবা, সবই ব্যবসার চক্ষু দিয়ে দেখ্‌তে হবে। রাজা যখন ব্যবসাদার তখন এতদিন দাসত্ব করে তাদের কারবারী মনোভাবের কতটা হজম করেছে এ জাতটি আমাদের! গুরুগিরি বল, শান্তি স্বস্ত্যয়ন কবচ, তন্ত্রমন্ত্র বল, জ্যোতিষশাস্ত্রী বল, চিকিৎসক বল, উকিল, ধর্ম্ম-শিক্ষক এ সব এখন ঠিক ঠিক কারবারী ঢংয়েই ত চলছে। কালমাহাত্ম্য বাবা কালমাহাত্ম্য,—গুরু গুরু,—মা জগদম্বা!

কথা শেষ হইল—। কোন রকমে প্রসাদ পাওয়ার কালকুটু কাটাইয়া, সকল কাজ শেষ হইলে যখন ভৈরবী মাতা একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন,—আমি সেই অবকাশে খেয়া পার হইলাম।

পচণ্ডী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম প্রায় সাড়ে তিনটা—তখন গাড়ী নাই। সন্ধ্যায় গাড়ী। বসিয়া বসিয়া অট্টহাসের সকল কথাই ভাবিতেছিলাম। একটি গাড়ী তখন বিপরীত দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল।

আধা বয়সী গৌরবর্ণ ভদ্রলোক একটি সুন্দর শিশু কোলে, একখানা তোয়ালে-কাঁধে, পায়ে চটি, আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাকে স্থানীয় লোক বোধ হইল। বোধ হয় কাহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন।

নিকটে আসিয়া আমার মুখের দিকে এমন ভাবে দেখিতে লাগিলেন তাহাতে আমি একটা অস্বস্তি অনুভব করিলাম। উঠিয়া যাইব কি না, ভাবিতে ছিলাম,—তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: বাবাজির কোথা থেকে আসা হচ্ছে? আমি বলিলাম: অট্টহাস থেকে এই মাত্র আসছি।

কোথা যাওয়া হবে?

আমি: তারাপুর।

তিনি: আজ থেকে যান না আমাদের গ্রামে?

আমি: হঠাৎ আমায় কেন আহ্বান কচ্চেন বুঝতে পাল্লুম না ত?

তিনি: সাধুসঙ্গ লাভ ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নেই জানবেন।

হাসিয়া বলিলাম: আমি সেরকম সাধু নই, আমার সঙ্গে আপনার কিছুই লাভ হবে না নিশ্চয়ই বোলছি।

তিনি বলিলেন: তা আমরা দেখে নেবো, এখন ত চলুন। উঠে পড়ুন দেখি!

শেষে যাইতে হইল। পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি কি করেন? তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন: শুনলে হয় ত অস্বস্তি অনুভব করিব।

জিজ্ঞাসা করিলাম: পুলিশ নাকি?

তিনি বলিলেন: হাঁ,—ঠিক ধরেছেন,—এখন আর ত কিছু ভাবনা নেই নিঃসঙ্কোচে চলুন।

আমি: আমার মুখের দিকে আপনার দেখার ধরণ দেখেই আমি সেই রকমই একটা কিছু অনুমান করেছিলাম।

সত্য সত্যই কোন ভয়ের কারণ ছিল না বা হয় নাই। আমায় তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। তারপর যথোচিত যত্ন সহকারে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিলেন। দুই একজন বন্ধু বান্ধবও ডাকাইলেন এবং সংকীর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। নিরোল গ্রামে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কীর্ত্তনীয়া আছেন; তাঁহাদের একদলকে আনাইয়া আমায় পদকীর্ত্তন শুনাইলেন। বলিলেন: এই কীর্ত্তনীয়াই আমাদের গ্রামের গৌরব।

কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন: আমার এই শিশুটির গান শুনিবেন? এস ত বাবা, সেই গানটা কর ত? বলিয়া পুত্রকে ডাকিলেন। বোধ হয় আড়াই কি তিন বৎসরের শিশু,—নিঃসঙ্কোচে সে আসিয়া বাপের হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

বাপ বলিল: গাও। পুত্র বলিল: তুমি গাও। তখন বাপ সুরু করিলেন,—সুধামাখা হরিনাম, কে রে আনিল জগতে,—

তখন শিশু অতি মধুর স্বরে আরম্ভ করিল। কি মিষ্ট স্বর, কথা তাহার,—অস্পষ্ট বটে কিন্তু সুর নির্ভুল এবং স্পষ্ট। কোথায় ছিল কে আনিল, রে—এইভাবে সব গানটি গাহিয়া শিশু হাসিয়া আত্মপ্রশংসার সঙ্কোচে বাপের কোলে মুখ লুকাইল।

পুলিশ বিভাগের লোক—এই প্রথম দেখিলাম হরিভক্ত, অতি সাত্ত্বিক ভাবের মানুষ। বাস্তবিক অবাক হইয়াছিলাম।

বড় আনন্দে সে রাত্র কাটাইয়া পরদিন প্রাতে তারাপুর যাত্রা করিলাম।

তারাপুর আসিতে মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে যতটা, বোধ হয় রামপুর হাট ষ্টেশন হইতে একটু বেশী হাঁটিতে হয়। আমি মল্লারপুর হইয়াই আসিয়াছিলাম। মাঠের পথে,—অনেকটা দূর হইতে তারার মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। তারাপুর গ্রামখানি ধান-জমি হইতে অনেকটাই উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। বর্ষাকাল, পথে ঘাটে কাদা হইয়াছে, গ্রামখানিও বড় অপরিষ্কার—গ্রামের ভিতর রাস্তাটায় দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইয়াছিল। মন্দির সংলগ্ন স্থান, খ্যাপা বামার কুটীর, শ্মশানক্ষেত্র, এ সকল স্থান, দ্বারকা নদী পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

গিয়া উঠিলাম একেবারেই বামার কুটীরে। বামা-খেপার ভাল নামটি বামদেব। তিনি কুটীরের বাহিরে বসিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থা তখন তাঁহার, বসিয়া বসিয়া যেন ঝিমাইতেছিলেন।

কুটীরের বাহিরে যে চালা আছে সেইখানেই গিয়া বসিলাম,—তিনি ঝটিতি একবার চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলাম, কি বিশালায়ত চক্ষু—তাহাতে লালের আভা। অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলাম। প্রথমে প্রণাম করি নাই। দুই একজন আরো যাঁহারা সেখানে ছিলেন, তাঁহাদের একজন বলিলেন : ইনি বাবা যে, প্রণাম করলেন না ? আমি তখন উঠিয়া প্রণাম করিলাম। তাঁহার মূর্ত্তিতে এমনই একটি আকর্ষণ আছে যাহাতে প্রণামের কথা মনেই হয় নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : কোথা হোতে আসা হচ্ছে বাবা !

আমি অট্টহাসের কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন : ওখানে গৌরীকান্ত ভৈরব আছে নাকি ? আমি বলিলাম : নামটি তাঁহার জানি না, তিনি আর কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ পর তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে চলিয়া গেলেন। বাবার সঙ্গে দুই একজন ভক্তও গেলেন, আমিও উঠিয়া সরোবর এবং মন্দিরাদি স্থান দেখিতে লাগিলাম।

মন্দিরটি পুরানো, বাঙ্গলার বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্য—তাহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্য ততটা নাই, পোড়া ইটের নানাপ্রকার গড়ন আছে, মন্দির সংলগ্ন ভোগ রান্নার স্থান ; বিশাল প্রাঙ্গণ—চারিদিকেই প্রাচীর। বক্রেশ্বর কালিবাড়ীর যে ভাবের সংস্থান তারামন্দির তাহাপেক্ষা অনেক প্রাচীন, উন্নত, সুরক্ষিত এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ। স্থানটি দেখিয়াই আমার প্রাণে আনন্দ হইল,—ভাবিলাম, কিছুদিন এখানে থাকিব। মন্দির পার্শ্বেই একটি ঘাট-বাঁধানো রম্য সরোবর।

একটি ব্যক্তি শ্যামবর্ণ, মধ্য আকারের, দীর্ঘ কেশ, শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু দুটি—নামটি তার নগেন পাণ্ডা। তিনি ঘাটের চাতালে বসিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে আলাপ হইল। এখানে পাণ্ডাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী, নগেন পাণ্ডা এখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বলিতে হইবে না, ইনি একজন গোঁড়া তান্ত্রিক। গলায় তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কবচ। চরস আর গাঁজাই হইল সারাদিনের চল্‌তি নেশা। কারণটা রাত্রেই চলে। একজন যুবা বেশ ফর্শা রং, চক্ষু দুইটি তার কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, রোগা শরীর, বড় বড় চুল, অল্প গোঁফ-দাড়ী—তিনিই বাবার কুটীরের সব সময় সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধান করেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, আবার গাঁজা ডলাই-মলাই করেন আর শেষে বাবার প্রসাদ পান।

স্নানাদি সারিয়া লইলাম। শুনিলাম, দ্বিপ্রহরের পর মার মন্দিরে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা। এখনও অনেক দেরী দেখিয়া শ্মশানের দিকে বেড়াইতে গেলাম। বেশ বিস্তৃত শ্মশান। তাহার মধ্যে জাম গাছই যেন বেশী। পথ হইতে নদীতীরে অনেকটা লম্বা শ্মশানভূমি। চারিদিকেই নর-কপাল ও অস্থির ছড়াছড়ি। বামার সাধন স্থানটুকু বেশ চওড়া করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। (এটা প্রথমবার ১৯১১ সালে যখন যাই তখন দেখি নাই, দ্বিতীয়বার, অনুমান ১৯১৬ সালে যখন যাই তখন দেখিয়াছিলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও তখনই দেখি। এখানে আমার প্রথমবারের বিবরণই দিলাম।) তাহার কতকটা দূরে একটি বেশ প্রকাণ্ড বৃক্ষ। জাম কি অশ্বত্থ মনে নাই, তাহার মূল হইতে কতকটা উচ্চে যেখান হইতে মোটা ডাল বাহির হইয়াছে তাহার সঙ্গে এক করিয়া একটি হাল্কা কুটির বাঁধা আছে। সেখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের

সাধনস্থান বা আসন। তিনি সেইখানেই থাকেন। একটি সিঁড়ির মত আছে, তাহারই সাহায্যে উঠা-নামা করা হয়। তাহার পার্শ্বেই একটি উঁচু চাতাল গাঁথা আছে, কোন সমাধির চাতাল, তাহার সঙ্গে চক্কোত্তি মহাশয়ের কুটীরের একাংশ মেলানো। আসাম অঞ্চলে জঙ্গলে যেমন কোথাও কোথাও গাছের উপর কুটীর বাঁধা হয়—অনেকটা সেইরূপই।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন ওখানেই ছিলেন, গৌরবর্ণ মানুষটি প্রৌঢ়, মাথায় জটাজুট। তামাক খাইতেছিলেন—দেখা হইল। সামান্য পরিচয়-হিসাবে দু এক কথাও হইল। পরে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। সে কথা যথাসময়েই বলিব।

আজ এইভাবে দেখাশুনা করিয়াই দিনটি কাটাইলাম। রাত্রে বাবার আশ্রম কুটীরের চালার একপার্শ্বে শয়নস্থান ঠিক করিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমি একপার্শ্বে আর বাবার ঘরের সেই অধ্যক্ষ যুবাটি—অপর পার্শ্বে।

সকালে বাবা পুকুরঘাটে বসিয়াছিলেন—সঙ্গে পাণ্ডাদের কে কে ছিলেন। শরীর খারাপ যাইতেছিল কয়দিন, আজ স্নান করিবেন। একটি শিশু বালককে যেমন করিয়া স্নান করানো হয়, বাবাকে সেই রকম সকলে মিলিয়া স্নান করাইয়া দিল। তারপর বাবা একটু ধূমপান করিলেন।

আজ সারাদিন এত বাইরের ভক্তগণের আমদানী ছিল যে একটু শান্তিতে কথা কহিতে বা তাঁহার কাছে কিছু আসল কথা শুনিতে পাই নাই।

বৈকালে একটু ফাঁক পড়িল,—বাবা তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন,—আমি গিয়া বসিলাম। নগেন পাণ্ডা আরও সব কে কে ছিল যেন।

একজন আসিয়া বলিল: বাবা—বাবু আইচেন যে, তাঁর মেয়্যাও আইচেন, ছেল্যাকে নিয়া আইচেন—আপনাকে দেখাতে। মন্দির-বাড়ীতে আছেন, এই আসবেন এইখানকে এখনি।—মেয়ে অর্থাৎ স্ত্রী।

বাবা কিছুই বলিলেন না, না—রাম, না—গঙ্গা।

কতক্ষণ পর একটি ভদ্রলোক সঙ্গে স্ত্রী, কোলে একটি এক বৎসরের ক্ষুদ্র রুগ্ন শিশু সন্তান—আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

বাবা বলিলেন: তোর ছেলেকে নিয়ে এসেছিস্?—কিন্তু ও রকম নিয়ে এলে হবে না, তুই ওকে আমায় দিয়ে দিতে পারবি?

ভদ্র ব্যক্তি বড় কাতরকণ্ঠে তাঁহার চরণের প্রান্তে মস্তক-স্পর্শ করিয়া বলিলেন: বাবা এ আপনারই সন্তান, আমার নয়, যা আপনার ইচ্ছা তাই হবে বাবা—

আচ্ছা, আচ্ছা। বেশ ত বল্লি,—এখন যা বলি, তাই কর দিকি! ছেলেটার গা থেকে সব কাপড় খুলে নে—নিয়ে ঐ শ্মশানের উপর মাটিতে ফেলে রেখে আয় গা, যা।

শুনিয়া জননী আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রাণে বল ছিল; তিনি বলিলেন: তোমার কান্না কেন? যাঁর ছেলে তিনি যেখানে রাখতে বোলবেন সেইখানেই রাখতে হবে। চল, ওঠ—

স্নেহ-কাতরা জননী মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিলেনঃ ওখানে শেয়াল কুকুর ঘুরে বেড়াচ্চে যে—কি ক'রে ওখানে,—

স্বামী কোন কথায় কান না দিয়া,—চল চল, ওঠ—বলিয়া সন্তানকে কোলে লইয়া চলিলেন। জননীও উঠিতে ছিলেন, বাবা তাঁহাকে বলিলেনঃ মা, ওখানে তুই যাবি কেনে, তুই হেথা বসে থাক্‌, বাবু আসুন, এলে যাবি গা।

কাজেই তিনি বসিয়া অবগুণ্ঠনের মধ্যে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণেই তাঁহার স্বামী আসিলেন। তখন বাবা বলিলেনঃ যা তোরা এখান হোতে চলে যা, যেঁয়ে মন্দিরে বোস্‌গা যা। তাঁহারা আবার বাবাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বাবা, তখন তাঁহারই একজনকে বলিলেনঃ দেখ ত বাবা কেলোটা কোথাকে ?

একটু উঠিয়া সে ব্যক্তি বাহিরে দাঁড়াইয়া বড় গলায় 'কেলো' 'কেলো' বলিয়া ডাকিলেন, অল্পক্ষণেই ফিরিয়া আসিলেন—সঙ্গে এক কালো কুকুর।

কুকুরটা ভয়ানক কালো, দেশী গ্রাম্য কুকুর হিসাবে বেশ বড়, চক্ষু দুটি যেন জ্বলিতেছে। সে আসিয়া বাবার কাছে সুমুখের পা দুটি ছড়াইয়া তাহার উপর মাথাটি রাখিয়া দিল। বাবা তাহার গায়ে হাত দিয়া একটু আদর করিলেন তারপর যেমন করিয়া আপন অনুগতজনকে আজ্ঞা করেন, সেই ভাবে বলিলেন,—যা কেলো, তুই শ্মশানে ছেলেটাকে ছাখ গা যা। শুনিবামাত্রই কুকুরটি উঠিয়া শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল। বাবা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যে সকল ব্যক্তি ওখানে ছিলেন, তিন চারটি লোক একটা আতঙ্কে সকলেই যেন অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে বাক্য নাই।

আমার মনে একবার হইল—দেখিয়া আসি শিশুটি কি ভাবে শ্মশানে পড়িয়া আছে। কিন্তু কৌতূহল থাকিলেও বিস্ময় এবং একটা আতঙ্ক মিলিয়া এমন একটি ভাবে আমায় অভিভূত করিয়াছিল, আমি উঠিতেই পারিলাম না।

দ্বিপ্রহরের পর প্রসাদ পাইবার সময় ওখানে সকলে সমবেত হইলে দেখিয়াছিলাম সেই ভদ্র ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে একটি বিষাদের ছায়া তখনও দেখিয়াছিলাম।

আমরা প্রায় পাশাপাশি বসিয়াছিলাম কিছু কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। পরিচয়ে জানিলাম, কলিকাতায় থাকেন এবং রেল আফিসে কর্ম্ম করেন, নিজ বাড়ি জিরেট বলাগড়। সন্তান হইয়া বাঁচে না, চারিটি সন্তান শিশুকালেই গিয়াছে—এইবার তাই বাবার কাছে আনিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষেই বাবার শিষ্য বলিলেন। বাবা বৈকালে যাইতে বলিয়াছেন ছেলেটিকে লইয়া—

প্রায় দেড়টা নাগাৎ প্রসাদ পাওয়ার পর যখন আমি বাবার কুটীরে আসিয়া বসিলাম তখন বাবা নিজ-শয্যায় শুইয়াছিলেন, ঘুমান নাই। পাশে একজন বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে তিনি শুইয়া আছেন; দুই একটি কথা অস্পষ্ট গোঁয়ানির মত মধ্যে মধ্যে আমার কানে আসিতেছিল। তাঁহার আওয়াজই ঐরূপ, অবশ্য বয়স হইয়াছিল বলিয়াও বটে, তাহার

উপর দাঁতগুলি বোধ হয় বেশীর ভাগই গিয়াছে—সেইজন্য কথা কহিতে গেলে গলার স্বর ঐরূপ অস্পষ্ট হইত।

যিনি বাতাস করিতেছিলেন, তিনি নিকটেই ছিলেন—আমি ছিলাম কতকটা দূরে, বাহিরের দিকে। সেই কালো কুকুরটি ছাড়া অপর চারিটি কুকুর বাবার ঘরের দরজার নিকটেই শুইয়াছিল। একটি সাদা, একটি লাল, একটি হলুদ রং, অপরটি খয়ের রং—বোধ হয় উহাদের মধ্যে সাদাটি গর্ভবতী ছিল, সে মধ্যে মধ্যে বাবার কাছে যাইতেছিল; তখন বাবা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে ছিলেন। কুকুরগুলির উপর বাবার অসীম স্নেহ দেখিলাম। উহাদের নাম আছে। যথা—কেলো, ভুলো, শ্বেতফুলি, লালি এইরূপ।

বেলা তিনটা নাগাৎ বাবা উঠিলেন,—গাঁজা চলিল, তারপর বাবা আমার দিকে দেখাইয়া বলিলেন: ওঁকে দাও।

নগেন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন: উনি এ সব খান না। বাবা তখন আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি ব্রহ্মচারী বট!

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম: না না আমি গৃহী,—আপনাকে দর্শন করতেই এখানে এসেছি। শুনিয়া বাবা বলিলেন: তোমার কিছু অসুখ বিসুখ আছে নাকি?

আমি বলিলাম: না, আমার শরীরে কিছু অসুখ নেই। তবে ভবব্যাধি যদি বলেন তা আছে।

বাবা: শরীরে অসুখ-বিসুখ কিছুই নেই, তবে আমার কাছে কি করতে এয়েছ?

আমি: অসুখ কি ব্যাধি না থাকলে কি আপনার কাছে আসতে নেই!

তিনি: কৈ, কঠিন রোগ না হোলে ত কেউ আমার কাছে আসে না। ঐ দেখ না, এক মরা ছেলে নিয়ে এলো গা, বাঁচিয়ে দাও,—আমি কি করবো-তারা—মা যা করবেন, তাই হবে। আমি কি ডাক্তার বটি?

এখন দেখিলাম, বাবার বেশ প্রফুল্ল ভাবটি।

কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে গরদের জামা-চাদর-পরা মোটাসোটা একজন ধনবান ভদ্রলোক আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন।

বাবা মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বলিলেন: কে, অমর্ত্ত?

হাঁ বাবা! বলিয়া তিনি আবার প্রণাম করিলেন।

মেয়্যেটি মারা গেছে বটে?

তিনি বলিলেন: আর কি বোলব বাবা, মার ইচ্ছা। তারপর অসুখের সমস্ত ইতিহাস—সে কথায় আমাদের কাজ নাই।

বাবা আমাদের বড়ই সরল লোক। এতটা বয়স হইয়াছে কিন্তু গম্ভীর বলিয়া ধরিবার যো নাই। আমাদের পক্ষে তাঁর ভাষা বুঝা শক্ত। কারণ একে ত বাবা পল্লীগ্রামের মানুষ, তার উপর বাবার কথা সংক্ষিপ্ত—বুঝিয়া লইতে পারি, কিন্তু ব্যাখ্যায় বড় হইয়া যায়। সেইজন্য মাঝে মাঝে ঠিক বাবার উক্তিগুলি যথাসম্ভব সোজা করিয়া বলিবার চেষ্টাই করিতেছি।

বাবা খুব রসিক লোক, বোধ হয় তাঁর প্রত্যেক কথাই রসিকতা-মাখান। একটা কথা বলিয়া এমন ভাবে মুখের দিকে চাহিবেন, যাহাতে কথার সহজ রহস্যটি অনুভব করা যায়—কিন্তু তিনি গম্ভীর, নিজে যেন ধরা দিতে চান না। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্যও রহস্য-মাখানো। এইভাবে তিনি কথা কহিতেন। আজ সকালে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়াই কিছু শুনিব বলিয়াই বাবার কাছে গিয়া বসিয়াছি। একজন নিয়তই তাঁর কাছে আছে, উঠা-বসায় সাহায্য করিতেছে। ব্যাধি তাঁর বিশেষকিছু আছে বলিয়া বোধ হইল না, কিন্তু কেমন অথব্য হইয়া পড়িয়াছেন, কথা সব সময়েই চলিতেছে, মাঝে-মাঝে অতি করুণ, হৃদয়ভেদিস্বরে, মা, কিম্বা তারা, তারা, বলিয়া ডাকিতেছেন। চক্ষু যেন জল-ভরা, রক্তবর্ণ, তাহাতে জ্যোতি। যখন আমার দিকে চাহিলেন, মনে হইল একেবারে আমাকে গ্রাস করিয়া লইলেন। একটু ভয় হয় সে চাহনি দেখিলে;—কিন্তু কথা শুনিলে সাহস আসে।

আমার দিকে চাহিয়া রসিকতা করিয়া বলিতেছেন: বাবা, বড় ছোটবেলায় ঘর ছেড়েছ,—গিন্নিটি কি মনের মত হোলো' না বুঝি?—

আমি চুপ করিয়াই থাকিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু জবাব দিতে হইল। বলিলাম: আমি ত ঘর ছাড়ি নি!

তিনি: ঐ হোলো, বৈরিগীর ধাঁচা নিয়ে ত ঘোরা-ফেরা হচ্ছে! আমি কিছু বলিলাম না দেখিয়া তিনি নিজেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যথা,—বেশ করে ঝেড়ে, দমভোর যৌবনটা ভোগ করে এলে ভাল হোতো বাবা, বুঝছ না! দুটি চারটি ফলও হয়ত হোতো, জীবনের-রসটা ভাল করে ভোগ করলে যোগটা ভালই হোতো তাই বলছি।

এমন সময় কলিকাতার বাবুটি তাঁর সেই রুগ্ন সন্তানটি কোলে, প্রফুল্লমনে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন, পশ্চাতে স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবার সহচর সেবকও গাঁজার কলিকাটি সেই সময় লইয়া বাবার হাতে পৌছাইয়া দিলেন। বাবা প্রফুল্লভাবে বলিলেন:—কেমন তোর ছেলে ত বাঁচল?

সে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্রণাম করিয়া ভক্তি গদ-গদ স্বরে বলিলেন: বাবা, এ ত আপনার, আমার ছেলে কেন বোলছেন?

বাবা বলিলেন: মা-ই বাঁচিয়েছেন—আমার কি সাধ্য—ও কথা বলতে নেই। তবে তোকে ত মানুষ করতে হবে। আমি ত ওকে মানুষ করতে পারবো না। যা—ঘরে যা,

যেয়ে তারা মার নামে ওকে ডাকবি। সে ব্যক্তি তখন পকেট হইতে কি একটা বস্তু তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া কি ভাবিয়া আবার রাখিয়া দিলেন, পরে বলিলেন: ও বেলা যাব তখন আমরা, এ বেলা প্রসাদ খাব এখানে। তবুও বাবাকে ত কিছুক্ষণ দেখতে পাব। বাবার সঙ্গে আমাদের—

বাবা বাধা দিয়া বলিলেন: সব শালা চোর এখানে,—টাকা-কড়ি দিস না, কোথায় রাখবো। তার চেয়ে কিছু মাল দিয়ে যাস্। মাল অর্থে নেশার জিনিস।

বাবা এবার কলিকাটি লইয়া টান দিলেন, একটি কেমন আওয়াজ হইল। এমন কখনও শুনি নাই। প্রসাদ লইয়া সেবক পশ্চাতে বসিয়া গেল।

সেই ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া বাবা তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: এই দেখ কেমন গেরস্ত সংসারী, সাধনও আছে মার কৃপায় আবার সংসারী, কাজকর্ম্মও হচ্ছে। ছাড়াছাড়ি নেই, সংসারকে ভয় নেই। এমন না হোলে মার কৃপা হবে কেন? বাবাজীর গোড়ায় গলদ।

আমি বলিলাম: খুলে বলুন, তা হোলে বুঝতে পারবো।

তিনি: ঐ ত গোড়াতেই ভয়। ঘরে থাকবো না বাইরে যাবো। শেষে ভেবেছিস্ কি ধাঁধা পড়তে হবে নি? মাকে ত জানতে নাই বাবা—সে কেমন মেয়্যা,—দেখবে তখন বুঝবে যখন ঘোরপাক খাওয়াবেক।

আমি বলিলাম: যদি বলি মা-ই ত সব করাচ্চেন।

বাবা তখন সেই ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন: এই দেখ্ ঠ্যাঁটা,—যদি মা-ই সব করে থাকে জানছিস, তবে অত হিসাব করে সব কাজ করছিস্ কেনে? মা-কে ধরে এক জায়গা বসে থাকগা যা না।

আমার এ সময় তর্ক-বিতর্ক আনার অভিপ্রায় নয়, উদ্দেশ্য কিছু সাধুসঙ্গ করা—তার ফলে যদি কিছু পাওয়া যায়। বামাক্ষেপারও শরীর খারাপ। মনে হয় ইহার পর এক বৎসরের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তখন আমি কলিকাতায়। যাহা হউক আমি আর কিছু বলিলাম না।

আমার ধারণা হইয়াছিল—অন্যান্য সাধু যেমন লোক-সঙ্গ হইতে দূরে থাকেন, কিছু জানিতে বা বুঝিতে চাহিলে বিশেষভাবে ধরিতে হয়, বাবার সে-সব নাই। কারণ বাবার সর্ব্বদাই শিশুর মত ভাব, বিচার-বুদ্ধি পূর্ব্বক কিছু বলেন বা করেন তাহা বোধ হইল না। যখন তিনি কারও সঙ্গে কথা কন, সে কথার মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তাহা বুঝা যায় না, আর তাঁর ভাষা এমন যে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না তাহা বলিয়াছি। যাঁহারা নিয়তই তাঁহার কাছে থাকেন তাঁহারা ব্যতীত অন্যস্থানের লোক চট্ করিয়া তাঁহার কথা ধরিতে পারেন না।

ভাবিলাম, ওখানকার একজনকে না ধরিলে তাঁহার সঙ্গে কথা কওয়ার সুবিধা হইবে না। নগেন পাণ্ডা বলিয়া একজনের কথা বলিয়াছি—বাবার সঙ্গ-লাভের আশায় গিয়াছি এবং আমার

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া তাঁহাকে কিছু সাহায্যের জন্য কাল অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমার মনে হইল তাঁহার পরিচিত এবং ভক্ত-বিশেষ ব্যতীত বাবা আর কাহাকেও তেমন আমল দিবেন না। কিন্তু নগেন পাণ্ডা বলিল যে উহা ঠিক নয়, বাবার স্বভাবই ঐরূপ, তাঁহাকে জোর করিয়া না ধরিতে পারিলে, নূতন লোক হোক বা পরিচিতই হোক কেহ সহজে তাঁর কৃপা বা স্নেহ পাইতে পারে না। তারপর যে ব্যক্তি যে ভাবের, যে দলের অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লোক তিনি তাহা বুঝিতে পারেন, এবং সেই ভাবেই তার সঙ্গে ব্যবহারও করিয়া থাকেন। নগেন বলিল: যদি আমি তামাক বা গাঁজা প্রভৃতি খাইতে পারিতাম তাহা হইলে সুবিধা হইত। অর্থাৎ সেখানে চট্ করিয়া স্থান পাইতাম, বাবারও অনুগ্রহ হইত। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, উহা ঠিক নয়।

যাহা হউক, এখন নগেন পাণ্ডা বাবাকে আমার সম্বন্ধে বলিল: বাবা, ইনি আপনার কাছে শুনতে চান, সেইজন্যই এসেছেন। শুনিয়া বাবা বলিলেন: ওঃ—কথা শুনতে এসেছ? এই-ত কথা হচ্ছে, শুনে যাও,—কিছু দক্ষিণে এনেছ? বাবা রসিক লোক। দক্ষিণে অর্থাৎ গাঁজা আমি বুঝিতে পারি নাই, নগেন বুঝিয়াছিল সেইজন্য বলিল, উনি ওসব পছন্দ করেন না, তা ছাড়া উনি ছেলেমানুষ, ওর কাছে ওসব কিছু নাই। উনি বেদাচারী।

বাবা বলিলেন: তবে কালী বল, তারা বল, বাবা, মায়ের নামই সার, আর কি করতে পারবি বল। আমরা মদ ভাং খাই আর মায়ের চরণে পড়ে থাকি, মা যা করেন। আর কিছু কাথাবার্ত্তা তো জানি না। বলিয়া একবার, তারা-মা, এমন অপূর্ব্বভাবে বলিলেন যে তাহা শুনিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। (যেমন শিশু মাকে ডাকে সেইরূপ তাঁহার মধ্যে একটি জীবন্ত এবং ব্যাকুল অনুভূতি।)

তারপর বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন: হ্যাঁ বাবা, তোমার গুণের কথা ত কিছু জানলাম না।

আমি বলিলাম: আপনার কাছে এসেছি, আমাকে দয়া করুন। আমার ত গুণ এমন কিছু নাই যার কথা বলে আপনাকে খুসী করতে পারবো।

তিনি বলিলেন: তা হোক, মুখে যে গুণের কথা লেখা আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি বাবা, লুকালে হবেক কেনে।

সস্ত্রীক ভদ্রলোকটি শিশু-কোলে, এই সময় বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মন্দিরের দিকে গেলেন।

এমন সময় বেশ হৃষ্ট পুষ্ট শ্যামবর্ণ শরীর, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চক্ষু, উজ্জ্বল কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, লাল কাপড়-পরা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ হইবে। এক ব্যক্তি আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিল। বাবা নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া যেন সজীব হইয়া উঠিলেন, বলিলেন: সাঁইতে থেকে এই এলি নাকি?

সে ব্যক্তি বলিল : মজুমদার মশাইও এসেছে, দুপুরে আপনার কাছেই আসবে কয়ে গাঁয়ের মধ্যে গেল। কাল সারা রাত ধরেই কাজ চলেছিল—দেখেছি উয়ার মনের গতিক ভাল নয়।

বাবা বলিলেন : তবে উ মরবে গা, ক্রিয়া-কর্ম্ম না করে শুধু কারণ খেয়ে ফুর্ত্তি করবো বল্লেই কি মার দয়া হয়,—উয়ার কথায় আর কাজ নাই,—মা বুঝবেন গা। তু একটা মায়ের নাম কর—সেই ভাল হবে।

তখন সেই ব্যক্তি বেশ সতেজ গলায় রাজা রামকৃষ্ণের একখানি গান ধরিল,—

দীন-তারিণী, দুরিতবারিণী, সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন-নিধন-কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।

সে গানটি এমনই মধুর—শুনিতে শুনিতে বাবার চক্ষে আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। গানের শেষ লাইনটিও মনে আছে—

বৈশেষিক বেদান্ত নাহি পেয়ে অন্ত,
অনন্ত তোমায় চিনিতে পারেনি।

তারপর বাবা বলিলেন : সেইটা বল্‌ত! নগেন পাণ্ডা বলিল : কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে—সেইটা। তখন তিনি সেইটি ধরলেন—

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে বিষয়-বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়া মহতত্ত্ব, ছাড়ি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনে আপনে।

গানখানি শেষ হইলে গাঁজা চলিল, বাবা প্রসাদ করিলেন। বাবা ঢুলিতেছেন, চক্ষে ধারা, আবার টানিতেছেন,—শেষে কাশিতে-কাশিতে ছিল্‌মটি ভক্তের হাতে দিলেন।

নগেন পাণ্ডাও প্রসাদ পাইল, পাইয়া উঠিয়া গেল। তখন বাবার দিকে চাহিয়া একজন বলিল : আপনার কাছে আমার কথা আছে বাবা। বাবা বলিলেন : বল কেনে। কিন্তু সে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল, ভাবটা এই যে আমার সম্মুখে অর্থাৎ আমি থাকায় সেখানে, তাহার কথা বলিতে আপত্তি আছে। দেখিয়া আমি তখনই নদীতীরে শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া এক জাম-গাছের তলায় বসিলাম। ভাবিতেছিলাম এখানে কি করিতে আসিলাম, কেনই-বা আসিলাম। বাবার সাঙ্গোপাঙ্গ এমনভাবে ঘিরিয়া আছেন যে নিরিবিলি একটু যে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিব তার যো নাই। মনটা খারাপ হইয়া গেল। এখানে আর থাকিব কি না ভাবিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল : বাবা আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

অন্তরে একটু বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম হয়ত বাবার দয়া হইয়াছে। গিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে না বসিতেই তিনি বলিলেন : বাবা, মনে দুঃখ পেয়ে গেলে তাই

ডাকলাম। তা উ শালা আমায় সেই চুরির কথা বলে—সে হয়ে গেছে উ কথায় আর কাজ কি, যা হয়ে গেছে তার কথায় আবশ্যক কি আছে। তু গান করিস নাকি? * ছিচরণ তু কি বলিস?

ঐ ছিচরণই গোপনীয় কথা বলিয়া আমায় উঠাইয়া ছিল। সে ব্যক্তি সায় দিল, বলিল: হ্যাঁ উয়ার কলকাতার গান একটা হোক না। আমি তো অবাক, শেষে অব্যাহতি পাইলাম একখানা ব্রাহ্ম-সঙ্গীত গাহিয়া। বাবা বলিলেন: তোর স্বরটা নরম বটে।

ঐ ছিচরণ দেখিলাম, তখন হইতে আমায় একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। বাবার সভায় গাঁজা-প্রসাদ পাইয়া ছিচরণ উঠিল, আরও দুই তিন জন উঠিল। লোক কমিয়া গেলে আমারই সুবিধা। দুজন ছাড়া আর সব যখন গেল—আমি তখন বাবার কাছে ঘেঁসিয়া পায়ে হাত দিলাম। দিবামাত্রই বাবা চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন: ওরে শালা, পায়ে হাত দিতে হবেক নাই, তু বল কি বলিস। পায়ে হাত দিয়ে আমার মন ভুলাতে আইচিস্, খোসামুদ্দা!

আমি বলিলাম: আপনি তো মনের কথা বুঝেছেন, আপনি আমায় দয়া করুন। তিনি বলিলেন: তু-ত এখন দুচার দিন এখানে থাকবি, একটু ঠাণ্ডা হ কেনে, তবে সব হবে যেঁয়ে। মনটা তোর ভাল বটে।

আমি বলিলাম: আপনি আমায় ঠাণ্ডা করে দিন। আমি বড়ই চঞ্চল।

তিনি: আমি করলে হবেক কেনে, তু আমার কথা লিবি কেনে। তোর এখন প্রাণটা ঘুরতে চাইচে, ঘুরতে হবেক তোরে অনেকখানি, তা বেশ, ঘোর না দিন কত। দেখ যেঁয়ে মায়ের কাণ্ডকারখানাটা। একটু থামিয়া আমায় আবার বলিলেন, ঠাণ্ডা হতে চাস্‌তো আমি যা বলি তা শুন, আমি বলি, ঘরকা যা। ঠাণ্ডা হোতে আর জায়গা কোথা, কোনখানে ঠাণ্ডা হোতে হবেক নাই। তোর মা বাবা আছে বটে?

আমি: হাঁ, বাবা, মা, ঠাকুরমা, দিদিমা—

তিনি: আর বলতে হবেক নাই—ঐ হয়েছে—ঘরে যেয়ে বাপ মায়ের চরণ পূজা করগা, তাইতেই, সব পাবি গা, সব হবে। শুনিয়া আমার মনে হইল যে আম্যাকে ভাগাইবার জন্য এরূপ ভাবের কথা বলিতেছেন!

আমি তখন বলিলাম: দেখুন, একটা অন্তরের কথা আজ আপনাকে বলছি। সদা সত্য কথা কহিবে, কখনও মিথ্যা বলিবে না, কাহারও কিছু চুরি করিবে না, প্রবঞ্চনা করিবে না, পিতা মাতার সেবা করিবে, তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে অথবা তাঁহাদের ভগবান জানিয়া মনে-প্রাণে অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের তুষ্ট রাখিবে ইত্যাদি ভাল ভাল কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি আর নীতি-পুস্তকে পড়ে আসছি কিন্তু প্রাণ ত চায়না তাঁদের দেবতা-জ্ঞানে সেবা

---

* তাঁহার ঠিক নামটি মনে নাই, হয় শ্রীচরণ কি শ্রীগোবিন্দ কিংবা ঐ রকম একটা কিছু হইবে। আর চুরির কথা এই যে বাবার কিছু টাকা কিছুদিন পূর্ব্বে চুরি হইয়া যায়—সে কথা পরে যথাসময়েই হইবে।

করিতে। ভগবানকে দেখতে পাই না, কল্পনায় তাই হয়ত বেশ একটা আকর্ষণ অনুভব করি—কিন্তু বাপ-মাকে চক্ষের সামনে নানাভাবে আমাদেরই মত সহজ ভাবেই পাই বোলে হয়ত ভগবানের মত ভাবতে ত কোন কালেই পারলুম না। কেমন যে একটা দুর্ব্বলতা এসে পড়ে—মনে মনে ঠিক করলেও কাজে পারি না।

তিনি বলিলেন: কেন রে—

আমি বলিলাম: বাপ-মার উপর ভগবানের ভাব এনে যে ভক্তি তা আমার আসে না। আমি তাঁদের সৎ পুত্র হোতে পারলাম না,—আমার বাড়ী ভাল লাগে না, তাঁদের সঙ্গ ভাল লাগে না।

তিনি বলিলেন: হ্যাঁ দেখ আমার দিকে,—যে যেমন ছেল্যা তার বাপ-মা—ভগবানও সেই রকম হয়। তুই ঠ্যাঁটা হয়েছিস্ তাই উঁয়ারাও ত ঐ রকম হইচে। তু যদি ভাল,—সোজা রকম মানুষ হতিস্ উয়ঁারাও ভাল হোতো। আসলে তু ত ভগবান চাস না, তুই হেথা-সেথা যাবি আর করে বেড়াবি, এখন তাই তোর মন। তা তাই কর কেনে,—তবে বাপ-মাকে ভক্তি করে করবি, তাদের দোষ দেখে তাদের অমন হেলা করবি কেনে?

আমি: আপনার কথায় এখন তাই ভাল মনে হচ্চে—কিন্তু তাঁকে ভগবান বোলে ত ভাবতে পারি না—এইটাই বড় দুঃখ যে।

তিনি: মনে জানবি বুড়া বাপ-মাকে যে খেতে না দেয়, সেবা না করে সে শালা কোন দিনও ভগবান পাবে নাই।

আমি: বাবা আমার কাছে খেতে পরতে চান না—সে জন্যে ভাবনা নেই কিন্তু তিনি ত আসলে আমাদের এড়িয়ে থাকতেই চান।—এখন আমরা মানুষ হয়েছি, আপনি চরে খাব, তাঁর কাছে আসবো না, কোন কিছু জানাবো না এই তিনি চান। তবে আমি উপার্জ্জন করে যদি তাঁর হাতে এনে দিতে পারি—আর তাঁর কাছে কিছু আশা না করি তাহোলে তিনি সুখী হবেন।

তিনি: আমার কথা তুই ত নিচ্ছিস না,—আমি বলি তু তাদের সেবা করবি, তাদের প্রসন্ন রাখবি। তাতেই তোর কাজ হবেক।

আমি: আমার সেবা ত তিনি চান না—

তিনি: তু বড় ঠ্যাঁটা,—তিনি চাইবে কেনে, তু আপনি করবি গা।

আমি: দেখুন, সত্যি কথা, আমার এমন প্রবল ভক্তি নেই যে তিনি না চাইলেও আমার মনের জোরে তাঁকে আমার উপর সন্তুষ্ট করে নিজের জন্ম সার্থক করি। আমার মনে হয়, এখন তাঁর কাছ থেকে তফাতে থাকলেই ভাল হয়। দূরে থেকে যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা মনে রাখতে পারি, কাছে থাকলে, নানা প্রকার ব্যবহার দেখে তা পারি না। কাজেই তাতে লাভ নেই জেনেই আমি বাইরে দূরেই থাকি।

তিনি: দেখ, তোর যখন বিয়া হইচে তখন তোর এমনটা ভাব তাঁদের ভাল লাগে নাই। তু ঘরকে যা চলে, মায়ের চরণ ধরে পড়ে থাকগা—সেই তোর এখন কাজ। টাকা আনবি, বাপের হাতে দিবি, সংসার-ধম্ম করবি তাই ত ভাল।

বাবা এই সব কথাই বলিতে লাগিলেন ঃ যখন বুঝিলেন তাঁর কথা আমার মনে ধরিতেছে না, তখন বলিলেন ঃ

এই দেখ কেনে মানুষের বুদ্ধি—আমরা মুখ্যু, জানিস কিনা, কলেজে পড়ে পণ্ডিত হই নি, শাস্তোর পড়ি নি, কিছু জানি নি, বল ত, বাপ মা বেঁচে থাকতে কোথায়, কোন শাস্তোরে ঘর ছেড়ে বৈরিগী হয়ে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। তোরা এমনই ঠ্যাঁটা হয়েছিস, ঘরের ভগবান ফেলে বাইরে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মরিস—তোর কি লাজ লাগে নাই ?

আমি ঃ দেখুন, সত্যিই আমি যে হতভাগা তাতে কোন সন্দেহ নেই—না হোলে বাপ মাকে ভগবান বোলে ভক্তি না করতে পেরে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন ? সময় সময় যেন বুঝতেও পারি যে হয়ত আমি ঠিক কাজ করছি না—কিন্তু বাপের উপর ভগবান বোলে ভক্তি যদি না আসে ত কি করি বলে দিন আমাকে।

কেন হয় না বল দেখি তোর,—আমি ত ছেলে-বেলা থেকে বাবা যা বলতো তাই শিরোধার্য্য করেছি। বাপে বোললে—চল গানের পালা গাইবি গা, আমি তখনি গেছি। বাপে বললে—ও কাজ করিস না, তখনি সে কাজে গুরুজ্ঞান করিচি। (গুরুজ্ঞান অর্থাৎ অনিষ্ট জ্ঞানে পরিত্যাগ) তুই-ই পারিস না কেনে ?

আমি বলিলাম ঃ আপনার মত বুদ্ধি যদি আমার থাকবে, তাহোলে আমার এমন অবস্থা কেন,—আমরা বেশী বুদ্ধিমান কিনা। বাপের মধ্যে অনেক দোষ দেখতে পাই। কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, এই সব নিত্য নিত্য দেখে আর ভক্তি থাকে না।

আরে তু শালা, বাপের খুব ঠেঙ্গানী খেয়েছিস বুঝি ?—আমি কি ঠেঙ্গানী খাইনি মনে করেছিস ?—আমিও খুব খেয়েছি, মার হাতেরও ঠেঙ্গানী খেয়েছি, তাতে কি হয়, দোষ করেছিস মারবেন নাই ?

আমি ঃ ভগবানের কি অমন কাম ক্রোধ আছে, তিনি কি তাঁর সন্তানকে এমন ভাবে পীড়ন করেন ?

আরে এটা বুঝিস না বাঁকা ত্যাড়া একটা নোয়াকে সোজা করতে গেলে পিটতে হয়—সোজা হোলে ত কথা ছিল না—তুই ত্যাড়া বাঁকা ছিলি, তাই ঠেঙ্গানী খেয়েছিস—ভগবান যাকে বলিস তিনি ঐ মা তারা, ওই কি মারে নি বাবা ? উ-ও ত মারে সময় সময়—যখন দেখে যে না ঠ্যাঙ্গালে ছেল্যাটা সোজা হয় নাই—তখন দেয় খুব করে বসায়ে।

আপনার কথা শুনে এখন বুঝতে পারছি ব্যাপার, কিন্তু তখন ওসব ভাবতে পারি নি, তাঁদের দোষ বলেই ভেবেছি।

তিনি ঃ আমি এত কথা কইব কেনে, তুই আপনি বুঝে লে না, তোর বুঝবার ইচ্ছা থাকলে তিনি বুঝিয়ে দেবেন যেঁয়ে। তুর ভগবান আর কুথা আছে, যাদের থেকে ঐ শরীর হয়েছে তিনিই তুয়ার ভগবান ! মা যিনি গভ্যে ধরেছেন তিনিই ঐ মা—তাই বোলি, ঘরকে চলে যা—যেঁয়ে কোরে দেখনা কেনে, ঠিক হবেগা।

আমি : তাঁরা চান আমি চাকরী করি, উপার্জ্জন করি—তাহোলে তাঁরা সুখী হন। কিন্তু আমার যে চাকরী করতে ভাল লাগে না।

তিনি : ঐ ত গাঁয়ের কুড়ের মরণ, কেনে তু চাকরী কর না তাতে দোষ কি ?

আমি : চাকরী করতে আমার ইচ্ছা যায় না যে, কি করি বলুন দেখি ?

তিনি : বাপ মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধটা কি, তাঁদের দ্বারা ছেল্যার কতটা ভাল হোতে পারে, তার ধারণা এখনকার সন্তানদের ত নাই-ই, আবার বাপ মায়েরও নাই। এই কথা বলিয়া বাবা একটু নিরীক্ষণ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমার বোধ হইল তিনি দেখিতেছেন, আমি তাঁর কথা কিরূপভাবে লইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : কেন এমনটা হোল, বলুন,—আপনার মুখে শুনলে তবে যদি বুঝতে পারি।

তিনি তখন বলিলেন : তুই ঘরকে যেয়ে তাঁদের অনুগত হয়ে ভক্তি করে দেখগা যা, তা হোলে সব বুঝতে পারবি।

আমি বলিলাম : জোর করে ভক্তি করা যায় কি ? আমার প্রাণ যা চায়, তা না পেলে তাঁকে কেমন করে ভক্তি করি,—মনে হয় বাল্যকাল থেকেই আমার বাবাকে যমের মত ভয় করতেই শিখেছি, তাঁকে দেখলেই আমার ভয় আসে মনে, তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দে কথা কইতে পারি না, তিনিও আমাদের কাকেও নিজের কাছে নিয়ে দু'দণ্ড বসতেও চান না। বড় হয়ে কাজের জন্য যেটুকু যাওয়া, তাঁর নিজের দরকারমত ডাকেন সেটি হয়ে গেলেই আর যেন কোন সম্বন্ধ নাই।

তিনি সব শুনিয়া বলিলেন : দেখ্ আমি মুখ্য মানুষ বড় বড় কথা জানিনি, সোজা কথা বলি শোন। তোর মধ্যে যে সব ভাল ভাল ভাব, জ্ঞান, ভক্তির এই যে সব ধারণা জন্মেছে—সেটা তুই কি করে পেলি আমায় বল দিকি ?

আমি : আমার বোধ হয় আমি যেমন ভাব, সংস্কার নিয়ে জন্মেছি সেই সবই এখানে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন : ওরে ঠ্যাটা দুষমন কোথাকার, যে তোকে ছিষ্টি করেছে সে যদি তার গুণগুলা না দিয়ে ছিষ্টি করতো তা হোলে তু কোথা পেতিস বলদিকি আমায়। তোর ভিতরে যে যে গুণ আছে বোলে গরব করিস তু—সে সবই তোর জন্মদাতার দেওয়া—না হোলে তু পাবি কুথাকে—অ্যাঁ—

আমি : তবে, সে জিনিসগুলি আমি তাঁর মধ্যে আমার মনোমতভাবে দেখতে পাইনা কেন ?

তিনি : তাঁর মধ্যে অবশ্যই তা আছে, তুই বুঝতে পারিস নাই, তবে তার প্রকাশের ধরণ আলাদা রকম এই যা,—এই দেখ তোর মধ্যে ভগবানে সহজ ভক্তিও আছে, আবার সন্দেহও আছে—সেইজন্যে তুই জ্ঞানের দিকটাই ভাল মনে করেছিস, আর তাই পাঁচ জায়গায় অম্বল চেকে বেড়াচ্ছিস—তোকে দেখে পষ্ট বোঝা যায় তোর জন্মদাতারও ভগবানে সহজ ভক্তি

আছে—আবার বিচার করতে গেলে সন্দেহ অবিশ্বাসও আছে, তবে তাই নিয়ে সে কিছু যাচাই করে নি, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, যার জন্যে তোর মনের মত ভাবগুলি তার মধ্যে দেখতে পাস নাই। আর ঐ যে তোর ভয় বলছিস্ ঐ ভয়টাই তাঁর পীড়নের জন্যই হোক বা রাগী স্বভাবের জন্যই হোক সেটা ত ঐ ভক্তির আর এক ভাব। ভয় দিয়ে তোর সম্বন্ধটাকে জোর করে রেখে গিয়েছে। একটু বুদ্ধি করে ঐ বাপকে ধরলেই তোর সব-কিছু হয়ে যায়—তাঁতে তারও কল্যাণ হয়, তোকে সৃষ্টি করা সার্থক হয়।

আমি : আমি বেশ ভালই জানি তিনি আমাকে তাঁর কাছে ঘেঁসতে দিতে চান না। তিনি আমাদের দূরে রাখতেই চান। একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—সেটারও মানে আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম : কি তাঁর ভাব, দয়া করে বলুন শুনি।

তিনি : তিনি গোড়া থেকে যে সব ব্যবহার করেছেন সে গুলিকে তুই অন্যায়, অত্যাচার ভেবেছিস, সেগুলা সে ত জানে, তাঁর মনে আছে, তু ত সেগুলা তাঁর অপরাধ বোলেই ধরে নিয়েছিস, মন থেকে মিটাতে পারিস নাই, সেই কারণেই ত সে আর তুর ঘেঁস নিতে চায় নি। আবার যেদিকে দেখ কেনে, তু যেমন তাকে ভাল দেখিস নাই, সেও ত তুকে তার মনের মত দেখে নাই, তু ত তার মনের মত হতে পারিস নাই, সে কেমন করে ঘেঁস দিবেক তুকে? তোর দিক থেকেও তাঁকে যেমন বিচার করেছিস, তাঁর দিক থেকেও ত তোকে দেখতে হবেক। তা তুকে যদি সে না ল্যায় তু মনে কোন খোঁটা রাখিস না, সে পিতা, জন্ম দিইছে ত, তার লেগে মনে কিছু গোল রাখিস না,—

আমি বলিলাম : যদিও একটা ভয় গোড়া থেকেই আছে বটে কিন্তু তার জন্যে আমি নিজেকে বরং তাঁর কাছে অপরাধী মনে করি কারণ আমি যে ঠিক তাঁর মনের মত হোতে পারি নি সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি। দুঃখ এটুকু আমার মনে বরাবরই আছে যে বাবার সঙ্গে আমার একটা প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারলো না, যা অন্য অনেকের আছে। যেখানে যেখানে সংসারে বাপে ছেলেতে একটা ভালবাসার, প্রেমের সম্বন্ধ দেখি, আমার প্রাণটা হু হু করে উঠে যে আমার জীবনে সে সুকৃতি নেই। তবে আমি এটা জানি তিনি আমায় মনে মনে ভাল বলেই জানেন, তবে প্রকাশ করেন না।

তিনি : দেখ, দেহ ফুরালে সম্বন্ধ ফুরায় নি, তু যত ভাল, যত বড় হবি সে তুর বাপ হঁয়েই থাকবেক, শেষ অবধি দুজনায় প্রেম না হোলে চলবে নি। তু ঠিক জানবি তার তুকে চাই, সে তুকে ভুলবেক নি। হেথায় যতটা দূরে সে থাকে, সেই পরলোকে আর তা নাই, সব সোজা হয়ে যায়। আচ্ছা জন্মদাতার কথা ত হঁয়্যা গেল, এখন মায়ের কথা, বল দেখি তু মাকে ত পূজা করতে পারিস? মাকে তুষ্ট করলেও জগদম্বাকে পাবি।

আমি : দেখুন, মা আমার খুব ধার্ম্মিক আর ভালমানুষ, কিন্তু আমাদের সংসারে যত কিছু অশান্তি তার বেশীর ভাগ—সংসারের কর্ত্তা বা গিন্নি যিনি তাঁদের উদার ব্যবহারের অভাবে অর্থাৎ সংকীর্ণতার জন্যেই হয়ে থাকে। মেয়েমানুষের এইসব দুর্ব্বলতা আমরা যদি উপেক্ষা করতে

পারি তা হোলেই ভাল, না হোলে আমাদেরও তার মধ্যে জড়ায়, আর দুঃখের একশেষ করে। সেই জন্যেই আমার ধারণা হয়েছে যে সংসার থেকে বেরিয়ে না গেলে সম্বন্ধচ্ছেদ না করলে, কোনপ্রকারে আত্মকল্যাণ নেই। বাড়িতে আমাদের নিত্যই অশান্তি, বাড়িতে ত থাকতে পারি না কাজেই জননীকে সেবা আমার ঘটে উঠে না'—কাজেই মায়ের উপর আমার যে ভক্তি তা মনে মনেই থাকে।

তিনি বলিলেন: সে কথা লয়, অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে ঐ মাকেই জগৎজননী ধারণা করে তারই চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারলে, তোর আর অন্য কিছুই দরকার করবে নি।

আমি: যে সব তত্ত্ব আমি জানতে চাই তা তো মায়ের কাছে পাই না, তিনি লেখাপড়া বা জ্ঞান-বিদ্যার ধার ধারেন না;—বাবাও কখন তাঁকে শিক্ষা দেন নি কিছু, কাজেই আমায় সেইজন্যে বাইরে আসতে হয়।

তিনি: যদি মনে প্রাণে ঐ মাকেই ইষ্ট বোলে বুঝতে পারিস ত ঐ থেকেই তু যা যা চাইবি সে সবই তোর মাঝে আপনি ফুটবে গা। তা তোর সে সব ত হবে না, আপনার মাকে ইষ্টদেবতা করে ধরা, এ কি সহজ কথা, এ সবার হয় কি? তাইত এত ঘোরপাক খেতে হয়। ঘরে আছে ভগবান, তু তাকে চাবি না। তু কর কেনে যা তোর মন লাগে। হ্যাঁ দেখ—বাপে মায়ে মেল না হোলে সন্তানে মেল হবে কি করে, বাপের এক ধাঁচা (প্রকৃতি) মায়ের এক ধাঁচা, তার ফলও হবেক তেমনি।

আমি:—সত্য কথা। আমার মা বাবার কথা আমি জানি, বলতে পারি। বাবা আমার ভয়ঙ্কর বলবান, উদ্ধত প্রকৃতি, অনাচারী (ভোগী), আর মা আমার নিরীহ ত্যাগী, শান্ত-শিষ্ট, নিরক্ষর, শুদ্ধাচারী, পূজা তপস্যা-পরায়ণা, ভীরু স্বভাব,—

তিনি: ঐ রকমই পনের গণ্ডা এখানে, কাজেই এ ভাবের ছেল্যা মেয়্যা জন্মাচ্চে। হ্যাঁ দেখ, তারা মা ঐ রকম মেয়্যার সাথে ঐ রকম দস্যি পুরুষগুলার মেল করায়েঁ মনের মত মানুষ তৈরী করেন। আমরা তাঁর খেলা কি বুঝি, তিনি কি ভাবে কি রকম মানুষ তৈরী করেন—কোন কাজে লাগান তাকি আমরা জানি? মা মা, তারা—বলিয়া বাবা অন্তর্মুখী হইলেন।

এমন সময় বাবার পরিচারক ব্যতীত সকলেই উঠিয়া গেল। আমি একটু আরো কাছে বসিলাম। বাবা স্থির নিস্পন্দ।

কতক্ষণ পর আমার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন: তোর ভাল হবেক, ইটা তোর উঠতি জন্ম, মা তোকে ভাল পথেই নিয়ে যাবেন। তু তোর মা বাবা হোতেই উঠবি গা, বাপ তোর ভৈরব বটে?

আমি: তা ত জানি না—তিনি ত মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই নেন নি—তিনি বলেন, যাঁকে ভক্তি হবে, গুরু বলে মানতে ইচ্ছা হবে তাঁর দেখা পেলে মন্ত্র নেবেন। আমার বোধহয় তাঁর মন্ত্রদীক্ষার উপর বিশেষ আস্থা নেই। বিশেষত কুলগুরুর উপর তাঁর মোটেই শ্রদ্ধা নেই আর আমারও ঠিক সেই ভাবটা এসেছে। বাবা বলেন, ভগবান সকলকার, মনে মনে ডাকলেই হোল।

তিনি : মদ ভাঙ্গ খায় বটে ?

আমি : হাঁ, ওসব যৌবনকালে খুব বেশী ছিল এখন অন্য ভাবে—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন : কোন্ ঠাকুরে তাঁর মন, জানিস তু ?

আমি : তা ঠিক জানি না, তবে তাঁর মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প কখনও কখনও শুনেছি—রাম, কৃষ্ণ আর শিব, এই তিনের কথাই তিনি বিশেষ করে বলতেন। যখনই যার কথা বলেন আমার মনে হয় সেই তাঁর ইষ্ট, কিন্তু কাজে অনাচারী—

তিনি : হাঁ হাঁ, তু শালাদের আবার আচার—শক্ত মনিষ আচার মানবে কেন,—তবে গুরু না হোলে ত কুণ্ডলিনী জাগবেন নাই !

এই কুণ্ডলিনীর ব্যাপার আমায় জানিতে হইবে, এখন বোধ হয় সুযোগ উপস্থিত।

৩৩

পর দিন একটু সুবিধা বুঝিয়া খ্যাপার কাছে গিয়া বসিলাম, তখন সেখানে আরও দু'তিন জন উপস্থিত। বাবা রসিক লোক, একটু রসিকতা না করিয়া কথা কহিবেন না, বলিলেন : চিল পড়েছে যখন, কুটাটা না লয়ে উঠবেন না। ছিলিম চলিতেছে—সেটা আর না বলিলেও চলে। এখন যাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথাটা বলিলেন, আমি বুঝিলাম,—কিন্তু আর কেহ মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া—একবার আমার দিকে, একবার বাবার দিকে চাহিতে চাহিতে কত কি ভাবিতে লাগিল কে জানে !

নগেন পাণ্ডা ছিল চালাক লোক, বুঝিল আমাকেই বাবা লক্ষ্য করিয়াছেন,—খুসী হইয়া বলিল : কেমন, এবার বাবাকে পেয়েছেন দেখি,

আমি বলিলাম : বাবা যে সদাশিব, তা কি জানেন না !

এইবার বাবা একটু চেষ্টা করিয়া উঠিবার ইচ্ছা করিলেন, অমনি তাঁর সেবক আসিয়া ধরিয়া সাহায্য করিলেন এবং চালার বাহিরে লইয়া গেলেন, দুই তিনটি কুকুরও চলিল।

জন দুই তিন গ্রামের লোক আসিতেছিল,—পথে বাবাকে দেখিয়াই প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন : তোরা কে বটিস ?—তাদের মধ্যে একজন বলিল : আমরা পলুর পাতা নিতে এয়েছি গুটিপোকার লেগে, হোই ওখানে গাড়ীতে চালান দিয়েছি, বলি বাবাকে দেখ্যা আসি একবার।

ইহারা গুটিপোকার চাষ করে, ভিন্ন গ্রামে থাকে,—মধ্যে মধ্যে গুটির জন্য পলু-পাতা জোগাড় করিতে দূরে আসিতে হয়। একেবারে অনেক দিনের খোরাক জোগাড় করিয়া গো-গাড়ী বোঝাই লইয়া যায়। সেই সময় ফিরিবার মুখে একবার বাবাকে প্রণাম করিয়া যায়। বাবা এদের ভালবাসেন, স্নেহ করেন, আর অন্তরে অন্তরে আশীর্ব্বাদ করেন। গাঁজাটা-আস্‌টা সাধ্যমত

সেবার মত তাহারা কিছু দিয়াও যায়, কারণ বাবার আশীর্ব্বাদের ফল তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। তারা বলে, বাবা জেন্ত দেবতা।

বাবা এখন তাহাদের বলিলেন: দিয়্যা যা কিছু গাঁজার লেগে,—শুনিবামাত্রই তাহাদের একজন কোঁচার খুঁট খুলিয়া কিছু পয়সা,—ডবল পয়সা, আর একটা দুয়ানি মিলাইয়া, চার ছয় আনা বাবার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল। বাবা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন: যা, তোদের গুটি তাড়ায় পাকবে, দেখিবি।

এখানে যারা বসিয়াছিল—নগেন পাণ্ডা, আর দুই এক জন, তারা ত প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া গেল। আমি অপেক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে আমার পাশে, কেলো, ভুলো, লালী প্রভৃতি দুই তিনটি বাবার প্রিয় ভক্ত, পচা মড়া খাইয়া আসিয়া নানা ভঙ্গিতে শুইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। যে সকল খাদ্য তাহারা খাইয়াছে, জঠরে গিয়া বিষম দ্বন্দ্ব সুরু করিয়াছে, পাশে বসিয়া নানা প্রকার শব্দ—চোঁ-চাঁ, গোঁ-গা শুনিতেছি আর দেখিতেছি। তাহারা স্থির থাকিতে পারিতেছে না, মধ্যে মধ্যে বড় ছটফট করিতেছে, বেশ বুঝা যায় একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছে।

কতক্ষণ পর বাবা আসিলেন—আমি এবার কুণ্ডলিনীতত্ত্ব শুনিবার জন্য একটু কাছে-ঘেঁসিয়া কেমন করিয়া কথাটা উঠাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

বাবা বসিয়াই,—মা, মা, বলিয়া দুইবার ডাকিলেন—সেই শব্দে আমার অন্তরে কেমন করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যত কিছু সঙ্কোচ সব কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে আমি সুরু করিলাম:

আপনি যে কুল-কুণ্ডলিনী জাগার কথা কাল বলেছিলেন,—

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ পর বলিলেন: মা যে ঐ ঘুমিয়ে আছেন মূলাধারে, তাঁকে জাগাতে হবে নাই? সে না জাগলে কে মুক্তি দিবে,—কার সাধ্য?

আমি: আপনি আমাকে একটু অনুগ্রহ করুন, খুলে না বললে আমি কি করে বুঝবো বলুন,—

তিনি: ক্যানে আমি তোকে ও গুহ্য কথা বোলতে যাবো, তুই কি দীক্ষা নিবি, না তন্ত্রমতে সাধন করবি, যে জানতে চাস!

আমি: ঐ সকল গুহ্যতত্ত্ব আমার জানবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু আপনি যদি আমায় অপাত্র মনে করে না বলেন, তবে আর কি করতে পারি। আপনার কাছেই পাবো এই ভরসায় অত দূর থেকে এসেছি। যদি আপনি আমায় বুঝিয়ে দেন তবে ক্ষতি কি হবে আমি বুঝতে পারি না।

তিনি: যে সাধন-ভজন করবে না, কেবল হেথা-সেথা বেড়াবে, আর পাঁচ জনের কাছে পাঁচটা শুন্‌বে তার কাছে এ সব বল্‌লে নষ্ট হবে যে,—

আমি : আপনি কি বোলতে চান কুল-কুণ্ডলিনী কেবল তান্ত্রিকদেরই শক্তি, অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধক যাঁরা তাঁদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নেই, না তাদের ও শক্তি জাগবে না কখনও তান্ত্রিক-মতে সাধন না করলে ?

তিনি : দেখ তু চালাক বটে,—খুব বুদ্ধির কথা বোলেছিস। কুণ্ডলিনী সবারই আছে, সবারই জাগবে, তবে সাধন করলে, আর সময় হোলে। কুণ্ডলিনী না জাগলে কারো কিছুই হবে নাই। এক স্থানে, ধীর হয়ে সাধন করলে তবে সে জাগবে। আবার সাধন না করলে ঘুমাবেক।

আমি : তাই ত আমার জানতে ইচ্ছা, কেমন ব্যাপারটি—এসব আপনার কাছে শুনতেই এসেছি। শুনলে উপকার ছাড়া অপকার ত হবে না।

তিনি : তবে কিছু গাঁজা নিয়ে আয়। অমনি শুনবি নাকি ?

আমি : আমার কাছে কিছু পয়সা আছে, গাঁজা ত নাই। বলিয়া চার আনা বাহির করিয়া সেবকের হাতে দিলাম। তখন তিনি বলিলেন : সরে আমার আরো কাছে আয়। যেই তিনি ঐ কথাটি বলিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। চক্ষু তাঁর করুণায় পূর্ণ এবং অমানুষিক জ্যোতিতে উজ্জ্বল, যেন অনন্ত রহস্যের আধার, এমনই বোধ হইল, আর তাহা দেখিয়া বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম। সাহস বা শক্তি যেন সবই লোপ পাইল।

কাছে গেলে তিনি সস্নেহে আমার পিঠে হাত দিলেন, বলিলেন : চাদর খোল, কাপড়ের কসি আলগা করে দে। সে সব করা হইলে তিনি হাত নামাইয়া একেবারে মেরুদণ্ডের শেষ যেখানে, সেখানে আনিলেন। বলিলেন : দেখ আমি বলে যাই, তুই দেখে নে,—তা হোলে সব বুঝতে পারবি।

তাঁহার স্পর্শে আমার শরীরে রোমাঞ্চ, হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। দৃষ্টি সহজেই অন্তর্মুখী হইয়া গেল। আমি স্থির।

শিরদাঁড়ার নীচে যেখানে শেষ গাঁট সেই অস্থির উপর একটি আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া তিনি বলিতেছেন : ওরে তোর যে সে কাজ হয়ে গেছে,—তবে শালা তুই আমার সঙ্গে চালাকী করছিস বটে ? শুনিয়া একটা ভয়ের ভাব আসিল, তারপর আনন্দ হইল। আমি বলিলাম : আপনি কি বোলছেন, সত্য বলছি আমি কিছুই জানি না, বিশ্বাস করুন।

তিনি : দেখ, তুই জানিস আর নাই জানিস, হয়ত জানতে নাও পারিস, এখানে আমি দেখছি যে তোর পাক খুলেছে। এই এখানে কুণ্ডলিনী-শক্তি সাড়ে তিন পাক দেওয়া সকলকারই থাকে। মায়ের যে সংসার-গণ্ডী এইখানেই,—এই মায়া—মমতা, অহংকারের এমন কি যত কিছু ভোগ আর স্বার্থ এইখানেই তার প্রথম গাঁট। খুব বড় রকম গাঁট, এটা শক্ত করে বাঁধা আছে। যাদের খোলে—এই ছোট্ট সংসার-গণ্ডীতে আর তারা সুখ পায় না। ছাড়িয়ে যাবার জন্যে যখন ছটফট করে তখন গুরু বা সৎপুরুষের আশ্রয় পেলে এইখানকার গাঁট খুলতে থাকে।

এখানকার পাক খুললে প্রথম লক্ষণ তার এই দেখা যায় তার ভগবানে ভক্তি হয়, এ ছোট্ট সংসার থেকে মা জগদম্বার বিরাট সংসারে প্রবেশ করতে প্রবৃত্তি হয়। আর তার প্রকৃতি পাগলের মত সেদিকে ছুটতে থাকে। সংসারের ছোট ছোট কোন জিনিসেই আর কিছুমাত্র সুখ থাকে না। এমন কি মাগছেলে, ইন্দ্রিয়-সুখ পর্য্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই সময় বুঝতে হবে যে পাক খুলে সোজা হয়েছে। আর সোজা হোলেই তার মুখটা উপরের দিকে ফিরে যায়; তখন উপর-মুখো চলতে থাকে।

এই যে শিরদাঁড়ার সব নীচের জায়গা, এর নাম মূলাধার-চক্র—এইখানেই গাঁট, ঐ গাঁট খুলতে বড় গোল—ওটা খুললেই কুণ্ডলিনী আর কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে না, সোজা হয়ে উপরের দিকে যেতে থাকে। মা, মা, তারা—

বাবা একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন: তোর গুরুসঙ্গ কতদিন হয়েছে রে? আমি বলিলাম: প্রায় দুই বছর হোলো। শুনিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: কি রকম অবস্থায় হোলো খুলে বল আমাকে। আমি সব বলিলাম: ভগবান রামকৃষ্ণের কথাই প্রথম—তিনিই আমার জীবনে সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণ, প্রথম গুরু,—তাঁকে স্বপ্ন দেখা, কথা শুনা, তারপর ঘরে কিছুই ভাল না লাগা, জীবন্ত গুরু কোথায় পাবো বলিয়া নানা স্থানে সাধু-দর্শন। শেষে কলিকাতায় স্বামী পরমানন্দের সাক্ষাৎ। তাঁর আকর্ষণ; তারপর ক্রমে ক্রমে দীক্ষা ইত্যাদি। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন: দেখছি ঐ সময়েই তোর এটা হয়েছে,—এখন ত উর্দ্ধগতিই দেখছি—দেখিস সাধন যেন ছাড়িস না বাবা, তা হোলে আবার ঘুমাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা,—আপনারা বলেন যে তান্ত্রিক সাধন-প্রকরণের মধ্যে দিয়ে না গেলে কুণ্ডলিনী-শক্তি না কি কারো জাগেন না। একথা কি সত্যি? অন্য কোন ধর্ম্মের সাধনে তা হবে না?

তিনি: একথা তোকে কে বোলেছে—যত শালা অপগোণ্ডর কথা। তোর খিদে যদি পায় তখন ভাত খেলে তোর যেমন পেট ভরবে, ডাল রুটি খেলে কি তার চেয়ে কম পেট ভরবে? আসল কথা যার যা জোটে তার তাই খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করতে হবে ত। এখানে কত কত রকমের মানুষ, কত রকমের খাওয়া, যে বলে ভাত ছাড়া আর কিছুতেই পেট ভরবে না সে নিশ্চয়ই গেঁও মনিষ—ভাত ছাড়া আর কিছু খাওয়ার ধারণা নেই।

তারা মা ত এই ছিষ্টিটা করেছে—যত ধর্ম্ম সবই ত তারই ছিষ্টি। যার দেশে যে রকম খাওয়া চলিত সে তাই খাবে ত। ধর্ম্মও ত সেই রকম।

আমি বলিলাম: রামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথা বোলতেন, এমন সহজ সত্য সুমুখে থাকতে তবু ধর্ম্ম সাধন নিয়ে এত লাঠালাঠি আমাদের এ দেশে দেখা যায়।

তিনি বলিলেন: এক রাজার রাজত্ব,—তার মন্ত্রী আছে, লেঠেল সেপাই আছে, সেনাপতি আছে, গোমস্তা, চাকর-বাকর, সংসারের কত সবই আছে। আবার গুরু-পুরুত ঠাকুর-বামনও আছে। যে যে কাজ করে তার প্রকৃতি, বুদ্ধি সেই রকমই হয়ে থাকে। যারা লেঠেল—তারা

লাঠিবাজীটাই বোঝে ভাল, তা ধর্ম্ম নিয়েই হোক বা ঘরের মাগ, ছেলে, পাড়া-পড়শি নিয়েই হোক,—ওই রকমই তাদের বুদ্ধি।

ঠিক যেন রামকৃষ্ণের কথাই শুনিতেছি। বলিলাম: এখন, তারপর বলুন।

তিনি বলিলেন: কুণ্ডলিনী জাগেন মানে মানুষের মধ্যে যত ছোট ছোট হীনভাব আছে, মন সে-সব ছেড়ে বড়র দিকে লক্ষ্য করে। কারো যোগযাগ, কারো বিদ্যা, কারো ধর্ম্ম, কারো ভগবান,—কারো বড় বড় কর্ম্ম যাতে অনেক মানুষের ভাল হয়, ঐ সব দিকে প্রবৃত্তি যায়। জীবের মধ্যে কুণ্ডলিনী জাগার প্রথম লক্ষণই হোলো যে যে-অবস্থায় আছে সে অবস্থাকে হীন, কষ্টকর, ঘেন্নার জিনিস বোলে মনে হয়। সে কিছুতেই আর সে অবস্থায় থাকতে চায় না, পারেও না; বিষম ছটফটানী আসে—বেরিয়ে যাবার জন্যে।

আমি: তারপর?

তিনি: তারপর, এই যে মেরুদণ্ড,—এর মাঝ দিয়ে পথ আছে বরাবর মাথার ভিতর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত। কিন্তু সে-পথে কি ঐ শক্তি নাড়ী ধরে একেবারেই যাবে? তা যাবে নি, গাঁট খুলে পরও আর একটা চক্র আছে, স্বাধিষ্ঠান চক্র বলে তাকে—সেখানে ঠেকে যায়।

তিনি তাঁর স্পর্শ দিয়া স্থানটি দেখাইলেন, বলিলেন: এখানে ঠেকে গেলে সাধন চাই পেরিয়ে যেতে। যার যে-পথ সেই পথে এগিয়ে যেতে চেষ্টা লাগে না? বিনা চেষ্টায় কি বস্তু লাভ হয়? যারা যোগ-ধ্যান নিয়ে থাকে তারা ঐখানে একটু কঠিন তপস্যা করে, তান্ত্রিকদের কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে, গুরু দেখিয়ে দেন, তাই করলে ঐ চক্র পেরিয়ে যায়। এই দেখ. এইখানে মূলাধার আর ঠিক তার উপর এই স্বাধিষ্ঠান। আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, আর শরীর মধ্যে অপূর্ব্ব এক ভাবের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমি: যারা তন্ত্রমতে সাধন করে না, তাদের?

তিনি: তাদের কথা তারাই জানে। তাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে যে চেষ্টা—তাইত সাধন। সব ধর্ম্মেই এই ক্রম আছে, একটার পর একটা পেরিয়ে যেতে হয়,—না হোলে একেবারে হুড়মুড় করে কি যাবার যো আছে! ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে যেতে হবে।

আমি: তারপর?

তিনি: তারপর মণিপুর চক্র বোলে আর একটি গাঁট আছে। নাভির বিপরীত দিকে মেরুদণ্ড যেখানে, এই দেখ এথায় বলিয়া সেখানে স্পর্শ করিয়া দেখাইলেন। এটি পার হোলে তখন কাজ সহজ হয়। নূতন নূতন শক্তি তার মধ্যে জাগে আর তখন মনের আনন্দে সাধক আপন পথে এগিয়ে চলতে থাকে। এই মণিপুর অবধিই যা কিছু স্থূল তুচ্ছ ভোগের বাধা থাকে। এই মণিপুর-চক্র পর্য্যন্ত মানুষের যত ছোট ছোট ভোগ আর কামনার ভাবগুলির প্রভাব প্রবল থাকে কিন্তু যার লক্ষ্য বড় আছে, মনের জোর আছে তাকে আর ওদিকে টেনে রাখতে পারে না, তবে খুব সহজেও একে পেরিয়ে যাবার যো নাই। যারা অসাধারণ মানুষ,

খুব শক্তিমান, তারা কাটিয়ে যায়। যাদের মনের জোর কম তারা এই তিনটির মধ্যে পাক খায়,—মোটের উপর লক্ষ্য যার স্থির নয়—মন উন্নত হয়নি, তার পক্ষে এ চক্র ছাড়িয়ে উঠা কষ্টকর। এর উপরে না উঠলে কেউ মানুষ হোতে পারে না ;—তন্ত্রমতে এর উপরে উঠলে তবে বীর সাধক হয়, না হোলে পশু। পশুভাব যত কিছু তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ এই তিন চক্রের মধ্যে বাঁধা থাকে।

আমি : এই তিনটি হোলো কঠিন, পরমহংসদেবের কথাতেও আছে। তিনিও বলেছেন গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি, সাধারণ মানুষের মন এই তিন চক্রের ভিতর ঘোরাফেরা করে, আপনার সঙ্গে তাঁর কথার মিল—

তিনি বলিলেন : হাঁ, হাঁ, তিনি মাকে পেয়েছেন, সিদ্ধ মনিষ তিনি এ সব ত জানেন। যে জানে সে বলবে নি ক্যানে !

আমি বলিলাম : তা আমি বলি নি, আপনি মেরুদণ্ডের দিকে ঐ স্থানগুলি দেখিয়ে দিলেন আর তিনি বলেছেন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—তাই বলছি।

তিনি : কুণ্ডলিনী শক্তির আনাগোনার পথ হোলো ঐ মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে—তিনি হয়ত সাধারণ মনিষের কাছে লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি বোলেই বলেছেন। আসলে গুহ্য বা লিঙ্গ বা নাভি দিয়ে নাড়ীর পথ নয়, কি রকম জানিস, এই দেখ হেথা। তু সহজের মনিষ নয়, শালা চালাকী করে সব জেনে লিছিস। বলিয়া স্পর্শ করিলেন—আমি অপূর্ব্ব সুখময় অনুভূতির সঙ্গে পর পর গাঁট অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

এইবার বাবা সদয় হইয়া কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব দেখাইলেন। আর এখন প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োজন নাই জানিয়া সরলভাবেই বলিতেছি। (আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে আগা গোড়া একটি অতি সূক্ষ্ম পথ আছে। সেই পথই প্রাণের পথ বা নাড়ী, আমাদের প্রাণশক্তি এই পথে নিরন্তর উর্দ্ধ-অধঃ গতাগতি করেন। অতীব সূক্ষ্ম ইহার অস্তিত্ব।)

(ঐ প্রাণ বায়ু নয়, বা বায়ুর সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে মেরুপথে সাধারণত প্রাণের গতাগতি। গতাগতি অর্থে একবার উপর হইতে নীচে মূলাধারে আবার নীচে মূলাধার হইতে শত উপরে সহস্রারে যাতায়াত চলিতেছে, ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। চক্ষের পলক পড়িতে যতটা সময় আমরা হিসাব করিতে পারি, সেই সময়ের মধ্যে আমাদের সুস্থ শরীরে প্রাণের যে কতবার উর্দ্ধ-অধঃ গতাগতি হয় তাহার ধারণা করিতে পারি না। ঐরূপ ক্রিয়ারত প্রাণ-শক্তিকে ধরিয়া যোগমার্গে প্রবেশ করিতে হয়। তন্ত্রে ঐ প্রাণ-শক্তিকে মা, আর উর্দ্ধ-অধঃ গতি-ক্রিয়াকে নৃত্য বলা হইয়াছে অর্থাৎ মা নাচিতেছেন, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই। বিজ্ঞানের ভাষায়, প্রাণের স্পন্দন ইহাকেই বলে।)

(এখন ঐ ক্রমে প্রাণশক্তিকে ধরিয়া অগ্রসর হইলে সর্ব্বনিম্নে মূলাধার, যেখানে মেরুদণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্তে, ঠিক তাহার উপর একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ আছে দেখা যায়, তাহাকেই যোগশাস্ত্রে মূলাধার-চক্র বলে। নিরন্তর স্পন্দিত প্রাণশক্তি সেই পথে বাহির হইয়া

গুহ্যদেশে ক্রিয়া করেন। ঐরূপে মূলাধারের কিছু উপরে লিঙ্গমূলে মেরুপথের মধ্যে আর একটি দ্বার বা অতি সূক্ষ্ম পথ—প্রাণশক্তি সেই পথে নিঃসৃত হইয়া ঐ অংশে ক্রিয়া করেন, তাহার তান্ত্রিক নাম স্বাধিষ্ঠান-চক্র। ঠিক নাভির সোজা মেরুদণ্ডের মাঝে ঐরূপ আবার একটি সূক্ষ্ম পথ, তাহাকে মণিপুর-চক্র বলে। তাহার উপর হৃদ্‌পিণ্ডের সমসূত্রে মেরুপথে অপর সূক্ষ্ম দ্বার, যাহা হইতে প্রাণশক্তি ঐস্থানে অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদয়ে ক্রিয়া করেন। তাহার তান্ত্রিক নাম অনাহত-চক্র, যেহেতু আমাদের ধুক্‌-ধুকি বা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া শব্দময় এবং মৃত্যু অথবা নির্ব্বিকল্প সমাধি ব্যতীত কখনও সে শব্দ-ধ্বনি বন্ধ হয় না। তাহার উপরে, কণ্ঠের সমসূত্রে যে সূক্ষ্ম পথ প্রাণশক্তি সেই পথে নির্গত হইয়া কণ্ঠে ক্রিয়া করেন,—তাহাকে বিশুদ্ধাখ্য-চক্র বলে। তাহার উপর শেষ চক্র—যেখানে মেরুদণ্ডের আরম্ভ, চলিত কথায় সেই স্থান, ভ্রূ দুইটির মধ্যে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের আরম্ভ যেখানে সেই স্থান, অতীব সূক্ষ্ম ভাবের সৃষ্টি, যেখান হইতে প্রাণক্রিয়ার আরম্ভ, তাহার নাম আজ্ঞা বা প্রজ্ঞা-চক্র। তাহার উপর আর কোন চক্র বা কর্ম্মকেন্দ্র নাই। উপরে অনন্ত ব্যোম দেহাতিরিক্ত অখণ্ড চৈতন্য সত্তা,—সেই পরমাত্মার রাজ্য,—তাহাকে সহস্রার বলা হইয়াছে। মেরু মধ্যগত সূক্ষ্মতম প্রাণ-পথের কর্ম্মকেন্দ্ররূপে যে ছয়টি চক্র উহা ভেদ হইলে আত্মা পরমাত্মায় অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দভাবে মিলিত হন, সুতরাং সৃষ্টির পারে চলিয়া যান।

এখন এই যে মেরুদণ্ডের আরম্ভ স্থানে প্রথম চক্র যাহাকে প্রজ্ঞা চক্র বলে,—যেখান হইতে প্রাণশক্তির ক্রিয়া শেষপ্রান্ত মূলাধার পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে, ঐ স্থানই প্রাণকেন্দ্র। ঐ প্রজ্ঞা-চক্রই প্রাণের আরম্ভ এবং লয়ের স্থান। ঐ স্থানটি নাড়ীচক্রের মধ্যে প্রধান, মহান এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, শ্রেষ্ঠ স্থান যেহেতু ধারণা, ধ্যান, তত্ত্ব-নির্ণয়, উচ্চ উচ্চ অনুভূতি, প্রকাশ, আবিষ্কার, মোট কথা মনুষ্যজীবনের মন, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, প্রেরণা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অমূল্য সম্পদ্‌ যাহা কিছু ঐখানেই লাভ হয়। ঐ স্থানে উন্নত জীবের তৃতীয় নয়ন প্রকাশিত হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

এখন গুরুকৃপায় বুঝা যাইতেছে প্রাণের স্বাভাবিক রূপটি, যাহা, অতি সূক্ষ্ম উর্দ্ধ-অধঃ স্পন্দনময়। আর, আশীর্ষ মূলাধারাবধি স্পন্দনের অবকাশে মেরুপথে সংযুক্ত দেহযন্ত্রের ছয়টি কেন্দ্র হইতে অবিরাম নিঃসৃত প্রাণশক্তি যাহা এই স্থূল শরীরের সর্ব্বাংশ ক্রিয়াশীল রাখিয়াছে। আরও দেখিতেছি, প্রাণের দ্বিবিধ ক্রিয়া—এক হইল—স্থূল দেহাদি চালনা, অপর চিন্তা অনুভূতি প্রভৃতি মন বুদ্ধির ক্রিয়া—এই প্রাণ দুই ভাবেই অবিরাম ক্রিয়াশীল। ছয়টি কেন্দ্রপথে প্রবাহিত হইয়া যেমন দেহের প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে—সেই প্রাণ আবার প্রজ্ঞাচক্রে স্থির হইয়া অন্তঃকরণের যাবতীয় ক্রিয়াও সম্পন্ন হইতেছে—এই সকল কার্য্য যুগপৎ চলিতেছে—বিরাম বা বিচ্ছেদ নাই। এইবার কুল-কুণ্ডলিনীর সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

বিবর্ত্তনবাদটিকে মনুষ্য-জীবনের মধ্যে আনিয়া ধরিতে হইবে। এই বিশাল জগৎ সৃষ্টির মধ্যে প্রাণী-জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি হইল মানুষ—যেহেতু দেখা যায় মানুষই

সকল ইতর জীবের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। এই যে মানুষ বংশ, নানা ভাবের বৈচিত্র্য লইয়া জগতের সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হইয়াছে,—তন্ত্রশাস্ত্রে এই মানবের পরিণতি অনুসারে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা আছে। তাহা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ প্রথমে পশু, তারপর মানুষ বা বীর—তারপর দিব্য অর্থাৎ দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশু হইতে মানব-শরীরে বিবর্ত্তনকালে সেই জীবের উন্নত প্রাণশক্তির কতকাংশ আত্মারূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়—যাহা ক্রমোন্নতির ফলে (অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তর ভোগ কর্ম্ম জ্ঞানাদির ফলে) জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হইয়া শেষে পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। এখন পশুভাবে মানবের প্রথম অবস্থায় জীব প্রাণের উত্তমাংশ ঐ যে আত্মা, তখন সুপ্তভাবে অর্থাৎ অবিকশিত অবস্থায় মূলাধারে বর্ত্তমান থাকে। মূলাধার বলিতে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম নাড়ী বা প্রাণপথের শেষ প্রান্তে অবস্থিত প্রধান কেন্দ্র বা চক্র। প্রাণের মধ্যস্থতায় ঐ স্থান হইতে জীবাত্মার প্রথম মানব-জীবনের কর্ম্ম আরম্ভ হইয়া থাকে এবং ঐ কেন্দ্রকে মূল করিয়া জীবাত্মার সর্ব্ববিধ গতি নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া এবং প্রাণশক্তিরূপে আত্মার আধাররূপে ঐখানে অবস্থিত বলিয়া ঐ কেন্দ্র বা চক্রকে তন্ত্রশাস্ত্রে মূলাধার বলা হইয়া থাকে।

যেমন কালের মধ্য দিয়া জীব পশু হইতে মানব হয় তেমনই কালের মধ্য দিয়া ঐ আধারভূত প্রাণশক্তির মূল যে আত্মা, মনুষ্যত্বে বিকশিত হইবার প্রতীক্ষায় থাকেন, যেমন গর্ভস্থ শিশু মায়ের উদরে বাড়িতে থাকে ঠিক তেমনি। তখন আত্মার অবিকশিত অর্থাৎ ঠিক গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা, সেই জন্য তন্ত্রের মধ্যে এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া সুপ্ত বলা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন যে স্থূল ভাবাপন্ন পশু-প্রকৃতির প্রথম স্তরের মানুষের মধ্যে ঐ সুপ্ত আত্মা প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাড়ে তিন পাক দিয়া কুণ্ডলাকারে সাপের মত মূলাধারে অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকেন। এইভাবে ভোগ ও কর্ম্মদ্বারা জন্ম জন্মান্তরে জ্ঞান বা চৈতন্য শক্তির সহায়তায় তাঁহার সম্যক পুষ্টি হয় তখন সেই আত্মা বিকশিত হন। ইহাতেই বুঝা যায় যে জীবাত্মা স্বরূপে প্রতিভাত হইতে ক্রমবিকাশের অবস্থায় কতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন, পরে উপযুক্তরূপে শক্তিমান হইলে তবে পূর্ণ বিকাশের অবস্থা প্রাপ্ত হন। কালের মধ্যে শক্তিতে পুষ্ট হইয়া শেষে কালাতীত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিই এ শক্তি যোগাইয়া তাঁহার বিকাশের সহায়তা করিয়া থাকেন, সেই জন্য এক সম্পর্কে শক্তিরূপা প্রকৃতি আত্মার জননী, পূর্ণ বিকাশের অবস্থায় তিনি হন প্রিয়তমা। কুল-কুণ্ডলিনী জাগরণের ইহাই সার কথা। মানুষের দেহে আত্মা বুদ্ধি ঐ পর্য্যন্ত থাকে যে পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা না হন—এটুকুও জানিয়া রাখা ভাল।

যত কিছু শিবশক্তি-রহস্য রূপকের আকারে ইহার মধ্যে আছে যাহা সহজ সত্যকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের তাহাতে প্রয়োজন আছে কিনা সুধীজনে ভাবিয়া দেখিবেন।

খ্যাপা বাবা বলিলেন : তু এখন যা হজম করগা—

আমি বলিলাম: ষট্‌চক্র মধ্যে যে আর আর ব্যাপার যে বাকী—

তিনি:—তু এখন উঠে যা ত, কাল আসবি আবার, এখন যা। দক্ষিণা চাই,—নিয়ে আসবি দক্ষিণা, অমনি হবে না। এ সব অমনি অমনি হবার লয়, জানবি।

৩৪

দুই দিন আর খ্যাপার কাছে আমলই পাইলাম না। নানা প্রকারের মানুষ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে,—আর সে সমাজে যে সব কথা হয়, পরস্পরে যে ভাবে সম্ভাষণ চলে তাহাতে সাধুসঙ্গের আশা ক্ষীণ হইয়া যায়। বাবার কোন দিকে লক্ষ্যই নাই, আপন মনে, আপন ভাবেই সমাহিত;—কেবল মাঝে মাঝে, মা, মা বলিয়া ডাকেন, আর যত গ্রাম্য কথার প্রভাব ঝাড়িয়া ফেলেন।

বাবার কিছু টাকা ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বের কথা,—এই টাকার যে ঠিক পরিমাণ কত তা নির্ণয় করিতে পারি নাই,—তবে, ওখানকার কোন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম তিন চার হাজার টাকা হইবে,—টাকাটার কথা যিনি তাঁর বিশেষ বিশ্বাসভাজন—অমুক পাণ্ডা ছাড়া সম্ভবত আর কেহ জানিত না। কারণ সেই ব্যক্তি তখন বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভক্ত বা সেবক ছিল। তারপর সেই টাকা বাবা তাঁহার আশ্রমের একস্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থানটি বাবা ব্যতীত আর কারো জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই ধূর্ত্ত সেবক পাণ্ডা কোন প্রকারে তাহা জানিতে পারে। টাকা লোভের বস্তু, বিশেষত সংসারী মানুষের পক্ষে। ইহার লোভ সামলানো খুবই শক্ত। বেচারা উহার আকর্ষণ এড়াইতে পারে নাই। পাণ্ডা ঠাকুর খুব সাহসী লোক বলিতে হইবে যেহেতু তাহার এই কাজটি একেবারেই সেখানকার লোকের কল্পনার অতীত।

একদিন সকালের দিকে খ্যাপা বাবা একেবারে খেপিয়া উঠিলেন,—সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমার টাকাটা কোথায় গেল! সে দিন আবার অমুক পাণ্ডা অনুপস্থিত,—বাবা ঠিক বুঝিতে পারিলেন, এ কাজ তারই,—অন্য কাহারও এতটা সাহস হইবার নয়। যখন অমুক পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হইল, বাবা তাহাকে বেশ শান্তভাবে, পিঠে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন: টাকাটা বার করে দে, তোর ভাল হবে। কিন্তু যে ভালটা সম্প্রতি হস্তগত, তাকে ত্যাগ করিয়া অন্য রকমের ভালোর গুরুত্ব বুঝা সকলের ধাতে সয়না, বিশেষত তার মত এক পাকা সংসারী মানুষের। কাজেই, সে ব্যক্তি তখন, বাবার টাকা হারাইয়াছে শুনিয়া একেবারে যেন আকাশ হইতেই পড়িল। তখন বাবার বুঝি তাহাকে একটু জব্দ করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি থানা পুলিশ করিলেন,—এবং আদালতেও গড়াইল। তারপর যখন, তাহার কাহাকে সন্দেহ হয় জিজ্ঞাসা করা হইল, বিচারকের কাছে বাবা নিঃসঙ্কোচে তখন সেই অমুকের

নাম বলিয়া শেষে জানাইলেন—সে ব্যতীত আর কেহ একাজ করিতে পারে না কারণ কেবল সেইই এটা জানিত আর কেহই ইহার কথা জানে না।

তারপর যখন অমুক দেখিল আর রক্ষা নাই তখন যা হইয়া থাকে,—বাবার পায়ে জড়াইয়া কাঁদা-কাটা করিল।—বাবা জল হইয়া গেলেন, বলিলেন: আগে বলিস নাই কেনে? বাবা শেষে তাহাকে এই দণ্ড করিলেন যে তাঁহার আশ্রমে সে আর যেন না আসে। দিন কতক দণ্ড ভোগের পর সকলে দেখিতে পাইল তাহার হাঁপানীর অসুখ হইয়াছে—আর সে বাবার আশ্রমের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আবার ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিলেও তাহার কিছু সুবিধা হইল না, অসুখও সারিল না।

আমি যখন যাই তাহাকে প্রত্যহই বাবার দরবারে হাজির দেখিতাম। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বাবার সঙ্গে কথা কহিতেও দেখিতাম কিন্তু বাবার তেমন স্নেহের প্রকাশ দেখি নাই।

সেই অবধি বাবা, কাহারো নিকট কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, ঐ অর্থ যে অনর্থ,—দেখিস না?

যে ব্যক্তির কাছে এই সকল শুনিলাম সে বলিল: আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি সাধু লোক, মার কৃপায় কিছুই অভাব নাই—আপনি টাকা সংগ্রহ কেন করিয়াছিলেন? তাহাতে বাবা বলিলেন: ও সব ঐ বেটি মায়েরই ঘটাঘটি জানিস না,—টাকাটা আপনিই এলো, ভাবলাম এখন রাখি যখন কারো কাজে লাগবে তখন দেওয়া যাবে। তা হোলো ভালো, যার কাজে লাগলো সে মনিষটাও চেনা গেল। মায়ের টাকা, মাই ওটার ব্যবস্থা করলেন যেঁয়ে।

এখন যাহা বলিতেছিলাম,—

দুইটি দিন কাটাইয়া বাবা তৃতীয় দিনে সদয় হইলেন, আমিও কাছ ঘেঁসিয়া বসিলাম। আজ এখন আমি তাঁকে ধরিয়া বসিলাম,—আপনি খুলে বলুন যে সকলকারই কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগে কি না; বিনা সাধনে জাগে কিম্বা এই জাগার জন্য বিশেষ সাধনের প্রয়োজন হয়?

বাবা বলিলেন: যারা তান্ত্রিক, এই ধর্ম্ম আশ্রয় করেছে, দীক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম সাধনই হোলো কুণ্ডলিনী জাগা নিয়ে। সবার গোড়াও বটে সবার শেষও বটে।

আমি: যারা অন্য ধর্ম্মের লোক,—

তিনি: তাদের ধর্ম্মের মধ্যেও এই কুণ্ডলিনী জাগাবার সাধন আছে, হয়ত তার চেহারা একটু আলাদা, কিন্তু সব কিছু সাধনের গোড়ার কথাই হোলো ঐ কুণ্ডলিনী, ও না জাগলে কিছুই হবে নাই।

আসল কথা এই যে, তন্ত্রশাস্ত্রে যে শক্তি সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ গতানুগতিক ভাবের ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে প্রেরণা জোগাইয়া উচ্চতর জীবন-পথে পরিচালিত করে তাহাই কুণ্ডলিনী শক্তি। সে শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে প্রথমে সুপ্ত অবস্থায় থাকে,

পরে দেশ-কাল ও পাত্রের মধ্য দিয়া বিকশিত হয়। খ্যাপা বাবা বলেন যে, পুরুষের পক্ষে নারী আর যৌবন এই দুইটির সঙ্গে ঐ শক্তি জাগরণের প্রধান সম্বন্ধ। এই জন্য তন্ত্রোক্ত বামমার্গের সাধনে ঐ দুইটিই প্রধান। অনেকে বলেন, এই বামা খ্যাপা দক্ষিণমার্গের সাধক। এখন তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু প্রথম হইতে বহুকাল ইনি বামাচারী অর্থাৎ ভৈরবী লইয়া সাধন করিয়াছেন, এখানকার অনেকের কাছেই শুনিয়াছি। নগেন পাণ্ডা বাবার সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে অনেককাল কাটাইয়াছিলেন—তাহার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহা যথাসময়ে বলিব।

সাধারণত তন্ত্রের মধ্যে সাধনের দুইটি পথ,—বামমার্গ ও দক্ষিণমার্গ। এই সাধন, দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালীর সঙ্গে সহজ নিয়মেই বাঁধা। যখন তন্ত্রধর্ম্ম এদেশে প্রবল ছিল তখন ঐ সকল প্রণালীর সাধন কতকটা সম্ভব হইত এখন কিন্তু সম্ভব নহে। এখনকার সমাজে সাধারণ মানুষের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও ভুল হয় না। যে ভাবে এখনকার শিক্ষা-দীক্ষা চলিতেছে তাহাতে সাধারণ দেশবাসী-জনের ও-ভাবে বামমার্গে সাধন চলিতেই পারে না। কারণ সমাজের যে অবস্থায় ইহা আচরণীয়—সে অবস্থায় সাধারণ ভাবে প্রত্যেক নরনারীর নিজ নিজ জীবন-পথ নির্ব্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন। কোনও এক বিশিষ্ট ধারায় জীবনযাপনপ্রণালীর প্রভাব ইহার মধ্যে থাকিলে সাধনে সহজেই বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। কারণ আসল তন্ত্রে, স্ত্রী-পুরুষের যে সম্বন্ধ তাহা হিন্দু বিধি-নিয়মের বহির্ভূত। সেই কারণে আরও, হিন্দুপ্রধান ভারতে তন্ত্রধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দু-ধর্ম্মের একটা আপোষ হইতে পারিয়াছিল, পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিকাশ ঘটে নাই। সেকালে যাহা কিছু তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছিল—তাহা হিন্দু সমাজের বাহিরেই ঘটিয়াছিল। যাহা হউক কথা এই যে,—বামার কথা শুনিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের ব্যাপারে এখন আমার ধারণার মধ্যে যাহা স্পষ্ট হইল তাহা এই যে,—যখন কারো জীবন আর কিছুতেই গতানুগতিক ভাবে বদ্ধ থাকিতে চায় না—অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি ও স্থূল স্বার্থময় ভোগের মধ্যে তৃপ্তি পায় না তখনই তার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হন। এই জাগরণের লক্ষণই হইল গতানু-গতিকতার বিপক্ষে মনের ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন—একথা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। এখন, সকল জাতির, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অন্তরক্ষেত্রে এই ব্যাপার ঘটে তাহা জানা গেল। এই নিয়মেই মানুষ পশুভাবের প্রভাব ছাড়াইয়া—মনোবুদ্ধি প্রধান হইয়া ক্রমে উচ্চ স্তরে, উচ্চ উচ্চ ভাবানুরূপ কর্ম্মে অগ্রসর হয়। এই ক্রমে সে গুরুভাবে পৌছায় এবং বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ইহাই জগদম্বার সনাতন নিয়ম,—এই নিয়মের মধ্য দিয়া সকল জীবের গতিই নির্দ্দিষ্ট। তন্ত্রের কুণ্ডলিনী জাগরণ বৈজ্ঞানিক সত্য, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে মানুষ সমাজের-অন্তঃক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল—ব্যষ্টিতেও যেমন ইহার ব্যতিক্রম হয় না, সমষ্টিতেও তাই। তবে সমষ্টির কথা বহুদূর।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই কথা দুটি ব্যাপারকে সহজ করিবার জন্য আমিই লাগাইয়াছি—বাবা ও-কথা দুটি ব্যবহার করেন নাই। তিনি ভাবের মুখে বলিয়াছিলেন, একজন মনিষের যেমন

কুণ্ডলিনী শক্তি জাগে তেমনি মানুষ-গোষ্ঠীর ভিতরও জাগে, তবে তখন সত্যযুগ আসে। ব্যাপারটি পরিষ্কার করিতেছি। বাবার কথা সাধারণ লোকে কিভাবে লইত তাহা আমি জানি না, কারণ সাধারণ লোকে তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াই যে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে তাহা আমার মনে হয় না। গ্রাম্য ভাষার সহজ, সরল প্রকাশ বলিয়া তাঁহার কথা প্রথমটা মনে হয় বটে কিন্তু সেভাবে শুনিলে সাধারণে কেহই বোধ করি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর তাহা ছাড়া, তাঁহার কথার আক্ষরিক অনুকরণও খুব সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষত যখন কোন বিশেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কথা কন; যাহা তিনি প্রায়ই করেন না। যেভাবে আমি (সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই) তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির করিয়াছিলাম—কদাচ কেহ এরূপ যোগাযোগ ঘটাইতে পারিয়াছেন। একথা তিনিই আমাকে কয়েকবার বলিয়াছিলেন। যাহা হউক এখন সমষ্টির কথা এই যে,—

মানুষ প্রত্যেকেই ভিন্ন প্রকৃতির—প্রত্যেক জনই আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজে কতকটা মিলে-মিশে থাকে তো? প্রত্যেকেরই একটি আলাদা শরীর, নাড়ী (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তি এবং প্রাণের গতাগতির পথকে তন্ত্রে নাড়ী বলে),—প্রাণশক্তি, বুদ্ধি, মন, আত্মা এইসব নিয়েই একজন মানুষ, তেমনি এই পৃথিবী জুড়ে একটি শরীর আছে আর সেই বিরাট শরীরেরও ঐসব নাড়ী, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা আছে, আমরা জগতের জীবকোটি তার মধ্যেই আছি। সাধারণ মানুষ যারা পশুত্ব নিয়ে আছে তারা এর কিছুই জানে না, যারা মানুষ বা বীর হয়েছে তারা আভাষ মাত্র পায়, যারা দিব্যভাবে গিয়েছে তারা জানতে পারে, যারা একেবারে পাশমুক্ত হয়েছে তারাই প্রত্যক্ষ করে। এক সময় মায়ের ইচ্ছায় এখানকার মানুষগোষ্ঠীর ভিতর কুণ্ডলিনী জেগে ওঠেন, তখনই সত্যযুগের পালা পড়ে।

অর্থাৎ তখন এই হয় যে মানুষ-সমাজে তুচ্ছ স্থূল ভোগাদির প্রভাব ছাড়াইয়া একটি বিরাট চৈতন্যের প্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখনই তাহাকে সত্যযুগের আবির্ভাব বলিতে হয়। যে যুগে মানবসমাজ আত্ম-তত্ত্বে অথবা ধর্ম্মের চরম অনুভূতিতে মুখ্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকে সেই ত সত্যযুগ? যে যুগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তপঃ, আচার সবই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দমুখী হইয়া গতিমান—সেই যুগই ত সত্যযুগ?

এখন কথা হইল, একজনের মধ্যে কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় কুণ্ডলিনী জাগেন এই কথা লইয়া আজ অনেক কথা বলিলেন, তাহা বিশদ ভাবেই বলিতেছি। উত্তরে—তিনি প্রথমে সাধারণ ভাবেই বলিয়াছিলেন যে, বিশেষ অধিকারী না হইলে কাহারও কুণ্ডলিনী শক্তি জাগে না, মূলাধারে ঘুমাইয়াই থাকে। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনায় বলিলেন,—সকলকার জীবনে একবার ঐ শক্তি জাগিয়া উঠে, কিন্তু আবার ঘুমাইয়া পড়ে। তখন কোন্ কোন্ অবস্থায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ শক্তি জাগে তাহাই ছিল প্রশ্ন। এখন ইহাও জানিয়া রাখা ভাল এ ব্যাপারে তথাকথিত বিদ্বান মূর্খে ভেদ নাই অর্থাৎ অর্থকরী বিদ্যার স্থান নাই।

তিনি বলেন,—মানুষের যখন যৌবন আসে, সহজ ভাবেই তখন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য প্রাণ ছটফট করে। তারপর যখন তাদের মিলন হয়, ভালবাসা সহজভাবেই তাদের প্রাণের মধ্যে বিকশিত হয়—নাম তার প্রেম, প্রণয় এইসব। তখন তাদের জীবনে যে আনন্দ তা হিসাব করবার জিনিস নয়—তখনই কুণ্ডলিনী জাগেন। এই গেল স্বাভাবিকভাবে জাগরণের কথা—তারপর কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মত কেউ কেউ আবার অল্পবয়স থেকেই অর্থাৎ যৌবন আসবার পূর্ব্ব থেকেই ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদ পাবার জন্যে লালায়, তারপর যৌবনের মধ্যে এসেও নানা উপায়ে লালসা মেটাবার চেষ্টা করে এমনও ত দেখা যায়;—তাদের কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে কুণ্ডলিনী জাগরণ ঘটে না। তাদের চঞ্চল চিত্তের মধ্যে ইন্দ্রিয়সুখটুকু ছাড়া আর কিছুতে লক্ষ্য থাকে না বলে তাদের অধোগতিই হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক যৌবন-বিকাশের সঙ্গে যাদের জাতীয় সংস্কার অনুযায়ী সামাজিক প্রথায় বিবাহের মধ্যে দিয়ে মিলন ঘটে, তাদের জীবনের মধ্যে যে আনন্দ, যে সার্থকতা বা যে বস্তু লাভ হয়, সে জিনিস ঐ লম্পটদের ত হোতে পারেই না, তাদের হয় কি—বেশী দিন ইন্দ্রিয়-সুখকেই প্রবলভাবে ধরে থাকলে সামাজিক ন্যায়, ধর্ম্ম না মেনে কেবল ঐ একটা জানোয়ারী সুখের আস্বাদন করতে করতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়—সে সব লোকের যৌবনের শেষের দিকে একটা বৈরাগ্য আসে,—ঐ সময়েই কুণ্ডলিনী জেগে উঠেন।

আমি বলিলাম: যারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, যারা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকায় বললেন, তাদের ঐ অবস্থায় অনাচারের ফলে তাদের কুণ্ডলিনী শক্তি তখন কিভাবে কিরূপ অবস্থায় থাকেন?

আমার এই কূট প্রশ্নটি শুনিয়াই তিনি চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন: তাতে তোর কাজ কি রে শালা, ও-সব ব্যাজার কথা বলিস কেনে? ওতে তোর লাভ কি?

আমি তখন মিনতি করিয়াই বলিলাম: দেখুন, আমরা গোড়া থেকেই সকলে সাধু প্রকৃতির মানুষ নয়, যৌবনের আগে স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু কিছু অন্যায় যে করি নি তা সাহস করে বলতে পারি না। আর এখনকার দিনে প্রকৃতির নিয়মেই আমাদের সকলকার যৌবনের পূর্ণ বিকাশ হয়ে প্রেমানন্দে জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনের যোগাযোগ যে ঘটেছে তা নয়—সেই জন্যেই জানতে ইচ্ছা করে—

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: সত্য করে বল দিকি তোর কত বয়সে রসবোধ হয়েছিল?

আমি বলিলাম: বোধহয় নয়-দশ বছর বয়স থেকেই নারী-রূপের প্রভাব দেখাশুনায় অনুভব করেছি—

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: তার আগে?

আমি: তার আগে মা, মাসীমা, দিদিমা, ঠাকুরমাদের মুখে রূপকথার গল্পে, নানাপ্রকার বর্ণনায়, নায়ক-নায়িকাদের মিলন-বিরহের ব্যাপারে বেশ একটা আকর্ষণ অনুভব করেছি মনে হয়। যে সব রূপবতী, দীপ্তিময়ী কিশোরীর রূপ, তাদের লাবণ্য মনকে আকর্ষণ করতো, তাতে মনের মধ্যে একটা অস্ফুট বেদনার অনুভব করতাম—এসব কথা এখনো মনে আছে।

তিনি : আচ্ছা, আরও আগে, কত ছোট বয়েসের কথা মনে আছে বলতে পারিস ?

আমি : বোধ হয় যখন আমার বয়স দু'বৎসর তখন আমার শরীরের উপর ভয়ানক একটা আঘাত লাগে—তখন থেকেই বোধ হয় আমার সব কথাই মনে আছে। এখন অনেক সময় ভেবে দেখেছি যে শিশুকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঐ রসানুভূতি জাগে, তার বেশীর ভাগ কারণ মেয়েদের গায়ের গন্ধ, স্নেহবশে কোলে নিয়ে টেপাটেপি, চুমু খাওয়া, বুকে নেওয়া, নানারকমের কাতুকুতু দেওয়া ইত্যাদি। শিশু-ছেলে নিয়ে অসংযত যত কিছু আদর, আত্মীয়া মেয়েমহলে ঘটে থাকে আমাদের বাঙ্গালার প্রত্যেক সংসারে বিশেষত অ-শিক্ষিত মূর্খ মেয়েদের মধ্যে শিশু-ছেলেকে নিয়ে এমন অনেক ভাবের ঘাঁটাঘাঁটি হয়—যাতে অতি অল্প বয়স থেকেই বেশ স্পষ্টভাবে ওটা জেগে উঠে আর সংস্কারকে প্রবল করে।

তিনি : হাঁ, সেটাই ত গোড়ার কথা,—ছোঁয়া-ছুঁই ব্যবহার যে ঐসব রসের ব্যাপারে কত বড় শক্তিমান তার হিসাব নাই। শিশুরা ত অসহায় তাদের ত সহজে হয়; বালক যুবা বৃদ্ধ লোকের শরীরেও ওর প্রভাব কম নয়। আচ্ছা এখন বল, সুর, গান বা বাজনার প্রভাব তোর উপর কি রকম ছিল। তোর গান ভাল লাগতো ?

আমি বলিলাম : শিশুবেলা থেকেই ভাল লাগতো খুব,—এত ভাল লাগতো যে ছেলে-বেলায় পড়াশুনা ফেলে যাত্রা শুনতে ভালবাসতাম। একবার যাত্রা শুনলে দু'তিনদিন পড়াশুনায় মন লাগতো না।

তিনি বলিলেন : গান আমারও খুব ভাল লাগতো। খুব ছেল্যা বয়স থেকেই ভালো লাগতো। আমিও গান করতে পারতাম ভালো রে। গানও ত রস বটে—সব রসই এক রস হোতে—ঐ আদিরসই গোড়া জানবি।

আমি বলিলাম : এখন প্রসন্ন হয়ে বলুন যা জিজ্ঞাসা করেছি ?

তিনি যেন অবাক হইয়াই বলিলেন : কি ?

আমি : ঐযে উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের,—তখন স্মরণ করিয়াই বলিলেন : হাঁ হাঁ, ওদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি বে-বাগে জেগে উঠে, তাদের মাথা খেয়ে দেয় যে,—

আমি : কি রকম, খুলে একটু বলুন, না হোলে বুঝতে পারবো কি করে ?

তিনি : বুঝতে পারিস নাই ?—তাদের লক্ষ্য থাকে ত সুধু ঐ শরীরের আয়েস, তাতে হয়-কি, কেবল ঐ সুখের ইচ্ছাই খুব বেড়ে উঠে, কোনও মেয়্যাকে ভালবাসতে পারে না; মেয়্যা দেখলেই কেবল ঐ সুখের কথাই মনে হবেক—তা ছাড়া আর কিছুই তার মনে হবে না। মায়ের সোজা নিয়মের দিকে তাকাতে পারে না, মন যেদিকে টানে সেই দিকেই যেতে হবেক তাকে। যখন ঐ ভাবে যেতে যেতে ইন্দ্রিয়-সুখ অনেকটা ভোগ হয়ে যায় তখন ভিতরে ভিতরে কুণ্ডলিনী পাক খুলতে থাকে তাদের মধ্যে তখন একটা অবসাদও এসে পড়ে, তেজক্ষয় হোলে পর।

আমি : তা হোলে ও-ভাবে উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের শক্তিক্ষয়েও কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগেন ?

তিনি : তা জাগবেন নাই? তু যদি গোঁ-ভরে, লালস করে একদিকে অন্ধ হয়ে ছুটিস্ ত ধাক্কা খাবি না? পথ না দেখে ছুটলেই পড়তে হবে যে। তখনই চৈতন্য হবে। যে কেউ ভুল করে গোঁয়ারের পারা, চোখে দেখে না, কানে শুনে না—একবাগে দৌড়ায়, ফলে তাকে এক জায়গায় ধাক্কা খেতেই হবে যে; আর তখন চৈতন্য হবেক। ও শক্তি আর ঘুমায়ে থাকতে পারবে না, জেগে উঠবে। মায়ের রাজত্বে ওটি হবার যো নাই যে গো!

আমি : আর যৌবনের স্বাভাবিক গতিতে বয়সের সঙ্গে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনে বিবাহিত জীবনেও ত কুণ্ডলিনী জাগেন?

তিনি : হাঁ, যদি দুঁয়ার মধ্যে ভালবাসা জন্মে থাকে তবেই হবে;—না হোলে স্বধু ইন্দ্রিয়-স্থখের লক্ষ্যটাই বলবান হোলে শক্তি জাগে না। যেখানে দেখবি একজন আর একজনকে না ভেবে থাকতে পারে না, দু'জনার মধ্যে খুব টান ধরেছে—ঐখানেই শক্তি জাগার কথা বুঝতে হবেক।

আমি : তাহোলে একজনের মধ্যে প্রেমের বিকাশ হোলেও শক্তি জাগে?

তিনি : হাঁ, তা জাগবেন নাই, প্রেম কি সহজ কথা নাকি, সকলকার বিয়ায় কি প্রেম জন্মায়? মায়ের কত অনুগ্রহ থাকলে তবে সে একজনা প্রেমের অধিকারী হয়?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আচ্ছা, আর কোন্ কোন্ অবস্থায় কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগেন বলুন না? আপনার কথা শুনে আশা হয় যে তা হোলে সকলকারই কোন না কোন সময় কুণ্ডলিনী জাগবেন।

তিনি :, আর গুরু-লাভ হোলেই শক্তি জাগেন, সে-রকম গুরু হোলে চ্যালার শক্তি' জাগিয়ে দিবেন যে।

আমি : ও ত আছেই,—ও-সব গুরু-কৃপার কথা বাদ দিয়ে অন্য কিভাবে শক্তি জাগতে পারে সেই কথা—

তিনি চটিয়া উঠিলেন : বলিলেন, গুরু-কৃপা ছাড়া কিছু হবার যো আছে নাকি! যখনই হবে, গুরুর কৃপা ছাড়া কি করে হবে; বলিয়া উদ্দেশে তিনি যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিলেন : শালা গুরুর কৃপা মানবেন নাই—খৃস্তান হইছেন। অনেক কষ্টে শেষে বুঝাইতে পারিলাম যে গুরু-কৃপা প্রাণপণ করিয়াই মানিয়া থাকি—এখন অন্য কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি বলিলেন : হাঁ দেখ—যদি কারো কঠিন বিপদ-আপদ আসে, কি কঠিন রোগ হয় যেমন মরণের কাল এলো মনে হবে, সে অবস্থায়ও তার কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠেন। আর অতিরিক্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-ঘটিত মনঃকষ্টে পড়িলে ঐ শক্তি জাগে,—আর বাড়াবাড়ি করিস্ না —বুঝলি?

তাহা হইলে ইহাই পাওয়া গেল যে কুণ্ডলিনী-শক্তি কার কিভাবে জাগিবে তাহার ঠিক নাই। মোটামুটি যে কয়েকটি অবস্থায় জাগে তাহা এই :—

(১) স্বাভাবিক যৌবনকালে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ে মানবের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঐ শক্তি জাগে।

(২) অস্বাভাবিকভাবে যৌবনের ব্যাভিচারে—উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-প্রতিক্রিয়ার ফলেও ঐ শক্তি জাগে।

(৩) কোন কঠিন বিপদের মধ্যে পড়িলেও ঐ শক্তি জাগে।

(৪) কঠিন রোগের মধ্যেও ঐ শক্তি জাগে।

(৫) অতিরিক্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-ঘটিত গভীরতম মনঃকষ্টে, অথবা যে কোন কারণে হোক—অসহনীয় দুঃখের ফলেও কুণ্ডলিনী-শক্তি মানুষের মধ্যে জাগিয়া উঠেন।

ইহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, কঠিন দুঃখ বা গভীর মনোবেদনার ফলে যদি শক্তি জাগতে পারেন তা হোলে বেশী কিছু সুখের ব্যাপারেও ত তা হোতে পারে?

তিনি একবার তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন: হাঁ তা ত হোতে পারে বটে। কোন সময় কারো জীবনে যখন এমন কিছু ঘটে যাতে তার আনন্দের সীমা থাকে না—এমন সুখ যাতে সংসারের আর কোন কোন সুখই কিছু না বলে মনে হবে তখনও ঐ শক্তি জেগে উঠবেন। সুখ হউক বা দুঃখই হউক মানুষের জীবনে বা প্রাণে যাতে জোরে ঘা লাগে তাইতেই জেগে উঠেন যে।

তাহা হইলে মানুষের অতি সুখের মধ্যে বা ফলে ঐ শক্তি জাগরিতা হন?

একটু থামিয়া খ্যাপা কতক্ষণ পর বলিতেছেন: যেভাবেই জাগুক না কেন আবার ঘুমাবার সম্ভাবনা আছে। যখন জাগলো তখন কিছুকাল খুব উচ্চ অবস্থা থাকলো—তার পর 'আবার ধীরে ধীরে অহংকার জেগে উঠল, মনে হোলো, আমার এতটা উঁচা অবস্থা হয়েছে—কৈ আর কারো ত এমন অবস্থা দেখতে পাই না—এইভাবে আবার ক্রমে নেমে পড়তে আরম্ভ করে—শেষে আবার ঐ শক্তি ঘুমিয়ে পড়লো, এই রকমই ঘটে থাকে।

আমি বলিলাম: তা হোলে উপায়?

তিনি: উপায় পিছনে গুরু-শক্তি না থাকলে এমন ত হবেই। গুরু-শক্তি না পিছনে থাকলে কারো সোজা উঠ্‌বার জো নাই হেথা;—মায়ের কড়া নিয়ম যে, তবে আর লোকের চক্ষে গুরু-শক্তি দেখা দিক বা না দিক, ভাল মনিষের দিকে গুরুর দিষ্টি থেকেই যায়—আবার তাকে তুলে দেন। কি-রকমটা হয় জানিস,—পতন হোলে পর তার আবার সেই অবস্থা পাবার লেগে প্রাণটা ছটফটায়,—তখন সে আবার একটু কষ্ট করে—সেই অবস্থা পাবার জন্যে, পেয়েও যায় শেষে অবশ্য। ও এমনই সুখ যে একবার সে সুখের অবস্থা পেলে আর কিছুই ভাল লাগবে না। যার ও শক্তি জেগেছে সে বুঝে, অপর কি জানবে?

তিনি কতক্ষণ পর বলিতে লাগিলেন: যেটা পরে মানুষকে বড় করে উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়, ছোট ছেল্যো অবস্থার মধ্যেও সেই রসাভাস দেখা যায়। ও সংস্কার ত মানব-সমাজে আদি কাল থেকেই চলে আসছে। কারো খুব অল্প বয়সেই ইন্দ্রিয়ে বা মনে প্রকাশ পায়, তবে ওটা ঢাকবার জিনিস বোলেই ঢাকাই থাকে! আবার ওদিকে যেমন রস বোধ জাগে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন সুযোগে সংযোগের ফলেই ত জাগে? আবার সেই সুযোগ সংযোগের অভাবে

আপনিই ঢাকা পড়ে যায় ছেল্যা মেয়্যাদের মধ্যে। প্রকৃতি নিজেই ঐ রসঘটিত ব্যাপারকে গুপ্ত রেখেছে। যার প্রকাশ হয় তার নিজের কাছেই হয় সাধারণত অপরের কাছে গোপন থাকে। কোন কোন ছেলে বা মেয়ের ও সংস্কার খুব তেজি দেখা যায় ত, তাদের খুব তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি। তাদের ভিতরে শক্তির প্রভাব বেশী থাকে বলেই ঐ সব ব্যাপারেও সাধারণের তুলনায় একটু আগেই প্রকাশ পায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: যাদের তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি বলছেন তাই বলেই কি তাদের রসবোধ খুব কম বয়সেই দেখা দেয়?

তিনি: ওই আদিরসের অনুভূতি সূক্ষ্মভাবে সংস্কার হয়ে সকল শিশুরই মনের মধ্যে থাকে, সুপ্তভাবেই থাকে এটা বুঝিস ত? তা হোলে, যেমন যেমন চৈতন্য-শক্তির বিকাশ হোতে থাকে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে নানাবিধ ভোগ আস্বাদনের শক্তি বাড়তে থাকে, যে শিশুর সব ইন্দ্রিয় সুস্থ, সবল, তাদের মধ্যে ঐ রসবোধ সহজ নিয়মের মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে জেগে ওঠে—যখনই সুযোগ পায় বা যোগাযোগ ঘটে, তবে দুর্ব্বল বা অসুস্থ ইন্দ্রিয় বা শরীর যাদের, তাদের তুলনায় সুস্থ ছেল্যাদের আগেই প্রকাশ পায়। সব বাপ-মায়েতেই তা জানতে পারে, সকলের আগে যদি লক্ষ্য করে,—বাপ-মা থেকেই সন্তানে ওটা পায় কিনা!

আমি: আচ্ছা, তখন থেকে শিক্ষা দ্বারা ঐ সব শিশুদের ভিতর থেকে ও সকল ভাব দূর করতে পারা যায় না?

তিনি: মর শালা, শিক্ষে দিয়ে আগুনকে চাপবি কি করে, সেদিকে যা দিয়ে আগুনকে ঢাকা দিবি তাই-ই পোড়াবে যে। তুই বলিস্ কি রে বোকা, আদিরস, যা সৃষ্টির মূল শক্তি তাকে শিক্ষে দিয়ে উল্‌টে দিবি। একি কিছু বুঝবার বা জানবার জিনিস নাকি বাইরের কিছু একটা যা থেকে ওদের তফাৎ রাখবি। এ-যে ইন্দ্রিয়ের জেন্ত অনুভব অন্য কিছুতেই ঢাকা পড়বে নাই। সব কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়,—ওটিকে আর কাউকে শিক্ষা দিতে হয় নি।

ঐ শক্তিটাই সব শক্তির মূল, সেই জন্যই ওকে মূলাধার শক্তি বলে। যার যতটা ঐ শক্তি প্রবল তার অনুভব শক্তি অতীব তীক্ষ্ণ হয়, ধী বা ধারণা-শক্তি প্রখর, অতি অল্প বয়সেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতের যে ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি, গভীর তত্ত্ব সকল বিচার, সিদ্ধান্ত এ সব ঐ মূলীভূত আধার শক্তিরই ফল। যে শিশু ভবিষ্যতে মহা বিদ্বান বা জ্ঞানী বা কর্ম্মী হবে, তার গোড়া থেকেই এমন কি বালক অবস্থার আগে থেকেই ঐ আদিরসের সংস্কার খুব প্রবল দেখা যায়। কিন্তু এমনই প্রকৃতির নিয়ম শিশু অবস্থা থেকেই সেই সব ছেলে মেয়েদের মনে এটা যে বিশেষ গোপনীয় এ সংস্কারও স্পষ্টভাবে তাদের মধ্যে দেখা যায়,—তাই-ই শেষে এ ব্যাপারে সংযমের সহায়তা করে।

আমি: ঐ অবস্থায় তাদের সংযম বোলে কিছু একটা ফোটে কি?

তিনি: যোগাযোগের অভাব আর সংযম এক জিনিস না হোলেও বাইরের চেহারাটা একই। যার দ্বারা মহৎ কিছু হবে, তাদের বেলা রসবোধ জাগলেও প্রকৃতি-জননী ঐ ব্যাপারে

কাজের বেলা যোগাযোগের অভাব ঘটিয়ে দেন, শেষে তাই সংযমে পরিণত হয়ে তার প্রতিভা নানাদিকে বিকাশ পায়।

আমি : যোগাযোগ ঘটাঘটির ব্যাপারেও তাঁর হাত আছে নাকি, বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকে !

তিনি : দেখিস্ না, ঐ অবস্থায় সংযমের মত একটা কিছু যদি না থাকতো তা হোলে মানব-সমাজে ছেলেরা অতি অল্প বয়স, বালক বলে গণ্য হবার আগে থেকেই যৌন ব্যবহার লোক-চক্ষের সুমুখেই সুরু করে দিতো, লাজ-লজ্জা, কোন রকম সঙ্কোচ কিছুই থাকতো না। একটি শিশু হয়ত আর একটির সঙ্গে ঐ রসের খেলা করচে এমন সময় যদি বয়স্থ কেউ সেথায় এসে পড়ে তখনই স্বভাবতই তারা বিরত হয়,—তার সংস্কারে আপনা থেকেই একটা সঙ্কোচ এসে পড়ে—তাই-ই পরে বয়সকালে সংযমের স্পষ্ট কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম একটা সঙ্কোচ যদি ঐ শিশুবয়স থেকেই না থাকতো তা হোলে মানব-সমাজ ছাগলের সমাজে পরিণত হোতো যে। আর এটা ঠিক জানবি, কি শিশু, কি বালক-বালিকা, কি যুবক-যুবতী যতই গোপনে তাদের আদিরস-ঘটিত বৈধবা অবৈধ ব্যাপারকে রাখতে যত্ন করুক না কেন প্রকৃতি সাহায্য না করলে সেটা গোপন থাকতে পারে না। প্রকৃতি ঠিক জানেন কার কোন কাজটা কতটা গোপন রাখতে হবে। তাঁরই অভিপ্রায় অনুসারে সব কিছু ঘটনাই গোপন বা লোকচক্ষে প্রকাশ পায়। নিজ সৃষ্টির রক্ষার জন্যই তিনি কোনও ব্যাপার প্রকাশ বা গোপন করেন। সমাজে এমনটা দেখতে পাওয়া যায় না কি যে এক একটা ব্যাপার এমন বহুদিন গোপন থেকে পরে প্রকাশ পায়,— সংশ্লিষ্ট লোকেও তা জানতে পারে না,—যখন প্রকাশ করবার হয় তখনই তাঁর ইচ্ছায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন কর্ম্মকর্ত্তারা তার ফলভোগ করেন। সকল ব্যাপারেই এটা হয়ে থাকে, সুধু ইন্দ্রিয়-ঘটিত ব্যাপার বোলে নয়। গুপ্ত ততদিন যতদিন তার অভিপ্রায়।

আমি বলিলাম : এ-ত বড় অদ্ভুত ঠেকে, প্রকৃতির হাত আছে এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে !

তিনি : তুচ্ছ, উচ্চ ওসব কথা নয়,—আমরা এখানে রয়েছি কেমন, ঠিক মায়ের কোলে শিশু যেমন থাকে ঠিক তেমনি। শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে তখন মায়ের দৃষ্টিতে শিশুর সবটাই দেখা যায়। শিশু বরং মায়ের অনেকটাই দেখতে পায় না। আমাদের যতই কেন বিদ্যা-বুদ্ধি-চাতুরী থাক না ও চক্ষুকে এড়াবার যো নাই।

আমি : আচ্ছা, সে চোখটা থাকে কোথায়, কোনখান দিয়ে তিনি এ সব দেখেন ?

তিনি : ভেবে দেখ দেখি, কোনখান্ দিয়ে তিনি আমাদের সবটাই দেখতে পান ?

আমি : বুঝা বড়ই শক্ত,—তবে আমার যা মনে হয় বোলতে ভরসা হয় না।

তিনি অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বলনা, না হয় ভুলই হবে তাতে ক্ষতি কি,—আমি তো শেষে তোকে বোলতে পারব—

আমি বলিলাম : আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের চক্ষেই আমাদের সব কিছুই তিনি দেখেন।

তিনি : কি রকম, খুলে বল না।

আমি : ধরুন, আমরা যা কিছুই করি না কেন, ভাল বা মন্দ যত কাজ সে সব আমি করছি বোলেই ত করি,—আমাদের সব কাজ আমাদের ত ভালমতেই জানা থাকে। আর তিনি ত অন্তর্য্যামী, আমাদের সকল ব্যাপারই আমাদের মধ্যে অন্তর্য্যামী হয়ে তিনি খুব স্পষ্টভাবেই জেনে ফেলেন। যা আমরা জানি তা তিনি সবই জানেন।

তিনি : হাঁ, এইত ঠিক বোলেছিস্—তু শালা সব জানিস্, ন্যাকা সেজে হেথায় এসেছিস্—বল দেখি ঠিক কিনা ?

আমি : আচ্ছা, এটা খুব আশ্চর্য্য মনে হয় না কি যে, তিনি এতটা কাছে আমাদের অন্তরের মধ্যে আছেন অথচ আমরা তাঁর থাকাটা কল্পনায়ও আনতে পারি না। কোন গোপন কাজ করে মনে করি সকলের চক্ষু এড়িয়ে কতই চতুরের কাজ করলাম।

তিনি : পশুজন্ম ঘুচলে পর তবে ঐ সব জ্ঞান হয়। (তন্ত্রে মানবের যে তিন অবস্থার কথা আছে; যথা—মানুষ প্রথমে পশু, তারপর বীর বা মানুষ, শেষে দিব্য-শক্তির বিকাশে দেবতা,—সেই হিসাবেই এই পশুর কথা বলিতেছেন।) কুণ্ডলিনী না জাগলে ত সে দিকে যাবার পথ নাই। পশু-জন্ম আর বীর বা মানব-জন্ম এই দুইটা জন্মই দীর্ঘকালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সব কিছুই কালের ভিতর দিয়ে হবে যে। ছিষ্টির এতটা ভোগ, এতটা শক্তির খেলা এ সব ত ভোগ করতে, জানতে হবে—সে কি দুই এক দিনের ব্যাপার ?

আমি : থাক্ ও সব কথা, এখন বলুন আমাদের মত মানুষ, যাদের এ সব জানতে শুনতে ইচ্ছা হয়, সৎপথে যেতে প্রবৃত্তি হয়, কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠলেও এত বাধা আসে কেন, সোজা পথ পাওয়া যায় না কেন ? উদ্দেশ্য ত সৎ আছে, অবশ্য অহংকার করে বলিনি,—

তিনি : না, না, অহংকার হবে কেনে, যথার্থ কথাই ত বলছিস্। হাঁ দেখ, তুই যে সৎ উদ্দেশ্যের কথা বলছিস্,—এখন কতটা তুই ঐ সৎভাবকে আঁটালো করে ধরেছিস তা তো তুর জানা নাই। মনে হয়ত হোলো তুই সৎ ভাবেই চলেছিস, কাজে দেখা গেল কোন সুযোগ যদি এলো ত অসৎভাবেই ফেঁসে গেলি, এমন ত ঘটে।

আমি : হাঁ তা ঘটতে পারে বটে, সত্যি কথা, গলদ আছে আমাদের এই সৎভাবে থাকার মধ্যে,—এটা আমরাও দেখতে পাই যখন মনটা সরল থাকে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলেও অনেক সময় পথের জটিলতা ঘুচাতে পারি না—

তিনি : একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে আছে এখানকার সকলকার সব ব্যাপার যে,—কোনটা নিছক আলাদা নেই ত, কাজেই ব্যাপার সব জটিল। চট করে কাজ হবে কি করে। তেমন তেমন জোর যদি থাকে ত তবেই জটগুলা কাটা যায়, ছেঁড়া যায়। তবে কুণ্ডলিনী জাগার সঙ্গে সঙ্গে এমনই একটা শক্তি পাওয়া যায় যে সব থেকে নিজের উদ্দেশ্যটি ঠিক আলাদা করে নেওয়া যায় তাইতেই ভাল হয়। তারপর পশুজন্মের সকল মানুষেরই মেয়াদের আসল পরিচয়টা পেতেই বিলম্ব হয় বেশী, তাইতেই অনেক কাল যায় যে। তারপর ধন-মান-টাকার কথা আছে;

মেয়্যা আর টাকা এই দুটাই আগুন নিয়ে খেলা করার পারা। স্বধু সহবাসের সুখটি লক্ষ্য করে মেয়্যাদের দেখলেই পুড়তে হবে।

আমি: রামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথা বলেছেন, তিনি সাধুদের ও দুটাই ত্যাগ করতে বলেছেন। কিন্তু দেখুন পুরুষদের বিপদটা এই ব্যাপারে খুব বেশী, মেয়েদের কিন্তু ও সব ভাবই নাই, তাদের মধ্যে সংযম এতটা বেশী বা লালস অবশ্য ভগবানের ইচ্ছাতে এতটা কম যে তাদের পতনের সম্ভাবনা খুবই কম। গোড়া থেকেই তারা সব ত্যাগই করতে পারে।

তিনি: না তা ঠিক না। ত্যাগ তারা মন থেকে সহজে করতে পারে না, তবে সব কিছুই ধৈর্য্য ধরে সইতে পারে; কিন্তু পুরুষের সঙ্গে পড়লে তারা ভালবাসার জন্যে সব কিছুই ছাড়তে পারে। অত দিনের ধৈর্য্য, অত দিনের ত্যাগ এক কথায় ছেড়ে দেয়--যদি পুরুষকে অনুগত দেখতে পায়। আসলে সরল মন বোলে তাদের ভোগাস্তিও বেশী। মহাপ্রকৃতি মেয়েদের অতটা সহ্য করবার শক্তি যদি না দিতেন তা হোলে এ সংসার ছারখার হয়ে যেতো।

আমি বলিলাম: পশুভাবের মানুষ যারা তাদের কথায় আমাদের কাজ নেই। ভাগ্যক্রমে যথাসময়ে ঐ যে কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠেন তখন থেকেই ত মনুষ্যত্বের কাজ আরম্ভ হয়, কিন্তু তাও আবার ঘুমিয়ে পড়ে বোলছেন যে—এ ত ভয়ের কথা?

তিনি: হাঁ, যৌবনের সময় ঐ যে স্বাভাবিক কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগা, ও জায়গায় যদি সতর্ক না থাকা যায় তাহোলে আবার সুপ্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তারপর আবার যে জাগে সেই জাগাতেই মহৎ ফল লাভ হয়।

আমি: যদি বা জাগলো আবার সুপ্ত হবার সম্ভাবনা কেন?

তিনি: প্রথম জাগায় ভাল ঘুম ছাড়ে না—ভেবে দেখ, যে সব প্রবৃত্তি এতকাল একজনের ধাতে স্থায়ী হয়ে বোসেছে তা কি একবারেই বদলে যেতে পারে? যেতে যেতে কতদিন যায়; সেই জন্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেও একেবারেই সে-রকম ঘুমাতে পারে না, আবার জেগে উঠবার জন্যেই মুকিয়ে থাকে। মনে কর, পশুভাবের ইন্দ্রিয়-সুখের লালস, স্বার্থপরতা, অপরের সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করে নিজের সুখ-দুঃখকেই বড় করে দেখা সে গুলা কি একেবারেই যায়? প্রথমে যৌবনের কামজ-সম্বন্ধ নিয়ে নারী-সম্ভোগ, যার আকর্ষণ এতটা প্রবল থাকে সেটা থাকতে ত কিছু ভাল কাজ বা উচ্চ-ভূমিতে গতি হবে না—সেই জন্য দ্বিতীয়বার যখন শক্তি জাগে তখন ঐ ভাবের কামজ-নারী-সম্বন্ধের উপরও একটা ঘৃণা এসে পড়ে।

আমি বলিলাম: ঘৃণা থাকাও ত ভাল নয়; ঘৃণা, লজ্জা এ-সব তো এক-একটা পাশ, ঘৃণা যদি কোন জিনিসের উপর থাকে তা হোলে ত সেই পাশে বদ্ধ থাকাই হোলো? —নয় কি?

তিনি: অবশ্য প্রথমটা তা হয় বটে, সেটা প্রতিক্রিয়ার ফলেই হয়। কিন্তু তারপর আপনার প্রকৃতির সঙ্গে সেটা মানিয়ে নিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষের আসল সম্বন্ধ জ্ঞান হোলেই সেই ঘৃণার ভাবটা উবে যায়—তাই হোলো কুণ্ডলিনী-জাগরণের মুখ্য ফল।

আমি : তাহোলে কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরণের মুখ্য ফল কি এই নর-নারীর যথার্থ সম্বন্ধ-জ্ঞান ?

তিনি : মনে কর যখনই মানুষ বড় হয়ে নিজ শক্তিতে মহৎ ভাব সকল প্রকাশ করতে থাকে,—যেমন ঋষিকল্প মানুষেরা আসলে তাদের স্ত্রীকে ত্যাগ করবার আর দরকারই হয় না—তাদের এমনই একটা সহজ ভাবের স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ-জ্ঞান পাকা হয়ে যায় যাতে রক্ত-মাংসের দেহগত সম্বন্ধটা একেবারেই তুচ্ছ হয়ে যায়। সুধু যৌন-সম্বন্ধ-জ্ঞান মাত্র নয় জগতের সকল ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধটাও বদলে যায়। ঐ জ্ঞানই হোলো ঐ শক্তি জাগরণের মুখ্য ফল। প্রথমে যে সব ভোগ আকর্ষণের বস্তু থাকে,—পরে চৈতন্যের আলোতে সে সকলের রূপ বা প্রভাব উল্টে যায় অথচ কোন বস্তুর লোপ হয় না। দ্বিতীয়, জাগরণে এই সব উচ্চ ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়—তা থেকে পতন নাই। তখনই এখানকার সকল বস্তুর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ সার্থক হয়, তত্ত্বজ্ঞান ফোটে, সকল ভোগ সকল জিনিসের স্বরূপ দেখা যায়।

আমি : এ জগতে ভোগ আর কর্ম্ম শেষে জ্ঞান—এই ত এখানকার মোটা কথা ; অবশ্য শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভেদে অধিকার নিয়ে কথা আছে।

তিনি : হাঁ, সাধারণভাবে ভোগ, কর্ম্ম আর জ্ঞান এই তিনটিই আসল। ভোগের মধ্যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—নিয়ে যে সকল ভোগ তার মধ্যে মৈথুনে ঐ সবকটাই একসঙ্গে হয় বোলে যৌবনে তার আকর্ষণই সকলের বড়। তারপর হোলো অর্থ বা ঐশ্বর্য্য ভোগ, তার পর শেষ হোলো জ্ঞান এবং লোক-কল্যাণ সম্পর্কে কর্ম্ম যত আছে—গুরু ভাবে তার শেষ—তার ফল হোলো জন এবং সমাজ থেকে শ্রদ্ধার আকাঙ্ক্ষা—গুরুপদে প্রতিষ্ঠাই হোলো এখানকার শেষ ভোগ বা কর্ম্ম !

আমি : মোটামুটি ভোগ এই তিনটি হোলেও আমার মনে হয় চতুর্থ একটি আছে।

তিনি : কি ?

আমি : আত্মজ্ঞান বা কোন বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য তপস্যা বা কর্ম্ম।

তিনি : আত্মজ্ঞানের জন্য ঐকান্তিক যত্ন তা হোলো এ জীবনের মূল উদ্দেশ্য—তার ফলাফল শেষে ঐ গুরু-ভাবের মধ্যে গিয়েই পড়লো—আলাদা হোলো কি করে ?

আমি : কেন ? এই জগত-সৃষ্টির কৌশল, পদার্থ-বিজ্ঞান ব্যাপারে সৃষ্টিতে কত কত মূল উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান—ও দেশের কত পণ্ডিত-মহাত্মা এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের তপস্যায় জীবনপাত করছেন—কত কত আবিষ্কার করছেন, তাতে,—

তিনি : তাঁরা কি লোক-সমাজের উপকারের উদ্দেশ্য নিয়ে এ-সব করছেন না ?

আমি : তা হোতে পারে—তবে মূলত সে সব কাজ ত প্রেরণা-মূলক। আর নিঃস্বার্থ ভাবেরই মনে হয়।

তিনি : তা হবে ! কিন্তু প্রথমত তার মধ্যেও তাঁদের আনন্দ পূর্ণমাত্রায় আছে—কাজেই সেটা উচ্চ স্তরের ভোগের মধ্যেই এসে পড়লো। তারপর তার তপোলব্ধ জ্ঞান, যা তিনি রেখে

যেতে চান, সেও ত ঐ গুরুপদের পর্য্যায়ের মধ্যে পড়লো। ঐ মূল তিনটি ভোগ থেকে পৃথক আর একটি তাকে কি করে বলা যায়?

আমি: তা ঠিক না হোক, এসব ত উচ্চ উচ্চ ভাবের অবস্থা বলতে হবে।

তিনি: তা তো হবেই, ঐ গুলাই ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভোগের মধ্যে এলো? তাতে দেখতে পাবি—ঐ সব উচ্চ ভোগের মধ্যে তাঁদের উঁচু অবস্থায় নারী, ধন বা অর্থের সম্বন্ধ থাকলেও তার সঙ্গে কোন মলিন ভাবের সম্বন্ধই নেই। এটুকু বুঝে লাভ আছে।

আমি: তা বটে, ঐ-সব উচ্চ স্তরের মানুষ যাঁরা—তাঁরা সঙ্গে স্ত্রীও রেখেছেন অর্থও রেখেছেন। কিছুই ত্যাগ করেন নি। এতে আমার মনে হয় যে আমাদের ভারতে মানুষের ধাতে ত্যাগ ত্যাগ করে একটা যাপ্য বায়ু-রোগের প্রভাব আছে।

তিনি: এই দেখ্ না কেন, মেয়্যা মানুষই বল্ আর ধন বা অর্থই বল্ এদের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় হয়ে গেলে সে সব ত তার জীবনে সাধনের সহায় হয়ে যায়। হেথায় মেয়্যা-মরদের স্বরূপ-জ্ঞান হোলেই এদের সঙ্গে তোর যথার্থ সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়ে যায় তখনই জীবন সার্থক হয়। আর সেইটাই বুঝবার লেগেই না মেয়্যা-মরদের এতটা ঘাঁটাঘাটি! পশুভাবের যা-কিছু সবই এই দেহকে নিয়ে—দেহ-জ্ঞান যাদের বেশী তারাই ত পশু আর ভোগ-বিলাসের জঙ্গলের মাঝে দলবেঁধে ঐ পশুগুলাই ত চরে বেড়াচ্ছে, এটা ত বুঝেছিস?

আমি বলিলাম: তা তো খুব ভাল করেই বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই অগাধ পশুত্ব থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায় কি বলে দিন আপনি।

তিনি: আহা, এতটা শুনে, এতটা বুঝেও বোকার মত কথা বলিস কেনে! অনায়াসে পশুত্ব ঘোচাবার কত সহজ পথ এখানে রয়েছে,—শাক্ত হোলেই পশুত্ব ঘুচবে, শক্তিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করলেই শাক্ত হওয়া যায়। স্বুধু এ দেশের মানুষের কথা নয় সারা পৃথিবীর মানুষের শাক্ত হওয়া ছাড়া পশুত্ব ঘোচাতে আর অন্য উপায়ও নাই। দেবীসূক্তে জানিস দেবী কি বলছেন?

আমি: সে আর জানবার দরকার নেই, এখন একটা শুভ খবর আপনাকে দি, শুনে সুখী হবেন যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষই শাক্ত হয়ে গিয়েছে। সহজ ভাবেই তারা অনেককাল আগেই শক্তিকে আশ্রয় করে জগদম্বার শ্রেষ্ঠ সন্তান বোলে পরিচয় দিয়েছে,—কেবল ভারতবর্ষের হিন্দু বলতে যাদের বুঝায় তারা ছাড়া। দেশের এরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যে কোনও উপায়েই হোক শক্তিকে দেশের সকল হিন্দু অধিবাসীর ভিতর থেকে তাড়িয়ে জড়াবস্থা আনতেই হবে, না হোলে অন্তঃসারশূন্য হয়ে শীঘ্র পরলোকে পৌছে বৈকুণ্ঠ অধিকার করা যাবে না,—এরা বলছেন শাক্ত হয়ে কোন লাভ নেই—কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থটুকুই ইহকালে ভাববার জিনিস।

শুনিয়া খ্যাপা বাবা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিলেন,—তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন: তাঁরা না হয় শীঘ্র শীঘ্র গিয়ে ভূতনাথের দল বাড়ালেন, কিন্তু যাদের সৃষ্টি করে গেলেন, তাঁদের বংশধরেরা! তাদের জন্যে কি করে গেলেন?

আমি : তাদের জন্যে—জগতের শ্রেষ্ঠ শাক্তদের যাতে তারা চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে পদসেবা এবং পদপূজা করে ধন্য হোতে পারে তার পাকা উপায় করে গেলেন—আর শেষে বাপ-পিতামোর পাকা মার্কামারা পথ ত আছেই—আর বাবা ভূতনাথও আছেন। যাক ওকথা—এখন আমার শেষ কথা একটু আছে দয়া করে যদি শেষ করে দেন,—সেটা এই যে তান্ত্রিকদের যেমনভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় অ-তান্ত্রিকদের কি ঠিক সেই রকম হয় ?

তিনি : তান্ত্রিকদের কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগানো, আর তাকে প্রত্যেক চক্রের ভিতর দিয়ে তোলা—সে সব আলাদা সাধন, তাতে মজা আছে। সাধারণ মানুষ সে সব মজা পায় না। মনে কর, অনেককাল থেকে কত কত সাধক যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেক চক্রে পদ্মের কথা বলেছেন,—প্রত্যেক পদ্মের মধ্যে পৃথক পৃথক দলের কল্পনা আছে—প্রত্যেক চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী আছেন, বীজমন্ত্র আছে—যেমন যেমন এক একটি চক্র ছাড়ায় কুণ্ডলিনী-শক্তির নানা ভাবের বিকাশ অনুভব করা যায়। এ সব আলাদা সাধন—এর একটা মহৎ উপকার এই হয় যে ঐ শক্তির উপর আয়ত্ব বিস্তার করা যায়। অনুভব করা যায় ঐ শক্তি কখন কোন্ চক্রে কি ভাবে ক্রিয়া করছে—তার ফল কি হচ্ছে। তাতে ধী-শক্তি তীক্ষ্ণ হয়, অন্যান্য শক্তির বিকাশ হয়! এই পদ্ধতি অতি প্রাচীন, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত। এর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী-শক্তি প্রত্যেক চক্রের মধ্যে থাকার ফলে যে যে ভাব হয়, যে যে শক্তির স্ফুরণ হয় সে সকল অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দের স্ফূরণ হয় তার তুলনা নেই। তান্ত্রিক যাঁরা, ঐ শাস্ত্র অনুযায়ী যথার্থরূপে সাধন করেন, তাঁদেরই সেটা বিশেষ লাভ যা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষে পেতে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ঐ ধরণের কিছু কিছু সুবিধা আছে যা অপর দলে নাই। এ তো জানা কথা। তান্ত্রিকদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তির নামে যা বলা হয়েছে তা অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে আত্মশক্তিরূপেই প্রকাশ। প্রথমেই অবস্থা বিশ্লেষণ করেই ওকে কুণ্ডলিনী বলা হয়েছে—ঐ শক্তি জাগরণের পর আত্মাতেই ওর চরম পরিণতি অর্থাৎ ওর শেষ, আত্মার সঙ্গে এক হোয়ে মিলে যাওয়ায়।

আমি : আপনার কথায় এ বিষয়ে আসল কথা এই বুঝা গেল যে, অধ্যাত্ম জীব-চৈতন্যকেই তান্ত্রিকেরা কুণ্ডলিনী-শক্তি রূপে ধারণা করেছেন। তারই জাগরণ থেকে চরম পরিণতি পর্য্যন্ত একটি অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-সাধন পথ তাঁরা সৃষ্টি করে নিয়েছেন, যার হদিস অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কেহ পায় না। তন্ত্রের ইহাই পরম গৌরবময় সর্ব্বার্থ সিদ্ধির পথ। জগতের যত ধর্ম্ম-সাধনের পথ আছে, এটি বিশেষ—তার মধ্যে একটি নিজ মহিমায় উজ্জ্বল, অনন্যসাধারণ একটি পথ যার কথা সভ্যসমাজের অধিকাংশেরই অজ্ঞাত। কেমন এই ত? এখন বলুন জীবাত্মার সঙ্গে কুণ্ডলিনীর আসল সম্বন্ধটা কি ?

তিনি : এখন জীব বলতে হবে, জীবাত্মা নয়, জীবের সঙ্গে তার সম্বন্ধ, প্রথম অবস্থায় তাকে তার অংশও বলা যায় আবার তার প্রকৃতিও বলা যায়। যৌবনে যেমন মানুষ তার প্রেমের আধার-স্বরূপ জীবন-সঙ্গিনীকে পেয়ে পূর্ণ হয়—আনন্দময় হয়, সেই রকমই এদের সম্বন্ধ,

তারপর শেষে জীবাত্মা যেমন পরমাত্মায় আশ্রয় পেয়ে পূর্ণ হয়। সেই রকমই এই কুণ্ডলিনী, জীবের সঙ্গে মিলিত হয়ে, এক হয়ে উভয়েই পূর্ণ হয় যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ দুই-ই অপূর্ণ থাকে। তারপর, এটা বুঝতে হবে যে প্রথম স্তরের স্থুল মানুষের মধ্যে যে জীব, তা' শক্তিরূপেই অধিষ্ঠান করেন। তারপর নানাভাবে ভোগ-আবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে যেমন অবস্থা-বিশেষে কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা হন তখন দুজনেই দুজনকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কালের মধ্যে দিয়েই এই শক্তির বিকাশ হয়,—বিকাশের পূর্ব্বে জীব নিজেকে শক্তি মাত্র ভাবতে পারে, কারণ তখন দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গেই তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ থাকে—তখন তার অস্তিত্বের সবটাই স্থুল। ক্রমে ইন্দ্রিয়-গ্রামের সঙ্গে মনাদি পুষ্ট হোলে পর,—কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্ভব হয়,—উহাই চৈতন্য-শক্তি,—সাধারণত একেই সুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ বলে। প্রথমে ছিল ঘুমিয়ে—অর্থাৎ তার ক্রিয়া দেখা যায় নি—এখন জাগরণে তার ক্রিয়া দেখা গেল। আসলে জীবের চৈতন্য-শক্তিই হোলো কুণ্ডলিনী,—জেগে উঠে তার গতি হয় বিকাশের পথে অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্রের পানে ;—সেই কেন্দ্র হোলো প্রজ্ঞাচক্র, যেটা প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা সবেরই কেন্দ্র, কি-না অধিষ্ঠান স্থান ; মানুষের সব কিছু ধারণার স্থানই হোলো ঐখানে। পূর্ণ যৌবনের প্রভাবে যেমন নারী তার স্বাভাবিক প্রাণের টানে ভর্ত্তার সঙ্গে যোগাযোগ অপেক্ষা করে, মিলনের কাল যত নিকট হয়, ততই তার ব্যাকুলতা বাড়ে—তারপর হয় যোগাযোগ বা মিলন। একই সত্তায় পরিণত হয়ে পূর্ণ হয়, জীবের হয় পুনর্জ্জন্ম—চৈতন্য-শক্তির যোগে তখন তাঁর উপাধি হয় জীবাত্মা। তখন পরমাত্মায় পূর্ণতা ও অনন্ত ভাবটি ছাড়া আর সব ভাব বা ঐশ্বর্য্য ফুটতে থাকে জীবাত্মার মধ্যে। অবশ্য এই ফোটার ব্যাপারে কত জন্ম-জন্মান্তর হয়, তার হিসাব রাখছে কে ? ও দিকে জীবের স্থুল ইন্দ্রিয়জ ভোগের ঘোর কাটতেই কত জন্ম কাটে—তারও ঠিক নাই। পরে, জীবাত্মা পরমাত্মার লাগ পেয়ে সর্ব্বজ্ঞ হন, পূর্ণ হন, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হন,—এই হোলো জীবত্বের ইতিহাস ; আর রাধা-তন্ত্রের সার কথা। আমি স্তম্ভিত,—নির্ব্বাক বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলাম।

বাবা বলিলেন : যাঃ, এখন আর জ্বালাস না, তু চলে যা।

আমি বলিলাম : ও ত হোলো, এখনও একটা কথার মীমাংসা হয়নি যে !

বাবা বলিলেন : আবার কি ? এর পর আরও কি কথা হবে রে শালা, তু বলিস কি ?

আমি : এর পরের কথা নয়, আগের কথা। নরনারীর আসল সম্বন্ধটা কি ? কেমন করে আমরা এই মোহ-ঘটিত সম্পর্ক থেকে উদ্ধার পেতে পারি ?

তিনি বলিলেন : ও ত আপনিই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হবে, ও কারুকে বোলে দিতে হয় না। তোর ত বিয়া হয়েছে সন্তানও হয়েছে, তু ত সব জানিস ;—কেমন করে ছেল্যার জন্ম দিতে হয় সে কি তোকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে নাকি ?

আমি : সে ত একটা ব্যাপক মোহঘটিত ব্যাপার,—আসল সম্বন্ধটা তা হোলে কি ? জানতে ইচ্ছা হয় না কি ?

তিনি : ও ত শেষের কথা, এখন সে কথা কেন ? সময় হোলে মানুষে তা আপনি বুঝে।

আমি : দেখুন, আপনার সঙ্গ পেয়ে আমার কত লাভ। আমরা যে সব তত্ত্ব জানতাম না তা আপনার কাছে শুনে আমাদের কত উপকার। কুণ্ডলিনীর কথা শুনে ভরসা হোলো যে প্রকৃতির নিয়মে আপনাথেকেই ও শক্তি জাগে—এমন কথা আগে কোথাও শুনিনি যে তান্ত্রিক না হোলেও শক্তি জাগে।

তিনি : ও সবই গুহ্য কথা, ও রহস্য প্রকাশ করতে নাই,—সব কি বলতে আছে রে! আচ্ছা, তুই-ই চেষ্টা কর-না কেন ভাবতে, নরের সঙ্গে নারীর আসল সম্বন্ধটা কি! আমি বরং একটু আভাষে তোকে সাহায্য করছি,—

ভেবে দেখ, ঐ মেয়্যারা কি রকমে ছিষ্টি রাখছে—তাকে প্রথমে তুই পেলি কোথা ? প্রথমে দেখ, তোকে মা হয়ে পেটে ধরলে, তারপর এই জগৎ স্বষ্টির মাঝে তোর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তোকে প্রসব করলে—তারপর বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ করলে—তুই বড় হলি। যেমন যেমন তোর ভাব তেমন তেমন শক্তি পেলি, সামর্থ্য পেলি, শৌর্য্য-বীর্য্য পেলি, ক্রমে জোয়ান হয়ে কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনতে লেগে গেলি! আর একলা যেন থাকা চলে না, এতো সব থাকতেও কোনখানে বড় একা একা ঠেকে। তখন বৌ হয়ে এলো তোর জীবনের সাধ পূর্ণ করতে, সংসারের রহস্যময় নূতন নূতন স্বষ্টির দিকে লক্ষ্য পড়লো, ভোগের নেশা লেগে গেল, একেবারে মসগুল। নেশার ঘোরে কত স্বষ্টি করে ফেললি,—তার সঙ্গে মিলে জগতের কত কিছু দেখলি, কত কিছু জানলি,—যদি সঙ্গে সঙ্গে দিব্য-ভাবের খোঁজ পেয়ে গেলি তো ভাল, সব সম্বন্ধ সার্থক হয়ে গেল,—নিজের সঙ্গে সকলকারই স্বরূপ দেখতে পেলি ;—আর তা যদি না হোলো তবে মানুষ হয়েই রয়ে গেলি, পুরাণো ভোগের মক্‌সো চলতে লাগলো, আর সে তোকে শান্ত, যাতে কোনো তাপ না লাগে, তোকে আগলে তোর সেবাতেই লেগে রইলো! যত-কিছু তোর পাপ, তাপ, অসুখ, অশান্তি—আবার অপরদিকে তোর সুখ, সম্পদ, দুঃখ, উচ্চ-নীচ যত ভাব, তোর আদর অনাদরের, মান-অপমানের, বেগ ধরে জীবন-সঙ্গিনী হোয়েই রইলো। তোর স্বষ্ট জীবগুলি বড় হোয়ে তোর জগৎ-সংসারকে সফল করলো,—তুই হলি কর্ত্তা, সে তোর পিছনে, তোর সব-কিছুর বোঝা নিয়ে সঙ্গী হোয়ে রইলো। তারপর কাল পূর্ণ হলে, যদি তুই আগে সেঁটে গেলি তো ফাঁকি দিলি ; আর যদি সে আগে গেল ত তোকেই বুঝবার ভার দিয়ে গেল যে সে তোর কে ছিল ? সে না হোলে তোর আসা, এত বড় হওয়া—এত কাণ্ড করার কোন সম্ভাবনাই ছিল কি ?

এখন বুঝে দেখ্‌না কেনে তার সঙ্গে তোর কিসের সম্বন্ধ—বা কোথায় সম্বন্ধ।

আমি অনেকক্ষণ যেন স্তম্ভিত হইয়াই রহিলাম। বাবা স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না বটে কিন্তু যে বস্তুর আভাস দিলেন সেটা ত সহজ বা সরল ব্যাপার মনে হয় না। একটি অস্পষ্ট বিশাল নগ্ন, সত্য যেন মূর্ত্তি ধরিয়া অন্তঃকরণের সবটা জুড়িয়া উঁকি মারিতেছে,—এ কি!

ইতিমধ্যে বাবার সেবক, ছিলাম প্রস্তুত করিয়া হাতে ধরাইয়া দিল এবং দূরে পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আমি ভাবিতেছি,—এক জীবনেই যেন চক্র সম্পূর্ণ হইয়া গেল—বস্ তারপর আর কোনই সম্বন্ধ নাই! তারপর আবার মনে হইল ঠিক যেন বিরাট পথে পথিকের সঙ্গে পথিকের দেখার মত—মধ্যে কতকটা পথ একসঙ্গে চলিয়া শেষে আর যেন সম্বন্ধ নাই,—তাহা হইলে দার্শনিকেরা যেমন বলিয়া থাকে। একথাটা অত্যন্ত স্থূল।

ইতিমধ্যে বাবা কখন কলিকার কাজ শেষ করিয়াছেন লক্ষ্য ছিল না, হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, বলিতেছেন: না না, এক জন্মেই সব শেষ হবে কেনে, আসলে দুজনের শেষ একসঙ্গেই হবে যে! শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: সে কখন, জন্মান্তরে নাকি?

তিনি বলিলেন: জন্মান্তর? ও ত দিনরাতের ব্যাপার! তার হতে যদি তোর কি ভালো হয়ে থাকে তোর হতেও তার কিছু ভালো ত হয়েছে বটে? তুইও যেমন তাকে চাস, সেও ত তোকে তেমনিই চায়, তু যেমন তাকে ছাড়তে চাস নাই সেও ত তোকে ছাড়তে চায় নাই—দুজনা দুজনার কাজ গুছিয়ে ল্যায় যে! ছাড়াছাড়ি এই শরীরটাতে হোলো, কিন্তু বাকি সবই রইলো। যতক্ষণ না শেষের কাজ মিটে।

আমি: জীবন-সঙ্গিনী আবার জন্মজন্মান্তরেও ধাওয়া করেন নাকি?

তিনি: ভয় করে নাকি তোর? যথার্থ ই তুই যদি তাকে চাস, সত্যই তোর টান যদি থাকে তবেই তো ধাওয়া; যদি তা না থাকে তবে কে তোকে ধরতে যাবেক, কার এত মাথা-ব্যথা বল্ দিকি?—

সমাপ্ত